সৌরভ

সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচন।

—সম্পাদক—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

—ষষ্ঠ বর্ষ—

কার্ত্তিক ১৩২৪ হইতে আশ্বিন ১৩২৫।

ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য—দুই টাকা।

PUBLISHED FORM
RESEARCH HOUSE—MYMENSINGH.

বিষয় সূচী।

ষষ্ঠ বর্ষ } ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩২৪। { প্রথম সংখ্যা।

বাঙ্গালায় পূজা।

বাঙ্গ্‌লা দেশে জঙ্গ্‌লা মেয়ে পাহাড়ে পার্ব্বতী
আস্‌বে না আর পূজা খেতে দুর্গা ভগবতী!
জগৎ ভরা এবার তাহার আদর আমন্ত্রণ,
জেপেলিনে সবমেরিণে দেবীর আগমন!
দেশে দেশে লেগে গেছে মহা পূজার ধূম,
দিকে দিকে শঙ্খ বাজে গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্!
আত্মবলি দেয় সকলি রক্তে ডাকে বান,
জয়ের উপর জয়ের কেবল বিজয় অভিযান।
আকাশ রাঙ্গা পাতাল রাঙ্গা রাঙ্গা সাগর জল,
রাঙ্গায় রাঙ্গায় হাস্‌ছে মায়ের রাঙ্গা চরণ তল!
বুকের রক্ত দেওয়ার ভক্ত বঙ্গবাসী নয়,
চাল কলা কি ছাগল ভেড়া অধিক যদি হয়!
দিবে হদ্দ বিলের পদ্ম বনের দুর্ব্বা ঘাস,
আর কি,—দুটা বেলের পাতা—এইত অভিলাষ!
শরৎ কালের শেফালিকা ঝুপ্‌রি ভরা ঝরে,
সস্তা পেয়ে কিঞ্চিৎ দিবে পদ্ম পায়ের 'পরে!
ধূপ পোড়ায়ে গন্ধ দিবে, প্রাণ পোড়ায়ে নয়,
কোমল বুকে কেমন করে' কামান গোলা সয়?
ছিঁড়েদিছে বেল্‌জিয়ম তার হৃদয়-শতদল,
বৃটন্ দিয়াছে তার অর্ঘ বাহু-বল।
রুমেনিয়া সাজিয়া সে শেফালিকার মত,
উজার করে পূজার ধূমে বীরের জীবন কত!
উৎসর্গ সে দূর্ব্বাদল 'শ্যাম' অর্ঘ্য তার
লাক্সেমবর্গ মণ্টিনিগ্রো সাইবেরিয়া আর!
রুষিয়া পেষিয়াদিছে উষীর বিলেপন,
চূর্ণ করি জীর্ণ জারের মুকুট সিংহাসন!
সেলনিকা দীপ্তশিখা দগ্ধ হৃদয়তল
পূজার ঘরে উজল করে প্রদীপ সমুজ্জ্বল!
ভার্দ্দুনের সে ধূনার ধূমে জগৎ অন্ধকার,
পলে পলে গর্জ্জে কামান লক্ষ হাউটজার!
ইটালিদেয় লাল পিটালীর গড়িয়ে স্বস্তিক,
আল্পসের সে কল্প চূড়ায় হাস্‌ছে দশদিক্!
'জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষোজহি' বলি
আকুল্ অধীর্ দিতেছে বীর্ রুধিরের অঞ্জলি!
রঘুর ভিটায় ঘুঘু চরে! এই সুরথের দেশ?
অরথ বিরথ নীরথ ভারত জড়ভরত বেশ!
কোথায় বা সে মেধস মুনির পুণ্য তপোবন,
লণ্ড ভণ্ড কমণ্ডলু দণ্ড কুশাসন!
বিশ্বখ্যাত শিষ্য কই সে শক্তি উপাসক,
কে দিবে আজ হৃদয়-পদ্ম রক্ত-গঙ্গোদক!
আসবেনা আর এদেশে তাই শক্তি দশভুজা,
কোণায় করে সোণাবাবু কলা বৌয়ের পূজা!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

আলোচনা ও মন্তব্য।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দু—তাহাদের অবস্থা ও ব্যবস্থা।

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু—সংখ্যায় ও সামাজিক, বৈষয়িক ইত্যাদি বিষয়ে যে ক্রমশঃই অধোগতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বোধ হয় বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। যে সকল ব্যক্তি নিজেদের জাতির কল্যান কামনা করিয়া থাকেন বা যাঁহারা এই সব বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে কি দুর্দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এবং এই দুর্দিনে শিক্ষিত হিন্দুরা তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে পরাঙ্মুখ হইলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর এ সংসার হইতে লোপ হওয়া সামান্য সময় সাপেক্ষ মাত্র। এই সময়ই শিক্ষিত হিন্দুর সমক্ষে নিম্ন শ্রেণীর দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করিবার উপযুক্ত সময়। আশা করি উন্নত চরিত্র, শিক্ষিত, সহৃদয় হিন্দুগণ উদারতার সহিত বিষয় আলোচনা করিয়া তাহাদের প্রতি নিজদের কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

হিন্দু রাজাদের রাজত্বকালীন তাঁহারা জাতি বর্ণ প্রভৃতির বিবাদ নিজেরাই বিচার করিতেন। গৌতম ও মনুসংহিতায় এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার রাজা বল্লাল সেন কয়েক জাতিকে উন্নীত এবং কয়েক জাতিকে পাতিত করেন। বল্লাল চরিত পাঠে জানা যায় যে তিনি কৈবর্ত্তকে জল আচরণীয় করিয়া দেশে প্রচলন করেন এবং কাঁসারি ও মালী-দিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর পদ প্রদান করেন। মোগল বাদসাহদের রাজত্বকালীন এই সব জাতি বর্ণ ঘটিত বিবাদ তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের সহায়তায় সম্পন্ন করিতেন। ১৬৭৯ খৃঃ ১৬ই আগষ্ট তারিখের বিচার বিভাগের বিবরণীতে লিখিত আছে "হিন্দুদিগের জাতি চ্যুতি সম্বন্ধীয় শাস্তি ব্রাহ্মণদিগের নিকট পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত হইলে তাহা রাজ বিধিদ্বারা সম্পন্ন করাইবে। অধিকাংশ সময়ে হিংসা, দ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া লোকে জাতিচ্যুতির প্রার্থনা করে কিন্তু আমাদিগকে সেই সব বিষয়ের বিশেষ সাবধান হইতে হইবে এবং আমাদের অনুমতি ব্যতীত কাহাকেও জাতিচ্যুত করা হইবে না।" অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই সব জাতিচ্যুতি ব্যাপারের বিচার করিতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে একটী জাতিমালা কাছারি ছিল এবং মহারাজা নবকৃষ্ণ, কান্তবাবু এবং গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সময়ে সময়ে সেই কাছারীর অধ্যক্ষ স্বরূপ কার্য্য করিতেন। শেষ দুইজনকে লইয়া মহামতি Burke, Warren Hastingsএর বিরুদ্ধে বিশেষভাবে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন "He has put his own menial domestic servant—he has enthroned him, I say, on the first seat of ecclesiastical Jurisdiction, which was to decide upon the castes of all those people, including their rank, their family, their honour, and their happiness here, and in their Judgment, their salvation hereafter." বোধ হয় ইহার পর হইতেই East India Company জাতিমালা কাছারি উঠাইয়া দিয়া থাকিবেন।

উপরি উদ্ধৃত বিবরণ হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে হিন্দুদিগের এই জাতি বিচার ইত্যাদির জন্য কোনও না কোনও প্রকারের বৈঠক ছিল। এবং এখন তাহা নাই। তাহা না থাকার দরুণ হিন্দুদিগের বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতিগত কোনও বিবাদ বিসম্বাদ হইলে তাহার মীমাংসা হওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বিশেষ ভাবে পূর্ব্ববঙ্গে সামান্য ২ কারণে জাতিচ্যুত হইয়া, পুনরায় স্বজাতি সমাজে প্রবেশাধিকার না পাইয়া অনেক কে অন্য সমাজের আশ্রয় লইতে হইতেছে। শিক্ষিত, উদারমতাবলম্বী হিন্দুদিগের কি এখন কর্ত্তব্য নয় যে তাঁহারা এই জাতিমালা কাছারির স্থান অধিকার করেন? তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য নয় যে তাঁহারা হিন্দু-দিগের জাতি বর্ণ প্রভৃতির বিবাদ মীমাংসার ভার গ্রহণ করিয়া বহু হিন্দুদিগকে জাতিচ্যুতি হইতে রক্ষা করেন?

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে নমশূদ্র, কৈবর্ত্ত দাস এবং রাজবংশী এবং কিয়ৎ পরিমাণে তিয়র জাতিই সংখ্যায় প্রধান। কৈবর্ত্ত সংখ্যায়—২৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৯০;

নমশূদ্র ১৯ লক্ষ ৮ হাজার ৭২৮; রাজবংশী ১৮ লক্ষ ৮ হাজার ৭৯০ এবং তিয়ড় ২ লক্ষ ১১ হাজার ২৭০। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এক তিয়ড় ভিন্ন অন্য তিন জাতির ভিতরে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক কম। কৈবর্ত্তদের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার, নমশূদ্রদের মধ্যে ২৫ হাজার ৬ শত, রাজবংশীদের মধ্যে ৬৩ হাজার ৭ শত স্ত্রীলোক। শুধু তিয়ড়দের মধ্যে ২ হাজার ৮ শত বেশী। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা যে পরিমাণে কম তদুপরি তাহাদের বিবাহ প্রথার কঠোরতা এবং বিধবার সংখ্যার আধিক্যের বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে আন্দোলন আলোচনা করিয়া সামাজিক রীতি নীতি কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে ইহারা ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইবে। যে নমশূদ্রদের মধ্যে প্রায় ৩৫ হাজার—১ হইতে ১২ বৎসরের বালিকা বিবাহিতা, এবং ৫ হাজার বাল বিধবা সেই সমাজে ১২ হইতে ৬০ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতার সংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার। বাল বিধবার সংখ্যা বাদ দিলে দেখা যায় যে ৪০ বৎসর বয়স্কা পর্য্যন্ত প্রায় এক লক্ষর উপর বিধবা আছে এবং ২০ হইতে আমরণ বিবাহ করিতে পারে না এরূপ পুরুষের সংখ্যা প্রায় ৫২ হাজার। রাজবংশীদের মধ্যে বাল বিধবা প্রায় ৩ হাজার এবং ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিধবার সংখ্যা প্রায় ৬২ হাজার। কৈবর্ত্তদের মধ্যে ঐ ঐ সংখ্যা প্রায় ৭হাজার এবং এক লক্ষ ১৫ হাজার। ইহাদের মধ্যে অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যাও কম নহে। বিবাহের কঠোর নিয়মের জন্য যে পরিবারে ৪। ৫ জন পুরুষ আছে তাহাদের ১ কি ২ জন ব্যতীত বাকী কয়েক জন বিবাহ করিতে সক্ষম হয়না এবং যাহারা বিবাহ করে তাহাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে পরিবার ধ্বংশে পরিণত হয়। ইহাদিগকে টাকা দিয়া বিবাহ করিতে হয়। অর্থের লোভে দরিদ্র পিতা মাতা ৫। ৭ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ দেয় এবং অল্প বয়স্কা কন্যাকে অল্প টাকা দিয়া পায় বলিয়া ২০। ৩০ বৎসরের যুবা ৫। ৭ বৎসরের কন্যার পানি গ্রহণ করে। ইহার বিষময় ফল সমাজ প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছে। এই গেল সমগ্র বঙ্গের হিসাব।

মৈমনসিংহের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

	১৯১১		১৯০১	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক
নমশূদ্র	৮৬০০৪	৭৮৯০২	৭৯৭০৪	৭৬১৭৯
কৈবর্ত্ত	৬৫৪১৭	৬৪৫৮০	৬৫২৬৭	৬৫৪৯৪
তিয়ড়	১১৩০৪	১১৪৫১	১১২০৯	১১৩৮০

উপরি উক্ত হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে কৈবর্ত্তদের মধ্যে ১৯০১ সালে পুরুষের অপেক্ষা ২২৭টী স্ত্রীলোক বেশী ছিল কিন্তু ১৯১১ সালে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৩৭টী কমিয়া গেল। অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করা এই সংখ্যা হ্রাসের এক প্রধান কারণ তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এই জেলায় হিন্দুর সংখ্যা ১৮৯১ হইতে ১৯০১ সালে বাড়িয়াছিল শতকরা ৪; অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী বাড়িয়াছিল শতকরা ১৬ এবং ১৯০১ হইতে ১৯১১ তে হিন্দুর বাড়িয়াছে শতকরা ৬ ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর বাড়িয়াছে প্রায় ২০।

কি কি কারণে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সমাজ এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়েছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা শিক্ষিত হিন্দু সমাজের নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। সামাজিক কু প্রথা যে একটী প্রধান ও অন্যতম কারণ সে বিষয়ে যে মত ভেদ হইতে পারে না তাহা নিশ্চয়। আরও অনেক কারণ আছে তন্মধ্যে অন্য সামাজিক রীতি নীতির বিষয়ই আলোচনা করা যাউক। প্রথমে বিবাহ প্রথার সংস্কার না করিলে উন্নতির দিকে কিছু মাত্র অগ্রসর হওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয় না। বিবাহ প্রথার সংস্কার করিতে হই-লেই পণ প্রথা নিবারণ এবং ১ মাসের শিশু হইতে ১২।১৪ বৎসরের নাবালিকা বিবাহের প্রথা নিবারণ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। স্ত্রী লোকের সংখ্যা কম হওয়ার দরুণ এবং বিধবাদের পুনঃ বিবাহ প্রচলিত না থাকায় অল্প বয়সেই কন্যা বিবাহের আবশ্যক হইয়া পড়ে। অনেকেরই অবস্থা স্বচ্ছল না থাকায় উপার্জ্জন-ক্ষম হইয়া পণের ৩।৪ শত টাকার সংস্থান করিতে প্রায় ২৫।৩০ বৎসর বয়স অতিক্রম করে এবং তখন এক ৫।৭

বৎসরের বালিকার পানি গ্রহণ করে। বালিকা পূর্ণ যৌবনের সময় স্বামী বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়, না হয় কালগ্রাসে পতিত হয়। তাহার ফলে সমাজে ব্যভিচারদোষ এবং স্ত্রীজাতির অন্য ধর্ম্মালম্বন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এই সব সমাজে যে ব্যক্তি বিবাহ করিতে পারে না বা যাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে, সে একটী বিধবাকে লইয়া স্বামী স্ত্রীভাবে জীবন যাপন করিয়া থাক। ইহা সমাজে দূষণীয় বলিয়া গণ্য নহে কিম্বা তাহাদের লইয়া আহারাদি বা সামাজিক কোনও গোল মাল হয় না। ইহাকে তাহারা "সাংঘা" বলিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে এই সংঘা কে শাস্ত্রীয় প্রথা অনুসারে বিবাহে পরিণত করিয়া লয় না। সমজে এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবে, তবুও শাস্ত্রীয় পথ অবলম্বন করিয়া পবিত্র দাম্পত্য জীবন যাপন করিবে না। ইহাদের সমাজে পূর্ব্বে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। মরণোন্মুখ জাতির যাহা হইয়া থাকে ইহাদের ও তাহাই হইয়াছে—প্রাচীন প্রথা বর্জ্জন করিয়া সমাজে পাপের স্রোত বৃদ্ধি করিয়া সংখ্যায় দিন দিন হ্রাস হইতেছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলন না করিলে ইহাদিগকে ধংস হইতে রক্ষা করিবার উপায় নাই।

এই সঙ্গে কো অপারিটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে একতার ও সম্মিলনী শক্তির বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করা এবং শিক্ষার প্রচার করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের এই দুরবস্থা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করাইয়াদিতে সাহায্য করা অন্য প্রধানতম উপায়। এই তিনটীকাজ বিশেষ দরকার এবং ইহা শিক্ষিত সমাজের একটী অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। শিক্ষিত হিন্দু সমাজ নিজের কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিলে যে অন্যায় কার্য্য হইবে তাহাতে তাঁহাদিগকেও যে ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হইবে ও বিশেষরূপে ফল ভোগ করিতে হইবে তাহা নিশ্চিত।

শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী।

আত্মহত্যা।—আমাদের দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা যে ইদানীং বাড়িয়া চলিয়াছে,তাহা বোধ হয় সকলেরই চোখে পড়িয়াছে। স্নেহলতার আত্মহত্যার পর দেশে একটা সভা করিবার ধুম পড়িয়াগিয়াছিল। আমাদের মধ্যে এমন লোক বোধ হয় খুব কমই আছেন, যিনি খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা দেখিতে এবং পরকেও আকারে ইঙ্গিতে দেখাইতে চান না। সভার পৌরহিত্য করিতে পারিলে যত সহজে নামটা ছাপা হয়, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। সেই জন্যই হউক, কিংবা আপাততঃ হাতে বয়ঃস্থা কন্যা ছিল বলিয়াই হউক—যে কারণেই হউক, স্নেহলতার দেহ যে আগুণে পুড়াইয়াছিল তাহার নির্ব্বাণ হওয়ার আগেই দেশে যে সভার আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, অনেক মনীষী তাহাতে দেহ-প্রাণ দান করিয়াছিলেন।

বর-পণ রহিত করাই ছিল সভাগুলির উদ্দেশ্য; কিন্তু তাহা হয় নাই। যাঁহারা সভায় মেয়ে চালাইয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা পারেন নাই। সে জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু আসল যে সামাজিক সমস্যাটী—তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি যায় নাই, সে জন্য আমরা আরও দুঃখিত।

কেহ যেন মনে করেন না, আমাদের কন্যা নাই; কিন্তু তথাপি বর-পণ যে মানবের সভ্যতার একটা অতি ভয়ঙ্কর অন্তরায়, একথা আমরা মানিতে প্রস্তুত নই। আর, যদিও বা কন্যাদায়-গ্রস্ত বন্ধুর বিপদে সহানুভূতি দেখাইয়া বর-পণের অন্যায্যতা স্বীকার করি, তথাপি বর-পণ রহিয়াছে বলিয়াই যে এদেশে এত আত্মহত্যা হইতেছে একথা মানিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

বিষয়টী কি? উপর্য্যুপরি কতকগুলি আত্মহত্যা এ দেশে ঘটিয়াছে। সবগুলির বৃত্তান্ত কাগজে প্রকাশিত হয় নাই বটে, কিন্তু সকলেরই দুই চারটীর কথা জানা আছে। সব স্থলেই অবিবাহিত কন্যা আত্মহত্যা করে নাই, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আত্মহত্যা যারা করিয়াছে তারা রমণী।

আত্মহত্যা নানা কারণে মানুষ করে, কিন্তু কোনও একটা বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইলে যতটুকু ধৈর্য্য এবং পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়; তাহা আমরা অনেক সময়ই করিতে যাই না। যেহেতু বর-পণে কাহারও

অসুবিধা হইতেছে সকলের অসুবিধা ইহাতে নিশ্চয়ই হয় না—এবং যেহেতু এক জায়গায় টাকা ছাড়া উচ্চ বংশের সৎপাত্রের সহিত বিবাহ হয় নাই বলিয়া কোনও বালিকা প্রাণ দিয়াছে,সুতরাং সমস্ত আত্মহত্যারই এ একই কারণ, ইহা মনে করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ বিবাহিত রমণীর বেলায় বর-পণ কারণ হইতে পারে না।

তবে, কি কারণে এত সব আত্মহত্যা হইতেছে? প্রথমতঃ আমাদের দেখা উচিত, আগের চেয়ে ইহা বাড়িয়াছে কিনা। দ্বিতীয়তঃ দেখা উচিত ইহার কোন সাধারণ কারণ আছে কিনা। সর্ব্বত্রই ঠিক একই কারণ থাকিতে পারে না, কিন্তু রমণীই যেখানে অতিমাত্রায় আত্মহত্যা করিতেছে, সেখানে এমন কিছু একটা বিশেষত্ব আছে যাহা আমাদের রমণীদের অবস্থার সহিত সংসৃষ্ট। সেই বিশেষত্ব টা কি?

এই অনুসন্ধানে অনেক অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ, অনেক হত্যাও আত্মহত্যা বলিয়া চলিয়া যায়; ভদ্র গৃহে এরূপ ঘটনার সংখ্যা খুবই কম বটে, কিন্তু নাই বলা যায় কিনা সন্দেহ। দ্বিতীয়তঃ পুলিশের ভয়ে কিংবা সামাজিক নিন্দার ভয়ে, অনেক আবশ্যক বৃত্তান্ত চাপা পড়িয়া যায়। তৃতীয়, এরূপ একটা সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে বহুতর ঘটনার একত্র সমাবেশ ও তুলনা আবশ্যক; সেরূপ এখনও করা হয় নাই। সুতরাং জিজ্ঞাসা হওয়া মাত্রই এ সম্বন্ধে আমরা একটা উত্তর করিতে পারিতেছি না।

যদি আগের চেয়ে—অর্থাৎ যখন বর্ত্তমান শিক্ষা এতদূর প্রসার লাভ করে নাই তখনের চেয়ে—এখন রমণীর আত্মহত্যা বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কারণ যাহাই হউক না কেন,—সমাজের নূতন যে সব পরিবর্ত্তন হইয়াছে সে সকলের মধ্যেই থাকিবে। আমাদের নূতন শিক্ষা—বিশেষতঃ আমাদের উপন্যাস সে জন্য কতটুকু দায়ী? উপন্যাসের নায়িকা যে দুই একখানা চিঠি লিখার পরই আফিমের কৌটা খুলেন, আমাদের রমণীরা সেটাকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ত?

প্রশ্নটী আলোচনার অযোগ্য নহে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যথা সময়ে আমরা ইউগণ্ডার রাজধানীতে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম আমাদের দুইজনকে ঐখানে প্রায় একবৎসর কাল থাকিতে হইবে। এই দেশে কয়েকটি পাকা রাস্তা প্রস্তুত করাইবার ভার কাপ্তেন সাহেবের হাতে দেওয়া হয়। ডাক্তার সাহেবেরও দেশটা খুব ভাল লাগাতে তিনিও যোগার যন্ত্র করিয়া এখানে থাকিবার আদেশ পাইলেন। কাপ্তেন সাহেবের অনুগ্রহে রবি এই রাস্তা প্রস্তুত কাজে বেশ একটি বড় চাকরী পাইল। আমিও বাদ গেলাম না। এই কার্য্য উপলক্ষে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ১০০০ কুলি আনা হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে ১৭৭ জন মিস্ত্রী ছিল। ইহাদের সুখাসুখের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমার কাজ হইল। এদেশে ইহাদের কোনও প্রকার কষ্ট হইতেছে কিনা? উহাদের প্রতি উপরিতন কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহার কি প্রকার হইতেছে, খাদ্যাদি ভাল সরবরাহ হইতেছে কিনা, উহাদের বাস করিবার জন্য উপযুক্ত বাস ভবন পাওয়া গিয়াছে কিনা প্রভৃতি কাজ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিবার ভার আমাকে দেওয়া হইল। এই ভারতবর্ষীয় মিস্ত্রী ও কুলীদিগের খাদ্যাদি সরবরাহের জন্য গভর্ণমেণ্ট নিজে দোকান খুলিয়াছিলেন। ঐ দোকানে দ্রব্যাদির দর বাঁধা ছিল। উহার অধিক আদায় করিলে দোকানদারের কঠিন শাস্তি হইত। আমরা পূর্ব্বে যে ইউগণ্ডা রেলের কথা বলিয়াছি, উহাতেও ঐ প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় কুলি প্রভৃতির সুখাসুখের প্রতি গভর্ণমেণ্ট বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

এই কাজ করিবার জন্য আমাকে ইউগণ্ডার ভিন্ন২ স্থানে যাতায়াত করিতে হইত, এজন্য এদেশীয় ভিন্ন২ শ্রেণীর লোকদিগের সহিত মিশিবার অবসর পাইতাম। এই কারণে আমি এদেশের অনেক রকম অদ্ভুত আচার ব্যবহারের কথা জানিতে পারিয়াছিলাম। এইবার আমি উহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। পাঠকেরা একটা কথা মনে রাখিবেন। এই সকল আচার ব্যবহার শুধু যে একটি বিশেষ স্থানে আবদ্ধ তাহা নয়।

অনেকগুলি প্রথা ইউগণ্ডা, ব্রিটিস্ ইষ্ট আফ্রিকা, জর্ম্মান ইষ্ট আফ্রিকা, কঙ্গো প্রদেশ প্রভৃতি অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে আমরা যে সব আচার ব্যবহারের কথা লিখিয়াছি, সে সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলিতে পারা যায়। আমি যে সব কথা বলিয়াছি বা বলিব তাহা স্বচক্ষে দেখা। ইহাদের তিলমাত্র অত্যুক্তি নাই। ঠিক যেমন-টি দেখিয়াছিলাম, তাহাই লিখিয়াছি।

ভূতের ভয় ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। ইহাদের দৃঢ়বিশ্বাস জীবজন্তু মৃত্যুর পর ভূত যোনি প্রাপ্ত হয়, এবং জীবিতাবস্থায় যেখানে বাস করিত, ভূত হইয়াও সেইখানে অদৃশ্য ভাবে অবস্থিতি করে। তবে উহারা বাড়ীর মধ্যে থাকিতে পারে না। গ্রামের মধ্যে বড়২ গাছ বা জঙ্গলের মধ্যে থাকে। এইজন্য এদেশের লোক সন্ধ্যার, পর বড় গাছ বা গভীর জঙ্গলের মধ্যে সহজে প্রবেশ করে না।

ভূত দুই শ্রেণীর। ভাল ও মন্দ। ভাল ভূতেরা কাহারও অনিষ্ট করে না, বরং অনেক সময় মন্দ ভূতের হাত হইতে নরনারীকে রক্ষা করে। দুঃখের বিষয় মন্দ ভূতের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইহারা সর্ব্বদা লোকের অনিষ্ট করিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়। গাছের উপর থুথু ফেলিলে, প্রস্রাব করিলে বা ময়লা ফেলিলে ইহারা প্রায়ই অনিষ্ট করিয়া থাকে। আমাদের দেশের মত ঘাড়ে চাপে, পালিত পশু পক্ষীর মধ্যে মড়ক আনয়ন করে, ঘরে আগুণ লাগাইয়া দেয়, বাড়ীর লোকদিগের মধ্যে নানা প্রকার দুঃসাধ্য রোগের সৃষ্টি করে। কাহারাও একটু কঠিন রকম পীড়া হইলে ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, উহা ভূতের কাজ। এই রকম ধারণা বলিয়া, এদেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। কাহারও পীড়া হইলে ও উহা একটু কঠিন ভাব ধারণ করিলে গৃহস্থ গ্রামের জুজু পুরোহিতকে ডাকিয়া আনে। তিনি ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু খুব কম। মন্ত্র ও তুক্‌তাক্ তাঁহার প্রধান সহায়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই জুজু দিগের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। দেশের সমস্ত লোকই নিরক্ষর। প্রায় সকলেই নির্ব্বোধ, নানা প্রকার কুসংস্কার পূর্ণ ও নিতান্ত সরল। আমরা আজকাল যাহাকে বলি 'সেকেলে' এখানকার সকলেই তাই। তবে ইহাদের মধ্যে যাহারা একটু চালাক চতুর হয়, ৫।৭টা নূতন কথা শিখে, তাহারা এদেশে একটা 'কেষ্টবিষ্ণু' হইয়া দাঁড়ায়। ইহারা যে নিজের কারদানি দেখাইয়া সকলকে ঠকাইয়া বেড়াইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? এই প্রকারের লোকই এদেশে জুজু পুরোহিত হয়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে জুজুর ছেলে হয়ত বাপের মত চালাক হয় নাই। সে ক্ষেত্রে বাপ তাহাকে নিজের কাজ প্রায়ই শেখান না। তিনি জানেন যে নিতান্ত ভাল মানুষ হইলে এ ব্যবসায় কখনও উন্নতি করা যায় না। বরং লোকের কাছে ধরা পড়িয়া অপদস্থ হইবার ভয় থাকে।

এদেশের ঔষধাদি সমস্তই লতা, মূল, পত্র, গুল্ম প্রভৃতি। সামান্য জ্বর, উদাময়, সর্দ্দি ইত্যাদি হইলে এই সব দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়। পীড়া কঠিন হইলে জুজু আসিয়া মন্ত্রাদি পাঠ করেন ও অপদেবতার উদ্দেশে ছাগ, মুরগি, ভেড়া এবং রোগ বিশেষ কঠিন হইলে গো, মহিষ এমন কি নরবলি পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। এই জুজু দিগের ক্ষমতা কি প্রকার অপ্রতিহত তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দেশের রাজারা পর্য্যন্ত ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলেন। কাহারও সহিত শত্রুতা থাকিলে ইহারা ঐব্যক্তিকে ডান বা ভূতাশ্রিত বলিয়া প্রচার করিয়া তাহাকে জলে ডুবাইয়া বা আগুণে পোড়াইয়া মারিতে পারে। এদেশের নিয়ম এইযে, ডাইনি বা ভূতাশ্রিত দিগকে প্রায়ই এই দুই উপায়ে নিহত করা হয়।

জুজুরাও এক২ সময় খুব জব্দ হয়েন। একবার কোনও কারণে একজন লোক গ্রামের জুজুর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। ইহার কয়েক দিবস পরে সে প্রচার করে যে, তাহার এক কঠিন পীড়া হইয়াছে। সে সর্ব্বদা লম্ফ ঝম্প দিত, সকলকে কামড়াইতে যাইত, কখন২ কাঁদিয়া উঠিত। যথাসময়ে জুজু মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রোগীর সম্মুখে বসিয়া নানা প্রকার মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। যাহাতে রোগী কাহারও উপর অত্যাচার না করে এই জন্য দুইজন লোক তাহার দুই পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। হটাৎ রোগী এক লম্ফে

জুজুর উপর আসিয়া পড়িল এবং তাহাকে এমন প্রচণ্ড ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল যে চিকিৎসক অবিলম্বে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। রোগীর রাগ তখনও পর্য্যন্ত যায় নাই। সে অবশেষে ঐ হতভাগ্য জুজুকে এমন ভাবে কামড়াইয়া দিল যে উহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

ইউগণ্ডায় রক্তমোক্ষণ, জোঁকবসান ইত্যাদি প্রথাও দেখিলাম। এসব কাজ করিবার জন্য এদেশে এক শ্রেণীর লোক আছে, ইহারা এখানে 'সবটু' নামে পরিচিত। জ্বর হইলে এখানে প্রায়ই কাঁচা তামাক পাতার রস খাওয়ান হয়, অনেকে তামাক পাতা মুখে রাখে। শুনিলাম, সাধারণ জ্বর ইহাতে প্রায়ই ভাল হয়। সর্দ্দি হইলে অনেকে মধু পান করে দেখিলাম। আমার যতদুর অভিজ্ঞতা তাহাতে বোধ হইল এদেশে রোগের সংখ্যা খুব অধিক নয়। তবে ভাল চিকিৎসক না থাকাতে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা খুব অধিক; বিশেষতঃ শিশুদিগের মধ্যে। এদেশের স্থানে স্থানে য়ুরোপীয় চিকিৎসকের আমদানি হইয়াছে বটে,কিন্তু এখন পর্য্যন্তও ইহাঁদের উপর অধিবাসীদিগের সে প্রকার আস্থা হয় নাই। তবে অস্ত্র করিবার প্রয়োজন হইলে ইহারা প্রায়ই ইহাঁদের নিকট উপস্থিত হয়। য়ুরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত ডাক্তার ইহাদের মধ্যে এখন একজনও দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমরা ভূতের কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এই বিশ্বাসটা এদেশে যে কিপ্রকার প্রবল তাহা বোধ হয় আমি ঠিক বুঝাইতে পারিব না। এই বিশ্বাস এত প্রবল যে পিতা মাতা পুত্রকে, স্বামী স্ত্রীকে, মনিব ভৃত্যকে প্রায়ই বিশ্বাস করে না। হয়ত কোনও মন্দভূত তোমার স্ত্রীকে একদিন সন্ধ্যার সময় কোনও বড় গাছের তলায় একা পাইয়া তাহার ঘাড়টা মট্‌কাইয়া দিল, তাহার পর উহার দেহকে আশ্রয় করিয়া তোমার সহিত স্ত্রীরমত বাস করিতে লাগিল। এপরিবর্ত্তন তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? এই জন্য এদেশে সকলেই অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে বাস করে। এদেশে কাহারও উপর কোনও লোকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইলে জুজু মহাশয়কে আহ্বান করা হয়।

ভূতেরা অনেক সময় পশু পক্ষীর দেহ পর্য্যন্ত আশ্রয় করিয়া থাকে। এই জন্য এদেশের লোক ইহাদিগকে বিশ্বাস করে না। এ দেশের চারিদিকে যে প্রকার গভীর জঙ্গল এবং উহা যে প্রকার নানারকম ভীষণ ও অদৃষ্টপূর্ব্ব জীব জন্তুতে পূর্ণ এই নিরক্ষর লোকদিগের মনে এপ্রকার ভূতের বিশ্বাস হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

অনেক সময় ভূতেরা কাহারও অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা করিলে গৃহস্থের বাড়ীর ছাদের উপর বা উঠানে উপস্থিত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করে। নৃত্যটা ঠিক মাটীর উপর হয় না। ভূমি হইতে প্রায় ২ হাত উপরে শূন্যেতে ও অলক্ষ্য ভাবে ঐ নৃত্য চলিতে থাকে। ঐ সময়ে সে আকর্ষণী বিদ্যা দ্বারা ঐ বাড়ীর যাহাকে ইচ্ছা তাহার বুক হইতে রক্ত শোষণ করিতে থাকে। একদিনেই অবশ্য সমস্ত রক্ত শুষিয়া লয় না। কয়েক মাস পর্য্যন্ত এই কার্য্য চলিতে থাকে। তাহার পর অবশ্য তাহার মৃত্যু হয়। যক্ষ্মা কাশ দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস কোনও ভূত অলক্ষ্যে উহার বুকের রক্ত পান করিতেছে। এই প্রকারের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইহারা বাড়ীর ছাদে, দরজার উপর ও উঠানে অনেক সময় ছোট ছেলের মাথা, গণ্ডারের দাঁত বা কুমীরের লেজ ঝুলাইয়া রাখে।

যখন এদেশ ইংরাজ শাসন প্রবেশ করে নাই, তখন ডাইনি পরীক্ষা করিবার উপায় এক এক স্থানে বড়ই ভীষণ ছিল। কাহারও উপর এপ্রকার সন্দেহ হইলে গ্রামবাসীরা তাহাকে গ্রামের বাহিরে জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গিয়া এক গাছের সহিত ভাল করিয়া বাঁধিত, এবং তাহার পর পেটে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ এক ছিদ্র করিয়া দিত। উহাদের ধারণা ছিল যে, সে যদি সত্যই ডাইনি হয়, তাহা হইলে উহার পেটের ভিতর হইতে ভূত মহাশয় কোনও ছোট পাখী, গিরগিটি বা ব্যাঙ প্রভৃতির আকারে বাহির হইবে। যদি কিছুই বাহির না হইত, তাহা হইলে অবশ্য তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কিন্তু তাহাতে হতভাগার বিশেষ কিছু লাভ হইত না। প্রায়ই রক্তপাত হইয়া উহার মৃত্যু হইত।

আজ কাল অবশ্য এই নৃশংস প্রথা গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য এদেশের লোক এখন ঐ প্রথাটাকে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছে। ডাইনিকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, এবং উহার মৃত্যুর পর উহার নবদ্বারের ছিদ্র মৃত্তিকা দ্বারা বন্ধ করিয়া দেয়।

ইহারা মনে করে যে এরূপ করিলে উহার দেহের ভিতর-কার ভূত আর বাহিরে আসিয়া কাহারও অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

একবার একগ্রামে মড়ক উপস্থিত হইয়াছিল। ইহা যে কোনও ভূতের কাণ্ড ইহা গ্রামবাসীরা স্থির সিদ্ধান্ত করিল। তাহার পর গ্রাম্য জুজুর পরামর্শে একদিন প্রাতঃকালে গ্রামের সকলে একস্থানে একত্র হইল এবং মন্ত্রাদি পাঠের পর এক রাশ চালের উপর প্রত্যেকের শরীর হইতে এক বিন্দু করিয়া রক্ত বাহির করিয়া ফেলা হইতে লাগিল। দুই একদিনের শিশু পর্য্যন্ত বাদ গেল না। তাহার পর সকলে ঐ রক্ত মিশ্রিত চাল এক এক মুঠা খাইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। শুনা যায় এই ঘটনার পর ঐ স্থান হইতে মড়ক অদৃশ্য হইয়া যায়।

এই জুজু পুরোহিত দিগের মধ্যে যাঁহারা প্রবীন ও অভিজ্ঞ তাঁহারা অনেক অলৌকিক কার্য্য করিতে পারেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ইহার মধ্যে মন্ত্রদ্বারা বৃষ্টি আনয়ন করা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। লোকের বিশ্বাস ইহারা ইচ্ছা করিলে যখন তখন বৃষ্টি করাইতে পারে। আসল কথা এই যে, বায়ুর গতি, মেঘের ও আকাশের চেহারা দেখিয়া ইহারা প্রায়ই জানিতে পারে যে শীঘ্র বৃষ্টি হওয়া সম্ভব কি না। যত দিন পর্য্যন্ত দেখে যে, বৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা নাই, ততদিন পর্য্যন্ত নানা প্রকার অছিলায় লোকদিগকে ভুলাইয়া রাখে। যখন দেখে যে শীঘ্র বৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা, তখন খুব উৎসাহের সহিত তুকতাক আরম্ভ করে।

গ্রামের কাহারও কোনও দ্রব্য অপহৃত হইলে এই পুরোহিতেরা অনেক সময় বেশ কৌশলের সহিত চোরের সন্ধান করিয়া দেন। একবার সরকারি ট্রেজারি হইতে এক থাল সিকি অদৃশ্য হয়। পুলিসের বিশেষ চেষ্টাতেও চোরের কোনও সন্ধান হইল না। ঘটনা স্থানের নিকটেই একজন প্রাচীন পুরোহিত বাস করিতেন। পুলিসের দারোগা মহাশয় উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে উহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধ সমস্ত কাহিনী শুনিয়া চোর ধরিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল।

এক নির্দ্দিষ্ট দিন প্রাতঃকালে ট্রেজারির সমস্ত ছোট বড় কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া দারোগা বৃদ্ধের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ প্রস্তুত ছিলেন। উহারা আসিবা-মাত্র খুব ধুমধামের সহিত মন্ত্রাদি পাঠ করিলেন। তাহার পর তাহার গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া সকলকে লইয়া বাহিরে আসিলেন। সেখানে আবার মন্ত্র পাঠ করিলেন এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "তোমাদিগকে একে ২ ঐ ঘরের মধ্যে যাইতে হইবে। যাইয়া দেখিবে একটি এক হাত প্রমান বংশ দণ্ড পড়িয়া আছে। উহা মন্ত্রপূত করা আছে। উহা দক্ষিণ হস্তে উঠাইয়া লইয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া বলিবে, 'আমি চুরী করি নাই। যদি করিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন আমার সর্ব্বনাশ হয়।' কিন্তু আবার বলিতেছি ঐ বংশ দণ্ড দক্ষিণ হস্তে উঠাইয়া লইতে ভুলিও না।"

সর্ব্বসমেত ১৩ জন কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সকলে একে ২ যাইতে লাগিলেন। প্রত্যেকে যখন ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন, তখন বৃদ্ধ নিজের উভয় হস্তদ্বারা তাঁহার দুই হাত ধরিয়া মস্তকের নিকট লইয়া গেলেন ও বলিতে লাগিলেন "তুমি যদি নির্দ্দোষী হও তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করিবেন।"

এই ব্যাপার শেষ হইবার পর বৃদ্ধ সেই তের জনের মধ্যে এক জন ঐ দেশীয় চাপরাসীর হাত ধরিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "দারোগা, এই চোর। এযদি অস্বীকার করে, এখনই ইহার মুখ হইতে রক্ত বাহির হইবে।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকটা তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের দুইপা জড়াইয়া ধরিল ও মুক্তকণ্ঠে নিজের দোষ স্বীকার করিল। এই ঘটনার দুই মাস পরে আমি ঐ স্থানে উপস্থিত হই, এবং এই বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করি, এবং কি করিয়া চোর ধরিলেন তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি। বৃদ্ধ প্রথমে বাগ মানিলেন না, কিন্তু কিছু দক্ষিণা দেওয়াতে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলেন।

"ঘরের মধ্যে যে বংশ দণ্ড রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাতে বেশ ভাল করিয়া কেরোসিন তৈল মাখাইয়া দিয়াছিলাম। আমি জানিতাম, প্রকৃত চোর কখনও উহা স্পর্শ করিবে না। উহা হাতে তুলিয়াছে কি না জানিবার জন্য আমি প্রত্যেকের দুই হাত ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। ঐ ১৩ জনের মধ্যে কেবল ঐ একটা লোকের হাতে তেলের গন্ধ পাই নাই। সুতরাং চোর যে কে তাহা বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই।"

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

সুপ্রজনন-বিজ্ঞান (Eugenics.)

আমরা পতিত জাতি, দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণই অতীতের দিকে। বর্ত্তমান আমাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভবিষ্যৎ প্রহেলিকাময়। শাস্ত্রমতে আমাদের সুখের যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর নাকি চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখে কল্কি, ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইবার নাকি আমাদের বিলম্ব নাই। কার্য্যতঃও হিন্দুর ন্যায় কোন্ জাতি এমন দ্রুতগতিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে? জাতিভেদের বিষময় ফলে, ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আমরা গান্ধার হইতে পেশোয়ারে, কাম্বোডিয়া হইতে বঙ্গোপসাগরের তীরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। এই স্থানটুকুর ভিতর ও বৎসরের পর বৎসর যে ভাবে সংখ্যায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছি—তাহা মহা চিন্তার বিষয়।

পক্ষান্তরে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি ইয়ুরোপ চির-নবীন, চিরপরাক্রমশালী। সে-দেশবাসীদের ধর্ম্মে কর্ম্মে মৃত্যু কথাটী নাই। সর্ব্বক্ষণ, এক জয়ের আশা, নবজীবনের ভাব লইয়া তাহারা উন্নতির পথে দিন দিন ধাবিত হইতেছে। তাহাদের দেশের প্রচারিত বিবর্ত্তন বাদ মৃত্যুর ভাব প্রচার করে না;—স্বর্ণ-যুগ তাহাদের সম্মুখে।

উনবিংশ শতাব্দী ইয়ুরোপের মহাগৌরবের কাল। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কত শত সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ আবিষ্কারের দ্বারা এই অত্যল্প কাল মধ্যে ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। পদার্থ বিদ্যা, ভূবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, কোন্ দিকে উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয় নাই? সে উন্নতির স্রোতের যেন বিরাম নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ডারউইন কর্ত্তৃক যে বিবর্ত্তনবাদ বিবৃত হইয়াছিল,—পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিজ্ঞানই অল্পাধিক পরিমাণে তাহার ভাবে অনুপ্রাবিষ্ট। জ্ঞান-রাজ্যে এমন ব্যাপক ভাব এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। ইহার ভাব গ্রহণ করিয়াই প্রাণীবিদ্যা, জ্রূণতত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞান পরিপুষ্ট হইতেছে।

Eugenics—যাহার কথা বলিতেছি, এই বিবর্ত্তন-বাদেরই পরোক্ষ ফলস্বরূপ। ডারউইনের Survival of the fittest শক্তিমানের উদ্বর্ত্তন, এই সিদ্ধান্ত—ইহার মূল সূত্র, জনয়িতাস্বরূপ।

Eugenics অর্থ well-born সুজাত। কালক্রমে এই সুজাতের ভাবের সঙ্গে well-bred সুপালিত এই ভাবটীও জড়ীভূত হইয়াছে। বাঙ্গলায় ইহার নামকরণ হইয়াছে, সুপ্রজনন-বিজ্ঞান। কবিবর রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়াছেন, সৌজাত্য বিদ্যা। প্রথমটীই অধিকতর চলিত বলিয়া এ প্রবন্ধে গ্রহণ করা গেল। বর্ত্তমান কালে যে সকল নূতন নূতন বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে—তাহার মধ্যে এই সুপ্রজনন-বিজ্ঞানকে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ বলিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। এমন কি, এক্ষণ পর্য্যন্ত, অনেকে ইহাকে বিজ্ঞান আখ্যা প্রদান করিতেও ইচ্ছুক নহেন।

সুজাত, সুগঠিতকায়, সুপালিত, মানসিক ও দৈহিক বলে শক্তিমান্ সন্তান সন্ততি দ্বারা যাহাতে বংশ ও জাতির পরিপুষ্টতা ও উন্নতি সাধিত হয় এবং যে সকল প্রভাবের ফলে জাতির অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহের উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহার আলোচনা করা ইহার উদ্দেশ্য।

ঈদৃশভাবে জাতির উন্নতিবিধানের ভাব পূর্ব্বাপর সকল সভ্য সমাজেই কথঞ্চিৎ বর্ত্তমান। স্পার্টার নীতিবিৎ লাইকারগাছের (Lycurgus) নাম কে না শুনিয়াছেন? যাহাতে স্পার্টান জাতি কখনও দুর্ব্বল না হয়, এই জন্য তিনি যে সকল কঠোর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের কল্যাণে বহুশতাব্দী ধরিয়া সে দেশ চতুর্দ্দিকে শত্রুপরিবেষ্টিত হইয়াও প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহার নিয়মানুসারে শিশুর জন্ম গ্রহণ করিবার পরেই সরকার পক্ষ হইতে তাহার দেহের পরীক্ষা হইত। দুর্ব্বল ও পীড়াগ্রস্ত হইলে, তাহাকে স্পার্টার সন্নিহিত টেগেসাস পর্ব্বতে নিয়া ফেলিয়া দিত। সপ্তম বৎসরে প্রতিবালকই স্বীয় গৃহ হইতে সামরিক বিদ্যালয়ে আনীত হইত। সেখানে বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ বিদ্যা ও ব্যায়াম সম্বন্ধে শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। তৎপরে বিবাহ; কিন্তু ত্রিংশ বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সৈনিকাবাসেই জীবন অতিবাহিত করিতে হইত। ত্রিংশ বৎসরে পদার্পন করিলে সে

নাগরিকের অধিকারসমূহ এবং স্ত্রীকে লইয়া সংসার প্রবেশ করিবার-অনুমতি পাইত।

প্লেটোও তাঁহার Laws নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যেমন কোনও মেষ বা অশ্ব পালককে, দুর্ব্বল ও পীড়াগ্রস্ত প্রাণীটিকে বিতাড়িত করিতে হয়, যেহেতু তাহা না হইলে, অন্যগুলিও কালে পীড়িত হইয়া পড়ে, সেই প্রকার যাহারা দেশের ব্যবস্থাপ্রবর্ত্তক (Legislator) তাহাদেরও দেখা উচিত, অপকৃষ্ট (Degenerates) লোক সমূহের সংখ্যা বাহুল্য বশতঃ সমাজ যেন কখনও দুর্ব্বল ও হীনতেজা না হইয়া পড়ে; প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে এমত অবস্থায় ভিন্ন দেশে প্রেরণ কর্ত্তব্য। অনেকটা ঈদৃশ রীতিনীতির অনুসরণ ফলে, কালে ভুমধ্য সাগরের দ্বীপ-পুঞ্জ গ্রীক উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল। ইংরাজের বর্ত্তমান উপনিবেশ অষ্ট্রেলিয়াও অনেকাংশে সমাজতাড়িত ঈদৃশ ব্যক্তিসমূহের সমাবেশে গঠিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বিবাহবিধি সকলও যে অনেক সময় এই প্রকার সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই প্রণীত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। সগোত্রে ও নিকট আত্মীয়ের ভিতর বিবাহ এই কারণে দোষাবহ, কারণ সন্তান এসকল স্থলে তেমন শক্তিশালী হয় না।

পূর্ব্বে যাহা অপ্রকাশ্য ভাবে ছিল, তাহাই এক্ষণে বিজ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমান আকারে Eugenicsএর জন্মদাতা Sir Francis Galton (১৮২২—১৯১১)। তিনি নরদেহবিজ্ঞানবিৎ (anthorpologist) ও ভ্রমণকারী। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে Hereditary genius নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সুবিখ্যাত হইয়া পড়েন। তিনি এই গ্রন্থে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, বংশানুক্রমের (Heredity) ফলে, কোনও বংশে ক্ষমতাশালী প্রতিভাপন্ন পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে; কোনও বংশ (Degenerates) অপকৃষ্টের দলে পূর্ণ হইতেছে। তাহার ইহাও প্রতিপাদ্য ছিল যে শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যবংশ উন্নত হয়। যে সকল তত্ত্বের অনুশীলনের ফলে ভবিষ্যবংশ ও জাতির উন্নতিসাধিত হয় সে শাস্ত্রের তিনি নামকরণ করেন Eugenics। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্বীয় অর্থে লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে এই Eugenics চর্চ্চার জন্য এক বিজ্ঞানাগার স্থাপন করেন। তাহার পরিচালনের জন্য প্রভূত অর্থও দান করিয়া গিয়াছেন। ১৯১১ সনে তাহার মৃত্যু হয়।

এই ভীষণ প্রতিযোগিতার দিনে, যখন লোকের সহিত লোকের, জাতির সহিত জাতির সংগ্রাম ও সংঘর্ষ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে—এমন শাস্ত্র, যাহার উদ্দেশ্য জাতিকে বলশালী ও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলা তাহা যে সকল সভ্য জাতিরই দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিবে, আশ্চর্য্য কি? তাই, এই অত্যল্প কাল মধ্যেই শুধু ইংলণ্ডে নয়, আমেরিকা, ফ্রেন্স ও ইয়ুরোপের অন্যান্য স্থানে Eugenicsর বিশেষ চর্চ্চা হইতেছে।

সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের মূলভিত্তি বংশানুক্রমে (Science of Heredity)। বলিতে গেলে, শেষোক্তটী ইহার অংশ বিশেষ। এই জন্য বংশানুক্রম-বিজ্ঞানের জন্মদাতা স্বরূপ Johan Mendal (১৮২২—১৮৮৪) মেণ্ডেলের সহিত এই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিচিত হওয়া প্রয়োজনীয়। অষ্ট্রীয়ার সিলিসিয়া প্রদেশে কোন সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহে তাহার জন্ম হয়। ১৮৫১—৫৩ পর্য্যন্ত ভিয়েনা নগরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করেন। তৎপরে ব্রন নগরের (Brun) মঠের স্কুলে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। কালে, এই মঠের প্রধান ধর্ম্মযাজকের (abbot) পদে উন্নীত হন। আট বৎসর পর্য্যন্ত তিনি স্বীয় উদ্যানপ্রসূত নানাবিধ মটর লইয়া সঙ্কর প্রথার (Hybridisation) নানাপ্রকার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। এই চর্চ্চার ফলে, তিনি বংশানুক্রম ও সঙ্কর নিয়ম সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহা ব্রনের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমিতিতে প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করেন, কিন্তু জীবদ্দশাতে তাহার প্রতি কাহারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। ১৯০০ সনে অধ্যাপক De Vries তাহার প্রবন্ধের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করান এবং তাহার পর হইতে বংশানুক্রম সম্বন্ধে তাহার মতসমূহ Mendel's Law মেণ্ডেল সূত্র

বা Mendelism নামে বিজ্ঞান-জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। এই সূত্র অনুসারে বংশানুক্রম কতকগুলি নিয়মাধীন। "অনেক সময় আদি জনয়িতার দুইটীতে দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত গুণ থাকিলে, দ্বিতীয় পুরুষের সন্ততিতে একটী জনয়িতার বিশেষ প্রকৃতিটি (character) প্রকাশিত হয়, অন্য জনয়িতার বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত প্রকৃতিটী, দ্বিতীয় পুরুষের সন্তানে প্রকাশিত না হইয়া তাহা আবার তৃতীয় পুরুষে দৃষ্ট হয়। আদি জনয়িতার যে গুণটী দ্বিতীয় পুরুষে দেখা যায়, তাহাকে মেণ্ডেল Dominant (প্রবল) নামে অভিহিত করিয়াছেন। আর যেটী যাপ্য অবস্থায় থাকে তাহাকে Recessive নাম দিয়াছেন।" নিয়মগুলি কতকাংশে জটিল। বারান্তরে বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা যাইবে।

এই প্রসঙ্গে জার্ম্মেণ লেখক প্রফেসার উইছমেনের (Wiesman) মত ও বিবেচ্য। তাহার মতে পিতামাতা প্রত্যেক হইতে বিচ্ছিন্ন দুইটী জীবকোষের (germ-cells) সংমিশ্রণে সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পিতামাতার কতকগুলি গুণদোষ আছে, যাহা এই জীবকোষের ভিতর দিয়া সন্তানে পর্য্যবসিত হয়, কতকগুলি হয় না। তিনি প্রথমটীর নাম দিয়াছেন Germinal characters জননকোষজ গুণ; দ্বিতীয়টীর নাম Somatic characters দৈহিক গুণ। এই জননকোষের (Germ plasm) কিয়দংশ সন্তানের জন্ম ও পরিপুষ্টি সাধনে ব্যয়িত হয়, কিয়দংশ সন্তানের দেহে বর্ত্তমান থাকে। কালে ভবিষ্য বংশ এই অংশ হইতে উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ ধারাবাহিকরূপে একই জননকোষের সাহায্যে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে।

পিতামাতার দেহ ভবিষ্য বংশের জীবকোষের রক্ষক (trustee) বিশেষ। ইহার মত অনুসরণ করিতে যাইয়া, অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন, মানুষের নিজ Individuality ব্যক্তিত্ব কিছুই নাই। জীবকোষ তাহাকে যেমনভাবে গঠিত করিয়াছে, তাহাকে সে ভাবেই বর্দ্ধিত হইতে হইবে। কিন্তু অন্যান্য মতে পিতামাতার শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জীবকোষ সমূহেরও উন্নতি সাধিত হয়, কালে ভবিষ্যবংশ সুসন্তানে শোভিত হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেমার্ক (Lamarck) এই মতের পৃষ্ঠপোষক। কোন্ মতটী যে ঠিক তাহা এক্ষণেও নির্দ্ধারিত হয় নাই। দুইটীর ভিতরই সত্য নিহিত রহিয়াছে, Eugenics মতাবলম্বীদের ইহাই ধারণা।

সুপ্রজনন বিজ্ঞান মোটামুটী দুই অংশে বিভক্ত। জীবকোষদ্বয়ের সম্মিলনে কি ভাবে, কি প্রকার গুণসমূহ লইয়া সন্তানের উৎপত্তি হয়, প্রথম অংশের বিচার্য্য বিষয় তাহা। বংশানুক্রম (science of heredity) এই অংশের মূল ভিত্তি।

মাতৃগর্ভে স্থান পাওয়ার পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সকল প্রভাব (influences) সন্তানকে গঠিত, বর্দ্ধিত বা তাহার ক্ষয় সাধন করে, তাহাকে তাহার জীবন সম্বন্ধীয় nurture (পোষণ ব্যাপার) বলা যাইতে পারে। এ সমস্তই Eugenics-র দ্বিতীয় অংশের বিবেচনার বিষয়। মানুষ একদিকে জন্মগত প্রভাবের (heredity) অন্যদিকে এই nurture পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর অধীন। পিতামাতা হইতে সে যতই কেন গুণাবলী প্রাপ্ত না হইয়া থাকুক, পারিপার্শ্বিক ঠিক না হইলে, সমস্তই নষ্ট হইবে; এমন কি বিশেষ খারাপ হইলে সমূলেই বিনাশ সম্ভাবনা। আবার nurture পোষণ ও পালন যতই কেন ভাল না হউক, জন্মগতই যদি দোষ থাকে, তাহা হইলে মূর্খ কখনও পণ্ডিতে পরিণত হইবে না, বানর মনুষ্যে পরিবর্দ্ধিত হইবে না।

এই জন্যই সুপ্রজনন মতে, লোক সকল জন্মান্তরীন কোনও দোষ লইয়া যাহাতে আবির্ভূত না হয়, তাহার প্রতি সর্ব্বাগ্রে সমাজের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সন্তানজনন সেই সকল নর নারীরই কর্ত্তব্য, যাহারা বলশালী, নিরোগী। কিন্তু, এই জন্য যাহারা জন্ম হইতেই পঙ্গু, দুর্ব্বল, ব্যাধিগ্রস্ত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, অথবা স্পার্টানদের মত মারিয়া ফেলিতে হইবে—এমন শিক্ষাও সুপ্রজনন দেয় না। বিবাহিত বা অবিবাহিত পিতামাতার সন্তানই হউক, প্রত্যেক জীবনই পবিত্র সামগ্রী,—সমাজের পক্ষে মহা মূল্যবান। প্রত্যেকই

সমাজ হইতে যতদূর সম্ভব ভালরূপে প্রতিপালিত হইবার অধিকারী। কোন্ বালক ভবিষ্যতে কিসে দাঁড়াইবে, বিজ্ঞান এক্ষণেও নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় নাই। জগদ্বিখ্যাত নিউটন ও বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় দর্শনের জন্মদাতা ডেকার্ট উভয়েই বাল্যকালে নিতান্ত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন এবং ভবিষ্য প্রতিভার কোনও পরিচয় দেন নাই। প্রতিভাসম্পন্ন নরনারীর সম্মিলনেই যে প্রতিভাবান লোকের আবির্ভাব হয়, এমতও নহে। রবার্ট ব্রাউনিং ও ব্যারেট ব্রাউনিং সুপ্রসিদ্ধ কবিদ্বয়ের পুত্রে কোনও প্রকার প্রতিভারই বিকাশ দেখা যায় নাই। প্রতিভার উৎপত্তি ও স্ফুরণ— অপূর্ব্ব, অজ্ঞেয়।

সুসন্তানের কথা মনে হইতেই, সর্ব্বাগ্রে সন্তানের মাতার বিষয় মনে হয়। সন্তান সম্ভাবিতা জননীর স্বাস্থ্য ও জীবিকা সম্বন্ধে সমাজের বিশেষ দৃষ্টি বাঞ্ছনীয়। তাহাদের প্রতি যত্নের অভাবে, অনেক সন্তান বাল্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যাহারা জীবিত থাকে, তাহাদের ভিতরও কত খঞ্জ, দুর্ব্বল, অন্ধ, পীড়াগ্রস্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত লেখক হেভেলক এলিস (Havelock Ellis) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, অপদার্থ ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি সকল—অন্ধ, মূক, বধির, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত, পাপাত্মা, মূর্খ, মৃগীরোগাক্রান্ত ইত্যাদি—যাহাদের দ্বারা সমাজের কোনও প্রকার উপকার হয় না, তাহারা সমাজ হইতে যে প্রকার আদর যত্ন পায়—সন্তান সম্ভাবিতা জননী তাহার কিয়দংশও পায় না। মক্ষিকাদিগের ভিতর রাণীমক্ষিকা অর্থাৎ যে ভবিষ্য বংশের জনয়িত্রী, তাহার সুখবর্দ্ধন ও জীবিকা যাপনের জন্যই অন্যান্য মক্ষিকা জীবনধারণ করে। সন্তানের জন্মদানের পরেই অপদার্থ অকর্ম্মণ্য জনককে মারিয়া ফেলা হয়। কিন্তু, আমাদের মনুষ্য সমাজে এই অপদার্থেরা, অকর্ম্মণ্যের দল, (Drones) মহাসম্মানের ভিতর লালিত পালিত হইয়া থাকে। সামান্য প্রাণীজগতের ভিতর যে বুদ্ধির বিকাশ দৃষ্ট হয়, বুদ্ধিমান মানব সমাজেও তাহা হয় না!

আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দরিদ্র জননীর সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে তত্ত্বাবধানের জন্য নানাবিধ সমিতি সৃষ্ট হইতেছে। আমাদের দেশে অবস্থা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সন্তানের জন্মগ্রহণের পর, যাহাতে তাহার ভরণ-পোষণের জন্য যথাবিধ সুবিধা থাকে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করা সমাজের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। বালকগণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ইংলণ্ডে সার টমাস বার্ণোর নেতৃত্বাধীনে Society for the prevention of infant mortality and the welfare of children under school নামে সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। যাহাতে বিদ্যালয়ে বালকদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরীক্ষা হইয়া তাহাদের রোগ নির্ণয় ও তাহার প্রতিকারের চেষ্টা হয় তজ্জন্যও নানাপ্রকার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিদ্যালয় সমূহে যাহাতে আলো ও বায়ু প্রবেশের বিশেষ বন্দোবস্ত থাকে, তাহার প্রতি ও দৃষ্টি দেওয়া যাইতেছে। Boy Scout Movementএর বিষয় আমাদের দেশে এক্ষণে অনেকে শুনিয়াছেন। বুয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে মেফেকিং নগরাবরোধ উপলক্ষে প্রথিতযশা সেনাপতি বেডেন পাওয়েল, এই সমিতির স্থাপয়িতা। বালকগণ বাল্যকাল হইতে অনেকটা কঠোর সামরিক নিয়মাধীনের ভিতর শিক্ষিত হইয়া নানাবিধ সৎকার্য্যে নিজ নিজকে নিযুক্ত করিয়া কালে যাহাতে চরিত্রসম্পন্ন কর্ত্তব্যজ্ঞানী নাগরিকে (citizen) পরিণত হয়, ইহাই এই সমিতির লক্ষ্য। ইহার অনুকরণে, Girl Guide Movement নামে বালিকাদিগের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চরিত্রোন্নতির জন্য ইংলণ্ডে আর একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

ক্রমে, বালক কৈশোরাবস্থাপ্রাপ্ত হয়। এই কালকে মানব জীবনের প্রধান কাল বলা যাইতে পারে। এই সময় তাহার যে দিকে গতি দেখা যায়—ভবিষ্যতে সে সেই দিকেই ধাবিত হয়। সুশিক্ষা, সৎসঙ্গ, ক্রীড়া, ব্যায়াম, সৎ আদর্শ, সকলই এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সন্তানগণের হস্তে, এ সময়ে কুগ্রন্থ দান কুকার্য্য। এবিষয়ে আমরা নিতান্ত উদাসীন। জীবনের এই কিশোর বয়সেই—বালকগণকে দুইভাগে বিভক্ত হইতে দৃষ্ট হওয়া যায়; এক ভাগ, যাহাদের জীবন-সূত্র কাজে

লাগিয়া থাকা, আর একাংশ, যাহারা হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইতে ইচ্ছুক। প্রথম শ্রেণীর লোকই জগৎজয়ী, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক যে সমাজে অত্যধিক, তাহার জগতে স্থান নাই, যেমন আমাদের।

যৌবনের পদার্পণের পূর্ব্বে বালক বালিকাকে শারীরিক স্বাস্থ্য ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য নিয়ম ও গুণ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। জাতির, বংশের উন্নতির ও মঙ্গলের সহিত যে তাহার নিজ মঙ্গল জড়িত—এই জ্ঞান তাহার হৃদয়ে উদ্বোধিত করিতে হইবে। জাতির দিকে চাহিয়া, কালে যে তাহাকে বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, ভবিষ্য সদ্বংশের জনয়িতা হইতে হইবে—ইহাও তাহার জানা প্রয়োজন। কি অবস্থায় তাহার বিবাহ করা উচিত এবং কি অবস্থায় নহে তাহাও তাহাকে জানিতে দিতে হইবে। ইহা প্রত্যেকেরই জানা উচিত, জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা অমূল্য-ধন এবং জাতির, বংশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি সন্তান জননশক্তির অবনতি।

চল্লিশবৎসর হইতে ইংলেণ্ডের জন্মের হার কমিয়া আসিতেছে। বাঙ্গলা দেশেরতো কথাই নাই। কিন্তু আমাদের অত্যধিক মৃত্যু ও জন্মহ্রাসের এবং ইউরোপের জন্মহ্রাসের কারণ অন্যবিধ। জন্মের হারের অল্পতা বশতঃ ফরাসীদেশ ধ্বংসের পথে বসিয়াছে বলিয়া সকলেই নির্দ্দেশ করিতেছে। ইয়ুরোপের অন্যান্য সভ্যদেশে ও এই ব্যারাম দেখা দিয়াছে। কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ডাক্তার ছেলিবি (Dr. Saleeby) বলিয়াছেন, জীবন সংগ্রামের কঠোরতা বশতঃ এক্ষণ অনেকে ইচ্ছা করিয়াই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায় গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। অনেকে দুইটী বা একটীর অধিক সন্তানের পিতামাতা হইতে অনভিলাষী। বর্ত্তমান শিক্ষার ফলেও রমণীর সন্তানজননক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। লোকের চরিত্রা-বনতিও সন্তান হ্রাসের অনেকটা কারণ।

কতকগুলি পীড়াকে তিনি Racial poison জাতিধ্বংসকারী বিষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে ম্যালেরিয়াই, সর্ব্বপ্রধান স্থান পাইবার উপযুক্ত। ইহা যে দেশে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহারই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, প্রাচীন এথেন্সের ধ্বংসের প্রধান কারণই এই ভয়াবহ পীড়ার আবির্ভাব। আমাদের দেশে যে ইহা কি সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কেবল যে ইহা অকালে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ সংহার করে এমত নহে, যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগকে ও শক্তি-হীন বীর্য্যহীন করিয়া অর্দ্ধমৃত করিয়া রাখে।

ম্যালেরিয়ার পরেই উপদংশ পীড়ার স্থান। ভবিষ্য বংশের উপর ইহার ভয়াবহ প্রভাব। উন্মাদকতা, কুষ্ঠ, মৃগী, যক্ষ্মা—ইত্যাদি বংশধ্বংসকারী ভীষণ কত ব্যাধির জনয়িতা ইহা। বর্ত্তমানে জার্ম্মেণ অধ্যাপক এরলিক ও জাপানের টকিও নগরের অধ্যাপক হাটার গবেষণার ফলে সেলভার্শ্বেণ (Salvarsan) নামে যে ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কল্যাণে এক্ষণ এই পীড়া হইতে অনে-কেই রোগমুক্ত হইতেছে এবং বৈজ্ঞানিকগণ আশা করিতেছেন যে ইহার সাহায্যে কালে এই ভীষণ পীড়া মানব সমাজ হইতে দূরীভূত হইবে। উপদংশের নীচেই প্রমেহের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সন্তান জননের ক্ষমতা হ্রাসের ইহা একটী প্রধান কারণ। যক্ষ্মা, উন্মাদকতা, মৃগী, মূর্খতা (Idiocy), কয়েক প্রকার মূকত্ব, বধিরতা ইত্যাদি নানাবিধ পীড়াও এই জাতিধ্বংসকারী, বিষের (Racial poison) অন্তর্গত। সুরাপান ও এই সংজ্ঞাশ্রেণীর ভুক্ত। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে অত্যধিক মদ্যপায়ীর সন্তান দুর্ব্বল মানসিক শক্তি (mentally deficient) লইয়া জন্মগ্রহণ করে। যাহারা এই সকল পীড়ায় আক্রান্ত, তাহাদের সন্তানের জনয়িতা হওয়া উচিত কিনা, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়।

Eugenicsর দৃষ্টি সমাজের উন্নতির দিকে। যাহারা সবল, সুস্থ, তাহাদের বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হওয়া, ইহার চক্ষে মহাদোষের বিষয়, আর যাহারা তাহা নহে তাহাদের বিবাহে ইহা মহা বিরোধী। স্বজাতি প্রীতিই এই শাস্ত্রের মূল উৎস। দেহ ও মনে সমানভাবে সুস্থ ও সবল সন্তান সন্ততিতে পূর্ণ হইয়া যাহাতে জাতি শক্তিশালী হইয়া ওঠে, তাহা সর্ব্বদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হইবে। এই জন্য, প্রয়োজন হইলে নির্ম্মম, হইতে হইবে।

বংশানুক্রমের নিয়মানুসারে, পিতামাতার দোষ যেমন তৃতীয় বা চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমন তাহার গুণ ও দৃষ্ট হইয়া হয়। অধ্যাপক কার্ল পিয়ার্শন যে সকল বংশলতা সঙ্কলিত করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে এমন এক একটী বংশ আছে, যাহা পূর্ব্বাপর প্রতিভাসম্পন্ন, কর্ত্তব্যজ্ঞানী উৎসাহী লোক দ্বারা শোভিত হইয়াছে, আর একটী আবার মদ্যপায়ী, কুচরিত্র, দুর্ব্বলচিত্ত লোকে পরিপূর্ণ। শেষোক্ত বংশের আদি জনক জননী প্রায়ই মদ্যপায়ী বা কুচরিত্র নরনারী। প্রত্যেক বংশেরই বংশতালিকা রাখার প্রয়োজন। যাহাতে কোনও প্রকার Racial poison গ্রস্তা বা কুচরিত্রা নারীর সংযোগে বংশাবনতি না ঘটে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। স্ত্রী নির্ব্বাচণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার। বিবাহের পূর্ব্বে তাহার বংশে কোনও প্রকার Raic l poisonর অস্তিত্ব আছে কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। যাহার তাহার সঙ্গে বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া অবিবেচকের কার্য্য। সুন্দর স্বাস্থ্যপূর্ণ সুগঠিতকায় সুশিক্ষিত চরিত্রবান্ উদ্যমশীল যুবক,—সুন্দরী স্বাস্থ্যপূর্ণা শিক্ষিতা নারীর পাণিগ্রহণ করিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়। প্রেমের ভাবে একে অন্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়া উভয়ে মিলিতে হইবে। ঈদৃশ পিতামাতার সন্তানই সুস্থ বলশালী ও উদ্যমশীল হইবে আশা করা যায়। নিজ নিজ বংশোন্নতির দিকে সকলের দিকে দৃষ্টি থাকিবে। জাতির ভবিষ্য-দিকে চাহিয়া সকলকে চলিতে হইবে।

এ পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত সভ্যদেশেই দর্শন শাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চ্চা হইয়াছে. কিন্তু কি উপায় অবলম্বনে জাতি মানসিক ও দৈহিক বলে শক্তিমান হইয়া উঠিতে সক্ষম হয়, তাহার বিশেষ কোনও অনুসন্ধান হয় নাই। ফরাসী জাতি পূর্ব্বে কতবার জার্ম্মেনিকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে, সেই বীরজাতি কেন আজ জীবন সংগ্রামে জার্ম্মেনির পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; জাপান কি উপায়ে দুর্দ্ধর্ষ জাতিরূপে অকস্মাৎ জগতের রঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইল; রোমের কেন ধ্বংশ সাধিত হইল হিন্দু জাতিই বা কেন মৃতপ্রায় হইয়া আছে; স্পেনও হলেণ্ডবাসিগণই বা কেন জগতের প্রধান-জাতির সংজ্ঞা হইতে অন্তর্হিত হইল ইত্যাদি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে, যে জাতির কি কারণে উন্নতি হয়, কি কারণেই বা তাহা অধঃপতন হয় তাহার সম্যক আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সুপ্রজনন বিজ্ঞানের লক্ষ্য, সে অভাব পূরণ করা।

অনেকে জার্ম্মেণ দার্শনিক নিট্‌জিকে সুপ্রজনন শাস্ত্রের জন্মদাতা স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা superman অতিমানুষ আদর্শ এই সুপ্রজনন বিজ্ঞানের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে। পুষ্টিকর খাদ্য ও জীবন-যাপন সম্বন্ধে উন্নত প্রণালী ইত্যাদি অবলম্বনের ফলে যাহাতে সমাজে দৃঢ় কলেবর সাহসী কার্য্যদক্ষ দৃঢ়চিত্ত মানবসমূহের আবির্ভাব হয়, তাহাই তাহার কাম্য ছিল। Beyond thyself shalt thou build তোমার ভবিষ্য-বংশ যেন তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হয়, ইহাই তাহার প্রধান শিক্ষা ও মন্ত্র ছিল। প্রত্যেক নরনারীরই এই মহৎ দায়িত্বের ভাব সম্মুখে রাখিয়া সংসারে প্রবেশ করা উচিত।

বর্ত্তমান কালে জগতের সমস্ত সভ্যজাতিই এক নূতন বিশ্ববিজয়ের আশা লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সুপ্রজনন বিজ্ঞান—বলিষ্ঠদেহ, বলিষ্ঠমনা, সুঠাম, সুন্দর, নরনারী সৃষ্টিই যাহার লক্ষ্য—কালে মানবের ভবিষ্য ধর্ম্ম সমূহের একাঙ্গভূক্ত হইবে—ইহাই তাহার প্রচারকগণের বিশ্বাস। এক নূতন আশার বাণী লইয়া এই নূতন বিজ্ঞান আবির্ভূত হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে মনে হইতেছে,—সর্ব্বত্রই Eugenicsর চর্চ্চা হইতেছে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও কি এ শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা হইতে পারে না?

যদি সুপ্রজনন বিজ্ঞান চর্চ্চার কোনও স্থানে প্রয়োজন থাকে, তবে আমাদের এদেশে, মৃত্যুর লীলাভূমিতে।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত।

———

কবি কঙ্কের করুণ কাহিনী।

এইস্থান হইতে কঙ্কের জীবন ক্রমেই বিপুল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে, এ অন্ধকারে একমাত্র লীলার বারমাসীই আমাদের পথ প্রদর্শক। লীলার বারমাসীর কবি, কঙ্কের সেই নিরুদ্দেশ রজনীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"আড়াই প্রহর রাত্রি কঙ্ক কি কাম করিল,
নিম্ব বৃক্ষতলে যাইয়া শুইয়া নিদ্রা গেল।
ঘুমে নাহি ঢুলে আঁখি উঠ-বৈসি করে,
বিষম চিন্তার কীট পশিল অন্তরে।
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা মগ্ন হেরিল স্বপন,
বড়ই আশ্চর্য্য কথা শুন সভাজন।"

কঙ্ক স্বপ্ন দেখিল, যেন প্রেত পিশাচের তাণ্ডব নর্ত্তনও অট্টহাস্য মুখরিত, এক মহাশ্মশানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চারিদিকে চিতা সাজান। এইরূপ একটী চিতায় এক ভীমদর্শন পুরুষ কঙ্ককে তুলিয়া দিবার জন্য, তাহার সঙ্গীগণকে ইঙ্গিত করিতেছে। বাড়বানল মধ্যস্থিত আগ্নেয়গিরির মত, সেই ভীমকায় পুরুষকে, কঙ্ক চিনিল—ঐ ব্যক্তি গর্গ। তার পার্শ্বেই আর একটী চিতা; কঙ্ক দেখিল, সে চিতায় বদ্ধচরণা, আলুলায়িত কেশা, এক রমণীর মূর্ত্তি নীরবে শায়িত রহিয়াছে, শিশির সিক্ত গোলাপের মত তাহার দুই চক্ষু ভাসিয়া অশ্রুধারা বহিতেছে। কঙ্ক তাহাকেও চিনিল, সে নীরব নির্ঝরিণী গর্গ দুহিতা লীলা! ক্ষণ পরে সেই শ্মশান-ভৈরবমূর্ত্তি প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ফুৎকার মাত্রে, তাহাতে অগ্নি জ্বালিয়া দিতে লাগিল। হুহু করিয়া চিতানল জ্বলিয়া উঠিল। কুণ্ডলীকৃত ধূম্র রাশিতে নৈশ গগনের চন্দ্রতারা ঢাকা পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পুষ্পহারের মত, সেই অপরূপা দৈবীমূর্ত্তি চিতানলে, আত্ম হারাইয়া ফেলিল। কঙ্ক চিৎকার করিতেছিলেন; পিতা, পিতা রক্ষা কর! কিন্তু কোথায় পিতা, সেই ভীমকায় পুরুষ শ্মশানে আর নাই, তাহার পরিবর্ত্তে কঙ্ক দেখিলেন, যেন চন্দ্রলোক হইতে, এক মুণ্ডিতশির কাঞ্চন কায় পুরুষ আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার করে কমণ্ডলু, প্রশান্ত বিশাল ললাটে চন্দনপুণ্ড সান্ধ্য তারকার মত ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে, নিশীথ যজ্ঞানল শিখা সদৃশ সেই উজ্জ্বল সৌম্যমূর্ত্তির প্রবেশ মাত্র, সেই মহাশ্মশানের জলন্ত চিতানল আপনা হইতে নিবিয়া গেল। স্বর্গ হইতে যেন অজস্রধারে পুষ্পচন্দন বর্ষিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে খোল করতাল লইয়া, মহাপুরুষের শিষ্যগণ, আসিয়া হরিবোল্ ধ্বনিতে, নৈশ-গগন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। শ্মশানের বিকটরূপ ফিরিয়া গেল। সেই স্বর্গবাসী জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষগণের অঙ্গশ্রীতে, মহাশ্মশান যেন সত্য সত্যই স্বর্গে পরিণত হইল। কঙ্কের হস্তপদের বন্ধন আপনা হইতে খসিয়া পড়িল। বন্ধনমুক্ত কঙ্ক হরিবোল্ বলিতে বলিতে সেই পুণ্য স্রোতে মিশিয়া গেলেন। কাঞ্চনকায় পুরুষ আসিয়া, কঙ্কের হাত ধরিলেন, মহাপুরুষের সুরভি-শীতল করস্পর্শে যেন সহসা কঙ্কের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল;

"রক্ত গৌর তনু তাঁর কাঞ্চনের কায়া,
আগুন হইতে কঙ্কে দিল বাঁচাইয়া।
স্বপনে আদেশ তার পাইয়া কঙ্কধর,
প্রভাতে গৌরাঙ্গ বলি ত্যজিলেন ঘর।"

কঙ্ক সেই রাত্রেই জন্মভূমি বিপ্রগ্রামের নিকট হইতে শেষ বিদায় লইয়া, নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৎকালে ভগবানের প্রেমাবতার, শ্রীচৈতন্যের পূজ্যপদ দর্শন প্রয়াসী, এতদঞ্চলের বহুলোক পত্নী পুত্র ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিতেছিলেন। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, অনেকে এই জ্বালা যন্ত্রনাময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া, ত্যাগী সাজিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গের শীতল চরণে আত্মসমর্পণ জন্য ছুটিয়া যাইতেছিলেন। বহুদিন হইতে কঙ্ক, গৌরাঙ্গরূপ দর্শন পিপাসায়, আকুল হইয়া কালের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

"বিদ্যাসুন্দর" গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

"কলিতে গৌরাঙ্গ বন্দো কৃষ্ণ অবতার,
যাহার দর্শনে হয় পাতকী উদ্ধার।
পাপস্রোতে বসুমাতা যখন ভাসিল,
নদীয়া নগরে আসি প্রভু জনমিল।

মদ্য মাংস খায় লোক করে অনাচার,
কালকলি পাপাগুনে পুড়িল সংসার।
তাহা দেখি প্রভু মোর কিরপা যে করিয়া,
শচির উদরে জন্মে নিমাই হইয়া।
আপ নি হরি ভক্তরূপে জগত মাতায়,
গহুরার প্রেম তরঙ্গে নইদা ভাইসা যায়।
প্রভুর নিকটে দেখ জাতি ভেদ নাই,
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া বলে চণ্ডালেরে ভাই।
হাড়ীতে রাঁন্ধিলে ভাত দ্বিজে বইসা খায়,
সেহত কারণে দেখ জাতি নাহি যায়।
পুনঃ পুনঃ বন্দি আমি, গৌরাঙ্গ চরণ,
কলিতে মনুষ্যিরূপে দেব নারায়ণ।

*　　*　　*　　*

"কবে বা হেরিব আমি গৌরার চরণ,
সফল হইবে মোর মনুষ্য জনম,
পাপী তাপী মুঞ প্রভু আমি অল্পমতি,
হইব কি প্রভুর দয়া অভাগার প্রতি।
হউক বা না হউক দয়া পদ না ছাড়িব,
বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব।"

শেষ কয়েকটী চরণে, কবির গৌরাঙ্গ দর্শনের বিপুল আগ্রহ দেখা যায়। তিনি শ্রীচৈতন্যকে স্বয়ং ভগবানের অবতার জানিয়া, তাহার চরণ দর্শনাকাঙ্ক্ষা ক্রমেই প্রবল করিয়া তুলিতেছিলেন। মহা-পণ্ডিত গর্গের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া, পীর ফকিরের নিকট দীক্ষিত হইয়া, কিছুতেই তাহার অতৃপ্ত কামনা মিটিতে ছিল না। গৌরাঙ্গ দর্শন তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল, আজ তাহা উদ্‌যাপন জন্য জন্মের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

মহাপ্রভু তখন বঙ্গদেশের নানা স্থানে, শিষ্যগণ সঙ্গে সুমধুর হরি সংকীর্ত্তণে দেশ মাতাইতেছিলেন। আজ নবদ্বীপ, কাল শ্রীহট্ট, তাহার খোল করতালের পবিত্র ধ্বনিতে মুখরিত হইতেছিল। কঙ্ক নবদ্বীপ যাইয়া শ্রীচৈতন্যের দেখা পান নাই। নবদ্বীপ ছাড়িয়া কঙ্ক মহাপ্রভুর অন্বেষণে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য তৎকালে তাহার সঙ্গীর অভাব ছিল না। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়িয়া তখন এক প্রবল প্রেমের বন্যা বহিয়া যাইতেছিল, তখন এই বিস্তীর্ণ মানব নদী, গৌরাঙ্গরূপ মহা সমুদ্রে মিশিবার জন্য, আবেগ ভরে ছুটিয়া যাইতেছিল। খোল করতাল ও হরিনামের মধুর ধ্বনিতে তখন দিক দিগন্ত মুখরিত হইতেছিল। হিমাচল হইতে, কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত কেবল অবিশ্রান্ত হরিবোল ধ্বনিতে পবিত্রীকৃত। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর ভাগ্যে সে কি শুভ মুহূর্ত্তই না গিয়াছে। মহাপুরুষের সুরভি-শীতল পদস্পর্শে, তখন ভারত ভূমি স্বর্গ, ভারতবাসী স্বর্গবাসী। যে দেশের, যে গিরি নদীর উপর দিয়া শিষ্যগণ সহ মহাপ্রভু চলিয়া গিয়াছেন, মহাপুরুষের চরণ স্পর্শে সে দেশের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। কত অহল্যা পাষাণী, মানুষ হইয়া গিয়াছে। কত কাষ্ঠের তরী সোনা হইয়াছে। মদ্য মাংসাহারী তান্ত্রিকগণের প্রভুত্ব খর্ব্ব করিয়া, দেশ ধন্য হইয়া গিয়াছে। কঙ্ক দেখিতে দেখিতে চলিলেন। প্রভুর প্রিয়তম শিষ্যগণের পদরেণুতে আকাশ ধূলি-সমাচ্ছন্ন। আজও পথে পথে তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি যে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, সে দেশের বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত তাহার অন্বেষণে আকুল চিত্তে ছুটাছুটি করিতেছে। যে দেশের উপর দিয়া, সেই ধর্ম্ম বাহিনী চলিয়া গিয়াছে, সে দেশের গাছের পাখী হরিনাম শিখিয়াছে; সে দেশের নদী আজও হরির নামের ধ্বনি শুনিলে, উজান বহিয়া যায়। শুষ্ক মাকন্দ মুকুলিত হয়, সে দেশের ধূলি কণা সকল মহাপুরুষের চরণ স্পর্শে তীর্থরেণুতে পরিণত। শ্রীঅঙ্গের স্পর্শে, সে দেশে বাতাস আজও সুরভিত। সে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, আজও হরির নামের ধ্বনি শুনিলে মূর্চ্ছা যায়। আজও সে দেশের কুল বধূ পর্য্যন্ত আকুল চিত্তে গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলিয়া ছুটিয়া ঘরের বাহির হয়। কঙ্ক সেই পদ চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। হিংসা, দ্বেষ, শোক, তাপ কলুষিত বিশ্ব পৃথিবীকে পেছন ফেলিয়া মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায়, বহ্নি বুভুক্ষু পতঙ্গের ন্যায় সেই জগত আলো করা জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতিরনলে পুড়িয়া ভস্ম হইবার জন্য উন্মাদের মত ছুটিয়া চলিলেন।

কবি লীলার বারমাসীর এক অংশে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত হরিনামামৃত পানে বিভোর ভারতবাসীর ও সেই স্বর্গীয় প্রেমতরঙ্গে প্রবমান ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিজেও ধন্য হইয়াছেন, আর তাঁহার দেশবাসীকেও ধন্য করিয়াছেন। অবান্তর হইলেও লীলার বারমাসীর এই অংশটি তৎকালীন দেশের রীতি নীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তত্বে পরিপূর্ণ। অবশ্য বারমাসী হইতে এই অংশটুকু ছাটিয়া দিলে মূল উপাখ্যানের কোনও ক্ষতি হইবে না বটে কিন্তু একটী উৎকৃষ্ট ভাবপ্রবণ গাঁথা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। লীলার বারমাসীর শ্রোতাগণ এই স্থানে আসিয়া সহসা খোল করতাল ও মধুর হরিনাম সুধাপানে মুগ্ধ হইয়া কিছুকালের জন্য কঙ্ক ও লীলার কথা ভুলিয়া যায়। নিমাইর জন্ম, নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি পাষাণদ্রবী করুণ সঙ্গীতে তাহারা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পরে। সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা লীলার বারমাসীর একটী উৎকৃষ্ট অংশ।

তবে লীলার বারমাসীতে এই অংশটি স্থান পাইবার কথা কি? তাহার উত্তর এই যে তখন আসমুদ্রহিমাচল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম বন্যায় প্রবমান। মানুষ তখন সেই নবীন প্রেমতরঙ্গে ভাসিতেছে, তখন হরি নামের ধ্বনি শুনিলেই দেহ মন পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। নিমাই নিমাই করিয়া তখন ভারতবর্ষ পাগল। হরি নামের মধুর ধ্বনিতে তখন পাষণ্ডের মনও গলিয়া গিয়াছে। বোধ হয় এই কারণে কবিগণ স্ব স্ব সঙ্গীতে দেশকাল পাত্র বুঝিয়া জন সমাজে আপন আপন সঙ্গীতের প্রসার বৃদ্ধির জন্য এইরূপে স্থানে স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ গাথা স্থান দিয়াছেন।

কিন্তু ইহার পর বারমাসীর কবি কঙ্ক সম্বন্ধে একবারে নীরব। জগতের সেই অনাদৃত নির্ব্বাসিত হতভাগ্য কঙ্ক কোথায় গেল। তাহার কি হইল; বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াও আমরা তাহার উত্তর পাইতেছি না। আমাদের কেবলি মনে হয়, এই সময় সেই চিরসুখ হারা অদৃষ্ট লাঞ্ছিত উন্মাদ ভক্ত যেন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ক্ষিপ্তগ্রহের মত ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

এদিকে সারা রজনী বিনিদ্র নয়নে কাটাইয়া প্রত্যুষে গর্গ যখন আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, তখন পথি মধ্যে তিনি অনেক গুলি অমঙ্গল দৃশ্য দেখিয়া আসিতে লাগিলেন,

> "বায়স ডাকিছে যত বসি চালে চালে,
> শকুনি গৃধিনী যত উড়ে পালে পালে,
> দূরহতে আসে যেন ক্রন্দনের ধ্বনি,
> এতেক দেখিয়া নাহি দেখে গর্গমুনি,"

চারি দিকে অমঙ্গল সূচনা, চারি দিকে বিপরীত দৃশ্য।

> "আসিতে পথের মাঝে অমঙ্গল নানা
> চারি দিকে যেন প্রেত পিশাচের থানা।
> কাক সাচান করে দিবসেতে রা,
> ডাক শুনি মুনির কাঁপিল সর্ব্ব গা।
> পথ কাটি শিবা ধায় না চায় ফিরিয়া,
> ঝটিতে চলিল মুনি আশ্রমে ধাইয়া"।

কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, গর্গ চতুর্দ্দিকস্থ সেই আশঙ্কা সূচক দৃশ্য হইতে নয়ন ফিরাইয়া ত্বরিত পদে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন। সব নীরব, এতবেলা হইয়াছে তবু পূজাগৃহের দ্বার রুদ্ধ। প্রাঙ্গণে গোবর ছড়ান নাই, বুঝি কাল সন্ধ্যার বাতিটীও জ্বলে নাই। বিষাদ ম্রিয়মান, দুএকটী মালতী মল্লিকা, দুএকটী যুথী যেন পাতার আড়ালে মুখ ঢাকিয়া শিশির ছলে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। পুষ্পবনে সে ভ্রমর ঝঙ্কার নাই, দুই একটী ভ্রমর উড়িয়া পড়িয়া যেন বিগত মহা শোক রজনীর বিষাদ সঙ্গীতটী গাহিয়া যাইতেছে—তাহা ভোরের আরতি গান নহে—শ্মশানের শোক গীত।

> "চারি দিক শূন্য ময় সুধু হাহাকার
> এত বেলা হলো কেহ না খুলে দুয়ার।
> মালতি মল্লিকা পড়ে ঝরিয়া ভূতলে,
> ভ্রমরা উড়িয়া যায় নাহি বসে ফুলে।
> নাহি খায় পুষ্প মধু না দেয় ঝঙ্কার
> বিপদ ভাবিয়া মুনি দেখে অন্ধকার।
> দেবালয়ে নাহি বাজে ভোরের আরতি।
> কাল বুঝি পূজা গৃহে না জ্বলিল বাতি,
> পুষনিয়া পাখীযত নীরব খাচায়
> নাহি ডাকে কণ্ঠে তারা না ডাকে লীলায়।"

গর্গ ভয়ে ভয়ে কাহাকেও ডাকিতে সাহসী হইলেন না, আরওএকটু অগ্রসর হইয়া গৃহ লক্ষ্মী স্বরূপিনী সুরভির অপঘাত মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন।

"প্রভাতে আসিয়া গর্গ আশ্রমে প্রবেশে,
নয়নেতে নিদ্রা নাই পাগলিয়া বেশে।
আশ্রমে পশিয়া গর্গ দেখিলা তখন
কাল বিষে সুরভি যে ত্যজিছে জীবন।"

এদিকে মাতৃ হারা পাটলীর হাম্বারবে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল,

"হাম্বারবে মা মা বলি ডাকিছে পাটলী,
গর্গের পাষাণ প্রাণ আজি গেল গলি।
কাতরে মায়ের কাছে হাম্বা রবে ধায়
কভু বা আসিয়া মুনির চরণে লুটায়।"

সংসারের সুখ দুঃখ বিদ্যুৎ ঝলকের মত এই আনন্দময় আশাপূর্ণ; পর মুহূর্তেই আবার বিষাদময় নিরাশ তমসাচ্ছন্ন। সুখ শান্তির পূর্ণ নিকেতন মুনির তপোবন তুল্য গর্গের আশ্রম আজ মহাশ্মশানে পরিণত।

এই মহাশোকের দৃশ্য গর্গ অবিচল চিত্তে অধিক ক্ষণ দেখিতে পারিলেন না। তাহার পাষাণ প্রাণ গলিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে গর্গ সংসারের স্নেহ দয়া মায়া মমতা হাসি কান্না সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। আজ মাতৃহারা পাটলীর করুণ বিলাপে আবার সে সকলই বুকে তুলিয়া লইলেন।

গর্গ বহুক্ষণ এক দৃষ্টে সুরভির মৃত দেহের পানে চাহিয়া রহিলেন। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। লীলাকেও ডাকিলেন না। কোটর মধ্যস্থিত বহ্নি জালায় দগ্ধীভূত তরুর মত, জলিয়া জলিয়া যেন ভস্ম হইতেছিলেন। তাহার দৃষ্টি অপলক, মানসিক ভাব উগ্র-অসংযত অপ্রফুল্ল।

বহুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। তারপর ধীরে ধীরে যাইয়া তিনি দেবমন্দিরের দ্বার খুলিলেন। ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গর্গ পূজায় বসিলেন। আজিকার পূজায় ফুল তাহার নয়নাশ্রু, নৈবেদ্য তাহার আত্মজীবন। বিন্ধ্যাচল চরণে নত অগস্ত্যের মত গর্গ জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন। তাহার দৃষ্টি নিমীলিত, মন নিরুদ্ধ, দর্শনেন্দ্রিয় কামনা বিরহিত। মহাযোগী যেন যোগাসনে বসিয়া অনন্তকালের সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। গর্গ অঞ্জলি ভরিয়া তপ্ত অশ্রু দেবতার চরণে অর্পণ করিতে ছিলেন।

ক্রমে একদিন—দুইদিন কাটিয়া গেল। গর্গ দেব-মন্দিরে ধর্ণা দিয়াছেন, পূজা গৃহের রুদ্ধ দ্বার খুলিতে কেহ সাহস করিল না। আশ্রমে গো হত্যা হইয়াছে। তিনি দেবতার চরণে কোন মহা অপরাধে অপরাধী, কি জন্য তাঁহার এ সর্ব্বনাশ না জানিয়া উঠিবেন না। হয়ত এই ভাবেই তিনি অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিবেন।

"বলা কওয়া করে লোকে এই মাত্র শুনে,
হত্যা দিয়াছেন গর্গ দেবের চরণে।
অন্ন নাহি খায় মুনি না খুলে দুয়ার
ক্রমে কথা রাষ্ট্র হইল সহর বাজার।
শিষ্যগণ আশ্রমেতে আসি ফিরি যায়
দুই শত মুনি বসিছে পুজায়।"

দেবতার আদেশ পাইবার জন্য গর্গ ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হইলেন। শোক দুঃখে জর্জ্জরীভূত মানব যখন অনন্যোপায় হইয়া দেবতার চরণে আত্মসমর্পন করে, রোগের ঔষধ পাপের শাস্তি, দুঃখের কারণ জানিবার জন্য দেবতার চরণে কায়মন প্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া মন স্থির করিতে পারে, তখন মনের ভিতর হইতেই তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তরগুলি, দেবতার আদেশ রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই মানস সম্ভূত বাণীই বিবেক বাণী বা দৈবাদেশ।

তিন দিন পর গর্গের সেই আশা সফল হইল। তিনি যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত শুনিতে পাইলেন, -

"শুন শুন শুন গর্গ দেবের বচন
দেবতা বিরূপ তোমা হইল যে কারণ।
আপন কন্যায় কে মারিতে যুক্তি করে
পালিত জনেরে কে বা বিষ দিয়ে মারে।
গয়বি আদেশ গর্গ শুনিলা শ্রবণে
কন্যেরে মারিতে বিষ দিলা অকারণে
তেহিনা কারণে তার এতেক সর্ব্বনাশ।
সেই বিষে সুরভির হইল প্রাণ নাশ।"

গর্গ সকল শুনিলেন। সুরভির মৃত্যুর তিনিই কারণ। তিনি নিজের অস্ত্রেই নিজে ক্ষতবিক্ষত। তাহার প্রদত্ত বিষেই সুরভির প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। তিনিই এই গোহত্যার ফলভাগী। তাহার আরও অনেক পাপ ছিল। তিনি অপাপবিদ্ধা লীলার চয়িত পুষ্পরাশি অপবিত্র জ্ঞানে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। শৈশব হইতেই সেই সরলা বালিকার ভক্তিপূর্ণ পুষ্পাঞ্জলিতে তাঁহার গৃহ-দেবতা প্রসন্ন। আজ ভ্রান্ত জ্ঞানে তিনি তাহার মানস দেবতার নিকট তিরস্কৃত। এতকাল ধরিয়াও তিনি ক্রোধ হিংসাকে জয় করিতে সমর্থ হন নাই। অতি সামান্য কারণে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। তাহার বহুদিনের সাধন ফলে প্রায় সিদ্ধ-ব্রত, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি গোহত্যার পাতকী, এ দেব পূজায় আর তাঁহার অধিকার নাই।

গর্গ স্থির চিত্তে দেবতার আদেশ শুনিলেন। আবার পূজায় বসিলেন। এবারকার পূজা—তাঁহার মুক্তির কামনা, গোহত্যাজনিত মহাপাপ হইতে অব্যাহতি লাভ দরবিগলিতধারে তাহার আত্মগ্লানি-জর্জ্জরিত জীবনের অশ্রুধারা গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতেছিল। অনিদ্রায় অনাহারে এইরূপে চতুর্থ দিনও কাটিয়া গেল। দেবতার দয়া হইল। গর্গ দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। সরলা পবিত্র হৃদয়া লীলার চয়িত পুষ্পরাশি না হইলে দেবতার প্রাণ তুষ্ট হইবে না। তাহারই অসামান্য সরলতা ডোরে দেবতা তাহার ঘরে বাঁধা। এই জ্ঞানে লীলার চয়িত যে বাসি ফুলগুলি বাহিরে পড়িয়াছিল তাহা কুড়াইয়া লইয়া অঞ্জলি ভরিয়া দেবতার চরণে উৎসর্গ করিলেন। আর সেই সঙ্গে উৎসর্গ করিলেন তাহার তপ্ত অশ্রুধারা—জীবন মরণ সংসার বাসনা মন প্রাণ বিষয় বৈরাগ্য হিংসা দ্বেষ কামনা সুখ দুঃখ জ্বালা যন্ত্রনা পাপ তাপ চিন্তা অচিন্তা বিকার নির্ব্বিকার যত কিছু সমস্ত। আজ হতে গর্গ মুক্ত পুরুষ।

গর্গ বাহিরে আসিলেন। আজ তিনি মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রফুল্ল। দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে গোহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। গর্গ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন; বুঝিতে পারিয়াছেন, যে ইহা কেবল কূটচক্রিগণের চক্রান্ত। ধূর্ত্ত গ্রামবাসীর পাপ প্রপঞ্চে ভুলিয়া তিনি এইরূপে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিয়াছেন।

খদ্যোতিকায় চাঁদের আলো, বনফুলে পারিজাতের সৌরভ। অবজ্ঞাত হেয় চণ্ডাল কঙ্কের অসামান্য প্রতিভা ব্রাহ্মণোচিত প্রভাব প্রতিপত্তি, তদুপরি গর্গ হইতে নিত্য অবজ্ঞাত লাঞ্ছিত, বিচারে পরাস্ত হইয়া ধূর্ত্ত গ্রামবাসী তাহাকে ভস্মীভূত করিবার জন্য এই চিতানল জ্বালিয়াছিল; গর্গের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি নিরপরাধ কঙ্কের অন্বেষণে চারিদিকে শিষ্যগণকে পাঠাইতে সংকল্প করিলেন।

বিচিত্র ও মাধব নামে তাঁহার দুই অনুগত শিষ্য ছিল।

"বিচিত্র মাধবে মুনি ডাকিয়া সম্ভাষে,
কঙ্কের অন্বেষণে তোমরা যাও দেশে দেশে।
বহুদিন পুত্র জ্ঞানে পালিয়াছি যারে,
হীরামন তোতা মোর কোথা গেল উড়ে।
চারিদিক শূন্য হেরি তাহার কারণ,
দেশে দেশে ঘুরি তোমরা কর বিচারণ।
ভাইয়ের মতন তোমরা করিয়াছ স্নেহ
কঙ্কের বিহনে মোর শূন্য হলো গেহ।
মলিন চান্দের আলো ফুল হইল বাসি,
আমার লাগিয়া কঙ্ক হইল বৈদেশী।
যাও যাও বিচিত্র আরে মাধব সুন্দর,
যেখানে যে দেশে গেছে পুত্র কঙ্কধর।
লাগাল পাইলে তারে করেতে ধরিয়া
আমার মাথার কিরা আসিও জানাইয়া
মাতৃহীন পাটলীরে দেয় তৃণ জল
আশ্রমে এমন আর নাহিক সম্বল।

... ...

আর কইও আর কইও জানায়ে মিনতি,
সন্দেহ ঘুচেছে মোর কঙ্কধর প্রতি।
আর কইও আর কইও পোষনিয়া পাখী
ক্ষীর সর ত্যজিয়াছে তোমারে না দেখি।
আন্ধাইরে ঢাকিয়া লইছে চাঁদের বাগান।
আমার আশ্রম আজি হইয়াছে শ্মশান।

"যতদিন নাহি ফির কঙ্কেরে লইয়া,
ততদিন এহিভাবে থাকিব বসিয়া।
না খাইব অন্ন আর না ছুইব পানি,
এইরূপে অনাহারে ত্যজিব পরাণী।
যদি নাহি পাও তোমরা কঙ্কের দরশন
তবে জাইন এহিভাবে আমার মরণ।
আর যদি দেখা পাও কইও করে ধরি,
অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা ভিক্ষা করি।"

অশ্রুপূরিত নেত্রে বলিতে বলিতে গর্গ নীরব হইলেন, শ্রাবণের বারি ধারা প্লুত মহাগিরির ন্যায়, তাহার নীরব অশ্রুতে সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র হইয়া গেল।

"গুরু পদধূলি দোহে শিরে লইল তুলি,
আশীর্ব্বাদ করে মুনি হরি হরি বলি।
বিদায় হইয়া দোহে গর্গের চরণে
চলিলেক দেশান্তরে কঙ্কের অন্বেষণে।
বিচিত্র মাধব যায় কঙ্কে অন্বেষিতে
ঘরে থাকি লীলা তাহা শুনে সচকিতে।"

বিরহিণী লীলার তৎকালীন অবস্থা কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ আবেগময়ী ভাষাতে অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থানের প্রত্যেকটী গান, প্রতি কথা এমনই মর্ম্মস্পর্শী যে শুনিলে অশ্রু সংবরণ করা অসাধ্য হইয়া উঠে। মনে হয় যেন নদীর বেলায় দাঁড়াইয়া কোন বিরহিণী সুন্দরী, আপন গত জীবনের স্মৃতির কাহিনীটুকু লইয়া বীণাটী বাজাইয়া গাহিয়া যাইতেছে, আর মিশিতেছে—সলিল ধারায় তাহার তপ্ত অশ্রু। মিশাইতেছে—তটিনীতে কুলুধ্বনির সঙ্গে বিরহিণীর বীণার তান। আর মিশাইতে যাইতেছে—নদী স্রোতের সঙ্গে তাহার অতৃপ্ত বাসনা সহ বিরহবিদগ্ধ জীবন স্রোত।

কবি গাহিয়াছেন—

"অবধান সভাজন শুন দিয়া মন,
বিরহিণী লীলার শুন যত বিবরণ।
অন্ন নাহি খায় লীলা নাহি ছুয়ে পানি,
ভূতলে পাতিল শয্যা লীলা বিরহিণী।"

বিচিত্র মাধব চলিয়া গিয়াছে, অভাগিনী লীলা ঘরে বসিয়া কত না কিছু ভাবিতেছে; নদী তরঙ্গের মত, এক দুই করিয়া কত না কথা তাহার মনে উঠিতেছে, আবার লয় পাইতেছে—কি জানি—

"অভিমানে কঙ্ক যদি ফিরে নাহি আসে,
কেমনে হইবে দেখা থাকিলে বৈদেশে।
কি জানি কঙ্কেরে তারা খুঁজিয়া না পায়,
জিয়ন্তে না হবে দেখা কি হবে উপায়।
আহা কঙ্ক কোথা গেলে ছাড়িয়া লীলায়,
তোমার মালঞ্চ ফুল বাসি হইয়া যায়।"

মালঞ্চে ফুল ফুটে, আবার বাসি হইয়া যায়। মেঘ ছুটে, তারা ফুটে, চাঁদ উঠে, দিন যায়, রাত আসে। কিন্তু হায় অভাগিনীর সে দুঃখের রজনী আর পোহায় না। রজতধবল জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী যখন আলোক সাগরে ভাসিতে থাকে, লীলার মন তখন নিরুদ্ধ—গাঢ় তমসাচ্ছন্ন। অতীত জীবনের কত স্মৃতিই না মনের ভিতর জাগিতেছে। এমনই জ্যোৎস্না মাখা রজনীতে কতদিন লীলা কঙ্কসহ নদীতীরে বেড়াইতে গিয়াছে, দূর হইতে কত পালভরা নৌকা পাখীর মতন তাহাদের সামনে দিয়া উড়িয়া গিয়াছে, মাঝিমাল্লাগণের দুএকটী ভাটিয়াল সঙ্গীত আজও লীলার কাণে বহুদিনের বিস্মৃত স্বপ্ন সঙ্গীতের মত ধ্বনিত হইতেছে। অনেক সময় কঙ্ক সে গানগুলি শিখিয়া লইয়া অবসর রজনীতে লীলাকে গাহিয়া শুনাইয়াছে, চন্দ্রগ্রহণের দিন এমনই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ তলে, নিস্তরঙ্গ নদী জলে, পাড়াপরশীগণ সহ কঙ্ক ও লীলা স্নান করিতে আসিত। উভয়ে কতদূর সাঁতার কাটিয়া যাইত, কঙ্ক অনেক দূর যাইত, লীলা তত পারিয়া উঠিত না।

"আর কত দূর যাওরে বন্ধু আর কতদূর যাও,
ডুবিয়া মরে তোমার লীলা ফিরিয়া কেন্‌না চাও।"

লীলা পাড়ে ফিরিয়া আসিয়া তরঙ্গবিক্ষিপ্ত নদীর জলে কঙ্কের প্লবমান মোহন মূর্ত্তিটী নয়ন ভরিয়া দেখিত। এই যে উদ্যান—কঙ্ক নিজ হস্তে তাহা কত না যত্নে সাজাইয়াছে, ঝাকে ঝাকে মালতী মল্লিকা ফুটিয়া রহিয়াছে,

"কেবা তুলে ফুল আর কেবা গাঁথে মালা,
অভাগী কাটায় দিন কান্দিয়া একেলা।"

গাছের ফুল গাছে শুকায়। আগে কঙ্ক এই সকল ফুল

তুলিয়া মালা গাঁথিয়া নিজ হস্তে লীলার কবরীতে পরাইয়া দিয়াছে, আজও কত বাসি মালা তেমনি ভাবে ধুলায় পড়িয়া লুটাইতেছে। অনেক দিন হইল লীলা কঙ্কের বাঁশীর গান শুনে না। সে চিত্ত উচাটনকারী মধুর বংশী কৈ? আর ত তেমন করিয়া স্বর সুধা লহরীতে প্রান্তর প্লাবিত করিয়া বাজে না। এই না বাঁশীর গান শুনিয়া লীলার মন-যমুনা উজান বহিত, এইত না বাঁশীর গান শুনিতে শুনিতে লীলা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িত। আবার এই বাঁশীর গানেই লীলার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত, নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিত। অত্যুচ্চ বৃক্ষ হইতে কঙ্ক নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া ফল আনিয়া দিয়াছে, মৃণাল কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়া লীলার জন্য ঝিলের পদ্ম কুড়াইয়া আনিয়া দিয়াছে।

"অতি উচ্চ বৃক্ষ হতে পাড়িয়া দিছে ফল
কণ্টক ঘাটিয়া দিছে সোনার কমল।
হায় বন্ধু এবে মনে পড়ে সেই কথা
কোথায় অভাগী লীলা তুমি রৈলে কোথা।"

মাতৃহীনা লীলা মায়ের জন্য একটুখানি কাঁদিলে, কঙ্ক ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাহাকে কত ভাবে সান্ত্বনা করিত। অঞ্চল ধরিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিত।

এখন—"কান্দিয়া মাকরআশা ঝরে দুনয়নে,
কেউ না সান্ত্বনা করে কঙ্কধর বিনে।"

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া ভাই বোনের মত তাহারা দেবপূজার জন্য ফুল তুলিতে যাইত. সন্ধ্যাবেলা ধুপ ধুনা লইয়া যাইবার জন্য লীলাকে ত্বরান্বিত করিত।

"ঘনাইয়া আসিল সন্ধ্যা আসিতেছে রাতি,
শীঘ্র করি-কন্যা তুমি জাল সন্ধ্যার বাতি।"

লীলা দেবালয়ে সন্ধ্যার প্রদীপটী জ্বালিয়া, ধুপধুনা দিয়া দেবতার আরতি দিত, কঙ্ক বাহির হইতে শাঁখ বাজাইত। তারপর মন্দির সোপানে উভয়ে নতজানু হইয়া ভক্তিভরে কুলদেবতাকে প্রণাম করিয়া কুটীরে ফিরিত।

প্রাতঃসন্ধ্যা দুবেলা লীলা কলসী লইয়া নদীর ঘাটে যাইত, ছায়ার মতন কঙ্ক তাহার পাছে পাছে যাইত। সদ্যস্নাতা লীলা দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া পিতার পূজার আয়োজন করিয়া দিত। অনেক দিন তর্কচ্ছলে দুইজনে ঝগড়া ঝাটিও হইয়াছে। লীলা কঙ্কের সঙ্গে কথা বলিবে না—নীরবে কয়েক মুহূর্ত্ত কাটিয়াও গিয়াছে, পরক্ষণেই আবার বাহুগুলি লীলা কঙ্কের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে —"আমায় ক্ষমা কর।" অবসর রজনীতে কঙ্ক লীলাকে আশ্রম প্রান্তস্থিত বকুল বৃক্ষতলে লইয়া বসিয়া কত রূপকথা শুনাইয়াছে; কত সোনার কাটী রূপার কাটীর স্পর্শে কত পাতালপুরীর সুপ্ত রাজকুমার কত অজানিত পর্ব্বতরাজ্যের নিদ্রিতা রাজকন্যার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দিয়া লীলার মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া দিয়াছে।

"আরবার শুনাওরে বন্ধু তোমার রসের কথা,
কোথায় গেল মদনকুমার আর মধুমালা কোথা।"

যেদিন লীলা রাগ করিয়াছে, আর কিছুতেই আহার করিবেনা, সেদিন অনেক বেলা রৌদ্র তাপিত ক্লান্ত দেহ লইয়াও কঙ্ক লীলাকে আহার না করাইয়া নিজে আহার করে নাই।

"আইওগো আইওলো কন্যা আমার মাথা খাও
বাসি হইল ভাত ব্যঞ্জন কেন বা ভারাও।"

হাত ধরিয়া কত সাধা সাধি! দুপুর বেলা সুরভি প্রান্তর হইতে ফিরিয়া আসিত,—

"গোষ্ঠ হতে সুরভি ঐ আসিতেছে ফিরি
ওই শোনা যায় বাজে বন্ধুর বাঁশরী।"

বাঁশী বাজাইয়া কঙ্ক পেছনে পেছনে আসিত, লীলা তাহাকে দেখিতে পাইয়াও সুরভির গলা জড়াইয়া ধরিয়া অনাবশ্যক প্রশ্নে তাহাকে উপদ্রব করিত—কঙ্ক কোথায়? তখনই আবার কঙ্কের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহ হইতে তালের পাখাটি লইয়া ছুটিয়া আসিত—

'আইসাছে প্রাণের বন্ধু পাইয়া বহু ক্লেশ,
ঘামেতে ভিজিয়া গেছে তোমার মাথার কেশ
আনিতে তালের পাঙ্খা লীলা ঘরে যায়,
অঞ্চল পাতিয়া কঙ্ক শুয়ে আঙ্গিনায়"

সে হাস্য পরিহাসের দিন গিয়াছে। হায়! সুরভি আর নাই। তাহার জীবন সঙ্গিনী তাহাকে ছাড়িয়া কোন অজানা দেশে লুকাইয়াছে; আজ সুরভি থাকিলে লীলা তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া মনের আগুন নিবাইত।

সুখের দিন যত সহজে যায়, দুঃখের দিন তত সহজে যায় না। আগে হাসিতে হাসিতে দিন চলিয়া যাইত, এক্ষণে কাঁদিতে কাঁদিতে দিন ফুরায় না। প্রাতঃসন্ধ্যা বিহীন দীর্ঘ দিবস-রজনী কত অনাহারে কত অর্দ্ধাহারে যাইতেছে, কে তাহার সেই সুখ দুঃখের মানস সঙ্গিটী? কে তাহার দীর্ঘ দুর্গম সংসার প্রান্তরের সহযাত্রীটি? কোন অন্ধকারে লুকাইয়াছে তাহার জীবন আলো করা ধ্রুব তারাটি? হায় তাহা কোন মেঘে ঢাকা পড়িয়াছে?

তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ বিভাসিনী উষা যখন পূর্ব্বাসার গগনে স্বর্ণমুষ্টি ছড়াইয়া প্রভাতের সিংহাসনটি জুড়িয়া বসে, তখন সুপ্তোত্থিতা লীলা ভূমি শয্যা ছাড়িয়া যুক্ত করে জগত লোচন পদে শির নমিত করিয়া বলে,—

"পূবেতে উদয়রে ভানু পশ্চিমে অস্ত যাও
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া বন্ধের দেখা নিগো পাও।
এমন আন্ধাইর নাইরে তোমার আলো নাহি পশে,
যাওয়া আইসা ঠাকুর তোমার আছে সর্ব্ব দেশে।
কহিও কহিও ঠাকুর আরে তুমি দিন মণি,
যাহার লাগিয়া আমি হইনু পাগলিনী।
লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও
আলোকে চিনাইয়া পথ দেশেতে আনিও।"

উন্মাদিনীর মত লীলা দুবেলা নদীর তীরে ছুটিয়া যায়। জল আনিবার জন্য নহে, দেশ বিদেশ হইতে এই যে পাল ভরা নৌকা সকল আসিতেছে যাইতেছে, তাহাতে বন্ধের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু বিদেশের অচেনা লোক কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। কেবল মনের মর্ম্মন্তুদ দুঃখে গাহিয়া যায়—

"শুনরে বিদেশী ভাই মাঝি মাল্লা গণ,
কত না দেশেতে তোমরা কর বিচারণ।
পাহাড়ে পর্ব্বতে যাও তরণী বাহিয়া
লাগাল পাইলে বন্ধে আনিও কহিয়া।
যাহার লাগিয়ারে আমি হইলাম উন্মাদিনী,
নদীর কিনারে কান্দি বসি একাকিনী।
দিবস না যায়রে মোর না পোহায় রাতি
মম দুঃখ কইও বন্ধে জানাইও মিনতি।
আর কইও কইওরে দুঃখু বন্ধেরে জানাই,
মরিতে তাহার লীলার বেশী বাকী নাই।
শুন শুন নদী আরে শুন আমার কথা,
তুমিত অভাগী লীলার জান মনের ব্যথা।
তুমিত দরিয়ারে নদী নদী আরে কুলে তোমার বাসা,
তুমি জান কত লীলার মনের যত আশা।
তুমি জান কত লীলার ভাল বাসাবাসি,
জাগিয়া তোমার তীরে কাটাইয়াছি নিশি।
কত দেশে যাওরে নদী বহিয়া উজান,
কোথাও নি শুনিতে পাও নদী সেই বাঁশীর গান।
পাহাড়ে পর্ব্বতেরে নদী তোমার যাওয়া আসা,
অভাগীরে ছাইরা বন্ধে কোথায় লইল বাসা।
লাগাল পাইলেরে তারে কই লীলার কথা,
মিনতি জানাইয়া কইও দুঃখের বারতা।
নিশ্বাসে শুকায়রে নদী কান্দি গলে শিলা,
প্রাণে মাত্র এই ভাবে বাঁচি আছে লীলা।
সেওত বেশী নহেরে নদী দিন যায় চলি,
মরিবে অভাগী লীলা আজি কিম্বা কালি।
মরবার কালে দেখা যাইতাম যুগল চরণ
লাগাল পাইলে কইও লীলার দুক্কের বিবরণ"

নদী তেমনই ভাবে চলিয়া যায়, লীলার একটী কথারও উত্তর দেয় না। পাল ভরা নৌকার মাস্তল দূর দিগন্ত কুলে উড্ডীয়মান বিহঙ্গের ন্যায় মিশিয়া যায়; তেমন কত আসে, কত যায়, কৈ একটীও ত আশার বাণী তাহাকে বহিয়া আনিয়া দেয় না। অবিশ্রান্ত কুলুধ্বনিতে নদী কত জনের কত মানস তৃপ্তিকারী, আশার সঙ্গীত গাহিয়া যাইতেছে, কিন্তু লীলার কর্ণে তাহা কেবলই দুঃখময় নৈরাশ্য ব্যঞ্জক হাহাকার মাত্র। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লীলা নদী তীরে দাঁড়াইয়া আছে। এই যে আর একটী নৌকা, এই যে আর একটী আসিতেছে, আর একটু দাঁড়াই, দেখিয়া যাই, কৈ সেটিও ত চলিয়া গেল। দূর দিগন্তের ঘন মসীবর্ণ পর্ব্বত মালার উপর লীলা অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নের নির্নিমেষ দৃষ্টি বুলাইয়া এইরূপে প্রত্যহ ঘরে ফিরিয়া আসে।

এইরূপে দিন যায়, রাত আসে—

"রজনী কালের সাক্ষী শুন চন্দ্র তারা,
কোথায় হারাইল আমার নয়নের তারা।
জাগিয়া পোহাইছি নিশি তোমরাত জান,
কোন দেশে গেল বন্ধু বলহ সন্ধান।
সপ্ত সাগর তীরে পর্ব্বত অচলে,
যথা তথা যাও তোমরা এই নিশাকালে।
অতি উচ্চে কর বাসা পাওত দেখিতে,
বল শুনি বন্ধু মোর গেল কোন্ পথে।
শুন শুন শুনরে কথা যত তারাগণ,
তিলেকে বেড়াইতে পার এ তিন ভুবন।
খুজিয়া দেখিও প্রিয় আছে কোন স্থানে
মরিছে অভাগী লীলা বলো তার কাণে।
নিশিথে নিদ্রার ঘোরে ছিলাম অচেতন
অঞ্চল খুলিয়া চোরে নিয়াছে রতন।
সে রত্ন খুজিয়া আমি ঘুরিয়া বেড়াই
এমনি দুঃখের নিশি কান্দিয়া পোহাই।
কান্দিতে কান্দিতে মোর অন্ধ হইল আঁখি
কোন দেশে উইরা গেল আমার পিঞ্জরের পাখী।
এমন নিষ্ঠুর বিধি নাহি দিল পাখা
উড়িয়া বন্ধের সঙ্গে করিতাম দেখা।"

হায়! যদি পাখী হইতাম, তবে স্থাবর জঙ্গমময় বিশ্ব বসুন্ধরার প্রতি রেণুতে প্রতি ধুলিকণায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতাম, আমার সেই কণ্ঠের হার নয়নের মণি কোথায় পড়ে আছে।

যাইবার সময় লীলা পথি পার্শ্বস্থিত তরু সকলকে জিজ্ঞাসা করে:—

"দিবস রাত্তির সাক্ষী তোমরা তরু লতা
তোমরা নি জান গো আমার কঙ্ক গেল কোথা।
বল বল তরু লতা রাখ আমার প্রাণ
দয়া করি বল তার পথের সন্ধান।
আর যদি জানাবে বল যাইবার কালে
অভাগী লীলার কথা গিয়েছে কি বলে।"

গাছের শাখায় পাখী বসে—লীলা কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করে:—

উচ্চ ডালে বইসারে পাখী নজর বহু দূরে।
এই পথে নি যাইতে দেখছ আমার কঙ্কধরে॥
কত দেশে যাওরে তোমরা পাখী আরে উড়িয়া বেড়াও।
পূর্ণিমার চান্দে আমায় দেখিতে নি পাও॥
দেখিতে নি পাওরে আমার হীরামন তোতা।
দেখিলে জানাইও আমার দুঃখের বারতা।
কইও কইও কইওরে তারে আমার মাথা খাও।
অভাগী লীলার দুঃখ যদি নাগাল পাও॥"

মধুর স্বর লহরীতে আকাশ প্লাবিত করিয়া কোকিল পাপিয়া সঙ্গিগণ সহ উড়িয়া যায়, উদ্ভ্রান্ত নিরাশ প্রণয়িনী লীলা তখন বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু দুটী মুছিয়া কুটিরে ফিরিয়া আসে। পিঞ্জরাবদ্ধ শুক শারীকে লীলা কান্দিয়া জিজ্ঞাসা করে:—

তোমরাত পিঞ্জরার পাখী নাহি থাক বনে।
তোমরা তাহার কথা ভুলিলা কেমনে॥
ক্ষীর সর দিয়া পাখী পালিল যে জন।
কেমনে তাহার কথা হইলে বিস্মরণ॥
এত যে বাসিয়া ভাল পালিল সকলে।
কি বলিয়া গেল বধু যাইবার কালে।
কোন দেশে যাবেরে বলি কহিল ঠিকানা।
অবশ্য তোমাদের পাখী কিছু আছে জানে॥
ধরিয়া সারীর গলা লীলা কহিছে কান্দিয়া।
আগে আগে চল আমায় পথ দেখাইয়া॥
উড়িয়া যাইতে রে পাখী আছে তোমার পাখা।
এক দিন অবশ্য পথে হবে তার দেখা॥"

লীলা খাঁচার পাখী উড়াইয়া দিল।

"উড়িয়া যাও হীরামণ তোতা উঠরে আকাশে।
শীঘ্র গতি চল মোর বন্ধু যেই দেশে॥"

আমার প্রণের দেবতা যে দেশে আছে সেই দেশে যাও।

"দেখিলে শুনাইও তারে আমার দুঃখের গান।
বলিয়া কহিয়া আনিয়া তারে বাঁচাও লীলার প্রাণ॥
সম্পদ কালেতে পক্ষী পালিল তোমায়।
ভুলিতে এমন জনে কভু না জোয়ায়॥
পৃথিবী ভ্রমিয়া পক্ষী করিও সন্ধান।
বারতা আনিয়া তাহার বাঁচাও লীলার প্রাণ॥"

খাঁচার পাখী উড়িয়া আবার খাঁচায় আসে। লীলার যেজানী পাইয়াও হীরামণ শারী স্নেহের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া অধিক দূরে উড়িয়া যাইতে অসমর্থ। বাটী ভরা ফল জল পড়িয়া থাকে, হায়! মুক বিহঙ্গ জাতি তাহাদের ভাষা নাই, থকিত যদি কাঁদিয়া তাহারা গর্গের পর্ণ কুটীর ভাসাইয়া দিত।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল এ'দিকে বিচিত্র মাধবেরও কোন সংবাদ নাই।

এই স্থান হইতে প্রকৃত বারমাসী আরম্ভ। কিন্তু এই বারমাসীতে মাত্র ছয় মাসের সুখ দুঃখের বর্ণনা দেখাযায় আমরা আগামী বারে আমাদের পাঠকগণকে সেই লীলার বারমাসী উপহার দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

পোষ্য পুত্র।

(গল্প)

বৃদ্ধ জমীদার বাবু ক্রমে দুই সংসার করিয়াও যখন সন্তান লাভে পরাঙ্মুখ হইলেন, তখন তিনি নিতান্তই নিরাশ হইলেন। কেহ বলিত, জমীদার বাবুর কঠিন ব্যারাম, কেহ বলিত তিনি আটকুড়ে। এদিকে গণপতি দৈবজ্ঞ বলিতেছেন, আমি করকোষ্ঠি গণনা করিয়া দেখিয়া রাখিয়াছি স্বয়ং কার্ত্তিক কুমার ও লক্ষ্মী সরস্বতী রাজ গৃহ আলো করিবেন। একি ভুল হইতে পারে!" যাই হউক, এইরূপ আশায় ও নিরাশায়, সুখেও দুঃখে কিছু দিন চলিয়া গেল, কোন ফল ফলিল না। বরং জমিদার মহাশয়কে পুত্র কন্যার জন্মোৎসবের পরিবর্ত্তে ক্রমে দুটা করিয়া পত্নি-শ্রাদ্ধ করিতে হইল। তখন তাঁহার ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকা কঠিন হইয়া উঠিল।

(২)

বিমলা জমিদার বাবুর তৃতীয় পক্ষ—অন্ধের যষ্টি। উপর্য্যপরি দুইবার বুকে ঘা খাইয়া তাহার প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রত হইয়াছিল। আঘাতের দ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল, বৃদ্ধের হৃদয়ে প্রেমের ফাঁশ ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল—সেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসে বিমলাকে একেবারে সিক্ত করিয়া ফেলিল। বিমলার ইঙ্গিতে বিশাল জমিদারী চলিতে লাগিল। তখন বিমলা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তাহার মত বুদ্ধিমতী দ্বিতীয় নাই।

এদিকে দেশের যত মাদুলী কবজ একত্র জড় হইয়া বিমলার স্থূল বপু আরো গুরু ভারে প্রপীড়িত করিয়া তুলিল। জমিদার বাবু মনে করিতেন, অদৃষ্টই সকল বিপত্তির ও অশান্তির কারণ। বিমলা মনে করিত, অযোগ্যতাই নিরাশার কারণ। এই লইয়াও দুইজনে মাসে মাসে বেশ বাদ বিসম্বাদ হইত এবং তাহার ফলে সময় সময় আহার আয়োজন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিত এবং সে দিনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন নিভৃত কক্ষে, নির্জ্জন চিন্তায়, পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রু জলে কাটিয়া যাইত। অবশেষে বৃদ্ধ জমিদার মহাশয় সকলের পরামর্শে ও গৃহিণীর সম্মতি লইয়া দরিদ্রের স্তন্য পায়ী এক শিশু পুত্রকে পোষ্য পুত্র রূপে গ্রহণ করিয়া পিণ্ড দানের উপায় করিলেন।

(৩)

অনেকদিন পরে প্রাচীন টুটকা ফল প্রসব করিতে লাগিল, দৈবজ্ঞের কথা সত্য হইল। পোষ্যপুত্র যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, ঠিক সেই সময়ে বিমলা একটী নবকুমার প্রসব করিল। অধিক বয়সে একটী শিশু পাইয়া বৃদ্ধের স্নেহ অত্যন্ত ঘণীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত ক্ষুদ্রকায় স্তন্য পিপাসু নিদ্রাতুর শিশুটী অজ্ঞাত সারে পিতামাতার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল। বৃদ্ধের সঞ্চিত স্নেহ মমতা এতদিন এক অস্বাভাবিক উপায়ে প্রবাহিত হইয়া শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, সহসা আজ প্রাণের সন্নিকটে শিশুর কল-গীতি ধ্বনিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় ভবিষ্যতের দুঃস্বপ্নে জাগ্রত করিয়া তুলিল। স্বপ্নের প্রভাবে তাঁহার বার্দ্ধক্য যেন যৌবনে মণ্ডিত হইয়া উঠিল—তিনি কত রঙিন স্বপ্ন, কত সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। হায় আশার স্বপ্ন!

ইহার পর বৃদ্ধ জমিদারের যুবতী পত্নি উপরি উপরি

আরও দুটী কন্যা প্রসব করিয়া পোষ্য পুত্র রক্ষার অনাবশ্যকতা সপ্রমাণ করিয়াদিলেন। তখন জমিদার গৃহে বুদ্ধির লেনাদেনা বিস্তর হইতে লাগিল। বৃদ্ধ জমিদার অগত্যা তরুণী ভার্য্যার মতে মত দিয়া চির প্রচলিত প্রবাদ কথার সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। কূট বুদ্ধি নায়েব গোমস্তারাও উদর পূরণ জন্য মামলা সৃষ্টির পথ খুঁজিতে-ছিলেন, তাহারাও এক্ষেত্রে সায় দিয়া বর্ত্তমানে প্রভুর মন রক্ষা ও ভবিষ্যতে নিজ নিজ উদর পূরণের ব্যবস্থা করিলেন। সুতরাং অনতিবিলম্বেই পোষ্যপুত্রের মাসিক ব্যয় প্রেরণের ব্যবস্থার অব্যবস্থা হইল। অনোন্যপায় দেখিয়া পোষ্য পুত্রটীও ঠাকুর চাকর বিদায় দিয়া ভারাটে বাসা উঠাইয়া হোটেল বাস স্থির করিল।

পোষ্যপুত্র গিরীন্দ্রনাথ সুশীল ও সুশিক্ষিত সুতরাং চতুর্দ্দিকের আবহাওয়ার স্পর্শে বুঝিল, বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে; সে আপন উপায় আপনি খুঁজিতে লাগিল।

গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী আসিয়া দেখিল, বাড়ীর চতুর্দ্দিকে সংঘর্ষণ জনিত অগ্ন্যুৎগমের শোচনা দেখা যাইতেছে। অন্দরের মধ্যে শান্তিতে সময় কাটাইবার তেমন সুবিধা নাই, সুতরাং সে বহির্বাটীতেই বৈমাত্রেয় শিশু ভ্রাতার সহিত একটা স্নিগ্ধ আকর্ষণ জাগাইয়া কোনপ্রকারে বন্ধের দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। এই সম্মিলন বিমাতার অভিপ্রেত না হইলেও ভগবানের কৃপায় তাহা হইল এবং শিশুর টান ধীরে ধীরে গিরীন্দ্রের দিকে ঝুকিয়া পড়িল।

বালক আর অন্দরে থাকিতে চায় না। বালকের দৌরাত্মে গিরীন্দ্রেরও এক দণ্ড স্থির থাকিবার যো ছিল না। সে এক খানা পুস্তক পড়িতে বসিল, বালক দৌড়িয়া আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল; তারপর দোয়াত হইতে অলক্ষ্যে কালি লইয়া পুস্তকের পাতায়, নিজের নাকে মুখে, লিপ্ত করিয়া খিল্ খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। কখনও বা তাহার স্কন্ধে চড়িয়া আমোদ উপভোগ করিতেলাগিল, আবার রাগ হইলে তাহার চুল ধরিয়া সজোরে টানিয়া ধরিতেছে, কার সাধ্য ছাড়াইয়া নেয়। এ ছাড়া বাঘের ডাক, কাকের ডাক ডাকা, ঘোড়া হওয়া, হাতী হওয়া—এ সকলও ঘণ্টায় ঘণ্টায় করিতে হইত। এইরূপ আমোদের মধ্যে গিরীন্দ্রের দিন বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। বালকও অল্প দিনের মধ্যে গিরীন্দ্রের হৃদয় জুড়িয়া বসিল।

সংসারে অনেক রকমের লোক আছে—তন্মধ্যে পরের ভাল যে দেখিতে পারে এমন লোক বিরল। গিরীন্দ্র যে বালককে আদর যত্ন করে, এটা গ্রামের লোকের চখে বাজিত—বিশেষ তাহাদের বেতন ভোগী কর্ম্মচারিগণের। তাই তাহারা কেহ কেহ সময় সময় গোপনে আসিয়া গিরীন্দ্র নাথকে বিনা পয়সায় নানারূপ উপদেশ দিতে ত্রুটী করিত না। গিরীন্দ্র কিন্তু সে সব কথা কাণে তুলিত না। গিরীন্দ্র নাথের নিজের শক্তির উপর যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল; সে বলিত পুরুষাকার ব্যতীত কিছুতেই তাহার বিশ্বাস নাই। অদৃষ্টকে সে নিতান্তই দুর্ব্বলের অবলম্বন বলিয়া মনে করিত। সে দরিদ্রের সন্তান, জমিদারী-ভোগ-স্পৃহা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না, সুতরাং তাহাকে কেহ টলাইতে পারিল না।

(৫)

কালচক্রের ভীষণ আবর্ত্তনে বৃদ্ধের যখন আহ্বান কাল সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন তাড়াতাড়ি বিমলার পরামর্শে ঔরষজাত পুত্রকে সকল বিষয় সম্পত্তির ওয়ারিশ সাব্যস্ত করিয়া বৃদ্ধ জমিদার এক উইল সম্পাদন করিলেন। বৃদ্ধের এ গুপ্ত কীর্ত্তিতে পোষ্য পুত্র গিরীন্দ্র পথের কাঙ্গাল হইল। যাহাহউক বৃদ্ধ, পত্নির প্রীতি সম্পাদন করিয়া শান্তিতে চক্ষু মুদিলেন।

গিরীন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায়। বৃদ্ধ নায়েব দেখিল এ সুযোগে পোষ্য পুত্র দ্বারা একটা গোলযোগ করিবার উদ্যোগ করিতে পারিলে একটা ফসাদ বাঁধাইয়া কিছু টাকা বাহির করিয়া নেওয়া যাইতে পারে; তাই তিনি সশরীরে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু গিরীন্দ্রনাথ তাহার কথায় উত্তর না দিয়া বলিল "কর্ত্তা যাহা করিয়াছেন, তাহা ভালই হইয়াছে। নবকুমার থাকিতে আমি এ বিষয় লইয়া কি করিব। বরং তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন, আমি এখানে তাহার পড়া শুনার সুব্যবস্থা করিব। এখন পরীক্ষা উপস্থিত, আমি কেমন করিয়া বাড়ী যাইতে পারি।"

নায়েব ব্যর্থ মনোরথ হইয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন।

তখন গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল, যে গিরীন্দ্রনাথ উইল রদ করিবার জন্য উকীলের বাড়ী যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে, সত্বরই মোকদ্দমা দায়ের হইবে। সুতরাং নায়েব মহাশয় নাবালকের পক্ষে তদ্বির করিবার জন্য সত্বরই কলিকাতা চলিয়া যাইবেন। ফলে তাহাই হইল, নায়েব মহাশয় আরো কিছু অর্থ বাহির করিয়া লইলেন।

(৬)

নবকুমারের শিক্ষার জন্য কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিতে হইবে। সুতরাং বাড়ী ও কলিকাতায় লোক জনের দৌড়াদৌড়ি শুরু হইয়া গেল। অবশেষে মাসিক ১৫০৲ টাকা ভাড়ায় বাড়ী ভাড়া হইল। বিমলা দাস দাসী সহ কলিকাতা প্রবাসী হইলেন। গিরীন্দ্রনাথ অবশ্য এসব সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলেন না।

যে দিন বিকাল বেলা গিরীন্দ্রনাথ—ষ্ট্রীট ধরিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাহার কানে গেল কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে। তিনি ইতস্ততঃ চারিদিকে চাহিয়া পরিচিত কাহাকে না দেখিতে পাইয়া পুনরায় চলিলেন; এমন সময় পশ্চাৎ হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া নবকুমার তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। গিরীন্দ্র সহসা নবকুমারকে একাকী দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইল। গিরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল তোরা কবে এলিরে?—কোথায়—আর কে কে এসেছে।

বালক আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল—"উপর হইতে তোমাকে দেখিয়া নামিয়া আসিতে আসিতে তুমি অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছ, তাই তোমার পাছে পাছে, আসিয়াছি। আমাদের বাড়ী ঐ যে দেখা যায়। মা দিদি সকলি আছে ওখানে তুমি চল।" বলিয়া নবকুমার গিরীন্দ্রকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

উভয়ে ফিরিয়া চলিল। বাড়ীতে দাস দাসী, আত্মীয় স্বজন, আমলা ফয়লায় পূর্ণ। গিরীন্দ্রনাথকে কিন্তু কেহ বড় একটা গ্রাহ্য করিল না। কেবল না পারিতে দু এক জন শুষ্কভাবে মৌখিক "কেমন আছেন?" "ভাল আছেন?" "নমস্কার" প্রভৃতি বাক্যে পূর্ব্ব পরিচয়ের আভাস প্রদান করিল মাত্র।

বালক নবকুমার দাদা আসিয়াছে বলিয়া মাকে খবর দিতে গেল। ততক্ষণে গিরীন্দ্রনাথও যাইয়া বিমলাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল; বিমলা গিরীন্দ্রনাথকে দেখিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িলেন—তাহাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করাও উচিত মনে করিলেন না। গিরীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাহিরে আসিয়া বসিল।

এই সময় ঝি একটি রিকাবিতে দুইটী সন্দেশ ও এক গ্লাস জল লইয়া আসিয়া গিরীন্দ্রনাথের সম্মুখে রাখিল। রেকাবে দুই খিলি পানও ছিল। বিদায় সম্ভাষণের মূর্ত্তি ধরিয়া রিকাবিস্থ পানের খিলি যেন বলিতেছিল "নমস্কার! তাহলে মহাশয় আমাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়ুন।"

জলের পাত্রটী রেকাবির নিকট রাখিয়া দাসী বলিল "বড় বাবু একটু জল খান।"

গিরীন্দ্র ব্যগ্রভাবে বলিল "নবকুমার যে আসিল না।"

সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করিয়া ঝি মনে মনে বিমলার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। বলিল—"কি জানি—দাদা বাবু—বলিতে পারি না। মা বলেছেন—আপনি একটু জল খান।"

তখন নবকুমারের ক্রন্দন ধ্বনি শুনা যাইতেছিল। গিরীন্দ্র বজ্রাহতের মত নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিলেন। দুঃখে ও অপমানে তাহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছিল। মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

(৬)

আত্মগ্লানি ও অনুশোচনায় গিরীন্দ্রনাথের হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, কেন অপমান ডাকিয়া অনিলাম? যেখানে ভালবাসার উপর কোনও দাবী নাই, সেখানে ভালবাসিতে যাওয়া দুর্ব্বলতা দেখান মাত্র। সে রকম স্থলে, আপনার নিজের প্রতি গুরুতর অবিচার করা ব্যতীত আর কিছুই হয় না। পথ দিয়া বৈদ্যুতিক ট্রাম ঢং ঢং করিয়া চলিয়া গেল, মটর গাড়ী ফোঁস ফোঁস করিয়া দৌড়িয়া গেল, তাহার মধ্য দিয়া গিরীন্দ্রনাথ অপমানের বোঝা মাথায় করিয়া বাসায় পৌঁছিলেন। পাঁচ ছয় দিন তাহার অন্তরে অগ্নি জ্বলয়া

জ্বলিয়া অবশেষে নিবিয়া গেল বটে, কিন্তু হৃদয়ের সুরসাল ভাগ প্রায় নিঃশেষ করিয়া দিল।

স্নেহের বন্ধন এমনি বস্তু যে কড়া আঘাতে তাহা আরো শক্ত হইতে থাকে। নবকুমারের উপর যতই কড়া পাহাড়া পড়িল—নিষ্ঠুর আদেশ জারী হইল, নবকুমার ততই দাদার স্নেহ ভালবাসা পাইতে ব্যগ্র হইয়া, মাতৃ-স্নেহের উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করিল।

হটাৎ একদিন নবকুমার স্কুল হইতে আর বাসায় আসিল না—বহু তল্লাস অনুসন্ধান হইল—শেষে পুলিশে সংবাদ দিয়া, নায়েব বাবু পুলিশ সহ গিরীন্দ্র নাথের গৃহ তল্লাস করিয়া তথা হইতে নবকুমারকে বাহির করিলেন।

যথা সময়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নায়েবের পরামর্শে নবকুমারের প্রাণনাশের অভিপ্রায়ে তাহাকে লুকাইয়া রাখিবার জন্য গিরীন্দ্রের বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী মামলা রুজু হইল।

বালক নবকুমার কোর্টে উপস্থিত হইয়া গিরীন্দ্র নাথের নিকট স্বেচ্ছায় গিয়াছিলেন বলিয়া জবাব দিলে মোকদ্দমা ফাঁসিয়া গেল। গিরীন্দ্রনাথ কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইলেন।

ব্যাপার বুঝিয়া বালক নবকুমার বৃদ্ধ নায়েবের উপর বিরক্ত হইলেন বটে কিন্তু মাতা ও ভগ্নিপতিগণের জন্য তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না।

(৮)

নবকুমার এখন আর বালক নহে। বিবাহ করিয়া ছেলের বাপ হইয়াছে। সুতরাং তাহার স্বার্থ-দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে পড়িতেছে।

বিমলা ভাবিত নিজের পুত্র কন্যা থাকিতে পোষ্যপুত্র এই বিশাল সম্পত্তি ভোগ করিবে কেন বরং তাহা অপেক্ষা তিন পুরুষের বৃদ্ধ নায়েব আপন—সে খায় সেও ভাল। আর নবকুমার ভাবিত দাদা উপযুক্ত ওয়ারিস থাকিতে আমার সংসার অপরে লুটিয়া খাইবে কেন? আমার অভাব কিসের; দদা ই বা কিসের অভাবে ২০০৲টাকা মুসাহেবায় পরের গোলামি করিবেন।

পরস্পরের এই দ্বন্দ কোলাহলে গৃহের টাকা ধীরে ধীরে সরিতে লাগিল। আর লোহার সিন্দুকের শূন্য হৃদয় উদাস প্রাণ লইয়া খাঁ খাঁ করিতেছিল।

নবকুমার একটু ধর্ম্মভীরু। মাতার কার্য্য কলাপ তাহার একেবারেই মনঃপূত হইত না। সে এখন আপন ভবিষ্যৎ শুভাশুভ বিচার করিতে সক্ষম হইয়াছে। উপযুক্ত ভ্রাতার প্রতি যে একটা অধর্ম্মের কার্য্য ও নির্য্যাতন চলিতেছে সে স্পষ্ট তাহা দেখিতেছিল। নায়েব গোমস্তা, মেয়ে মানুষের সংসার পাইয়া যে লুটিয়া খাইতেছে, ভগ্নিপতিগণ চারিদিক হইতে স্বীয় স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন, তাহা দেখিয়াও মায়ের জন্য কোন কথা বলিতে সাহসী হইতেছে না। সকলেই যখন নিজ নিজ সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছে, তখন কেবল একজন—যিনি জমিদারীর প্রকৃত ওয়ারিশ—তিনি একেবারেই তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন কেন? এ ব্যবস্থা তাহার কিছুতেই সহ্য হইতে ছিল না। সে মাতাকে অনেক বুঝাইয়াছে, কিন্তু বিমলা সে সকল কথায় কর্ণপাত করাও সঙ্গত মনে করেন নাই। নবকুমার এখন মাকে নানারূপ ভয়ও দেখাইতে লাগিল—কিন্তু বিমলা সে প্রকৃতিরই মেয়ে নহেন। তিনি নবকুমারের কোন কথাই গ্রাহ্য করিলেন না।

(৯)

বিমলা শুনিলেন, নবকুমার তাহার সমস্ত সম্পত্তি গিরীন্দ্রের নামে ত্যাগ পত্র লিখিয়া দিয়া সে দলিল একেবারে রেজেষ্টরী করিয়া ফেলিয়াছে। শুনিয়া বিমলা রাগে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। নবকুমার তাহাতে ভ্রুক্ষেপও করিল না। পুত্রের অবহেলা মায়ের প্রাণে বিধিল—তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন—বৃদ্ধ নায়েবের সহিত পরামর্শ করিয়া নবকুমারকে ত্যাজ্য পুত্র করিলেন এবং নগদ অর্থ ও অলঙ্কারাদি কন্যাদ্বয়কে ভাগ করিয়া দিলেন। এই অর্ব্বাচীন পরামর্শেও ডানে বামে বহু অর্থ উড়িয়া গেল এবং যাইবার বন্দোবস্ত হইয়া রহিল।

ক্রমে অর্থ লোলুপ জামাতাদ্বয় আসিয়া শাশুড়ীর গৃহে অধিষ্টান করিলেন এবং প্রাচীন কর্ম্মচারী দলকে বরখাস্ত করিয়া নিজেরাই শাসন সমরক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বিমলার সকল বুদ্ধি তাহাদের লুব্ধ দৃষ্টির নিকট প্রতিনিয়ত পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। বিমলা আপন ঘরে পর হইলেন।

(১০)

গিরীন্দ্রনাথ যখন নবকুমারের অপূর্ব্ব ত্যাগের কথা অবগত হইলেন, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, বিমলার নিকট আসিয়া নবকুমারের ত্যক্ত সম্পত্তি সমস্তই নবকুমারের পুত্রের নামে লিখিয়া দিলেন।

বিমলা নবকুমারের ও পোষ্য পুত্রের স্বার্থ ত্যাগের নিকট কন্যা ও জামতাদ্বয়ের অন্ধ স্বার্থ পাশাপাশি রাখিয়া চিন্তা করিতে করিতে—পোষ্য পুত্রের প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িলেন।

বিমলা স্নেহালিঙ্গনে গিরীন্দ্রকে কোলে টানিয়া লইয়া নবকুমারের করদ্বয় তাহার করে স্থাপন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন।

মানুষ সময়ে আপন ভুল ভ্রান্তি সকলি বুঝিতে পারে। যখন তাহা পারে, তখন অনুশোচনা ব্যতীত তাহার আর অন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার কিছু থাকে না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সে কালের দণ্ডবিধান।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে খৃষ্টীয় ১৬০০ অব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ কর্ত্তৃক সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া "ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী" নামক বণিক সম্প্রদায় এ দেশে বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। ক্রমে তাঁহারা এদেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। তাঁহাদের উপনিবেশ-স্থান সমূহ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে থাকায়, তাঁহাদের অধীন অধিবাসীবৃন্দের জন্য বিচার পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অনুমতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তাঁহারা আবেদন করেন। তদনুসারে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা হইতে তদানীন্তন ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে তাঁহাদিগের অধীন জনগণের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। এদেশে বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে ও ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ক্রমে তাঁহারা দুইখানা সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল বাহাদুর বঙ্গদেশ শাসন জন্য নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিয়া তাহার দ্বারা দেশ শাসন করিতে অধিকার প্রাপ্ত হন।

তদনুসারে এদেশীয় লোকদিগকে অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার এবং তাহাদিগকে ইংলণ্ডীয় আইনের সুবিধা উপভোগ করাইবার নিমিত্ত কলিকাতাতে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে "সুপ্রীমকোর্ট" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদালতের এলাকা কলিকাতা নগর এবং সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয়।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখের একখানা গেজেটে তৎকালে ফৌজদারী মোকদ্দমায় অপরাধীকে কোন্ অপরাধে কি দণ্ড ভোগ করিতে হইত, তাহা অবগত হওয়া যায়। তখন কোন অপরাধে চতুর্দ্দশ জন অপরাধীর হস্তদগ্ধ করাইয়া তাহাদিগকে কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল। হীরক চুরির অপরাধে জনৈক পর্ট্টুগীজের হস্তদগ্ধ করা হয় এবং একমাস কারাদণ্ড ভোগ করিবার পর তাহাকে সেই প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে চৌর্য্যাপরাধে ৬ জন লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। কলিকাতার এস্‌প্লেনেড্ অঞ্চলে চুরি করা অপরাধে ৩ জন ইউরোপীয় সৈনিকের হস্তদগ্ধ করা হইয়াছিল, এতদতিরিক্ত তাহাদিগকে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডও ভোগ করিতে হইয়াছিল। টমাস্ নামক এক ব্যক্তির কুব্যবহারের জন্য বেত্রাঘাত ও এক মাসের কারাদণ্ড হইয়াছিল। একটি মোহরের আধুলি ও কিছু রৌপ্য চুরি করা অপরাধে লোচন নামক এক ব্যক্তিকে কলিকাতার বড় বাজারে প্রকাশ্যভাবে বেত্রাঘাত এবং তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদত্ত হয়। কানাই দে নামক এক ব্যক্তি হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক হইতে একটি মোহর চুরি করা অপরাধে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল যে তাহাকে বড় বাজারের দক্ষিণ সীমানা হইতে উত্তর সীমানা এবং পুনরায় উত্তর সীমানা হইতে দক্ষিণ সীমানা পর্য্যন্ত রাস্তায় যাইতে যাইতে বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইবে এবং ইহার পরও তাহাকে দশমাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে!

১৮০২ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট হইতে নিম্নলিখিত দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল :—নরহত্যা অপরাধে Joseph Mari Leperrousseএর প্রাণদণ্ড এবং পরে তাহার শবদেহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বিত, বিজয় মশালচির চুরি করা অপরাধে প্রাণদণ্ড; আনন্দী রাম এবং অতুল কৃষ্ণের ষড়যন্ত্র করা অপরাধে দুই বৎসরের কারাদণ্ড; রামসুন্দর সরকারের মিথ্যা শপথ করা অপরাধে সাত বৎসরের দ্বীপান্তর বাস। Ter Jacob Ter Petruse নামক জনৈক আমেরিকান ধর্ম্ম যাজকের মিথ্যা শপথ করা অপরাধে দুই বৎসরের কারাদণ্ড এবং ১৲ টাকা জরিমানা, ডাকাতি করা অপরাধে ইমামবক্সের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস। Thomas Norman Morgan নামক জনৈক ইংরেজের জাল করা অপরাধে দুই বৎসরের কারাদণ্ড এবং ১৲ টাকা জরিমানা। Choachill, Buxoo, Russie এবং ন্যামত উল্যার ডাকাতি করা অপরাধে ৭ বৎসরের দ্বীপান্তর বাস।

পক্ষান্তরে উক্ত সুপ্রীম কোর্টের ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা নবেম্বর তারিখের নিম্ন লিখিত দণ্ডাজ্ঞাগুলি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

John Maclauchlin, নরহত্যা অপরাধে ১৲ টাকা জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ড। মহম্মদ তিন্দাল নরহত্যা অপরাধে ১৲ জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ড, Mathew Farnes, ঐ অপরাধে ঐ দণ্ড। Thomas Eldred Sherburne. জাল করা অপরাধে ১৲ টাকা জরিমানা ও দুই বৎসরের কারাদণ্ড। Redecar চুরি করা অপরাধে সাত বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের সহিত দ্বীপান্তর বাস। মৃত্যুঞ্জয় কুমারও উল্লিখিত অপরাধে এরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদানীন্তন কালে জাল করা এবং চুরি করার অপরাধ নরহত্যা করার অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ বলিয়া আইন প্রণেতাগণের নিকট বিবেচিত হইত।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে Heniy Irwin নামক জনৈক সৈনিক ঐ দলস্থ অন্য সৈনিককে দ্বন্দযুদ্ধে হত্যা করিয়াছিল, কিন্তু বোম্বাই কোর্টের বিচারে সে খালাস হইয়াছিল।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে Alex. Moore এবং James Dempsey নামক সৈনিকদ্বয় অন্য দুই জন সৈনিককে দ্বন্দ যুদ্ধে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়, বিচারে Mooreএর এক বৎসরের কারাদণ্ড এবং ২০৲ টাকা জরিমানা এবং Dempseyএর এক সপ্তাহ কারাদণ্ড এবং ১৲ টাকা জরিমানা হয়। James Campbell নামক একব্যক্তি জনৈক এদেশীয় স্ত্রীলোককে বিকলাঙ্গ করা অপরাধে অভিযুক্ত হয়; বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টে কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং রামকানাই ঘোষ ২৫০০৲ টাকার ট্রেজারী বীল জাল করা অপরাধে অভিযুক্ত হয়। এ দেশীয় লোকদ্বারা ট্রেজারীর বীল জাল করা এই প্রথম; বিচারে তাহাদিগের উভয়েরই দুই বৎসরের কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতা সুপ্রীমকোর্ট হইতে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে হস্তদগ্ধ করার দণ্ডাজ্ঞা অত্যধিক মাত্রায় প্রদত্ত হইয়াছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখে কলিকাতা সুপ্রীমকোর্ট নিম্নলিখিত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করেন :—

(১) Ensign Soady নরহত্যা অপরাধে ২০০৲ টাকা জরিমানা ও একবৎসরের কারাদণ্ড।

(২) বৃন্দাবন ধুপী নরহত্যা অপরাধে হস্তদগ্ধ করার পর একবৎসরের কারাদণ্ড।

(৩) Joseph Moore এবং George Knose—নরহত্যা অপরাধে হস্তদগ্ধ ও একবৎসরের কারাদণ্ড।

(৪) Andrew Masbery—নরহত্যার অভিপ্রায়ে আক্রমণ করার অপরাধে তিন বৎসরের কারাদণ্ড।

(৫) Willam Sonbise—একটি ডাক বাঙ্গালাতে অগ্নিপ্রদান করিবার চেষ্টা করার অপরাধে দুই বৎসরের কারাদণ্ড।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতা সুপ্রীমকোর্ট কর্ত্তৃক Barry এবং Boyle নামক সৈনিকদ্বয় চৌর্য্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। Rodrignes, মাহিয়ানার হিসাবের খাতা জালকরা অপরাধে দুই বৎসরের কারাদণ্ড এবং ৩০০৲ মুদ্রা (pagoda) জরিমানা হয়।

ফকিরুন্নেছা বেগম তদীয় জনৈকা ক্রীতদাসীকে হত্যা করাইবার অপরাধে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল তারিখে অভিযুক্ত হন; তাঁহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইল, বিচারে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন। তাঁহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইল যে, হুকুম দেওয়ার পর হইতে পরদিন বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহাকে কয়েদ থাকিতে হইবে। এই লঘুদণ্ডের বিরুদ্ধেও বেগম সাহেবা প্রধান বিচারপতির নিকট আবেদন করেন যে প্রকাশ্য আদালতে উপস্থিত হওয়া অপেক্ষা তাহার প্রতি গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা আর হইতে পারে না। তাঁহার প্রতি যেন কোন দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত না হয়, তিনি সম্রাটের সমীপে আবেদন করিবেন। এই আবেদন পত্রের উত্তরে প্রধান বিচারপতি মহোদয় আদেশ দিলেন যে—সম্রাটের নিকট আপীলে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত থাকে। বেগম সাহেবাকে উপযুক্ত জামীন দিতে হইবে; যে হেতু আবশ্যক হইলে তাঁহাকে আগামী ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় দায়রার মোকদ্দমার বিচারের দিনে আদালতে উপস্থিত থাকিতে হইবে।”

তদানীন্তন কালে প্রকাশ্য স্থানে চৌরাস্তার উপর অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে ফাঁসি দেওয়া হইত। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টে এদেশীয় একটী স্ত্রীলোককে হত্যা করার অপরাধে মেনিলা দেশীয় একব্যক্তি অভিযুক্ত হয়; বিচারে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ১৩ই জুন শনিবার দিন লালবাজার ষ্ট্রীটের চৌরাস্তার উপর তাহাকে ফাঁসি দিবার হুকুম হয়।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতাস্থ হুগলী নদীতে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছিল। “এশিয়া” নামক জাহাজের Stewart নামক কাপ্তানকে হত্যা করার অপরাধে ৫ জন পর্ত্তুগীজ নাবিক অভিযুক্ত হয়। এই বিভাগের লোকদিগকে এইরূপ অপরাধে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করিবার নিমিত্ত নদীতে নৌকার উপরে ফাঁসিকাষ্ঠের মঞ্চ নির্ম্মাণের আদেশ প্রদত্ত হইল। এই ফাঁসি দেখিবার জন্য নদীস্থ জাহাজ সমূহ হইতে প্রত্যেকে এক একখানা নৌকা প্রেরণ করিবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হয়। এইরূপে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। নদী তীরস্থ অট্টালিকার উপরে এবং জাহাজের ডেকের উপরেও অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল। বেলা ৯ ঘটিকার কিছু পূর্ব্বে আসামীগণ প্রহরী বেষ্টিত হইয়া ফোর্টের ঘাট দিয়া ফাঁসি কাষ্ঠের সমীপে নীত হইল। তখন তথায় হরিদ্রা-বর্ণের পতাকা উড্ডীন করা হইল, অবশেষে ৯ ঘটিকা ২০ মিনিটের সময় আসামীরা ফাঁসি কাষ্ঠে লম্বিত হইল; এবং ক্ষণকাল মধ্যেই হতভাগ্যগণের প্রাণ বায়ু অনন্তে মিশিয়া গেল।

শ্রীরাজেন্দ্রকিশোর সেন।

বিবিধ সংগ্রহ।

কেশ।

সামান্য এক গুচ্ছ কেশের দ্বারা কখন কখন জটিল ফৌজদারী মামলার কিনারা হইতে পারে, একথা বোধ হয় অনেকেই বিশ্বাস করিবেন না। বিশেষজ্ঞগণ কেশ পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারেন উহা পুরুষ কি স্ত্রীলোকের। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে পুরুষের চুল অনেকটা একটী আনাম পেন্সিলের মত মনে হয় কিন্তু স্ত্রীলোকের চুল মটের ডগার মত ক্রমে সরু হইয়া উঠিয়া তাহার উপরে ব্রাসের লোমের মত কয়েকটী শাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ঐরূপ দুই চারিটী লোম কখন কখন স্ত্রীকেশের কাণ্ডেতেও বর্ত্তমান থাকে। ইহার কারণ পুরুষ তাহার কেশ চ্ছেদন করিয়া ফেলে, কাজেই তাহার কেশের কাণ্ডটীই পেন্সিলের মত দণ্ডায়মান থাকে। কিন্তু স্ত্রীলোক তাহার কেশ রক্ষা করে বলিয়া উহা যথেচ্ছা বর্দ্ধিত হইতে পারে। কাজেই ঐ কেশের প্রবল জীবনীশক্তি বর্ত্তমান থাকায় উহা শাখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কেশ মূলদেশ হইতেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মূল প্রদেশে অণুর উপরে অণু বিন্যস্ত হইয়া উহা ক্রমে বড় হইতে থাকে। কাজেই কেশের প্রান্ত বা শীর্ষদেশ সব চাইতে পুরাতন।

কেশ সছিদ্র না হইয়া নিরেট হইয়া থাকে। উহার বহির্দেশ অপেক্ষা অভ্যন্তর কিঞ্চিৎ কাল।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিতে চুল অনেকটা সর্প গাত্রের মত অনুমিত হয়। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম আঁইসের দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া মনে হয়। বৃদ্ধ বয়সে এই আঁইস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা চুলের বর্ণ পরিবর্ত্তন করা যায়, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে উহার ভিতরে বহু বায়ু বিন্দু পরিলক্ষিত হয়।

চুলের মূল উৎপাটন করিলে দেখা যায় যেন উহা জলকচুর মত স্থুল। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের এই স্থুল মূল দেশেরও পার্থক্য আছে। পুরুষের চুলের মূল অপেক্ষাকৃত স্থুল ও খাট কিন্তু সে স্থলে স্ত্রীলোকের অপেক্ষাকৃত সরু ও লম্বা হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের চুল ও পুরুষের লম্বা দাড়িতে কোনরূপ গোল হইবার সম্ভব নাই কারণ উভয়ের পার্থক্য অনেক।

চুল দেখিয়া লোকটী রুগ্ন কিম্বা সুস্থ ছিল, তাহা বলা যায়। লোক গুরুতর রুগ্ন হইলে চুলের মূলদেশও ক্ষীণ হইয়া পরে এবং পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করিলে কেশও সবল এবং সুস্থ হইয়া থাকে। কাজেই রুগ্নাবস্থায় চুলের যে অংশটুকু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সরুই রহিয়া যাইবে। সেজন্য অনেক সময়ে চুল পরীক্ষা করিয়া স্থির করা যায় লোকটি কত দিন পূর্ব্বে অসুস্থ হইয়া কতদিন আন্দাজ অসুস্থ ছিল।

একজন সুদক্ষ পুলিস কর্ম্মচারী যদি একমাত্র চুলের দ্বারা এতটুক সন্ধান জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার কার্য্যের অনেক সহায়তা হয় তাহা বলা বাহুল্য।

মৎস্য ধরা।

পৃথিবীতে মৎস্য ধরিবার যে কত প্রণালী আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে পেনরিন্ (Penrhyn) নামে একটী প্রবাল দ্বীপ আছে। সেখানে জাহাজের যাতায়াত কমই হইয়া থাকে। এথাকার মৎস্য ধরিবার প্রণালী কিছু অদ্ভুত। দ্বীপের নিকটে জলের গভীরতা প্রায় ১২ ফেদম অর্থাৎ ৭২ ফিট এবং জল অত্যন্ত স্বচ্ছ। সেখানে জলের নীচে প্রায় ২৫।৩০ ফিট পর্য্যন্ত সচ্ছন্দে দেখা যায়। তথাকার অধিবাসী সকল ৩।৪ হাত একটি সুতাতে বড়শী সংযোগ করিয়া কিঞ্চিৎ আধার মুখে গ্রহণ করিয়া জলে ডুব দেয়। প্রায় ২০ ফিট জলের নীচে দিয়া বড়শীতে আধার সংযোগ করিয়া উহা ফেলিয়া একটু সময় চুপ করিয়া থাকে। এক জাতীয় মৎস্য তৎক্ষণাৎ তাহা ভক্ষণ করিয়া আবদ্ধ হয়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ মৎস্যটী খুলিয়া কামর দিয়া ধরিয়া পুনরায় বড়শী ফেলিয়া অপর একটী মৎস্য ধরিয়া থাকে। কেহ বা একটী মৎস্য ধরিয়াই ভাসিয়া উঠে: ঐ মৎস্যের এক একটীর ওজন আধ সেরের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে হইবে। তাহারা এই কার্য্যটী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত করিয়া থাকে।

এক জাতীয় হাঙ্গর এই মৎস্য ধরিবার প্রধান অন্তরায়। ইহারা দৈর্ঘ্যে ৪৫ ফিটের অধিক হয় না। কিন্তু ইহারা ক্ষত করিলে তাহা হইতে রক্তপাত হইয়া কিম্বা ক্ষত বিষাক্ত হইয়া লোক মারা যায়। যখন এই হাঙ্গর আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে দেখিবামাত্র সকলে উপরে উঠিয়া পরে। যাহারা মৎস্য ধরে তাহারা সর্ব্বদা জলে ডুব দিয়াও এই হাঙ্গরের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া থাকে।

এক সময়ে একটী লোকের স্কন্দদেশে এই জাতীয় একটী হাঙ্গর কামরাইয়া ধরে। সে উহাকে ছাড়াইতে না পারিয়া এরূপভাবে জড়াইয়া ধরে যেন উহা আর নড়িতে না পারে এবং হাঙ্গরটীকে ধরিয়াই উপরে উঠিয়া পরে। দ্বীপে একজন ইংরেজ ছিলেন। তিনি ঐ ঘা ঔষধ দ্বারা পোড়াইয়া দেন এবং তাহাতেই সে যাত্রায় লোকটীর জীবন রক্ষা হয়।

নিব্।

১৮৩৫ সনে আমেরিকার অন্তর্গত ডেট্রয়েটের (Detrait) একজন স্বর্ণকার তথায় সোনার নিব্ তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে। পরে ঐ কারবার উঠাইয়া নিউ-ইয়র্কে (New-York) আনা হয়। ইহার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ইহা প্রস্তুতের চেষ্টা হয় কিন্তু তাহা ফলবতী হয় না। প্রথমতঃ এই সুবর্ণ নির্ম্মিত নিবের অগ্রভাগে হীরক কিম্বা মণি বসাইয়া দেওয়া হইত। কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত অধিক খরচ পরিত। ইহার পরে ইরিডিয়ম (Iridium) এবং অস্মিয়াম (Osmium) নামক যৌগিক ধাতু আবিষ্কৃত হয়। ইহাদের মূল্য হীরক হইতে অত্যন্ত কম অথচ শক্ত। এই আবিষ্কারে স্বর্ণ নিব্ প্রস্তুতে এক

যুগান্তর উপস্থিত হয়। এখন হইতে নিবের অগ্রভাগে ইরিডিয়ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সে সময়ে বিশুদ্ধ স্বর্ণকে গলাইয়া ১৬ কেরেট স্বর্ণে পরিণত করিয়া নিব্ তৈয়ার হইত।

ইহার পরে ১৮৮০ সনে যুক্তপ্রদেশে ফাউন্টেন্ পেন আবিষ্কার হয়। একটী ফাউন্টেন পেনে সাধারণতঃ ১৫ হইতে ২০ হাজার শব্দ লিখার কালী ধরে।

যদিও ফাউন্টেন পেন প্রস্তুত করিবার প্রণালী নিতান্ত সহজ, তথাপি দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত উহা প্রস্তুত করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। ১৯০৫ সনে যুক্ত প্রদেশে প্রায় ১½ লক্ষ ফাউন্টেন্ ও ষ্টাইলো পেন প্রস্তুত হইয়া ছিল।

খাদ্য রক্ষা।

আজ কাল খাদ্য দ্রব্য রক্ষার নানা রূপ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এক সময়ে খাদ্য দ্রব্য সেলি সেলিক এসিড (Salicylic acid) দ্বারা রক্ষাকরার প্রথা ছিল। কিন্তু এই এসিড্ স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত অহিত কর বিধায় উহা অনেকটা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কীটাণু দ্বারাই খাদ্য জিনিস পচিয়া থাকে। কাজেই যদি এরূপ প্রথা অবলম্বন করা যায় যাহাদ্বারা কীটাণুর বৃদ্ধি হইতে না পারে, তাহা হইলে খাদ্য জিনিস অবিকৃত অবস্থায় বহুদিন রাখা যায়। যদি ফল মূলাদি শুষ্ক শীতল স্থানে ৪০ ডীঃ তাপে রাখা যায় তাহা হইলে উহা বহুদিন ভাল থাকে। এইরূপ রক্ষা করাকে রিফ্রিজারেসন্ (Refrigeration) বলে। অর্দ্ধ ঘণ্টা গরম জলে সিদ্ধ করিলেও পচনকারী কীট মরিয়া যায়। ফল এইরূপ সিদ্ধ করিয়া বায়ু বদ্ধ পাত্রে রাখিয়া দিলে অনেক দিন ভাল থাকে। ইহা সহজেই করা যায় এবং এইরূপ ফল স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল।

অম্লরসে এইকীট সহজে জন্মিতে পারে না। সে জন্য যে সকল ফলে অম্ল আছে তাহা সহজে নষ্ট হয় না। বিলাতি বেগুন রক্ষা করিলে উহা কদাচিৎ নষ্ট হয়।

সেকেলে নিয়ম অনুসারে, লবণ, ভিনিগার কিম্বা শর্করা দ্বারাও ফল রক্ষা করা যায় কিন্তু ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী।

খেজুর, কিস্‌মিস্ প্রভৃতি ফল শুষ্ক করিয়াও রক্ষা করা যায়। কিন্তু এই জাতীয় ফলের সংখ্যা কম।

আনারস্ একটী বিশেষ ফল। ইহা হইতে কীট নাশক একরূপ স্রাবনিসৃত হয়, তাহার ক্রিয়া অনেকটা পেপসিনের (Pepsin) মত। ইহার মাংস, দুগ্ধ ইত্যাদি হজম করিবার ক্ষমতা আছে। শর্করা ব্যতীত ইহাকে রীতিমত রূপে পাত্রে ভরিয়া রাখিতে পারিলে অনেক দিন থাকে।

কিছু দিন হয় আমাদের বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীযুত বাবু মন্মথ নাথ দাস ইংলণ্ডে ফল রক্ষার্থে এক নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সসম্মানে বি, এ, পাশ করিয়া শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কিছু দিন পাঠ করেন এবং ১৯১১ সনে বিলাতে গমন করেন। তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি গ্রহণ করিয়া তথায় কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার আবিষ্কার ডাঃ এস, এ, কাপাডিয়া (Dr. S. A. Kapadia) পেটেণ্ট করিয়া নিয়াছেন। মিঃ দাস এরূপ একটী গ্যাস আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা হইতে যন্ত্র সাহায্যে কার্ব্বন মনক্সাইড (Carbon monoxide) গ্যাস বাহির হইয়া ফল পচিতে দেয় না। এই উপায়ে রক্ষিত এপেল তিনি ৭ সপ্তাহ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছেন। ঐসকল এপেল অষ্ট্রেলিয়া হইতে আসিতেও প্রায় ১৪ সপ্তাহ লাগিয়াছিল। এই নব উপায়ে রক্ষিত এপেলে কোনরূপ কাল দাগ ধরে না কিম্বা উহার কোন স্থান বিস্বাদ হয় না। এপেলের কোন স্থান আহত হইলে আহত স্থানের চারিধারে পেন্সিলের দাগ দিয়া এই প্রণালীতে রক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে আহত স্থানের পরিমাণ কোন রূপে চিহ্নিত স্থান অতিক্রম করেনা।

বর্ত্তমানে অন্যান্য ফল সম্বন্ধেও ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। আমরা আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে এই উপায়ের দ্বারা ফল রক্ষা করিয়া ভারতে এক অভিনব ব্যবসায় পরিচালিত হইবে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

দুঃখ।

দুঃখ আমার প্রাণের সখা, দুঃখ আমার সাথের সাথী,
দুঃখ আমার আঁধার ঘরে আলো করা সাঁঝের বাতি।
সুখের ঘোরে মত্ত হ'য়ে তাঁরে যখন যাইগো ভুলে,
দুঃখ তখন দৌড়ে এসে সামনে ধরে নামটি তুলে।
ওরে দুঃখ ওরে দৈন্য,
আমি আছি তোর (ই) জন্য,
আঁকড়ে ধরে থাক্‌ব তোরে, ভবের পথে ভয় কি আর?
তোরে পেলেই তাঁরে পাব, এই ধারণা আছে আমার।

শ্রীকৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী।

Pri..ted by Satish Chandra Roy, at the Jagat Art Press, Dacca.
Published by Kedar Nath Mozunder—Research House Mymensingh.

স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র।

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

সৌরভ

ষষ্ঠ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। | দ্বিতীয় সংখ্যা।

ধর্ম্ম ও দর্শনের ধারা।

বাংলা দেশে আজকাল নাটক, নভেল, গল্প, উপন্যাসের অভাব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সুবিখ্যাত উপন্যাস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে যে দর্শনের ও ধর্ম্মের ধারা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং অনুশীলনাদি সুচিন্তিত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী লিখিয়া বাঙ্গালীর মতিগতি ধর্ম্ম ও দর্শনেরদিকে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই ধর্ম্ম ও দর্শনের ধারা বর্ত্তমানে কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং কাহার কাহার হস্তে তাহা কি আকার ধারণ করিয়াছে তাহার আলোচনা বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দেশে আরও একটী চিন্তার প্রণালী প্রবর্ত্তনের জন্য সম্মান লাভ করার অধিকারী; সে প্রণালী বর্ত্তমানে সাহিত্য পরিষদ, অনুসন্ধান সমিতি ও প্রত্নতাত্ত্বিক গণের হস্তে পড়িয়া বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণের আশ্রয়ে এবং সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে নানারূপে পরিবর্দ্ধিত ও অভিব্যক্ত হইয়া ইতিহাসের ধারাতে পরিণত হইয়া দেশের ও দশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কিন্তু দর্শনও ধর্ম্মের ধারা তেমন কিছুই করিতে পারে নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। দেশের মধ্যে দুই একজন ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে প্রগাঢ় বিদ্যা বুদ্ধি মৌলিকতা ও পারদর্শিতা গুণে যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়া থাকিতে পারেন কিন্তু দেশের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মত ধর্ম্ম ও দর্শনের ধারা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করেন নাই। কতিপয় সুধিজন তাঁহাদের বক্তৃতায় ও পুস্তকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন যে ধর্ম্ম ও দর্শনের বিশেষত্বটুকুর উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও বর্ত্তমান জাতীয় জীবন তদ্ভাবে গঠিত করিতে কোনও প্রয়াস পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে স্থানে স্থানে হরিসভা, ধর্ম্মসভা ও বারোয়ারী উপলক্ষে রাশি রাশি বক্তৃতা, আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ পুরস্কার বিতরণ ও টাকা খরচ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে হইলেও ধর্ম্ম ও দর্শনের একটা ধারা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা কেহ করিতেছেন বা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

এতকাল যাবৎ আমাদের দেশের কোনও ইতিহাস ছিল না বলিয়াই বোধ হয় আমরা সকলে এত দিন ভাবিয়া আসিয়াছিলাম, আমরা হীন নিষ্প্রভ জাতির বংশধর; স্বাধীন জাতির হৃদয়ে যে আশা সদাসর্ব্বদা জাগরূক থাকে, সেই জাতির প্রতি রক্তকণিকায় যে আনন্দলহরী খেলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে যেন আমরা আজন্ম অপরিচিত ও সম্বন্ধ শূন্য। আমাদের সমস্ত দাবী ও আশা সকলই ভবিষ্যতের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতীতের কোনও কিছুর সহিত যেন তেমনভাবে আমরা জড়িত নই। কিন্তু সুখের ও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী মতে লিখিত মৈত্র ও চন্দ মহাশয়ের রাজমালা ও লেখমালা ও রাখালদাস বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় সে ভাবটা দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া একটা গৌরবময় অতীত স্মৃতির দাবীর সহিত এক জাতীয়তার আবহাওয়া দেশের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া দেশের ও দশের প্রভূত কল্যান সাধন করিয়াছে। একই রকম কারণে যেন ধর্ম্ম ও দর্শনের কোনও ধারাবাহিক অনুশীলন ও ইতিহাস না থাকায় অনেকের মনে একটা অন্ধ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে এ দেশবাসীর পূজা, হোম, অর্চ্চনা যা কিছু বাহিরে দেখিতে

পাওয়া যায় তাহা অন্তঃসার শূন্য—মন্ত্রশক্তির—বাণীর বিবাহ মন্ত্র উচ্চারণের ন্যায় অর্থ হীন বাহিরের জিনিস ; ভিতরকার সহিত ঐ সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের কোনও সংস্রব আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস—সত্য হউক মিথ্যা হউক নিতান্ত অল্প। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া সগৌরবে গৃহে ফিরিয়া আসেন, আর দেশের সরকারী বেসরকারী সকল প্রকার কাজকর্ম্মে ঢুকিয়া পড়েন, তাঁহাদের গৃহ ইতিহাসের খবর লইলে দেখা যায়, সেখানে হিন্দুর পূজা হোম অর্চ্চনার নাম গন্ধ নাই বলিলেই হয়। বর্ত্তমান যুগের সভ্যতা যাঁহাদের পেটে প্রবেশ করে নাই, তাঁহাদের গৃহেই আমাদের হিন্দুর সনাতন:ধর্ম্মের ক্রিয়া কলাপের বেশ একটু প্রাদুর্ভাব আছে। কিন্তু সেই জন্য তাঁহারা যে উপর্য্যুক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর তাহা কেহ স্বীকার করিবেন না। আমার ধর্ম্ম ও তাহার অনুষাঙ্গীয় ক্রিয়া কলাপ যদি আমার মধ্যে একটু উচ্চশ্রেণীর বিশেষত্ব না আনিয়া দিল, আমার ন্যায় অপর এক ব্যক্তি ধর্ম্ম প্রভৃতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়াও জীব জগতের নিম্নস্তরে চলিয়া না গেল, আমার ধর্ম্মময়জীবন যদি জগতে একটা ধর্ম্মের আবহাওয়া না বহাইয়া দিল, লোকে যদি আমার জীবন দেখিয়া বিন্দুমাত্রও আকৃষ্ট না হইল এবং ব্যক্তিগত ভাবে আমার জীবন যদি আমার প্রাণে শান্তি না ঢালিয়া মস্তকে বোঝার মত চাপিয়া বসিল ,তবে ঐ সকল ধর্ম্মপূজা হোম অর্চ্চনার কি প্রয়োজন, আর তাদের মূল্যই বা কি ?

আমাদের দেশের লোক যখন বাহিরের জিনিস সমালোচনা করিতে করিতে নিজের ঘরের বস্তুটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে তখন বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পারিবে যে যাহা পুরাতন তাহার প্রতি জ্ঞানের ও সম্মানের সংযোগ থাকা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হইলেও তাহা বর্ত্তমানের নয়, আর এযুগের মাপকাঠি লইয়া সকলকে নিয়ন্ত্রিত করাও যুক্তিসঙ্গত নয়। বৃদ্ধকে জোর করিয়া রাঙ্গা কাপড় পরাইয়া মখমলের পোষাকে ঢাকিয়া বাজারে বাহির করিলেও যাহাদের চোখ আছে আর দেখবার ইচ্ছা আছে তাহারা সকলেই বলিবে—বৃদ্ধ তুমি যুবক নও এবং যুবত্বের আশা তোমার দুরাশা; ফাগুনের হাওয়া ও বসন্তের বাহার তোমাকে দুঃখ দিবে মাত্র কিন্তু নাচাইতে পারিবে না। আমাদের ধর্ম্ম দর্শন আচার নিয়ম সব পুরাতন হইয়া গিয়াছে; নানা তর্কজালের পোষাক পরাইয়া দাঁড়া করিলেও সেগুলি নূতন হইয়া যাইবে না, দেশে একটা ধর্ম্ম ও দর্শনের ধারা বহাইয়া দিবে না। অথচ এই ধর্ম্ম ও দর্শনের মধ্যেই সাত কোটী বাঙ্গালীর প্রাণ ও তাহার অপরিমেয় শক্তি লুপ্ত আছে। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ধারার সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্ম ও দর্শনের ধারা না জাগিয়া উঠিলে দেশের লোক খোলা প্রাণে বদ্ধ আলিঙ্গনে এক হইয়া যাইতে পারিবে না।

বর্ত্তমানে যে কয়েকটী ব্যক্তি আমাদের দেশে ধর্ম্ম ও দর্শনের ধারা প্রবাহিত করিয়া এক জাতীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছেন তন্মধ্যে প্রভু জগবন্ধুর নাম উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার ধর্ম্ম যাহা তাঁহার ভক্তবৃন্দ দেশে বিদেশে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা যে বর্ত্তমান যুগধর্ম্মানুযায়ী হইবে তাহা অনুমান করা কষ্ট সাধ্য। সাত কোটী লোকের মধ্যে এক কোটী লোক খোল করতাল, অনাহার স্বল্পাহার ও দৈহিক নির্য্যাতনের পক্ষপাতী হইবে কিনা সন্দেহ। তবে প্রভু এখনও নিজে প্রচার করিতে বাহির হন নাই। তিনি যখন নিজে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তখন যদি তিনি কথাটা একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া যাহাতে সকলে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে, সেই ভাবে আচার নিয়ম উপাসনা প্রভৃতি পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট উপকার হইবে।

কয়েকটী ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রযত্নে অরুণাচল, জগৎপুরা প্রভৃতি স্থানেও দেশের মধ্যে ধর্ম্ম ও দর্শনের একটা অনাবিল প্রবাহ বহাইয়া দেওয়ার জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সকল আশ্রম যে সুনাম বজায় রাখিতে পারিয়াছে তাহাও মনে করি না। তাহারা যে সাম্প্রদায়িকতার বাহিরে যাইবে না, তাহা আমরা দুই দিনেই বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সমগ্রদেশ যে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিবে না ও করিবে না তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

ভগবান রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের কথাও

তাই। এইরূপ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম দ্বারা জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব পর নয়।

এখন জাতীয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমতঃ আমাদিগের ধর্ম্ম ও দর্শনের একটা ইতিহাস রচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই ইতিহাস রচিত হইলে জনসাধারণের বিশ্বাস হইবে যে তাহাদের মন হইতে ধর্ম্ম ও দর্শনের অস্তিত্ব লোপ হইয়া যায় নাই। তখন নূতন ও পুরাতনকে পাশাপাশি দেখিয়া নূতনকে আদর করিতে, জাগাইতে ও নানা আশায় অনুপ্রাণিত করিতে সকলে সক্ষম হইব। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনকে সম্মান করিতে ও তাহার নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিতে শিক্ষা করিব। তারপর জাতীয় উপাসনা ও জাতীয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করা সহজ সাধ্য হইবে বলিয়াই বিশ্বাস। তখন সে ধর্ম্ম যে শিক্ষিত অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান সকলেরই উপযোগী হইবে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।

যদি দেশের সুধিজন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মত ধর্ম্ম ও দর্শনের উদ্ধার জন্য একটী অনুসন্ধান সমিতি গঠন করিয়া অক্ষয় বাবুর মত শুধু সংগ্রহ না করিয়া ধর্ম্ম ও দর্শনের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ধার করিতে সমর্থ হন, তবে দেশের প্রভূত কল্যান সাধিত হইবে।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত এম্.এ.বি.এল।

বাঙ্গালার সমাজ।

(ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে ও পরে)

মুসলমানেরা আমাদের দেশে সাতশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমাদের সামাজিক ও ধর্ম্ম জীবনে যে পরিবর্ত্তন হয় নাই গত দেড় শত বৎসর মধ্যে তাহা হইয়াছে।

কি করিয়া ক্রমে ক্রমে এই পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহা জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল হয়। নিম্নে যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহার চল্লিশ বৎসরের ইতিহাস আমার নিজের চক্ষে দেখা এবং উহার পূর্ব্বকার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা। আমি দেখিয়া যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাই লিখিলাম। অবশ্য তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে।

ইংরাজ জাতি বড় চতুর। সেই জন্য তাঁহারা এই দেশ লইবার পর এই নিয়ম করিলেন, এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাঁহারা আমাদের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এদেশবাসীরা ধর্ম্মকে বড় ভালবাসে। নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন, অর্থ-লিপ্সু, কৃপণ হউক কিম্বা কঠিনপ্রাণ মমতাহীন ঠগী হউক, ইহাদের মতের সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য না থাকিলেও তাহাদের কার্য্য ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় ইহারাও ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া কাজ করিতে ইচ্ছা করে। এটা এজাতির বিশেষত্ব।

কর্ণেল অলকট্ এদেশে আসিবার এক বৎসর পরে যখন বহরমপুর আসেন, তখন একদিন কথাচ্ছলে আমাদের কয়েক জনের নিকট তিনি বলিলেন, "তোমাদের দেশের নৌকার মাল্লারা ও অপর দেশের পণ্ডিত অপেক্ষা ধর্ম্মের জটিল সমস্যা ভাল বুঝিতে পারে।" "An Indian Boatman understands the philosophy of religion better than a *Savant* of other countries."

কথাটা তখন অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার কুড়ি বৎসর পরে একদিন আমি ও ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ মজুমদার ভাগলপুরে রাত্রি দশটার পর আহা-রান্তে আমার বারান্দায় বসিয়া আছি—নগেন্দ্র ভায়া ফর্শী টানিতেছেন ও ক্যান্ট্ (Kant) ও হেগেলের (Hegel) মত বিচার করিতে ছিলেন—আমি ধীরে ধীরে তাঁহার কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ নগেন্দ্রের কথা থামিয়া গেল।

আমার বারাণ্ডার দক্ষিণ ধারে একটি গাড়ীখানা (আস্তাবল) আছে; তাহার মালীক দশরথ দোশাদ। লেখা-পড়া জানে না, সে তাহারই মত মূর্খ গাড়োয়ানদিগকে লইয়া ধর্ম্ম কথা বলিতেছিল। আমাদের কাণে গেল, প্রথমে— "ভগবান এক, মানুষ তাহাকে নানা নাম দিয়াছে মাত্র"। উপমা দিল, "দেখ, গঙ্গা এক, কিন্তু মানুষ তাহাকে "বাবুঘাট" "বাঙ্গালী টোলা ঘাট" "কয়লাঘাট" ইত্যাদি নানা নাম দিয়াছে।" আমরা দু'ভাই অবাক্। এই মূর্খ গাড়োয়ান্ তাহার মূর্খ বন্ধুদিগকে বেদান্ত দর্শনের জটিল প্রশ্ন সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের পার্লেমেন্টের সভ্য রামছে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ (Ramsay Macdonald) এদেশ দেখিয়া একখানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকের একস্থানে আছে যে "বাঙ্গালী দ্বারা, রাষ্ট্র আন্দোলন (Political agitation) অসম্ভব। সেই নায়কগণের দেশ সেবকগণের মধ্যে যাঁহারা সত্যনিষ্ট, সেই নায়কগণের সকলেরই মন রহিয়াছে পরকালের দিকে। তাঁহারা ইহ জগতের কাজ করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মন প্রাণ আছে পরকালের দিকে তাকাইয়া।"

আমি এতগুলিকথা লিখিলাম একটা কথা বুঝাইবার জন্য। সে কথাটা এই যে আমাদের জাতির মানসিক গতি, মানসিক চিন্তা, ধর্ম্মের দিকে, সংসারের দিকে নহে। আমাদের সমাজকে একটু ভাল করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে দেখিলে বুঝাযায় যে বিদেশীয়েরা আমাদের চরিত্রের এই ভাবটা ঠিক বুঝিয়াছেন। এই ভাব এই উদ্দেশ্যের (ideal) সাহায্যে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব এ দেশকে একবার মাতাইয়াছিলেন। তিনি সামগ্রী ভালই পাইয়াছিলেন—দেশের লোক শুষ্ক ন্যায়, দর্শন স্মৃতি লইয়া ব্যস্ত। অপরদিকে তন্ত্রের প্রকৃত সাধনা ত্যাগ করিয়া কতকগুলি লোক ধর্ম্মের নামে বীভৎস আচরণ করিতেছিল ও অপরকে শিখাইতেছিল। মহাপ্রভু যখন ডাকিলেন, তখন ঐ সকল দল হইতেই দলে দলে তাঁহার দলে লোক আসিল। তাহারা দেখিতে পাইল তাহারা যাহা চায় ইনি তাহাই দিবেন বলিতেছেন ও দিতেছেন। সেই জন্য সকলে শুষ্ক ন্যায়, দর্শন, স্মৃতি ত্যাগ করিয়া তাঁহার "প্রেম ধর্ম্ম" লইতে আসিল।

ইহার পর আর একজন মায়ের নামে ডাকিলেন। তিনি ভক্ত রামপ্রসাদ। তিনি মতে শাক্ত কিন্তু ভাবে বৈষ্ণবের ন্যায় ভক্ত। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে আর কোন শাক্ত ভক্ত ছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না। তবে ইহা নিশ্চয় যে বৈষ্ণবদিগের ন্যায় ভগবানের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ভজনার প্রথা তিনিই প্রথমে শাক্ত দিগকে দেখাইয়াছিলেন। শাস্ত্রে দেবীকে মাতৃসম্ভাষণ করা হইয়াছে, কিন্তু "কালী আমার মা" আর "আমি তাঁর বেটা" এই মধুর ভাব রামপ্রসাদের কৃপায় আমরা পাইয়াছি।

যখন ইংরাজরা আসিলেন তখন রামপ্রসাদের ক্ষমতা অটুট। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গৌরবিদ্বেষী; তিনি শাক্ত ছিলেন। নাটোরের রাজপরিবার ও শাক্ত। এবং বর্দ্ধমান রাজপরিবার শৈব ছিলেন।

গৌরচন্দ্রের ধর্ম্ম থাকিলেন রাঢ়ে এবং বরেন্দ্রভূমে। ইহা শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য এবং ঠাকুর নরোত্তম দাসের কৃপায়। পূর্ব্ববঙ্গ, শ্রীহট্টেও কোন কোন স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিছু কিছু ছিল।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদের ধর্ম্মে হাত দিলেন না বটে, কিন্তু ইংরাজ মিশনারীরা আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি একটী গুরুতর আক্রমণের আয়োজন করিলেন। তাঁহারা তরবারির ভয় দেখাইয়া নিজ দলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা প্রকৃতই বিশ্বাস করিতেন যে জীবের এক মাত্র ত্রাণকর্ত্তা যীশু——সুতরাং তাঁহারা অপরকে সেই ধর্ম্মে লইয়া যাইতে যে আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয়ান মিশনারীদিগের নিকট আমরা নানা বিষয়ে ঋণী। সুতরাং তাহারা আমাদের সমাজের যথেষ্ট অপকার করা সত্বেও সত্যের খাতিরে তাহাদিগকে অনাবিল নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয় না।

ইংরাজেরা কোন কার্য্য আধাআধি করে না, তাহারা আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যের সামঞ্জস্য রাখে। শীত প্রধান দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সমুদ্র তীরে বাস করিয়া প্রকৃতির সহিত চিরকাল যুদ্ধ করিতে করিতে কতকগুলি সংস্কার এই জাতির হৃদয়ে বদ্ধমুল হইয়াছে। তাঁহারা যখন যে কার্য্যে হাত দেয় তখনি তাহা সফল হয়, দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই। কিন্তু বহু বৎসর সাধনা দ্বারা তাহারা কতকগুলি জাতীয় ভাব গঠন করিয়াছে। ইহার মধ্যে একটী এই যে যখন যে কার্য্যে হাত দেয় তাহার, পূর্ব্বে সেই কার্য্যটী সম্পূর্ণ করিবার জন্য আয়োজন করে, তাহার ছোট বড় সমুদয় সামগ্রী সংগ্রহ করে যেন কার্য্যকালে কোন দ্রব্যের অভাব না হয়। তাহাদের প্রত্যেক কার্য্য যেন একটী বৃহৎ যুদ্ধের আয়োজন।

এ দেশে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যও তাহারা আয়োজনের কোন ত্রুটী রাখিল না। মিশনারীরা সচ্ছন্দে বাস করিতে পারে এরূপ বাড়ী স্থানে স্থানে নির্ম্মাণ করিল।

মুদ্রাযন্ত্র তাহারাই প্রথমে এ দেশে আনিল। বাঙ্গালা অক্ষরে পুস্তক ছাপাইবার প্রথা তাহারাই দেখাইল। অল্প মূল্যে ও বিনা মূল্যে পুস্তক বিতরণ করিতে লাগিল। নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিল এবং সে খানে অপর অপর বিদ্যার মধ্যে তাহাদের ধর্ম্ম পুস্তক ও পাঠ করাইত। নগরে, রাজপথে, হাটে ও বাজারে তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের নিন্দা করিত। ইহাতেও তাহাদের একটু বিশেষত্ব ছিল। তাহারা বেতন দিয়া পণ্ডিত রাখিয়া আমাদেরই নিকট আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িত। উদ্দেশ্য আমাদের ধর্ম্মাপেক্ষা তাহাদের ধর্ম্ম যে বড় তাহা আমাদের ও তাহাদের ধর্ম্ম পুস্তক উভয়ের তুলনা করিয়া দেখাইয়া দিবে। যখন মিশনারীরা এই আয়োজন করিতে ছিলেন তখন আমাদের দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল দেখা যাউক।

তখন হিন্দুসমাজ অখণ্ড অবস্থায় ছিল। গোস্বামীর শিষ্য বৈষ্ণব আর ভট্টাচার্য্যের শিষ্য শাক্তের ধর্ম্ম সম্বন্ধে মত ভেদ থাকিলেও সামাজিক কার্য্য উৎসব ও ভজনা উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া করিতেন। শাক্তের বাড়ী দুর্গোৎসব কিম্বা কালীপূজা হইলে তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও গ্রামের লোকের মধ্যে যাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন তাঁহারা ও তাহাতে যোগ দিতেন। আবার বৈষ্ণবের বাড়ীর দোল, ঝুলন ইত্যাদি উৎসবের সময় শাক্ত আত্মীয় বন্ধুরা সেইরূপ যোগ দিতেন। সমবর্ণের শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যেও বিবাহ সম্বন্ধে কোন আপত্তি ছিল না। অর্থশালী বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ভদ্রলোকেরা দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি পূজাও করিতেন, —— বলি-দিতেন কুমড়া, ইক্ষু ইত্যাদি অপর দিকে শাক্তের বাড়ীতে ও দোলযাত্রা রথযাত্রা ইত্যাদি হইত। অবশ্য দুই চারজন চরম মতাবলম্বী "গোঁড়া" বৈষ্ণবও ছিলেন আর ঘোর শাক্তও ছিলেন। নিত্য পূজা পদ্ধতির ব্যবস্থা এইরূপ ছিল; সকলেই কুলগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিতেন। একটু বয়স হইলেই দীক্ষা না লইলে সমাজে অপদস্থ হইতে হইত। কেহ কেহ যুবা বয়সেও দীক্ষা লইতেন। ভট্টাচার্য্যের শিষ্যেরা প্রত্যহ মৃত্তিকায় শিবলিঙ্গ গঠন করিয়া পূজা করিতেন। ইষ্ট-মন্ত্র জপ ও গুরুর উপদেশানুসারে সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন। গোস্বামীর শিষ্যেরা মালাজপ ও গুরুর উপদেশানুসারে ইষ্টমন্ত্র জপ পূজা করিতেন। লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজা, বাস্তু পূজা ইত্যাদি সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল। ইহা ব্যতীত যাহাদের অবস্থা ভাল ছিল তাহারা অন্যান্য পূজা উৎসব ইত্যাদি করিতেন। আর একটি ছিল — ব্রাহ্মণের প্রতি মর্য্যাদা দেখান। ইহাও হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য ছিল। এখনকার লোকে যে চোখে দেখে, তখনকার লোক আর এক চোখে দেখিত। সুতরাং তখনকার কার্য্য সমুদয় আমাদের এখন ভাল লাগিবে না। এখনকার লোকের নিকট ব্রাহ্মণদিগের সেই সময়ের আচরণ একটু বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তখনকার লোকের হইত না। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণ, ব্রাহ্মণ দেখিলেই প্রণাম পদধুলি গ্রহণ বা তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ অপমানের কাজ বলিয়া মনে করিত না। ব্রাহ্মণেরাও কথায় কথায় "তুই বেটা শূদ্র" বলা অন্যায় মনে করিতেন। যেমন ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল; সেইরূপ গুরুজন ও বয়োবৃদ্ধদিগের সম্মান প্রদর্শনও অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল।

সংসারের কর্ত্তা ও গিন্নীকে সংসারের সকলেই দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত তাঁহাদের কথা সকলেই শুনিত। যে না শুনিত সেই পাষণ্ড নামে অভিহিত হইত। বাঙ্গলায় তখন পাচিকার সৃষ্টি হয় নাই। ভদ্র ঘরের সকল স্ত্রীলোকেরাই পাক করিতেন। এবং কর্ত্তাদের আহারান্তে প্রসাদ পাইতেন। এই প্রথা যে কেবল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে ছিল তাহা নহে। ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ীর কোন্ রাণী কোন্ দ্রব্য ভাল রাঁধিতেন, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। অপর অপর জমিদারদিগের বাড়ীতে সংসারের স্ত্রীলোকেরাই রন্ধন করিতেন। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে শ্রীল রঘুনন্দনের কৃপায় ভারতের অপর দেশাপেক্ষা বাঙ্গালায় স্মৃতি শাস্ত্রের অত্যন্ত প্রসার হইয়াছিল। সুতরাং এখানে খাদ্যাখাদ্যের যেরূপ বিচার ছিল ভারতের অপর কোন স্থানে সেরূপ ছিল না, এখনও নাই। এই জন্যই বোধ হয় বাঙ্গালীরা খাদ্যের ভার সুপকারের হাতে না দিয়া সহধর্ম্মিণীদিগের হাতে রাখিয়াছিলেন।

হিন্দু সন্তান প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া রাত্রে নিদ্রা যাওয়া পর্য্যন্ত কি কি কার্য্য কিরূপে করিবে স্মৃতিকর্ত্তারা তাহার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এখন সমগ্র সংহিতা পড়া সহজ। কিন্তু যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, তখন এক ব্যক্তির পক্ষে সমগ্র সংহিতা পাঠ করা দূরে থাকুক এক খানা সংগ্রহ করাও কঠিন ছিল। রঘুনন্দন মনুসংহিতার প্রাধান্য রাখিয়া অপর সংহিতা--ন্যায়, অর্থশাস্ত্র জ্যোতিষের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাঙ্গালী গৃহস্থের জন্য স্মৃতি প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে যে কেবল পূজা অর্চ্চনার কথা ছিল তাহা নহে, গৃহ প্রবেশ, নববস্ত্রপরিধান, হলকর্ষণ, বীজ বপন এবং কোন দিন কোন দ্রব্য ভক্ষণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গেলেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণও ইহা সযত্নে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং সেই ব্যবস্থা অনুসারে যাহাতে কার্য্য হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এই সমুদয় সদনুষ্ঠানের ভার গৃহলক্ষ্মীদিগের হস্তেই ছিল। পুরুষ দিগের বিদ্যাশিক্ষা বিদ্যা দান ও বিষয় কার্য্যে অনেক সময় ব্যয় করিতে হইত। সুতরাং পূজা, ভোগ, নৈবেদ্য এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বস্তু পুরুষেরাই সংগ্রহ করিয়া দিতেন বটে কিন্তু তাহার আয়োজন গৃহলক্ষ্মীদিগেরই করিতে হইত।

গৃহলক্ষ্মীরা শৈশবে ও বাল্যে ব্রতদ্বারা নানা প্রকার শিক্ষা পাইত। এই ব্রতদ্বারা তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করা হইত। ভগবানের প্রতি ভক্তিও শিখিতেন, তাহা ছাড়া পিতা মাতা, ভাই শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী ইত্যাদি গুরুজনের প্রতি ভক্তি এবং গবাদি জীবের সেবা শিক্ষা করিতেন। উহার সঙ্গে ২ নিজ হাতে আলিপনা ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা শিল্পবিদ্যাও শিক্ষা হইত। তাহাদের খেলা ছিল রাঁধা বাড়া ইত্যাদি। একটি ব্রতের মন্ত্র আমার মনে পড়ে—

"ভাই আমার রাজ্যেশ্বর,
বাপ আমার দিল্লীশ্বর।"

যাঁহারা "গোকল" ব্রত করিতেন তাঁহারা অন্যান্য অনুষ্ঠানের পর নিজ হাতে দূর্ব্বাঘাস সংগ্রহ করিয়া সন্ধ্যার সময় গাভীর খুর ও সিং ধোয়াইয়া মন্ত্র বলিতেন ও সেই ঘাস খাওয়াইতেন। ইহাছাড়া কথকের মুখেও যাত্রা গানে অনেক ধর্ম্ম কথা শুনিতেন ও শিখিতেন। যখন মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় কাশীরাম দাসের মহাভারত কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ ছাপা হইল তখন আহারান্তে কোন ২ বাড়ীতে অনেক বৃদ্ধা যুবতী ও বালিকা উপস্থিত থাকিতেন। কোন বালক কিম্বা বালিকা উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া পুস্তক পাঠ করিত, আর উপস্থিত মহিলাগণ কাঁথা সেলাই প্রভৃতি কারুকার্য্য করিতে করিতে উহা শুনিতেন। বিদেশীয়েরা কেহ ২ বলেন যে বাঙ্গালীরা স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করেনা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না বলিয়া উহারা নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্থ হয়। আমাদেরও কোন কোন ব্যক্তি সেই কথা সমর্থন করেন। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা যেভাবে তাঁহাদের গৃহ পরিস্কৃত রাখিতেন, তাহা দেখিলে ইহারা আর একথা বলিতেন না। যে ভদ্রলোকের অবস্থা সচ্ছল ছিলনা কেবল কয়েক খানি খড়ের ঘরে পল্লিগ্রামে বাস করিতেন, তাঁহার গৃহও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। উঠান ও ঘর গুলি প্রত্যেক দিন গোময় ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দেওয়া হইত। সেই উঠান এত পরিস্কার থাকিত যে বালক বালিকাগণ প্রাতঃকালে সেখানে বসিয়া আহার করিত। পরিস্কার পরিচ্ছন্নের প্রতি দেশের আন্তরিক কত টান ছিল তাহা একটি গ্রাম্য গাঁথাতেই বুঝিতে পারা যায় ভিখারিরা গান করিত—

"সকাল বেলা ছড়া ঝাট
সন্ধ্যে বেলা বাতি
লক্ষ্মী বলেন সেই বাড়ীতে
আমার বসতি।"

এই উঠানের চারিদিকে নিত্য পূজার জন্য দু'চারিটী ফুলের গাছ থাকিত, আর থাকিত শাক্ সবজি। এখন আর তাহা নাই। এখন উঠানে "ছড়া ঝাট" পড়ে না, তাহার পার্শ্বে ফুল গাছ ও শাক সজিও দেওয়া হয় না। এখন বাড়ীর মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া যাঁহারা আমাদের নিন্দা করেন তাহাদের আমি দোষ দিতে পারি না।

হিন্দু মুসলমানের পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহার সামান্য উল্লেখ মাত্র করিব। অনেক জেলার কৃষকগণ

প্রায়ই মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, ইহা রাঢ়ের প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে না। এই মুসলমানেরা প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীর লোক। দু'চার ঘর ভদ্র মুসলমানও ছিল। গরীব মুসলমানদিগের মধ্যেও কতক প্রকৃত পাঠান বংশ বলিয়া দাবী করিত এবং দাবী করে।

মুসলমানের অনুষ্ঠান রোজা নমাজ ইহারা করিত না। গো মাংস ভক্ষণ অন্যায় বলিয়া ইহারা মনে করিত। হিন্দুর বাড়ীতে পূজা হইলে ঠাকুর দর্শন, নমস্কার ও প্রসাদ ভক্ষণ করিত। যাহারা আপনাদিগকে পাঠান বা ছৈয়দ বলিত ও নিজ হস্তে হলাকর্ষণ করিত না, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান—রোজা নমাজ করিত কিন্তু তাহারাও গোহত্যা দ্বারা কোরবাণী করিত না। কৃষক মুসলমানেরা (পাঠান ব্যতীত) হিন্দুর বাড়ীতে আহার করিত। ভদ্র মুসলমানেরাও মুসলমান দ্বারা পাক করাইয়া হিন্দুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। অপর পক্ষে হিন্দুরাও মুসলমানদিগের বাড়ী হইতে দূরে কোন হিন্দু প্রজার বাড়ী কিম্বা বাজারে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইয়া প্রতি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। এক কথায়, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব একেবারেই ছিল না। গোহত্যা লইয়াই হিন্দু মুসলমানের বিবাদ। তখনকার মুসলমানেরা গোহত্যা করা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিতেন না। বরং ইহা একটী অন্যায় কার্য্য বলিয়াই মনে করিতেন। মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের ধর্ম্ম লইয়া কোন বিবাদ ছিল না।

হিন্দু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণের অন্নকষ্ট ছিল না। দেশে খাদ্য দ্রব্য সুলভ থাকায় জমা জমী হইতে যাহা পাইতেন তাহাতে ভাত কাপড়ের খরচ চলিয়া যাইত। অধিক লোকে চাকুরী করিত না, উকীল মোক্তারের প্রয়োজন কম ছিল সুতরাং তাহাদের সংখ্যা ও কম ছিল। বড় চাকুরী বলিলে বড় জমিদারের সরকারে, নীল কুঠিতে, আর গবর্ণমেণ্টের নিমক মহলের দারোগা ইত্যাদি দু'চারটি ছিল। অধিকাংশ লোক সুতরাং নিজ গ্রামে থাকিত এবং সাংসারিক কার্য্য ও পূজা অর্চ্চনায় দিন কাটাইত। এখনকার ন্যায় পেটের জ্বালায় সহরে সহরে ঘুরিয়া বেড়াইত না। সাধারণ লোকে যথারীতি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কাণ্ড করিতেন——ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত করিতেন, কিন্তু যদি কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত যে ঐ সমস্ত কার্য্য কেন করা হয়, তাঁহারা যুক্তি তর্ক দ্বারা ক্রিয়া কাণ্ডের উদ্দেশ্য বুঝাইতে পারিতেন না। "আমার বাপ, পিতামহ ইহা করিয়াছেন সুতরাং আমি ইহা করি, না করিলে নরকে যাইব আর করিলে স্বর্গলাভ হইবে।" সমাজের পক্ষে এ ভাব অমঙ্গল কর নহে; কিন্তু যদি ইহার বিরুদ্ধে আর একটী দল হয় এবং তাহারা যুক্তি চাহে তাহা হইলে সর্ব্বনাশ; সেই সর্ব্বনাশ প্রকৃতই হইল। মিশনারীরা তরবারির দ্বারা যুদ্ধ করেন নাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিন্তু যে যুদ্ধের আয়োজন তাঁহারা করিয়াছিলেন তাহার ফল এই হইল যে কতকগুলি যুবক যাঁহারা তাঁহাদের নিকট শিক্ষা পাইয়াছিল তাহারা খ্রীষ্টান হইতে লাগিল। ইহা অপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গল এই হইল যে যাহারা খ্রীষ্টান না হইয়া সমাজে থাকিল, তাহারা পূর্ব্ব পুরুষের ধর্ম্ম ত্যাগ করিল বটে, কিন্তু আর একটা ধর্ম্ম মত গ্রহণ করিল না।

যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের হাতে ধর্ম্ম রক্ষার ভার তাঁহারা ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায় ও স্মৃতি লইয়া ব্যস্ত। বৈষ্ণব গোস্বামীগণের অবস্থা এত শোচনীয় যে যে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহাদের গোস্বামী পদ হইয়াছে অনেকে একেবারে সেই শ্রীগৌরাঙ্গকে ভুলিয়া গেলেন। মহাপ্রভুর লীলাগ্রন্থ তাঁহারা পড়িতেন না। তাঁহার মর্ম্ম ও বুঝিতেন না। ব্যবসার খাতিরে কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতের কতকগুলি শ্লোক এবং শ্রীচরিতামৃতের সংস্কৃত শ্লোকগুলি মুখস্থ করিতেন ও তাহা শিষ্য বাড়ী যাইয়া আওড়াইতেন। সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহাদের ও ক্রমে ধারণা হইতেছিল যে বৈষ্ণব ধর্ম্মটা নিম্নশ্রেণীর ধর্ম্ম——"তেলি মালীর ধর্ম্ম।" ইহার মধ্যেও কেহ কেহ শিষ্যদিগকে খাতিরে বৈষ্ণব পোষাকে সাজাইয়া তন্ত্রের মতে দীক্ষা ও সেই মতে পূজা করিতে উপদেশ দিতেন। সাধারণ লোক থাকিল "পঞ্চোপাসক"। দোল, দুর্গোৎসব সবই করে কিন্তু কোনটাই ঠিক ঠিক হয় না।

দেশের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা তখন এক মহাপুরুষ সিংহ বিক্রমে সমাজ রক্ষা করিতে দাঁড়াইলেন, ইনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম,

সুন্দর সুপুরুষ, মেধাবী ও বুদ্ধিমান। নিজ ক্ষমতায় নানা ভাষা শিখিলেন এবং বিধর্ম্মী দিগের ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিলেন। খৃষ্টান দিগের প্রতিপত্তি তিনিই প্রথম লাঘব করেন. তিনি দেখাইলেন আমাদের ধর্ম্ম অপর কোনও ধর্ম্ম অপেক্ষা ছোট ত নয়ই বরং নানা বিষয়ে বড়। অনেকের ধারণা যে রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। ইহা ভুল। তিনি যদি জীবনের শেষ ভাগে ইংলণ্ডে না যাইতেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় ক্ষমতাশালী শিষ্যের সাহায্য পাইতেন তাহা হইলে স্বামী দয়ানন্দের আর্য্য সমাজের ন্যায় একটী সমাজ হয় ত করিতেন। অথবা হিন্দু সমাজে যেমন শাক্ত বৈষ্ণব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম যাজনা করে সেইরূপ হিন্দু সমাজের মধ্যে থাকিয়া বৈদিক প্রথায় ধর্ম্ম যাজনের একটী দল করিতেন। রাজা রামমোহন রায় মূর্ত্তি পূজার বিরোধী ছিলেন, কোনও কোনও তান্ত্রিক সংন্যাসীরা ও কোন ও কোন ও বাউল সম্প্রদায় ও মূর্ত্তি পূজা করেনা; তাহারা যোগ সাধন দ্বারা মুক্তি পাইবার চেষ্টা করে। রাজা রামমোহন এইরূপ এক তান্ত্রিকের নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। তিনি সে গুরু ত্যাগ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার সতীর্থ এক তান্ত্রিকের সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের হিমালয় প্রদেশে দেখা হইলে সেই তান্ত্রিক বলিয়াছিলেন যে রাজা রামমোহন ও তিনি এক মতাবলম্বী। এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীও মূর্ত্তি পূজা করিতেন না।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ যখন আসরে নামিলেন তখন তিনি হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিয়া হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনার একটি দল গঠন করেন। ইহাতে তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, অনেক অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, চিন্তা ও সাধনাও কম করেন নাই। দেবেন্দ্র নাথ প্রথম ধর্ম্মাভাষ পাইয়াছিলেন তাঁহার পিতামহীকে দেখিয়া, ইনি বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। ঠাকুর মা-তে যে ভক্তি দেখিয়াছিলেন তাহা তিনি চির জীবন ভুলেন নাই। আর সেই জন্যই তাহাকে কিছু গোলেও পড়িতে হইয়াছিল। তিনি জানিতেন হিন্দুর বেদ ও বেদান্তে নিরাকার ভজনের উপদেশ আছে সুতরাং উহা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

দুর্ভাগ্য বশতঃ বোধ হয় তাঁহার নিকট বেদান্তের শ্রীভাষ্য ইত্যাদি বৈষ্ণবদিগের ভাষ্য পৌছায় নাই। তিনি পাইয়াছিলেন কেবল শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য। তাহা তাঁহার ভক্ত প্রাণে ভাল লাগিলনা। সেই জন্য তিনি উহা কাটিয়া ছাটিয়া তাঁহার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম উপাসনার পুস্তকে গ্রহণ করিলেন। বেদ বেদান্ত উপনিষদ ও তন্ত্র হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক তিনি লেখেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতি রাজা রামমোহনের একটু অধিক টান ছিল, সম্ভবতঃ সেই জন্যই মহর্ষি বৈষ্ণব দর্শনের অনুসন্ধান করেন নাই।

রাজার যে ভগবান শঙ্করের প্রতি টান ছিল তাহা তাঁহার নিজের কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বেদান্ত সারের বঙ্গানুবাদে লিখিয়াছেনঃ— "যদাপিও ভগবান আচার্য্যের কৃত ভাষ্যকে মোহের লিখিত করিয়া কহা সকলেরই দুষ্কৃতের কারণ হয় তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্য দেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের অত্যন্ত অপরাধ জনক হইবে, পূজ্যপাদ ভগবান ভাষ্য কারের শিষ্যানুশিষ্য প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন। সেই ভারতীর শিষ্য চৈতন্য দেব হয়েন"। রাজা মহাশয়ের এই লেখায় আমরা ২টী কথা পরিষ্কার পাইলাম—প্রথম এই যে তিনি ভগবান শঙ্করের মতাবলম্বী ছিলেন। দ্বিতীয় এই যে তিনি মহাপ্রভু শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ দেব কিম্বা তাঁহার শিষ্যগণের সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাহা করিলে তিনি শ্রীল কেশব ভারতীকে মহা প্রভুর গুরু বলিতেন না এবং প্রভুপাদ শ্রীল রূপ সনাতন, জীব গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকর্ত্তা দিগের সহিত ভগবান শঙ্করের কোন কোন বিশয়ে মতের অমিল তাহা উল্লেখ করিতেন ও তাহার নিজের মত ও লিপিবদ্ধ করিতেন। ইহাতে মহাত্মা রামমোহনের বিন্দু মাত্র দোষ নাই বরং আমাদের ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি যখন উপরোক্ত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না যিনি এই কথার প্রতিবাদ করেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ যদি জাগরিত থাকিতেন তাহা হইলে মহর্ষি যে ভাবে তাঁহার ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করিয়া ছিলেন তাহাও সম্ভবতঃ হইত না। রাজা রামমোহন ছিলেন শঙ্করের মতাবলম্বী অদ্বৈতবাদী, আর মহর্ষি ছিলেন দ্বৈত বাদী বৈষ্ণব।

তিনি যে কয়েকটী লোক লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন তাহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দ শ্রীল কেশবচন্দ্র ও প্রভুপাদ শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার আর একজন প্রধান শিষ্য ঠাকুর অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পরে মুঙ্গেরে শ্রীগৌর বিগ্রহ স্থাপনা করিয়াছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথকে বৈষ্ণব বলিলাম তাহার অর্থ ইহা নহে যে তিনি বিষ্ণু উপাসক ছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন না এবং শ্রীভগবান সম্বন্ধে বৈষ্ণবদিগের যে মত তাঁহারও সেই মত ছিল। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে একমায়া ভেদবুদ্ধি জন্মায় এই মায়া কাটিয়া গেলে পরমাত্মা ও জীবাত্মার কোন প্রভেদ নাই। দ্বৈতা বাদীরা বলেন যে তাহা নহে। শ্রীভগবানে ও জীবে চির-কাল পার্থক্য থাকিবে—জীব ভগবানের নিত্য দাস। মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের নিকট এই ভাবটীই ভাল লাগিয়াছিল।

বৈষ্ণবেরা এই ভাবের জন্য শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া পাঁচটী রসের দ্বারা ভজনা করেন। এই পাচটি পর পর এই:—(১) শান্ত (২) দাস্য (৩) সখ্য (৪) বাৎসল্য ও (৫) মধুর। রসের পুষ্টি হইলে দাস্যের মধ্যে শান্ত ও দাস্য থাকে; সখ্যের মধ্যে শান্ত, দাস্য ও সখ্য, বাৎসল্যের মধ্যে শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য এবং মধুর রসে অপর চারিটী রস থাকে। ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ কেবল মাত্র শান্ত রস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণ কেহ কেহ দাস্য ভাবও গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাহার মধ্যে আবার কেহ কেহ সখ্য ভাবের ছায়া মাত্র লইয়াছিলেন। অপর দুইটী রস অর্থাৎ বাৎসল্য ও মধুর তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই। শ্রীভগবানকে পিতা বা মাতা ভাবে ভজনা শান্ত বা দাস্য ভাবেই করা হয়। বাৎসল্য রস ও মধুর রসের ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধে করা অসম্ভব। ব্রাহ্ম সাহিত্যের কোন কোন স্থানে "হৃদয়ের রাজা" "প্রাণের স্বামী" "স্বামী" ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যায় কিন্তু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উহা ও শান্ত ও দাস্য ভাব ব্যঞ্জক তাহা বেশ বুঝা যায়।

মহর্ষির নিকট যাঁহারা উপদেশ পাইলেন তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার প্রিয়জনেরা সকলেই ভক্ত। এখানে একটী কথা লিখ। বাঙ্গলার ধর্ম্ম জীবনে দুটি বস্তুর আদর অধিক। "ত্যাগ ও ভক্তি-প্রেম"। এই দুইটীই যেন বাঙ্গালির ধর্ম্ম জীবনের "লক্ষ্য বস্তু।" যাহার নিকট এই সম্পত্তি দেখে তাহারই পায় ইহারা লুটাইয়া পড়ে। সেই জন্যই বোধ হয় যাহারা ব্রাহ্ম নহেন তাহারাও ভক্তির সহিত দেবেন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করেন।

যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা দেশে চালাইবার জন্য আয়োজন করিতে ছিলেন সেই সময় ইংরাজি নবিশদিগের মধ্যে আর এক শ্রেণীর যুবক দেখা দিল। ইহাদিগের নাম হইল ইয়ং বেঙ্গল। (Young Bengal) তাহারা খৃষ্টানের গির্জ্জায় যাইত না, ব্রাহ্ম মন্দিরে যাইত না বা হিন্দুর দেবালয়েও যাইত না। হিন্দু সমাজের মধ্যে বাস করিত বটে কিন্তু কোনও প্রকার ধর্ম্ম আচরণ করিত না—ইহার মধ্যে লেখা পড়া জানা ও সদ্বংশীয়ও অনেকে ছিলেন। তাহারা আমোদ আহ্লাদ করিতেন, কিছু কিছু বিদ্যা চর্চ্চাও করিতেন। ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার 'একাল ও সেকাল' পুস্তকে উহাদের কথা কিছু বলিয়াছেন। ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাঁহার সধবার একাদশীতে উহাদের একটী উত্তম ছবি দিয়াছেন; আর ৺নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার আত্ম জীবনীতে যশোহরের যে অবস্থা বর্ননা করিয়াছেন তাহাও ঐ ইয়ং বেঙ্গলদিগের স্মৃতি। উহা কবি কাহিনী নহে। যেমন একদিকে খৃষ্টান মিশনারীরা হিন্দু সমাজকে আঘাত করিতেছিলেন তেমনি অপরদিকে এই যুবক দল ও সমাজের যথেষ্ট অনিষ্ট করিতেছিলেন। সমাজ সংরক্ষকদলের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ পণ্ডিত ও সুধীবর্গ কিছু ২ চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু সে ইংরাজি শিক্ষার নব "যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে"? যে যুবকেরা সহরে লেখা পড়া করিতে আসিতেন তাঁহারাও এই বিষ লইয়া গ্রামে যাইয়া যাহারা ইংরাজি জানিত না তাহাদের মাথা খাইতে লাগিলেন। হিন্দু আচার বিচার, হিন্দু বিশ্বাস হইতে অপরদিকে লইতে লাগিলেন কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে নূতন কিছু দিলেন না। অবশ্য মিশনারীরা পুরা উৎসাহে তখনও কার্য্য করিতেছিলেন।

এদিকে দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন অল্পদিন মধ্যে সেখানে গোল বাধিল। তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কেবল নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা লইয়াই

সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি নানা প্রকার সংস্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন যে ভাবে ব্রাহ্ম সমাজে কার্য্য হইতেছিল উহাতে "কুসংস্কার" আছে এবং "পৌত্তলিকতা" আছে তাহাও তিনি বলিলেন।

দেবেন্দ্র নাথের সহিত কেশবচন্দ্রের মত মিলিল না, সুতরাং কেশব বাবু তাঁহার প্রিয়বন্ধু পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও আরও কয়েকজনকে লইয়া আর এক নূতন ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। এখানে কেশব বাবু হিন্দুদিগের প্রথা ছাড়িলেন এবং খৃষ্টানদিগের ভজনপ্রণালী অনেক লইলেন। এই নূতন দলের ব্রাহ্মগণ নব উৎসাহে কাজ করিতে লাগিলেন। হিন্দু সমাজ খ্রীষ্টানদিগের দ্বারা খুব লাঞ্ছিত ছিল, তাহার পর ইহারাও সেই কার্য্য অপরদিক দিয়া করিতে লাগিলেন। হিন্দুর "কুসংস্কারের" প্রতি ইহারা এত চটা ছিলেন যে ঢাকায় যখন ব্রাহ্ম মন্দির প্রস্তুত হয় তখন তাহার ট্রাষ্ট ডীডে এক সর্ত্ত এই লেখা হইল যে সেই মন্দিরের মধ্যে কেহ কখনও খোল কি করতাল বাজাইতে পারিবেন না। কিন্তু এই নূতন দলের মধ্যেও একবার "কুসংস্কার" লইয়া একটা আত্মকলহ উপস্থিত হইয়াছিল। কেশব বাবুর বক্তৃতা ইত্যাদি শুনিয়া মুঙ্গেরে কয়েকটী ভক্ত ব্রাহ্ম কেশব বাবুর পদধুলি লইয়াছিলেন ও আরও নানা প্রকারে তাঁহাকে ভক্তি দেখাইয়াছিলেন। ইহাতে কেশব বাবুর বন্ধুরা বলিলেন যে তিনি 'কুসংস্কারের' প্রশ্রয় দিতেছেন এবং 'নরপূজা' লইতেছেন। যাহা হউক সে বিবাদ সেবার মিট মাট হইয়া গেল কিন্তু কেশব বাবু কুচবিহার মহারাজের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলে আবার এক বিবাদ হইল। মহর্ষিকে ছাড়িয়া কেশব বাবু যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ করেন সেই সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৺আনন্দ মোহন বসু প্রভৃতি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এবার তাঁহারা প্রভুপাদ পূজনীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লইয়া কেশব বাবুকে ত্যাগ করিলেন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। যে সমুদায় সংস্কার কেশব বাবু আরম্ভ মাত্র করিয়াছিলেন কিম্বা হওয়া উচিত মনে করিতেন নূতন সমাজ পুরা মাত্রায় উহা চালাইলেন, ইংরাজদিগের সবই ভাল এই ভাবটা যেন তাহারা একটু বেশী মাত্রায় চালাইলেন।

হিন্দু সমাজের অবস্থা সে সময় শোচনীয়। ইয়ং বেঙ্গলের দল পল্লী গ্রাম পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিল। ইহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিত না, দিতে লজ্জা বোধ করিত। বরং নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিত। তবু অসভ্য কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু নামে পরিচয় দিত না।

কিন্তু আবার দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। ৺ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় চট্টগ্রামে বলিয়াছিলেন যে "আমাদের দুর্দ্দশাই এই, আমরা দূরে পশ্চিমে নিয়ত নয়ন নিক্ষেপ করিয়া আছি, কখনও আপনাদের দিকে, আপনাদের ঘরের দিকে, আপনাদের গৃহস্থালীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না।" অক্ষয় বাবু সাহিত্য সম্বন্ধেই এই কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু আমার মনে হয় যে, যে ভারতবর্ষ সমস্ত ধর্ম্মের আকর সেই ভারতবাসীরা ধর্ম্মের জন্যেও পশ্চিম দিকে তাকাইয়া থাকে। কি বলিতে যাইয়া কি বলিলাম। আমি বলিতেছিলাম দেশের ধর্ম্ম মতের অবস্থান্তর হইল। অত্যন্ত দুঃখের সহিত লিখিতে হইল ইহাও সেই পশ্চিমে হাওয়ার ফল।

ইংলণ্ডে ম্যাক্সমূলার সাহেব (Hebert lecturer) বক্তা হইয়া যখন বেদ বেদান্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে ছিলেন তখন কাহারও কাহারও মন একটু নরম হইল। তাহারা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন বুঝি আমাদের কুসংস্কারাপন্ন শাস্ত্র মধ্যে ভাল জিনিষও আছে। আমরা দেখি নাই বটে, খোজ লই নাই বটে, কিন্তু জার্ম্মান দেশের অত বড় পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া শাস্ত্র পড়িয়া যখন বলিতেছেন তখন নিশ্চয়ই আমাদের শাস্ত্রে ভাল জিনিষ আছে। যখন দেশের মনের অবস্থা এইরূপ সামান্য উন্মেষ হইতেছে সেই সময় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাডাম ব্লাভাস্কি ও কর্ণেল অলকট ভারতবর্ষে আসিলেন। (আগামী বারে সমাপ্য।)

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।

জুলেখা।

(Jami হইতে)।

সংসার গালিচা খানি গুটায়ে ফেলেছি মোর
হেরি দেবি তোমার বয়ান,
আমার আমিত্বটুকু আমূল তুলিয়া নিয়া
তোমা মাঝে করেছি নির্ব্বাণ।
আমারে হেরিতে হলে হেরিও তোমারি মাঝে
নেত্র মুদি অনুভব করি।
অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে আমার স্বার্থের চিন্তা
যাক্ সবি ঝুর ঝুর ঝরি'।
তোমাতে হেরি না আমি বিন্দু মাত্র দেহ লেশ
তুমি যেন শুধু আত্মা মন,
মোর শুধু আছে দেহ আত্মারে স'পিয়াদেছি
দুয়ে মিলে একটী জীবন।
স্বর্গ হতে বরণীয় এ মিলন রমণীয়
ইহা হতে স্পৃহনীয়তম,
জুলেখা তোমার পায়ে আমার পরাণ মন
লহ তুমি চির অর্ঘ্য সম।

শ্রীকালিদাস রায়।

মোগল শাসনে ভারতবাসীর অবস্থা

শিক্ষা ও চাকুরী।

ইস্লামের অন্তর্নিহিত শক্তি অতি প্রবল; ইহা আরব জাতিকে অদ্ভুত বলশালী করিয়াছিল। তাঁহারা মোহাম্মদের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে সিরিয়া ও মিশর, দশ বৎসরে পারস্য এবং এক এক বৎসরে স্পেন ও আফ্রিকা সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহাদের দিগ্বিজয়ের গতি প্রতিহত হইয়াছিল। আরব্যেরা দীর্ঘকাল যত্ন করিয়াও ভারতবর্ষে অধিকার স্থাপন করিতে পারেন নাই। ইহার পর তুর্কী জাতীয় মোসলমানদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। তুর্কী সুলতান মহম্মদ গজনী সপ্তদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁহার নির্ম্মম আক্রমণে স্বর্ণভূমি ভারতভূমি ছারখার হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্চনদ প্রদেশ ব্যতীত আর কোন স্থানেই তুর্কী জাতির স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। প্রথম তুর্কী আক্রমণের কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পরে পাঠান জাতীয় মুসলমানগণ উত্তর ভারত হস্তগত করেন।

পাঠানগণ পাশববলে এবং কৌশলে উত্তর ভারতের অধিকারী হইয়াছিলেন; কিন্তু আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাঁহারা অচিরে ভারতবাসীর সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাঁহাদের সাহায্যে ভারতবর্ষ শাসন করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে ভারতবর্ষ আত্মকলহে ছিন্নভিন্ন ছিল, এজন্যই পাঠান তাদৃশ নিরবলম্ব ভিত্তিতেও আপনাদের আধিপত্য রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের রাজভিত্তি কিরূপ নিরবলম্ব ছিল তাহা আমরা প্রদর্শন করিতেছি।

ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ দেশ, ইহার লোকসংখ্যাও অগণ্য। কিন্তু বিজেতৃগণ সংখ্যায় অল্প ছিল। মুসলমানেরা আপনাদের বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে অনিচ্ছুক ছিল। কেবল সমর ব্যবসায়ী এবং দুরাকাঙ্খের দল উচ্চাভিলাষের তাড়নায় ভারতবর্ষে উপস্থিত হইত। নতুবা মুসলমান শিল্পী তাহার যন্ত্র লইয়া, কৃষক তাহার লাঙ্গল লইয়া কখনও ভারতবর্ষে স্থায়ী বাস জন্য আইসে নাই। এই কারণ বিজেতা মুসলমান স্থাপত্য, কৃষি এবং গৃহকার্য্যের জন্য হিন্দুদের সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেন। হিন্দু জাতির নিকট তাঁহাদের অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। শিল্প, বস্ত্র বয়ন, চিকিৎসা, স্থাপত্য, হস্তী পালন প্রভৃতি নানা বিষয় মুসলমানেরা হিন্দুর নিকট শিক্ষা করেন। মুসলমান নরপতি রাজস্ব সংগ্রহ জন্যও হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিতেন। মুসলমান সামন্তদের সম্পত্তি রক্ষার ভারও অনেক সময় হিন্দুদের হস্তে ন্যস্ত হইত। ক্রমশঃ মুসলমান নরপতি হিন্দুদিগকে সৈন্যবিভাগেও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। সুলতান আলাউদ্দিনের সৈন্য সংখ্যা তিনলক্ষ পচাত্তর হাজার ছিল। এরূপ বিপুল সৈন্য দল কেবল মুসলমানের দ্বারা গঠিত হইতে পারে নাই অনেক হিন্দুও তাঁহার অধীনে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিয়া

ছিল। মুসলমান বিজেতৃগণ ভারতবর্ষে ইস্লামের প্রচার জন্য অবহিত হইয়াছিল। অনেক নিম্নশ্রেণীর ভারতবাসী ইস্লামের শরণাপন্নও হইয়াছিল; কিন্তু পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে যেরূপ আপামর সাধারণ সকলেই ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ হইতে পারে নাই। ভারতবর্ষে যাহারা ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, জনসংখ্যার তুলনায় তাহারা নগণ্য ছিল। দিল্লীর ইস্লাম ধর্ম্মোৎসাহী সুলতান ফিরোজ শাহের যত্নে অনেক হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও হিন্দু প্রকৃতি বিসর্জ্জন দিতে পারে নাই। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহান পাদশাহের শাসনকালেও এই সকল মুসলমানকে হিন্দুর আচার ব্যবহার পালন করিতে দেখা গিয়াছে। ফলতঃ মুসলমানের রাজশক্তি নিরবলম্ব এবং হিন্দুর সহায়তা অপরিহার্য্য হইলেও মুসলমানগণ তাহাদিগকে বিজিত বলিয়া তুচ্ছ করিত এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ঘৃণা করিত। রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রভাবের অভাব ছিল। মুসলমান নরপতি তাহাদিগকে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে বিরত ছিলেন। দিল্লীর সাম্রাজ্যাধিকারী তোগলক বংশ অবনত হইয়া পড়িলে অনেক প্রাদেশিক রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। এই সকল রাজ্যমধ্যে মালব এবং জৌন পুর প্রধান ছিল; এই দুই রাজ্যে সময় সময় হিন্দুর রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার এবং উচ্চপদ লাভের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের ধ্বংশ সাধন করিয়া একজন হিন্দু জমিদার আধিপত্য গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দিল্লীর পাঠান রাজশক্তির ধ্বংশের অব্যবহিত পূর্ব্বে হিমু অথবা হেমচন্দ্র সৈনাপত্যে বৃত ছিলেন। দিল্লীর পাঠান শাসনকালে হিন্দুর পক্ষে উচ্চপদ লাভের ইহাই একমাত্র দৃষ্টান্ত।

হিন্দুগণ প্রধানতঃ ধর্ম্মপার্থক্যের জন্যই উচ্চ রাজকার্য্যে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু কেবল ধর্ম্মজনিত বিদ্বেষের জন্যই হিন্দুরা উচ্চ রাজকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তাহা ঠিক হইবে না। অন্য একটী কারণেও তাহারা বিশিষ্ট রাজকার্য্য লাভের অনুপযুক্ত ছিলেন। হিন্দু মুসলমান দুই জাতিই হিন্দীভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন। ভারতবর্ষের অন্য শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি খুসরু হিন্দী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। কিন্তু রাজকার্য্য পারসী ভাষায় সম্পন্ন হইত। হিন্দুরা এই ভাষায় অজ্ঞ ছিল। মুসলমান নরপতি ধর্ম্ম পার্থক্য বশতঃ হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন, তারপর হিন্দুরা পারসী ভাষায় অজ্ঞ ছিল, এই দুই কারণে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে প্রবেশপথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ ছিল।

হিন্দু জাতি যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তাঁহাদিগকে সিংহাসনাধিকারী দেখিয়া আপনাদের জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সমধিক যত্নশীল হন; ইহার ফলে তাঁহাদের পরজাতি বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এবং স্বধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সাতিশয় রক্ষণশীলতা উপস্থিত হয়। এই কারণে হিন্দুরা পারসী শিক্ষা করা অপকর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। তারপর মুসলমানেরা সংখ্যায় ন্যূনতা বশতঃ হিন্দিভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করেন এবং রাজস্ব সম্বন্ধীয় কাগজপত্র হিন্দিভাষায় রক্ষিত হইতে থাকিলে হিন্দুদের পক্ষে পারসী শিক্ষা করা অনাবশ্যক হয়। কিন্তু কালক্রমে হিন্দু মুসলমানের একসঙ্গে বাস নিবন্ধন জাতিবিদ্বেষ অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন হিন্দুগণ পারসী ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। কোন সময় হইতে হিন্দুগণ পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। সমস্ত পরিবর্ত্তনের ন্যায় এই পরিবর্ত্তনও ক্রমে ক্রমে সাধিত হইয়াছিল, প্রথমে লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হয় নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ১৫০০ খৃষ্টাব্দের সমকালে সুলতান সেকন্দর লোদীর রাজত্ব সময়ে কতিপয় হিন্দু লেখক পারস্য ভাষায় রচনা করিতেন। তৎকালের ব্রাহ্মণ উপাধধারী একজন হিন্দু উৎকৃষ্ট পারসী কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার কতিপয় কবিতা এখনও বিদ্যমান আছে। বদায়ূনী লিখিয়াছেন যে, তিনি পৌত্তলিক হইয়াও ইসলাম শাস্ত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন এবং মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করিতেন। বস্তুতঃ খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুস্থানে পারসী শিক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভকালে অম্বরের রাজকুমার মনোহর পারসী রচনা করিতেন।

পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি কৌশল নিপুণ লিখকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু হিন্দু বিদ্বেষী বদায়ুনী লিখিয়াছেন যে, লবণাম্বু সর্ব্বরী হ্রদের পার্শ্বে মনোহরের জন্ম বলিয়া তাঁহার রচনাতেও জন্মভূমির আস্বাদ পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দু সমাজে যে পারসী শিক্ষার স্থূল প্রচার হইয়াছিল, আর একটী ঘটনা হইতে তাহার সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা তোড়রমল রাজস্বমন্ত্রীর পদে বৃত হইয়া পারসীতে রাজস্ব বিভাগের কাগজপত্র রাখিবার জন্য আদেশ দেন। এই পরিবর্ত্তনের বিষয় দস্তরউল আমল নামক গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে। এই আদেশ প্রদত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজস্ব-বিভাগের সমস্ত কাজ পারসীতে সম্পন্ন হইতে থাকে; ইহাতে হিন্দু রাজস্ব কর্ম্মচারীদের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। তোড়রমলের ন্যায় স্বধর্ম্মানুরাগী হিন্দু এইরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, ইহাতে আমাদের বিস্ময় জন্মিতে পারে কিন্তু তিনি হিন্দু কর্ম্মচারীদের হিত সাধন উদ্দেশ্যেই এইরূপ আদেশ দেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আকবর উদার নীতির বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুদিগকে বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করেন। তোড়রমল বুঝিতে পারেন, উচ্চকর্ম্মক্ষেত্রে মুসলমানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে হিন্দুকেও তাহাদের সমান শিক্ষালাভ করিতে হইবে। তোড়রমলের আদেশের ফলে হিন্দুরা রাজস্ব বিভাগের একাধিপত্য রক্ষার জন্য পারসী ভাষার অনুশীলনে একাগ্রচিত্তে নিরত হন।

আকবরের উদার নীতি এবং তোড়রমলের আদেশ মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাঘাত করিবে, উচ্চ রাজকার্য্যে তাঁহাদের একাধিপত্য নষ্ট করিবে, ইহা তাঁহারা অচিরে উপলব্ধি করেন। রাজা তোড়রমল রাজস্ব মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলে কতিপয় বিশিষ্ট মুসলমান মিলিত হইয়া আকবর সাহের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার অনুসৃত নীতির প্রতিবাদ করেন এবং রাজা তোড়লমলের পরিবর্ত্তে একজন মুসলমানের নিয়োগ জন্য প্রার্থী হন। আকবর জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা রাজকার্য্য কর, তোমাদের বিষয় সম্পত্তি কে রক্ষা করে?" তাঁহারা উত্তর দিল "হিন্দু কর্ম্মচারীবৃন্দ।" সম্রাট তখন বলিলেন, "বেশ, আমার বিষয়-জন্যও একজন হিন্দুকে নিযুক্ত করিতে দেও।" রাজা মানসিংহ রাণা প্রতাপকে বিনষ্ট করিবার জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তাঁহাকে প্রধান সেনাপতির পদে বৃত দেখিয়া অনেক মুসলমান সেনা নায়ক ঘোর অসন্তোষ প্রকাশ করেন, কেহ কেহ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধে গমন করিতেও অসম্মত হন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুজাতি প্রবলোৎসাহে পারসী ভাষা শিক্ষার জন্য প্রবৃত্ত হন। ইহার পর একশত বৎসর মধ্যেই তাঁহারা পারসী ভাষায় সাতিশয় উন্নতি লাভ করেন এবং মুসলমানদের সমকক্ষ হইয়া উঠেন। ইহার ফলে হিন্দুগণ রাজস্ব বিভাগের ন্যায় দপ্তর এবং মুন্সীখানার কার্য্যও হস্তগত করেন। খাফি খাঁ লিখিয়াছেন, সাজাহান বাদসাহের খ্যাতনামা মন্ত্রী সাদুল্লা খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার কার্য্য সম্পাদন জন্য রায় রঘুনাথ এবং চন্দ্রভন নিযুক্ত হন; কারণ তাঁহাদের ন্যায় পারসী রচনাদক্ষ ব্যক্তি তৎকালে আর কেহ ছিল না। ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে পারসী সাহিত্য রচিত হয়, তাহার অর্দ্ধেক হিন্দুর রচনা বলিয়া ব্লকম্যান সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হিন্দুজাতির মধ্যে পারসী ভাষার প্রচলন এতদূর হইয়াছিল যে, তাহার ফলে তাহাদের হিন্দি ভাষাও রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। ব্লকম্যান সাহেব লিখিয়াছেন, "এই সময় একটি নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়, এই ভাষার নাম উর্দ্দু অথবা হিন্দুস্থানী। এই ভাষার উদ্ভব এবং বিকাশ সাধন জন্য হিন্দুরা যতদূর যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিক এবং ভাষাতত্ত্ববিদমণ্ডলী কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা তদপেক্ষা অধিক যত্ন ও চেষ্টা করেন। হিন্দুজাতির মধ্যে যে সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পারসী ভাষার প্রচলন হইয়াছিল, সেই সময়ই সাহজাহান বাদসাহের রাজত্বকালে) উর্দ্দু ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল; এই ভাবে উদ্ভব এবং বিকাশের বিষয় চিন্তা করিলে এতৎসম্বন্ধে অভিনব তত্ত্ব পরিদৃষ্ট হইবে। কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন, শাহজাহানের পূর্ব্বে কি জন্য উর্দ্দু ভাষার উদ্ভব হয় নাই? এই প্রশ্নের সমাধানও ঐরূপই হইবে। হিন্দুজাতি পারসী ভাষাকর্ত্তৃক আবিষ্ট হইলেই উর্দ্দু ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল, যদি তাঁহারা উর্দ্দুর গঠন বিকাশের সহায়তা না করিতেন, তবে উহা পাঠান রাজত্ব সময়েও যেরূপ কালগর্ভে

নিহিত ছিল, শাহজাহানের রাজত্ব সময়েও সেইরূপই থাকিত।"

যদি মোগল শাসনকালের উচ্চ শ্রেণীর রাজপুরুষদের সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাইত, তবে হিন্দু মোসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যার তুলনা করিয়া আমরা কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিতাম। কেবল আকবর সাহ এবং শাহজাহানের সময়ের আমীর ওমরাহের তালিকা বিদ্যমান আছে। এই তালিকায় দৃষ্টি করিলে হিন্দু মোসলমানের অনুপাত দেখা যায়, রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর কিরূপ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও উপলব্ধ হয়। মোগল আমলে উচ্চ শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহারা মনসবদার নামে পরিচিত হইতেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনসবদার পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়কত্ব করিতেন, কিন্তু অনেক সময়েই নামে ঐ পরিমাণ থাকিলেও কার্য্যতঃ সৈন্যের পরিমাণ অনেক কম থাকিত। শাহজাহান বাদসাহের শাসনকালে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার এক চতুর্থ মাত্র রক্ষিত হইত। মনসবদারগণ ৫০০০ হইতে নিম্নদিকে ২০০ পর্য্যন্ত সেনার অধিনায়কত্ব করিতেন। দুই শতী মনসবদার আকবরের সময় আমীর শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, কিন্তু সাহজাহানের সময়ে আমীর শ্রেণী ভুক্ত হইতে হইলে পাঁচ শতী মনসব লাভকর আবশ্যক ছিল। পাঁচ হাজারের উপরেও মনসব ছিল। কেবল রাজকুমারগণই এই সকল মনসবের অধিকারী হইতে পারিতেন।

আইন আকবরিতে দেখা যায় যে, আকবর শাহের ৫০০০ হাজারী হইতে ৫০০ শতী মনসবদারের সংখ্যা ২৫২ জন ছিল, তন্মধ্যে ৩২ জন হিন্দু ছিলেন। তাঁহার ৫০০ শতী হইতে ২০০ শতী মনসবদারের সংখ্যা ১৬০ ছিল, তন্মধ্যে ২৬ জন হিন্দু ছিলেন। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে আইনে এই সংখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরে পাদশাহ নামায় শাহজাহানের মনসবদারের সংখ্যা লিপিবদ্ধ হয়। তাঁহার ৫০০০ হাজারী হইতে ৫০০ শতী মনসবদারের সংখ্যা ৬০৯ ছিল। তন্মধ্যে ১১০ জন হিন্দু ছিলেন। তখন ৩½ গুণ অপেক্ষাও বেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জাহাঙ্গীর ও আওরঙ্গজেবের সময়ের বিশুদ্ধ তালিকা রক্ষিত হয় নাই। ইঁহাদের রাজত্বকালে হিন্দু মনসবদারের সংখ্যা সমানই ছিল; কিন্তু তাঁহাদের পদগৌরব কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। হিন্দু মনসবদারগণ আত্মবিস্মৃত হইয়া আকবরের হিতার্থ জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। আকবরের সময় অনেকবার মনসবদারদের বিদ্রোহ হইয়াছে, কিন্তু এই সকল বিদ্রোহে কখনও হিন্দু যোগ দেন নাই। রাজা মানসিংহ দ্বিতীয়বার উড়িষ্যা বিজয়ান্তে প্রত্যাগত হইলে বাদসাহ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাতহাজারী মনসবদারের পদে উন্নীত করেন। ইতঃপূর্ব্বে পাঁচ হাজারী মনসবের উর্দ্ধে কেবল রাজকুমারগণই নিযুক্ত হইতেন। আকবর মানসিংহকে সাত হাজারী মনসবদার করিয়া তাহাকে সমস্ত মুসলমান রাজপুরুষের শীর্ষদেশে স্থাপন করেন। রাজা মানসিংহের পরবর্ত্তীকালে আর কোন হিন্দু ঈদৃশ উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে নুরজাহানের আত্মীয় স্বজনই রাজপুরুষদের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে পাঁচহাজারী মনসবদার রাজা জয়সিংহ, রাজা যশোবন্তসিংহ এবং রাণা জগৎসিংহ পদ মর্য্যাদায় সপ্তদশ, উনবিংশ এবং চতুর্বিংশ স্থানীয় ছিলেন। হিন্দু আমীর ওমরাহগণ শীর্ষস্থান লাভ করিতে না পারিলেও তাঁহাদের সংখ্যা উত্তরত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হিন্দু বিদ্বেষী আওরঙ্গজেব সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক তাদৃশ অধিক সংখ্যা দেখিয়া বিরক্ত হন এবং সুযোগমত হিন্দু আমীর ওমরাহের সংখ্যা হ্রাস করিতে আরম্ভ করেন। আওরঙ্গজেবের সময় হিন্দু মনসবদারদের উন্নতি লাভের আশা অন্তর্হিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সময়েও সুবা এবং প্রাদেশিক রাজ্যসকলে হিন্দুগণ রাজপুরুষদের শীর্ষস্থান অধিকার করিতেন। আমরা এখানে কেবল দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বাঙ্গলা সুবায় রায় রায়ান রঘুনন্দন দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত এবং রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত কালে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। গোলকুণ্ডার অধিপতি আবুহোসেন একজন ব্রাহ্মণকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন; যে সকল কারণে আওরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা জয় করিয়া মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন, তন্মধ্যে প্রধান মন্ত্রীর পদে ব্রাহ্মণের নিয়োগ অন্যতমরূপে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন।

আওরঙ্গজেবের পরবর্ত্তীকালে হিন্দুর প্রভাব পুনর্ব্বার

অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পাদশাহ ফরকশিয়রের শাসনকালে রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ সুরাটের এবং অজিত-সিংহ আজমঢ় এবং গুজরাটের শাসন কর্তৃত্ব লাভ করেন। ফরকশিয়র, রফি-উদ-দরজারত, রফিউদ্দৌলা এবং মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে রতনচাঁদ নামক একজন দোকানদার সৌভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপায় উজিরের সহকারী পদ লাভ করিয়াছিলেন। সমগ্র হিন্দুস্থানে তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা ও প্রতাপ ছিল। রাজা অজিতসিংহ এবং তাঁহার যত্নেই আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক পুনঃ প্রবর্ত্তিত ঘৃণ্য জিজিয়া কর রহিত হইয়াছিল। সায়ের উলমুতক্ষরিণ লেখক লিখিয়াছেন, "এমন কি, ধর্ম্ম এবং বিচার সম্বন্ধীয় কার্য্যেও তিনি এরূপভাবে হস্তক্ষেপ করিতেন যে, তৎসম্পর্কীয় রাজকর্ম্মচারিগণ সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন হইয়াছিল। এই হিন্দুর সম্মতি ব্যতীত কেহ কোন নগরের কাজির পদও লাভ করিতে পারিত না।

বঙ্গদেশের সুবাদার সুজাখাঁর আমলে রাজা আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ রাজকার্য্যে অতুল প্রতিপত্তিশালী ছিলেন।" এমন কি, তিনি মৃত্যুকালে পুত্র সরফরাজ খাঁকে এই দুই জন হিন্দুর মন্ত্রণামত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। আলীবর্দ্দী খাঁ বঙ্গের শাসন কর্তৃপদ অধিকার করিয়া রাজা জানকীরামকে প্রধান অমাত্যপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গোলামহোসেন খাঁ লিখিয়াছেন যে, জানকীরাম প্রতিভাশালী রাজকর্ম্মচারী এবং সুবাদারের অন্তরঙ্গগণ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও কর্ম্মঠ ছিলেন। মহারাজ মোহনলাল সিরাজদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে দুর্ল্লভ রায় এবং রামনারায়ণ বিশিষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

মোগল শাসনকালে অন্যান্য সুবায়ও হিন্দুগণ ঐরূপ উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত থাকিতেন, ইহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

কবি কঙ্কের করুণ কাহিনী।

(২)

প্রথমেই আমরা লীলার বারমাসী উদ্ধৃত করিলাম।

"দারুণ ফাল্গুন মাস গাছে নানান ফুল।
মালঞ্চ ভরিয়া ফুটে মালতী মুকুল॥
মধু লোভে যাওরে উড়ে ভ্রমরা ভ্রমরী।
বহু দিন নাহি শুনি বঁধুর বাঁশরী॥
নানাদেশে যাওরে ভ্রমর আরে পুষ্পমধু খাও।
কৈও কৈও লীলার কথা যদি লাগাল পাও॥
কৈও কৈও বঁধুর আগে শুন অলিকুল।
মালতীর গাছে তার ফুটিয়াছে ফুল॥
দারুণ চৈত্রের হাওয়া দূর হইতে আসে।
আমার বঁধু এমন কালে রৈয়াছে বিদেশে॥
গাছে গাছে সোণার পাতা ফুটে সোণার ফুল।
কুঞ্জেতে গুঞ্জরী উঠে ভ্রমরার রোল॥
ডালে বসে কোকিল ডাকে পুষ্পেতে ভ্রমর।
এমন না কালে বঁধু গেল দেশান্তর॥
না কইয়া না বইলারে বঁধু হইলা বৈদেশী।
মালঞ্চে ফুটিয়া ফুল ঝইরা হইল বাসি॥
বিনা সুতে হার গাঁথি মালতী বকুলে।
প্রাণের বঁধু নাহি ঘরে দিব কার গলে॥
কইও কইও কোকিলারে কইও বঁধুর আগে।
গাঁথা মালা বাসি হইলে প্রাণে বড় লাগে॥
যদি নাহি যাওরে কোকিল আমার মাথা খাও।
অভাগিনী লীলার দুঃখ বঁধুরে জানাও॥
নূতন বৎসর আইল ধরি নব সাজ।
কুঞ্জে ফুটে রক্তজবা আর গন্ধরাজ॥
গাছে ধরে নব পত্র নবীন মুকুল।
চারিদিকে শুনি মধুমক্ষিকার রোল॥
এহিত বৈশাখ মাস অতি দুঃসময়।
দারুণ রৌদ্রের তাপে তনু দগ্ধ হয়॥
কোকিল কোকিলা মাগে বসন্ত বিদায়।
আমার বঁধু এমন কালে রইয়াছে কোথায়॥
তন বৎসর আইল মনে নব আশা।

অভাগী লীলার কাছে কেবলি নৈরাশ ॥
জ্যৈষ্ঠ মাস জ্যেষ্ঠ রে ভাই সকল মাসের বড়।
ফলে ফুলে তরু লতা দেখিতে সুন্দর ॥
আম পাকে জাম পাকে পাকে নানান ফল।
মনসাধে ডালে বসি বিহঙ্গ সকল ॥
নানা গীত গায়রে তারা নানান ফল খায়।
অচেনা অজানা দেশে উড়িয়া বেড়ায় ॥
নিত্য আসে নব পাখী নূতন ভ্রমর।
কান্দিয়া সুধাইলে কেহ না দেয় উত্তর ॥
দারুণ গ্রীষ্মের তাপ জলন্ত অনল।
ভূতলে শুইল কন্যা পাতিয়া অঞ্চল ॥
আষাঢ় মাসের কালে আশা ছিল মনে।
অবশ্য আসিবে বঁধু লীলা সম্ভাষণে ॥
নূতন বরষা আসে লইয়া নব আশা।
মিটিবে অভাগী লীলার মনের যত আশা ॥
হাতেতে সোণার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে।
নবীন বরষা জলে বসুমাতা ভাসে ॥
সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
মরা ছিল তরু লতা উঠিলা বাঁচিয়া ॥
শুক্না নদী ভরে উঠে কুলে কুলে পানি।
বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরণী ॥
পাল উড়াইয়া তারা কত দেশে যায়।
আমার বঁধুর তারা লাগাল নি পায় ॥
এতকাল ছিলরে লীলা বড় আশার আশে।
সাধুর তরণী বাহি বন্ধু আইব দেশে ॥
কত দিন বাঁচেরে প্রাণ আশায় ধরিয়া।
দুই মাস গেল লীলার কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন।
ময়ূর ময়ূরী নাচে ধরিয়া পেখম ॥
কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার
লতায় পাতায় শোভে হীরামন হার ॥
মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা ॥
শ্রাবণ আসিল মাথে জলের পসরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া ধারা ॥
জলেতে কমল ফুটে আর নদী কুল।
গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল ॥
দিন রাতি ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি।
কুল চাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনী ॥
খাউরী বিউনা করে যত ডুমের নারী।
কত দেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী ॥
রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর ॥
কোন না বিরহী নারী হায় অভাগিনী।
অভেদ নাহিক জানে দিবস রজনী ॥
শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরে মাথে।
বউ কথা কও বলি কান্দিয়া ফিরে পথে ॥
কাহারে সুধাও রে পাখী আমি নাহি জানি।
আমি ও তোমার মত চির বিরহিনী ॥
শুন রে বিরহি পাখী-পাখী আরে পাইতাম
তোমার কাছে।
কহিতাম মনের দুঃখ মনে যত আছে ॥
কি কব দুঃখের কথা কইতে না জোয়ায়।
দেশে না আসিল বঁধু বর্ষা বহি যায় ॥
দিন যায় ক্ষণ রে যায় না মিটিল আশ।
এইরূপে কান্দিয়া লীলার গেল ছয় মাস।"

এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে ছয় মাস গত হইল। কঙ্কের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বিচিত্র মাধব কঙ্কের সন্ধান লইয়া ঘরে ফিরিবে, এই আশায় অভাগিনী প্রাণ রাখিয়াছে। ছয় মাস গত হইল, বিচিত্র মাধব ফিরিয়া আসিয়াছে; কঙ্কের কোন সন্ধান পায় নাই।

লীলা অতি ভয়ে ভয়ে বিচিত্র মাধবের কাছে কঙ্কের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিল :—

শুন শুন বিচিত্র আরে মাধব সুন্দর।
ঘুড়িয়া ফিরিয়া আইলা তোমরা বহু দেশান্তর ॥
নানা স্থানে ঘুরিয়া আইলে বহু ক্লেশে।
প্রাণের ভাই কঙ্কের দেখা পাইলে নি কোন দেশে ॥

বিচিত্র মাধব কত নদ নদী পর্ব্বত কত দেশের নাম বলিল। শ্রীহট্ট, কামরূপ, নবদ্বীপ এই ছয় মাস পর্য্যন্ত ঘুরিয়া কত দেশে দেশে পল্লিতে পল্লিতে তাহার অন্বেষণ করিয়াছে;

কিন্তু কপাল দোষে কোথাও তাহার সন্ধান পাইল না। বিচিত্র ও মাধবের এই দেশ ভ্রমণে কবি অনেক নূতন দেশের নদ নদী বন বনানীর অনেক প্রাকৃতিক শোভা, রীতিনীতি পদ্ধতি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনায় শেষ করিয়াছেন। বাণিজ্যচ্ছলে রাজা চন্দ্রধরের এইরূপ রহস্যপূর্ণ দেশ ভ্রমণের কথা পদ্মাপুরাণেও বর্ণিত আছে। এইসকল ভ্রমণ কাহিনী হইতে তদানীন্তন প্রাচীন বিবরণ অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়; আমরা বাহুল্য ভয়ে বিচিত্র মাধবের সেই বিচিত্র ভ্রমণ কাহিনী এখানে উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম—বিশেষতঃ কঙ্কের জীবনীভাগে তাহা অনাবশ্যক।

লীলা কেবলমাত্র একবার আপন নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিটী বিচিত্র-মাধবের উপর কেন্দ্রীভূত করিয়া চলিয়া গেল। তাহার এই নীরব মন্থর গমনের যদি কোন ভাষা থাকে, তবে তাহা এই—ইহজীবনে আমার আর কোন আশা ভরসা নাই—ইহ সংসারে আর আমার কেহ নাই—কিছু নাই।

তারপর বিচিত্র মাধব ধীরে ধীরে যাইয়া গর্গের চরণ বন্দনা করিলেন। উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে গর্গ তাহাদের শিরঘ্রাণ লইয়া বলিলেন—

বহু ক্লেশ পাইলে তোমরা আমার কারণে।
ছয় মাস ঘুরি আইলে পর্ব্বত কাননে॥
বল শুনি বৎসগণ তাহার বারতা।
তোমরা আইলে দেশে কঙ্ক রইল কোথা॥

শিষ্যদ্বয় আবার গুরুর পদধূলি মাথায় লইয়া বলিল,—দেব!

শৈশব সুহৃৎ মোদের প্রাণের বন্ধু ভাই।
প্রাণ দিতে পারি তারে খুজে যদি পাই॥
কত যে খুজিনু তারে নাহি লেখা জোখা।
নিখোজ হইলা বুঝি না পাইলাম দেখা॥

গর্গ আবার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক বলিলেন—বিচিত্র মাধব আবার যাও কঙ্ককে আনিয়া দিয়া তোমাদের গুরু দক্ষিণার ঋণ পরিশোধ কর। কঙ্ককে লইয়া আমরা সকলে এই হিংসাপূর্ণ বসতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানপ্রস্থে যাইব।

কঙ্ককে আনিয়া তোমরা দেহ দুই জনে।
লোকালয় ছাড়িয়া যাইব মোরা বনে॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক হবে পাড়া প্রতিবাসী।
নগর ছাড়িয়া মোরা হব বনবাসী॥

আমার মহাবানপ্রস্থেরও আর অধিক দিন সময় নাই অন্তকালে সেই প্রাণাধিক পুত্রকে শিয়রে রাখিয়া মরিতে পারি ইহাই কামনা। এই মুক্ত আকাশ তলে তোমাদের সব কটী ভাইকে সম্মুখে রাখিয়া আমার শেষ শয্যাটী পাতিব।

অনুগত শিষ্যদ্বয় আবার গুরুর পদধূলি মাথায় লইয়া গমনোদ্যত হইলেন। এবার গর্গ তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন—

শুন শুন বিচিত্র আরে মাধব সুন্দর।
আজি হতে তোমরা পুনঃ যাবে দেশান্তর॥
কিন্তু এক কথা মোর শুন দিয়া মন।
গৌরাঙ্গের পূর্ণ ভক্ত হয় সেই জন॥
যে দেশে বাজিছে গৌর চরণ নূপুর।
সেই পথ ধরি তোমরা যাও ততদূর॥
যে দেশেতে বাজে প্রভুর খোল করতাল।
হরিনামে কাঁপাইয়া আকাশ পাতাল॥
সেই দেশে কঙ্কের করিও অন্বেষণ।
অবশ্য গৌরাঙ্গ ভক্তে পাবে দরশন॥

কিন্তু সে কোন দেশ? গর্গ তাহাও বলিয়া দিলেন—

"যে দেশে গাছের পাখী গায় হরিনাম।
নাম সংকীর্ত্তনে নদী বহে সে উজান॥
শিষ্য পদধূলি মেঘে ছাইয়াছে গগন।
সে দেশে অবশ্য প্রভুর পাবে দরশন॥

গর্গ এইরূপ পথের সন্ধানও বলিয়া দিলেন। চন্দ্রসূর্য্য আকাশের যে স্থানেই উদয় কিম্বা অস্তমিত হয়, আকাশের দিকে চাহিলেই বুঝা যায়, তোমরা যাও গৌরাঙ্গরূপ শীতল চন্দ্রমা যে দেশে উদিত হইয়াছেন, সে দেশ জ্যোতিবিভাসিত আলোকপূর্ণ। তথায় সেই গৌরাঙ্গ মকরন্দলোলুপ মধুকরের অন্বেষণ নিশ্চয় পাইবে। তোমরা যাও।

গুরু পদধূলি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বিচিত্র মাধব আবার চলিয়া গেল।

"কঙ্ক অন্বেষিতে পুনঃ যায় দুই জন।
এ দিকে হইল কিবা শুন বিবরণ॥

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই এক জনরব প্রচারিত হইল—কঙ্কজলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

"জনরব এইমাত্র সর্ব্বলোকে বলে,
ডুবিয়া মরেছে কঙ্ক দরিয়ার জলে"।

বর্ষার মেঘ যেমন করিয়া অল্পে অল্পে সারাটা আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, এক দুই করিয়া সেই জনরব সেইরূপ সহস্র মুখে প্রচারিত হইতে চলিল। সে সন্দেহমেঘে ক্রমে ক্রমে লীলার ক্ষুদ্র হৃদয়খানিকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আশা আকাঙ্ক্ষার চন্দ্রতারা ঢাকা পড়িল। এই সুখ শান্তি ছায়া বিশ্বজগতের যেদিকেই অভাগিনী নয়ন ফিরায় সেই দিকেই সূচীভেদ্য অন্ধকার। কেবলি মেঘ, কেবলি বজ্রধ্বনি; এ অন্ধকারে অভাগী কাহাকেই বা পথের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিবে?

"বলা কওয়া করে লোকে এইমাত্র শুনি।
সুধাইলে উত্তর নাই না সুধালে শুনি॥
কাহাকে জিজ্ঞাসে কন্যা কি দেয় উত্তর।
সত্য কি জলেতে ডুবি মইল কঙ্কধর॥

লীলা কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় না, কি জানি জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের কি মর্ম্মঘাতি উত্তরই তাহার ভাগ্যে ঘটে। চারিদিকে সন্দেহের চিতানল ধূ ধূ জ্বলিতেছে, তারই মধ্যে দাঁড়াইয়া অভাগিনী ভাবিতেছে "কাহাকে জিজ্ঞাসা করি কি দেয় উত্তর"। আগে লীলা পশু পক্ষী তরুলতা সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, খাঁচার পাখী হিরামন তোতাকে যাইয়া কঙ্কের বার্ত্তা সুধাইত, আবেগ ভরে কখন চন্দ্র সূর্য্য আকাশ বাতাসকে লক্ষ্য করিয়া কঙ্কের সংবাদ জানিতে ব্যগ্র হইত, কিন্তু আজ সেই মূক বিরহিণী কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় না। "কাহাকে জিজ্ঞাসা করি কি দেয় উত্তর!" শরতের ভাটিয়াল নদী তেমনি করিয়া দিগন্তপানে বহিয়া যায়, মাঝিমাল্লাগণ তেমনই করিয়া মনের আনন্দে ভাটিয়াল গাহিয়া যায়। অপরাহ্নের সান্ধ্য প্রকৃতি তেমনই করিয়া আপন সোনালী রঙ্গের আঁচলখানি নীরে তীরে পাতিয়া দেয়, নিরাশ প্রণয়িনী লীলা প্রত্যহ অশ্রুসিক্ত নয়নে সান্ধ্য প্রকৃতি পানে চাহিয়া চাহিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। আবার সেই সুদীর্ঘ রজনী। চাঁদ উঠে, তারা ফুটে, কিন্তু সেই সন্দেহের বার্ত্তা "জিজ্ঞাসিলে অভাগিনী না পায় উত্তর।" "না বলিয়া চন্দ্রতারা আঁধারে লুকায়"; কালমেঘে নীরবে বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়, লীলার মনে সন্দেহের অন্ধকার যেন দ্বিগুণ ঘনীভূত হইয়া উঠে। নৈশ প্রকৃতি চারিদিক হইতে যেন একবাক্যে বলিতে থাকে—কঙ্ক নাই; হেমন্তের বায়ু কাণের কাছ দিয়া হাহাকার করিয়া বহিয়া যায়—কঙ্ক নাই, ভাটিয়াল নদী হাহাকারে কাঁদিয়া ছুটিয়া যায়; সেই অবিরত কুলুধ্বনি লীলার কর্ণে ধ্বনিত হইতে থাকে—কঙ্ক নাই। বৃক্ষপত্র ঝর ঝর করিয়া পড়িতে থাকে, প্রতি পত্রের পতন শব্দ লীলার কানে কানে বলিয়া যায়—কঙ্ক নাই, আবার—

"শুইলে সোয়াস্থি নাই নিদ্রা নাহি আইসে।
ঘুমাইলে স্বপন দেখে কঙ্কজলে ভাসে॥"

এইরূপে আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। হেমন্তের প্রভাতে সহসা একদিন মাধব আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। লীলা এতকাল আর কাহাকে ও কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পায় নাই। কাহারও নিকট হইতে হতভাগিনী আর যে তাহার নিজের হিতজনক উত্তর পাইবে সে আশা স্বপ্নেও করে নাই। লীলা সহসা মাধবকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না কিন্তু মাধবের ভাব দেখিয়া লীলার মনে হইল, তাহার এবারকার অন্বেষণও বৃথা হইয়াছে, নতুবা নিশ্চয় কঙ্ক মাধবের সঙ্গে আসিত। মাধবের চক্ষু মুখ বিশুষ্ক, জিজ্ঞাসা না করিলেও যেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহাকে অযাচিত নৈরাশ্যের বার্ত্তা বলিয়া দিতেছে।

প্রশ্ন করিতে হইল না। মাধব আপনা হইতে তাহার বিফল চেষ্টার সংবাদ প্রদান করিল—

শুন শুন বইন গো লীলা বলি যে তোমারে।
কত চেষ্টা করিয়া না পাইলাম কঙ্কধরে॥
কি দিব উত্তর আমি গুরুর চরণে।
দীর্ঘকাল কাটাইনু বৃথা অন্বেষণে"॥

আশার আকাশে নবঘন সন্দর্শনে এতকাল লীলা সলিল প্রাপ্তির আশাই করিতেছিল, অকস্মাৎ সেই বজ্রগর্ভ মেঘ হইতে নৈরাশ্যের অশনি সম্পাতে অভাগিনীর ক্ষুদ্র হৃদয়খানি একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনের সন্দেহ ঘুচাইবার জন্য লীলা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"জনরবে কিছু শুনিয়াছ কি!" মাধব বলিল—

"জনরব এইমাত্র লোক মুখে শুনি,
জলেতে ডুবিয়া কঙ্ক ত্যজিয়াছে প্রাণী"।

মাধব ইহাও বলিল যে কঙ্ক সঙ্গীগণসহ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্বেষণে যাইতেছিল, পথিমধ্যে ঝড় তুফানে নৌকা ডুবি হইয়া এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, সঙ্গীগণের মধ্যে অনেকে তাহাকে তরঙ্গের কোলে মৃতপ্রায় ভাসিয়া যাইতে দেখিয়াছে, এই নিদারুণ ঘটনা গত বর্ষার দরিয়ায় ঘটিয়াছে, সে আজ তিন মাস।

"বিদায় হইয়া কঙ্ক আমাদের স্থানে।
সংসার ত্যজিয়া যায় গৌর অন্বেষণে॥
আষাইঢ়া পাগল নদী খরধারা বয়।
অকস্মাৎ কালো মেঘ গগনে উদয়॥
ঝড় তোফানেতে ডুবে সাধুর তরণী।
জলেতে ডুবিয়া কঙ্ক ত্যজিছে পরাণী॥

চারিদিক হইতে নৈরাশ্যের এইরূপ প্রবল ঘাত প্রতিঘাত তদোপরি এই নিদারুণ সংবাদ—হৃদয়ত পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে—সে ভগ্ন হাড় আর কত সহ্য করিতে পারে।

"আর কত কাল সয়রে বন্ধু আর কত কাল সয়।
তোমার বিচ্ছেদ জ্বালায় তনু দগ্ধ হয়॥"

অভাগিনী আর সহ্য করিতে পারিল না। হেমন্ত যায় শীত আসে, এমন সময় একদিন লীলা অঞ্চল পাতিয়া শুইল, সেই শয্যা তাহার শেষ শয্যা।

তাহার পর একদিন হেমন্তের শেষ অপরাহ্নে পল্লীধুম ও কুয়াসা ঢাকা আকাশতলে আঁকা-বাঁকা গ্রাম্যপথ অতিক্রম করিয়া বিচিত্র সহ কঙ্ক আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া কি দেখিলেন? সব নীরব! সেত নহে মুনির আশ্রম, সেত নহে সাধনার সিদ্ধ তপোবন। সে যে মহাশ্মশান, প্রেত পিশাচের আবাস ভূমি। কোথায় তাহারা, প্রভাতে যাহাদের পবিত্র বেদগানে আকাশ মুখরিত হইত? কোথায় তাহার সেই সঙ্গীগণ? কোথায় সেই সর্ব্বশাস্ত্রের জলধিস্বরূপ দ্রোণ তুল্য তেজস্বী চিরারাধ্য গুরুদেব, জ্ঞান গরিমা-গাম্ভির্য্যের সমুন্নত ধবলগিরি, আর কোথায় সেই মহাগিরি নিঃসৃতা সেই নগেন্দ্র সম্ভবা প্রেমভক্তি ও মাধুর্য্যের ত্রিধারা স্বরূপিনী স্বপ্ন সঙ্গিনী মানস প্রতিমা। প্রেমের পবিত্র গঙ্গা, ভক্তির মন্দাকিনী, স্নেহের অলকানন্দা। দেব পূজায় উৎসর্গীকৃত কোথায় সেই পবিত্র পুষ্পের ডালি। লীলা, লীলা—বুঝি লীলা নাই, থাকিত যদি এই দীর্ঘকাল পর নিশ্চয় তাহার এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া হাওয়ার মত ছুটিয়া আসিত।

স্মৃতি! যে দিকেই নয়ন যায় সেই দিকেই কেবল মধুময় স্মৃতি। খাঁচা পড়িয়া আছে, পাখী নাই; ঘর আছে, কিন্তু গৃহবাসী নাই; শূন্য সিংহাসন পড়িয়া আছে, রাজা নাই; মালতী গাছ শুকাইয়া গিয়াছে, বকুল বজ্রাহত পথিকের মত শুষ্ক, মল্লিকার চিহ্ন মাত্রও নাই, তাহার স্থান ঝোপজঙ্গলে ভরা, দেবতার মন্দির যেন পিশাচের আভাস ভূমি হইয়াছে। একস্থানে লীলার পুষ্প বৃক্ষে জল সেচনীর ক্ষুদ্র কলসীটী পড়িয়া রহিয়াছে, যে প্রাঙ্গণে সিন্দুরটুকু পড়িলে তুলিয়া লওয়া যাইত, আজ তাহাতে মানুষ প্রবেশ করিতে ভয় পায়। মালঞ্চের বেড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, জ্যোৎস্না প্রফুল্ল চাঁদের বাগান কাল মেঘে ঢাকা পড়িয়াছে। সে সঙ্গীত নাই, সে কলহাস্য নাই, সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই; সে কৃষ্ণও নাই, সে বৃন্দাবনও নাই; চন্দ্র তারাহীন আকাশের মত, উষাহীন প্রভাতের মত, প্রাণশূন্য দেহের মত, দীপশূন্য গৃহের মত, কেবলি অন্ধকার, কেবলি নীরব নির্জ্জন নিশীথ শ্মশান।

চারি দিকে লীলার মধুমাখা স্মৃতি হইতে কঙ্ক সজল নেত্র দুটী ফিরাইয়া লইয়া দেব মন্দির পানে তাকাইলেন। নাই তথায় সায়াহ্নের আরতিগান, নাই তথায় কাসর ঘণ্টার উল্লাস ধ্বনী, নাই তথায় শিষ্যগণের শান্ত নির্ম্মল সাম সঙ্গীত। যে পাষাণ শীলার উপরে বসিয়া যোগেন্দ্র পুরুষ তুল্য গর্গ ধ্যান মগ্ন হইতেন, আজ তাহা গুল্মাচ্ছাদিত। দেব মন্দিরের দ্বার যেন বহুকাল হইতে রুদ্ধ, বহুকাল হইতে এ গৃহে মানুষ যায় নাই. এ অন্ধকারে দীপ জ্বলে নাই; নাই তথায় পুজার ফুল, নাই তথায় ধুপ ধুনা, নাই তথায় পুজার দীপ, নাই তথায় মন্ত্র সাধক পুরোহিত, নাই তথায় শালগ্রাম শীলা। এত নহে দেবমন্দির, এত নহে ভক্তির পবিত্র পীটস্থান, এ যে শোকের শ্মশানে স্মৃতির দেউল!

অকস্মাৎ নৈশনীরবতা ভঙ্গ করিয়া কাহার হাহাকার

ধ্বনী আসিয়া কর্ণে প্রবেশ করিল। কোন হতভাগা হরিশ্চন্দ্র আজিকার এই নিশীথ শ্মশানে প্রাণের পুত্তলিকে চিতানলে ডালি দিতে যাইতেছে রে? আকাশে তারার ঝিকিমিকি; কালো মেঘ ছুটাছুটি করিতেছে। মেঘের কোলে নীরবে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, অল্প অল্প ঝাপটা বাতাস বহিতেছে। নদ নদী হাহাকারে বহিয়া যাইতেছে। আবার সেই কণ্ঠস্বর। আবার সেই হাহাকার ধ্বনি। আকাশের মেঘ কাঁদিয়া উঠিল। সঞ্চারমান বায়ু স্তব্ধীভূত হইয়া উঠিল। চন্দ্র তারা মেঘে ঢাকা পড়িল, পশু পক্ষী, নীরব হইল। আকাশ নীরব নিথর, বৃক্ষ পত্র মর্ম্মর শূন্য, প্রকৃতি সাড়া হীন। আবার সেই কণ্ঠস্বর, সেই হাহাকার ধ্বনি। এ কণ্ঠস্বর কাহার? চিরপরিচিতের ন্যায় হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে আসিয়া হানা দিল। কঙ্কের প্রাণ উড়িয়া গেল। দুর্গম পথ প্রাণপণে অতিক্রম করিয়া, সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া, উল্কাপিণ্ডের মত কঙ্ক শশ্মান অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন।

যাইয়া কি দেখিলেন--দেখিলেন শুষ্ক ইন্ধন সজ্জিত চিতা, তদোপরি তাহার শৈশবের বিনা সুতায় গাঁথা মালতীর হার, শৈশব সঙ্গিনী মানস প্রতিমা শায়িতা। মেঘের উপর যেন অস্তমিত প্রায় চাঁদ ঘুমাইতেছে।

বহুদিন গত হইল লীলার নিকট হইতে বিদায় হইয়া রজনীর শেষভাগে কঙ্ক একদিন যে অদ্ভুতস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা সফল হইল। সেই প্রেত পিশাচের তাণ্ডব নর্ত্তণ মুখরিত মহাশশ্মান, সেই সজ্জিত চিতা, আর সেই শায়িতা মানস প্রতিমা।

দূর হইতে কঙ্ক দেখিলেন সজ্জিত চিতায় প্রাণাধিকা দুহিতাকে শায়িত করিয়া প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ড হস্তে শৃঙ্খল ছিন্ন উন্মাদের ন্যায় গর্গ হাহাকার রবে চিতা প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তাহার করুণ হাহাকার রব মেঘ বায়ু ভেদ করিয়া আকাশ বাসী দেবতাগণকে পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে। মিমিঝিমি দুই একটী নক্ষত্র যেন তাহার করুণ বিলাপে অধির হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মেঘের আবরণে মুখ ঢাকিতেছে। আত্মহারা তটিনী উচ্ছসিত হৃদয়ে বেলা অতিক্রম করিয়া চিতার কাছে ছুটিয়া আসিতেছে। ঝাউবনের হাহাকার ধ্বনি, শশ্মানবাসীগণের আর্ত্তনাদ শুনিতে শুনিতে কঙ্ক যাইয়া চিতার কাছে দাঁড়াইলেন। প্রজ্জ্বলিত আলোকে গর্গ বিদ্যুৎ ঝলকের মত কঙ্ককে দেখিবা মাত্র চীৎকার করিয়া বজ্রাঘাত চূর্ণ গিরির ন্যায় ভূতলে পড়িয়া মূৰ্চ্ছিত হইলেন। অনেকক্ষণ পর যখন তাহার চৈতন্য হইল, তখনি আবার উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া লীলার প্রাণ শূন্য দেহ জড়াইয়া ধরিলেন।

এই স্থানে গর্গের করুণ বিলাপে পাষাণও গলিয়া গিয়াছে।

"উঠ উঠ মাগো কত নিদ্রা যাও।
আমি অভাগায় ডাকি আঁখি মেলে চাও॥
আসিয়াছে প্রাণের ভাই তোমার লাগিয়া।
নিদ্রা ত্যজি উঠ তুমি দেখ চক্ষু চাইয়া॥
অভাগায় ছাড়িয়া মাগো কোথা যাও চলি।
একবার চাহি চক্ষু দেখ আঁখি মেলি॥
ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কেবা মোরে দিবে অন্ন পাণি।
বিউনী বাতাসে কেবা জুড়াইবে প্রাণী॥
কারে লইয়া দিব রে আমি দেবের আরতি।
কে মোর আন্ধাইর ঘরে জ্বালাইবে বাতি॥
কে তুলিবে পূজার ফুল ভরিয়া না ডালা।
কি করিয়া শূন্য ঘরে রহিব একেলা॥
পড়িয়া রহিল তোমার হীরামন শাড়ী॥
পড়িয়া রহিল তোমার জলের গাগরী॥
পড়িয়া রহিল আমার মনের যত আশা।
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া লইলে নদীর কূলে বাসা॥
শূন্য গৃহে আর নাহি যাইব একেলা।
আজি হতে সাঙ্গ মোর সংসারের খেলা॥

* * * *

কে মোর মরণ কালে বসিবে শিয়রে।
কাহারে লইয়া আমি রব শূন্য ঘরে॥
আর একবার মাগো চাও মেলি আঁখি।
নয়ন ভরিয়া তোমায় জন্ম শোধ দেখি॥
হায় কঙ্ক এত কাল কোথায় তুমি ছিলে।
তোমায় ডাকিয়াছে লীলা মরণের কালে॥"

এই অসহ্য শোকাবেগে মর্ম্মাহত কবি এই স্থানে অতি

অল্প কথায় পালা সঙ্গীত শেষ করিয়া শ্রোতাগণের নিকট হইতে বিদায় মাগিয়াছেন।

তাহার পরই আমরা দেখিতে পাই গর্গ এইখানে প্রাণসমা দুহিতাকে চিতানলে সমর্পণ পূর্ব্বক কঙ্ক সহ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের শান্ত শীতল চরণ উদ্দেশ্যে নীলাচল যাত্রা করিলেন।

"অনলে তাপিত হৃদি করিতে শীতল।
কঙ্কের সহিত মুনি যায় নীলাচল॥
সঙ্গে চলে অনুগত শিষ্য পঞ্চজন।
সংসার তেয়াগি গেলা জন্মের মতন॥

সেই যাত্রা তাহাদের অগস্ত্য যাত্রা। ইহার পর আর তাহারা ময়মনসিংহে ফিরেন নাই। গর্গের পাণ্ডিত্য, গর্গের জীবনী ময়মনসিংহবাসীর পক্ষে এক চির প্রচলিত প্রবাদের মত হইয়া রহিয়াছে। ঋষিপতিম মহাপুরুষের জ্ঞানরশ্মি বিভাসিত অগ্নিসম তেজোবন্ত প্রতিভার জ্বলন্ত মূর্ত্তি যেন ভাস্করাচার্য্য ফিডিয়াসের খোদিত গ্রীক দেবতার মূর্ত্তির ন্যায় ময়মনসিংহবাসীর মনে আজও অঙ্কিত রহিয়াছে। হায় হতভাগ্য ময়মনসিংহ, গর্গের সমতুল্য আর্ত্তের সহায় সাম্যমতের উপাসক তেজস্বী দয়ালু স্বভাব মহাপুরুষ কি পুনঃ তোমার জলাভূমিতে জন্মগ্রহণ করিবে?

কঙ্কের এই অপূর্ব্ব জীবন উপাখ্যানের প্রধান উপকরণ লীলার বারমাসী, এই লীলার বারমাসী সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। আমরা সংক্ষেপে এই বারমাসী সম্বন্ধে কিছু বলিয়া কঙ্কের জীবন আখ্যায়িকা শেষ করিব।

বোধ হয় কঙ্কের পরবর্ত্তী কোনও নিরক্ষর পল্লীকবি এই গীতি কবিতার সৃষ্টিকর্ত্তা। রাগিনী আদ্যন্ত ভাটিয়াল, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই মধুর গীতিকবিতাও ময়মনসিংহের অন্যান্য বারমাসী ও গীতিকবিতার ন্যায় কালধর্ম্মে আপন রচয়িতাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ভনিতায় কবির নাম দৃষ্ট হয় না, আশ্চর্য্যের বিষয় যিনি এমন একটী অপূর্ব্ব গীতিকাব্যের স্রষ্টা তিনি কাব্যের কোনও স্থানে আপন পরিচয়ের কিছুমাত্র আভাস দেন নাই। তিনি ময়মনসিংহের ভাষাভাণ্ডারে যে বিপুল দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা ময়মনসিংহের এক অমূল্য এবং অভিনব সম্পত্তি। কিন্তু হায়! সেই নীরব দানে দাতার হস্তচিহ্নটী পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু যিনি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা হউন তিনি স্বভাব কবি। এই একটী মাত্র সঙ্গীত দ্বারা তিনি তদানিন্তন ময়মনসিংহবাসীর উপরে প্রভুত্বের আসন স্থাপন করিয়াছিলেন। তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কত হস্তলিখিত মূল্যবান গ্রন্থ কালকীটের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আজও তাহার সেই রচিত সঙ্গীতমালা আবাল বৃদ্ধ বনিতার কণ্ঠে গাথা রহিয়াছে। মার কাছে মেয়ে, পিতার নিকট ছেলে শিখিয়া লইতেছে; মাঠে মাঠে রাখাল বালকগণ আজও ধেনু চড়াইতে যাইয়া লীলার বারমাসী গাহিয়া ক্লান্তি অপনোদন করে। বর্ষার ভরা নদীর উপর পালভরা নৌকার মাঝি মাল্লাগণ আজও সেই ভাটিয়াল রাগিণীতে লীলার বারমাসী গাহিয়া বহু দিনের অতীত জীবনস্মৃতি মনের মধ্যে জাগাইয়া দেয় মনে হয় কেহ যেন একটী চিরপরিচিত মধুমাখা সঙ্গীত হারমোনিয়ম দ্বারা ধীরে ধীরে সা রে গা মা করিয়া বাজাইয়া নিতেছে। লীলার বারমাসী নিশিথ স্বপ্নতুল্য অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয়।

কিন্তু কাব্যাংশে এই সঙ্গীতটী যতই সুমধুর হউক না কেন ঐতিহাসিক হিসাবে আমরা তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত হইতে পারিতেছি না। লীলার বারমাসীর কবি গাহিয়াছেন—

"আইস আইস প্রাণের বন্ধুরে বইস আমার কাছে।
দেখিব তোমার মুখে কত মধু আছে॥
তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হই লতা।
বেইরা রাখব যুগল চরণ ছাইড়া যাইবা কোথা॥
তোমারে শুইতে দিবরে বন্ধু অঞ্চল বিছানা।
মুখেতে তুলিয়া তোমার দিব সাচীপান॥
গলেতে গাঁথিয়া রে দিব মালতীর মালা।
ঝাড়িয়া পুঁছিয়া দিব তোমার গায়ের ধুলা॥
তুমিরে ভমরা বন্ধু আমি বনের ফুল।
তোমার লাইগা রে বন্ধু ছাড়লাম জাতিকুল।
ধেনু বৎস লইয়া তুমি যাওরে বাথানে।
বন্দের লাইগা থাকি চাইয়া পথপানে॥
পথ নাহি দেখি বন্ধুরে ঝুরে আঁখি জল।
পাগলিনী হইয়া ফিরি তিলেক না দেখিলে॥

নয়নের কাজল রে বন্ধু আরে বন্ধু তুমি গলার মালা।
একাকিনী ঘরে কান্দে অভাগিনী লীলা॥

একস্থানে লীলা কঙ্ককে ধেনু চড়াইতে যাইতে মানা করিতেছে---

"না যাইও না যাইও বন্ধুরে আরে বন্ধু চড়াইতে ধেনু।
আতপে শুকাইয়া গেছেরে বন্ধু তোমার সোনার তনু॥
আইস আইস বন্ধুরে খাওরে বাটার পান,
তালের পাঙ্খায় বাতাস করি জুড়াক রে পরাণ॥
আহা রে প্রাণের বন্ধু তুমি ছিলে কৈ।
তোমার লাইগা ছিকায় তোলা গামছা বান্ধা দৈ॥
গামছা বান্ধা দৈ রে বন্ধু শালিধানের চিড়া।
তোমারে খাওয়াইব বন্ধু সামনে থাক্যা খারা॥

* * *

উল্লিখিত পদের প্রত্যেক চরণে লীলা কঙ্ককে 'বঁধু' 'বন্ধু' ইত্যাদি সম্বোধন করিয়াছে। চণ্ডীদাসের রাধার ন্যায় মুগ্ধা লীলা কত রকমে কত যত্নে আপন বধুয়ার মন সন্তুষ্ট করিতে যাইতেছে, লীলা তাহার প্রিয়কে নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিয়া খাওয়াইবে, তালের পাখায় বাতাস করিবে, মুখে পান তুলিয়া দিবে, রোদের বেলা ধেনু চড়াইতে যাইতে দিবে না ইত্যাদি। ভাবের বর্ণনায় স্থানে স্থানে চণ্ডীদাসকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে, বাহুল্যভয়ে আমরা লীলার বারমাসীর সমস্ত অংশ তুলিয়া দেখাইতে পারিলাম না।

এক স্থানে দেখিতে পাই—

"লীলা যায় ফুল তুলিতে কঙ্ক যায় পাছে।
কত ফুল ফুটীয়াছে মালতীর গাছে॥
কোমরে আঞ্চল বান্ধা হাতে লয়ে ডালা,
পুষ্প তুলিবারে কন্যা যায় ভোরের বেলা।
মালাটি গাঁথিল কন্যা বাছা বাছা ফুলে।
আদরে পড়াইয়া দিল প্রাণ প্রিয় গলে॥
কঙ্ক বলে প্রাণ প্রিয়া আইস মম কাছে।
তোমার মুখেতে জানি কত মধু আছে॥
পুষ্পবনে দুই জনে করে কোলাকুলি।
ভ্রমর ভ্রমরা যেন পুষ্পবনে কেলি॥"

বারমাসীর অনেক স্থলেই আমরা দেখিতে পাই, কবি লীলাকে সরলা পবিত্র হৃদয়া ধর্মশীলা দেবদ্বিজে ভক্তি পরায়ণা বলিয়া তাহার যশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহাপুরুষ গর্গের যোগ্যা দুহিতা লীলাকে তীর্থ সলিলের সঙ্গে উপমা দিয়াছেন। সেই লীলা দেবতার জন্য পুষ্প তুলিতে গিয়াছে। এই স্থানে কবি উল্লিখিত শ্লোক কয়েকটি দ্বারা পাঠকের মনে যে চিত্রটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে অতি বড় নির্ব্বোধের মনেও ঘৃণার উদয় হয়। তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিতেও ইচ্ছা হয় না। এই স্থানে দেখিতে পাই লীলা ধর্ম্মশীলা পবিত্র হৃদয়া নহে, পরন্তু জ্ঞান হীনা পাপীয়সী কুলকলঙ্কিনী, শত দুঃখে দুঃখিনী হইলেও লীলার প্রতি পাঠকের প্রাণে একটুকুও সহানুভূতি আসে না। অন্ততঃ তাহার জন্য একবার আহা বলিতেও ইচ্ছা হয় না। তবে লীলার জন্য এত দুঃখ কেন? লীলার দুঃখে পাষাণই বা গলে কেন? আকাশের মেঘই বা কাঁদিয়া বর্ষে কেন? বৃক্ষের পত্রই বা ঝড়ে কেন? নিরয় গামীর নরক বাসইত শ্রেয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার দেখিতে পাই রাম উল্টা বুঝিয়াছেন। লীলার নির্ম্মল চরিত্রের উপর অযথা দোষারূপ করিতেছে দেখিয়া, সেই বিরুদ্ধ বাদীর প্রতি কবি তীব্র ভাষায় গালি দিয়াছেন। লীলার কলঙ্ক কথার বিরুদ্ধে কবি নিজেই তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছেন—

* * * *

"সন্ধ্যামন্ত্র নাহি জানে বেদাচার হীন।
দুরন্ত দুর্জ্জন যারা সমাজেতে ঘৃণ॥
মদ্য মাংস খায় সদা পাষণ্ড আচার।
জন্মিয়া ব্রাহ্মণকুলে যত কুলাঙ্গার॥
মিথ্যা বদনাম তারা দিল রটাইয়া।
কলঙ্কী হইয়াছে লীলা কুল ভাঙ্গাইয়া॥
একেত কুমারী কন্যা অতি শুদ্ধমতী।
কলঙ্ক রটাইল তা'র যত দুষ্টমতী॥"

পুষ্পবনের এই কলঙ্কচিত্র কবি যদি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তবে এ কথা কেন! ব্যভিচারিনীর আবার সতীত্বের প্রশংসা কেন? মিথ্যা বদনাম করিয়াছে বলিয়া গ্রামবাসীর দোষ কেন? কবি ত নিজেই সেই কলঙ্ক কথা ব্যক্ত করিয়াছেন; নিন্দার সঙ্গে প্রসংশা, কলঙ্কের সঙ্গে যশ, সতীত্বের সঙ্গে ব্যভিচার একাসনে স্থান পাইতে পারে

না। তবে একই সময়ে একই জনের চরিত্র চিত্রণে কবি এরূপ অসামঞ্জস্য ভাব কেন ফুটাইয়া তুলিলেন ?

লীলার বিলাপ লাচারীর আর একস্থানে দেখিতে পাই, মাধব যখন কঙ্কের সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিল, এবং কঙ্ক জলে ডুবিয়া মরিয়াছে বলিয়া জনরব কথা প্রকাশ করিল তখন লীলা বলিতেছে—

"সোদর সাক্ষাৎ বেশি, তাহতে অধিক বাসি
হেন ভাই জলেতে ডুবিল।
কি মোর কর্ম্মের লেখা আর না হইল দেখা
বিধি মোরে নিদারুণ হইল।

আরও একস্থানে আছে——

*　　*　　*　　*

প্রাণের দোসর ভাই, তা'হতে সুহৃদ নাই
হেন ভাই জলে ডুইবা মরে।
মরিবার কালে হায়, চখে না দেখিনু তায়,
এহি শেল রহিল অন্তরে।

আরও একস্থলে দেখিতেছি লীলা আপন নীরবচ্ছিন্ন দুঃখের কথা আপন মনে বলিতেছে—

"অকূলে ডুবিল নাও, শিশুকালে মৈল মাও
কত দুঃখে পাল্যা তুলে বাপে,
হেন বাপ বৈরী হইল কারে দোষ দিব বল
কপাল পুরিল ব্রহ্ম শাপে,
মনে চিত্তে নাহি জানি, লোকে বলে কলঙ্কিনী,
এত ছিল কর্ম্মে নাহি জানি
দিবস আন্ধাইর ঘোর চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী মোর
আর কারে সাক্ষী করি আমি !

সরল হৃদয়া পুণ্যশীলা লীলা নিজের মনের ভিতর খুজিয়া পাপের লেশ মাত্র দেখিতে পাইতেছে না। মনের মর্ম্মন্তুদ দুঃখে বিধাতার চক্ষুস্বরূপ চন্দ্র সূর্য্যকে সাক্ষী করিতেছে। যে পাপী, যে আপনার পাপের কথা সম্পূর্ণ জানে, মনে মনে সে কখনও ধর্ম্ম সাক্ষী করে না। যদি করে তাহা প্রকাশ্য মানব সমাজে নিজকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করার জন্য।

এইরূপ আর একস্থলে অনুতপ্ত গর্গ নিজ অপরিণাম দর্শিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে বলিতেছেন—

না জানিয়া না শুনিয়া করিলাম কর্ম্ম।
আজি হইতে আমারে ছলিল শাস্ত্র ধর্ম্ম॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম পণ্ড গেল ইহপরকাল।
আপনার পায়ে মারি আপনি কুড়াল॥
সরলা সুশীলা কন্যা পাপ নাহি জানে।
হানিছি কাঠারি ঘা তাহার পরাণে॥
অভিসন্ধি করিয়াছি মারিতে তাহায়।
কি কব পাপের কথা কইতে না জোয়ায়॥
দেবের সমান যার অন্তর সরল।
হেন পুত্রে বধিবারে দেই হ-াহল॥
আশ্রমে গো হত্যা হইল আমার কারণ।
অগ্নিতে পশিয়া আমি ত্যজিব জীবন॥

মূলগ্রন্থ কঙ্কের বিদ্যাসুন্দরেও এইরূপ প্রেমপিরীতির প্রস্রবণ মোটেই নাই, বরং দেখা যায় কঙ্ক তদীয় গ্রন্থে লীলাকে দেবী বলিয়া পুনঃ পুনঃ সম্বোধন করিয়াছেন। বন্দনাগীতিতে লীলাকে মাতা ও ভগিনীর আসনে স্থান দিয়াছেন, "বিরিঞ্চি তনয়া সেই স্বাহাস্বরূপিনী, স্নেহের ভগিনী মোর ভক্তির জননী!" কঙ্কের নয়নে লীলা দেবী তুল্যা পবিত্রা। কঙ্ক যে কখন লীলার পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। তিনি তাহাকে বিরিঞ্চি তনয়া স্বাহার ন্যায় পবিত্র চক্ষে দেখিতেন।

এরূপ প্রতিকূল ভাব লীলার বারমাসীতে স্থান পাইল কিরূপে ? এ কথার উত্তর এই যে, লীলার বারমাসী একজন কবির রচিত বলিয়া মনে হয় না। কেবল চরিত্র চিত্রণে নহে ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও এই কথাটী বিশেষরূপে উপলব্ধি হইতে পারে। নারায়ণদেব, দ্বীজ বংশী ও চন্দ্রাবতী প্রভৃতি কবিগণের রচনা একত্র হইয়া পদ্মাপুরাণের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তিন কিম্বা ততোধিক কবির রচনা ক্রমে ক্রমে এক সঙ্গে মিশিয়া লীলার বারমাসীও এইরূপ খিচুরীতে পরিণত হইয়াছে, গায়কগণও শ্রোতার মন যোগাইবার নিমিত্ত বিভিন্নভাব একত্র করিয়া আসর গান করিয়াছেন। এবং কবিগণও শ্রোতার মন রাখা ভাবগুলি সঙ্গীতাকারে গাঁথিয়া লইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় নিয়ত পরমুখাপেক্ষী

কবিগণের রচিত সঙ্গীতে এরূপ বিরুদ্ধভাব স্থান পাইবারই কথা।

দ্বিতীয় কারণ—কবিগণের অস্বাভাবিক কল্পনায় যথেচ্ছ চরিত্র চিত্রনে রঙ্গবেরঙ্গের আতিশয্যে স্বাভাবিকতা হারাইয়া অনেকস্থলে মূল ঘটনা এই ভাবে বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছে। এইরূপ দুর্লভ ঐতিহাসিক উপকরণ লইয়া তদানিন্তন কবিগণ কেন যে এমন ছেলেখেলা খেলাইয়াছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে তাহা পাওয়া বড় দুষ্কর হইবে না। একেত আমরা পরাধীন জাতি। বহুবৎসরের পরাধীনতায় আত্মমান ভুলিয়া গিয়াছি, আপন জাতিয় ইতিহাসের মর্য্যাদা বুঝিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। বাঙ্গালীর জীবন তখন কল্পনায় পর্য্যাবসিত। কবির কাব্য সাময়িক দর্পণ স্বরূপ, তাহাতে তদানিন্তন সাময়িক চিত্র সকল প্রতিবিম্বিত হয়। তদানিন্তন প্রত্যেক কবির রচনায় দেখা যায় বাঙ্গালী সিংহল বিজয়ী বীরের বংশধর বলিয়া আপন জাতিয় গৌরব ভুলিয়া ইতিহাসকে তুচ্ছ করিয়া প্রেমের স্রোতে গা ঢালিয়া-দিয়াছে, বাঙ্গালীর ইতিবৃত্ত তখন স্বপ্নপুরীর কাল্পনিক রূপ-কথায় পর্য্যবসিত। নায়ক নায়িকার একটু সারা পাইলেই তাহা বৈধ হউক আর অবৈধ হউক কবি ইতিহাসের মর্য্যাদা ভুলিয়া বাস্তব ঘটনাকে কল্পনার তরঙ্গে ভাসাইয়া এক অভি-নব প্রেমগীতির সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাতে আদিরস ঢেউ খেলাইয়া যাইতেছে, সে তরঙ্গে ইতিহাস টিকিয়া থাকিতে পারে সাধ্য কি? এইরূপ কল্পনার খেলাও আবার ইতি-হাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, অন্যত দূরের কথা। এইরূপ কল্পনার বিষম আবর্ত্তনে পড়িয়া আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মময় জীবন ব্রজযুবতীগণের প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে, লেখারগুণে জগতের একজন শ্রেষ্ট মহাপুরুষ যিনি কুরুক্ষেত্রের প্রধান নায়ক ধর্ম্মরাজ্যের সংস্থাপন কর্ত্তা, তিনিও যুবতীর চরণ তলে লুটা-ইয়া মানভঞ্জন জন্য রমনীর কৃপাপ্রার্থী; যে শির একদিন ভারত বন্দিত মহাজনগণের অর্ঘ্যে ভূষিত হইয়াছিল, সে শিরও কবি কল্পনায় যুবতীর চরণ তলে ধুল্যাবলুণ্ঠীত। বাঙ্গালী তখন প্রেমকাব্য, প্রেমগীতি লইয়া ব্যস্ত, ইতিহাসের মর্য্যাদা রাখে কে? এবম্বিধ সভাসদের হাতে পড়িয়া, বৃদ্ধ সেন রাজা যে তাহার জন্মভূমি শত্রুকরে অর্পণ করিয়া খিড়কির দ্বার পার হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

লীলার বারমাসীর অবস্থাও তাহাই হইয়াছে। কঙ্ক ও গর্গ উভয়ই তখন এতদঞ্চলের স্বনাম খ্যাত শ্রেষ্ট ব্যক্তি। কবিগণ তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিয়া এই অভিনব প্রেম-গীতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এমনও হইতে পারে বিরুদ্ধবাদী দলের প্রচারিত কঙ্ক ও লীলার অমূলক কলঙ্কর জনশ্রুতি কবিগণ তাহা সালঙ্কারে ব্যক্ত করিয়াছেন। শুধু কঙ্ক ও লীলার কাহিনী নহে, পল্লীগ্রামের অনেক সঙ্গীত ছড়াও বারমাসী, এইরূপে কলঙ্কিত অনেক বাস্তব ঘটনাও কল্পনার আতিশয্যে আপন ঐতিহাসিক সত্যটুকু হারাইয়া বসিয়াছে।

এই সকল বারমাসী বা গীতিকবিতা দ্বারা পল্লীকবিগণ যেমন একদিকে ভাষাকে নানা রত্নে ভূষিত ও নিত্য নব সঞ্চিত পুষ্পদামে সুরভিত করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি কল্পনার আতিশয্যে প্রকৃত ইতিহাসকে গোপন করিয়া এক অতিরঞ্জিত অভিনব মূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে সাহিত্যের ঐতিহাসিক শাখা অনেকটা খর্ব্ব হইয়া পড়ি-য়াছে। সাহিত্যের এক স্তর অন্য স্তরকে কোথাও বা সম্পূর্ণরূপে কোথাও বা আংশিকরূপে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কাব্য ও ইতিহাস দুই পৃথক বস্তু। ইতিহাস প্রকৃত ঘটনা, কাব্য কবির কল্পনা। আমাদের বিশ্বাস কোথাও প্রকৃত ঐতিহাসিক উপাখ্যান লইয়া এইরূপ কল্পনার খেলা খেলা-ইলে তাহাতে ফল এইরূপ বিকৃত হবারই সম্ভাবনা। নচেৎ এই সমস্ত বারমাসী বা পল্লী সঙ্গীত হইতেও আমরা অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বেরসন্ধান পাইতাম।

লীলার শেষ দশা সম্বন্ধেও আমরা দেখিতে পাই কবিগণ স্ব স্ব কল্পনাক্রমেই হউক, অথবা দেশকালপাত্র ভেদে শ্রোতাগণের মন রক্ষার্থেই হউক, বিভিন্ন পথের পথিক হইয়াছেন। এই সমস্ত সঙ্গীত রচনা করিয়া তদানিন্তন কবিগণ আসর গান গহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। এমতাবস্থায় তাহাদিগের দেশকালপাত্রানুসারে পরমুখা-পেক্ষী হইয়া সঙ্গীত রচনা করাটা বিচিত্র নহে। এতদঞ্চলে আজও এরূপ আসর গায়ক কীর্ত্তনিয়ার দল (যদিও সে স্রোতে এক্ষণে ভাটিয়াল পড়িয়াছে) দেখা যায়। তাহারা লোকের বাড়ীতে আজও এইরূপ বারমাসী ইত্যাদি গাহিয়া দুপয়সা রোজগার করিয়া থাকে। অবশ্য সেই সব গায়কের সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই।

উদরান্নের সঙ্গে। তাহারাও এইরূপ শ্রোতাগণের ফরমায়েসী নানারূপ ছড়া ও রঙ্গ বেরঙ্গের গল্প গানে সময় কাটাইয়া দেয়, আসলের সঙ্গে সম্বন্ধ খুব অল্প।

লীলার বারমাসীর প্রথমোক্ত কবি লীলার যে স্বাভাবিক মরণ চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে আমরা পাঠক বর্গকে দেখাইয়াছি। দ্বিতিয় কবি আখ্যায়িকার প্রায় শেষ পর্যান্ত তাঁহার সহচররূপে একই পথে আসিয়া সহসা পাশ কাটিয়া ভিন্ন পথে চলিয়া গিয়াছেন। তাহাতে আমরা লীলার এই ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা দেখিতে পাই। আমরা এক্ষণে দ্বিতীয় কবির সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

অনুসন্ধানকারী বিচিত্র মাধবের নিকট হইতে বারবার নৈরাশ্যপূর্ণ বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া, জনশ্রুতি মূলে ও মাধবের মুখে, কঙ্কের শেষ কথা শুনিতে পাইয়া হতভাগিনী লীলা আর স্থির থাকিতে পারে নাই। হ্যামলেটের ওফেলিয়ার মত তখন হইতে দেখিতে পাই লীলা অপ্রকৃতিস্থা--উন্মাদিনী। লীলা কারও সঙ্গে কথা বলে না, ডাকিলে সাড়া দেয় না, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না, আপন মনে চলিয়া যায়; উপরে আকাশ, পদতলে বিশ্ব পৃথিবী, চারিদিকে বৃক্ষলতা শোভিত বন উপবন, কোনও দিকে তাহার দৃষ্টি নাই।

যখন মাধব আসিয়া কঙ্কের মৃত্যু সম্বন্ধীয় জনরব লীলার নিকট প্রকাশ করিল, তখনও লীলা কিছু বলিল না। সে যে স্থানে যে ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, বুকের উপর হাত দুটী দিয়া, অতিদূর আকাশের পানে চাহিয়া, নিবাত নিষ্কম্প নিশীথশ্মশানের প্রায়—নির্ব্বাপিত দীপ শিখাটীর মত ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে লীলার চক্ষের জল শুকাইয়া গিয়াছে। সেই ভাবে চাহিয়া চাহিয়া সন্ধ্যা হইল, নিবাত গগনে তারা ফুটিল, চাঁদ উঠিল, অভাগিনী তখনও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া।

ক্রমে রজনী গভীর হইল। নৈশ প্রকৃতি নীরব নিথর; দুই একটী তারা গগনের গায় ছুটাছুটি করিতেছিল, দুই একটী উল্কাপিণ্ড দূর আকাশ হইতে পৃথিবীর পানে ছুটিয়া আসিতে না আসিতে জ্বলিয়া নিবিয়া পড়িতেছিল; তখন সহসা লীলা সাগরগামিনী তটিনীর ন্যায়—শৃঙ্খল বিহীনা উন্মাদিনীর ন্যায় নদীতীরাভিমুখে ছুটিল।

সুপ্তজগত। নদীর নীথর জলে তরী সকল ক্লান্ত-পক্ষ বিহঙ্গের মত স্থির ভাবে ভাসিতেছে। মাঝিমাল্লাগণ এইমাত্র বাউলগান গাহিয়া সুপ্তির ক্রোড়ে মাথা পাতিয়াছে। তাহাদের সুমধুর কণ্ঠস্বর ও খঞ্জনীর ধ্বনি এখন নৈশ সমীরণে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তীরস্থিত তরু সকল বিহঙ্গ কাকলী শূন্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ সকল নীরবে নিদ্রিত বেলা বক্ষে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

লীলা নদী তীরে দাঁড়াইয়া একবার নদীর নিথর জল রাশির পানে তাকাইল? এক দুই করিয়া ভাসমান তরী গুলির পানে চাহিল; চাহিয়া মুক্ত আকাশ ও দিগন্তের ঘন মসীবর্ণ তরুচ্ছায়া সকল প্রত্যক্ষ করিল।

এই নীরব নৈশ প্রকৃতির সঙ্গে সেই মুকবিরহিনীর চিত্রটী কবি অতি সাবধানেই অঙ্কিত করিয়াছেন। দেখিতে পাই, লীলার মুখে একটু ও শব্দ নাই। মনের দুঃখ মনেই আছে, ভাষায় প্রকাশ করিতেছে না। চক্ষু তেমনই শুষ্ক; হৃদয় তেমনই অকম্পিত। দুঃখের সেই জ্বলন্ত অগ্নিশিখা নীরব সহিষ্ণুতার প্রগাঢ় ধূম্রপুঞ্জে আচ্ছাদিত রহিয়াছে।

কবি লিখিয়াছেন—

"নদী জলে চায় লীলা আপনার মনে।
আর বার চায় লীলা আকাশের পানে॥
চাহিয়া চাহিয়া লীলা দুঃখিত অন্তরে।
চন্দ্র তারা গণে কন্যা কাইন্দা সাক্ষী করে॥
মুখে শব্দ নাহি লীলার চক্ষে নাহি জল।
দেবতার কৃপা মাগে পাতিয়া অঞ্চল॥"

লীলা নীরবে চন্দ্র তারাকে সাক্ষী করিল। নীরবে যুক্ত করে অঞ্চল পাতিয়া দেবতার নিকট শেষ কৃপা ভিক্ষা করিল। তারপর—

"আছিল হিজল গাছ নদীর কিনারে।
তার নীচে অভাগিনী যায় ধীরে ধীরে॥"

লীলা নদী তীরবর্ত্তী হিজল বৃক্ষতলে গেল। অধরোষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া যেন তীরস্থ তরুলতা সকলকে, আকাশবাসী দেবত'—চন্দ্রতারা সকলকে নীরবে চুপ করিয়া থাকিতে মিনতি জানাইল। তারপর—

"ডালে বান্ধাছিল তার যামনার লতা।
দাঁড়াইয়া দেখিছে লীলা মুখে নাহি কথা॥

দেখিয়া শুনিয়া লীলা কি কাম করিল।
শুকনা ঘামনা লতা কণ্ঠে তুলি দিল॥"

মেঘ ছুটিল, বায়ু বহিল, নিবাত নদীতে তরঙ্গ ছুটিল, নিদ্রিত মাঝিমাল্লাগণ জাগিয়া উঠিল। বাণবিদ্ধ রাক্ষসের মত মেঘ দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে নৈশ রজনী কোলাহলময়ী হইয়া উঠিল। তারা ডুবিল, চাঁদ অস্তমিত হইল; তখন সব শেষ।

তৃতীয় কোনও মিলন প্রিয়কবি। এই ব্যক্তি অতি যত্নে লীলার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। তিনি এতদূর পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু লীলার এই শোচনীয় অকাল মৃত্যু তাহার প্রাণে সহ্য হইলনা; তিনি গর্গের জ্ঞান মন্ত্রবলে মৃতা লীলাকে পুনর্জ্জিবিতা করিয়া তুলিয়াছেন এবং কঙ্কের সহধর্ম্মিণী করিয়া অতি সুন্দররূপে ঘর সংসার পাতাইয়া দিয়াছেন। ঐ ব্যক্তির ভাষা ও আধুনিক। তিনি তাহার গাতের শেষ ভাগে এতদঞ্চলের একজন সমজদার লোকের প্রসংসা গীতি গাহিয়া ধন্য হইয়াছেন। বোধ হয় কবি তদ্দারা আপদ কালে কোনরূপ উপকৃত হইয়া থাকিবেন; কিম্বা তাহারই আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া এরূপ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকিবেন।

শ্রীচন্দ্রকুমার দে।

সিন্ধু।

(১)

অম্বর অম্বুধি সনে একি পূর্ণ মহাসম্মিলন
অধঃ উৰ্দ্ধে নিবিড় চুম্বন,
গভীর উদ্গারে যেন মেঘ মন্দ্র উঠিছে উচ্ছ্বসি,
দিক্ দিগন্তরে ব্যাপ্ত কি অনন্ত নীল জলরাশি,
অম্বরের অন্তরাল হতে উঠি সূর্য্য স্বর্ণ করে
দিনান্তে মিশিছে পুনঃ দিগন্তের ওই অন্তঃপুরে।
কি উল্লাস ফুল্ল শুভ্র হাসি,
বিকাশে তরঙ্গ ভঙ্গে অবিরত শুভ্র ফেন রাশি।

(২)

অপূর্ব্ব অমৃত তরে সুরাসুরে সমুদ্র মন্থন
মনে পড়ে জল নারায়ণ!
নন্দনের পারিজাত, পূর্ণ শশী নির্ম্মল কিরণ,
বৈকুণ্ঠের অঙ্কলক্ষ্মী, ত্রিদিবের কৌস্তুভ রতন,
ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা ছিল মগ্ন অন্তরে অতল,
নীলকণ্ঠ সুশোভিত কালকূট ভীষণ গরল,
উর্ব্বশীর সৌন্দর্য্য বিভব,
ত্রিলোকের তীর্থ করি রাখিয়াছ অতীত গৌরব।

(৩)

সর্ব্বস্ব বিতরি সবে আজি সুধু লবনাম্বু রাশি,
সর্ব্বত্যাগী হে শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী!
পূর্ণ অর্ঘ্য পুষ্প পাত্র কার তরে করি ধরণীরে,
সিক্ত কর নিরন্তর হৃদয়ের ভক্তি প্লুতনীরে?
উদাত্ত ওঁঙ্কারে মাতি কত যুগযুগান্তর ধরি,
গাহিছ বন্দনা গান মুক্ত কণ্ঠে প্রাণপূর্ণ করি,
ভস্ম করি ক্ষুদ্র অহমিকা—
মহাযজ্ঞ তরে যেন জ্বাল তীব্র বাড়বাগ্নি শিখা।

(৪)

বাসুকীর ফণাসম শত উর্ম্মি করি দরশন,
মনে পড়ে অনন্ত শয়ন,
ওই বিশ্বরূপ হেরি তরঙ্গিণী আপনা পাশরি,
পর্ব্বতের মর্ম্মভেদী ধায় বেগে গৃহ পরিহরি,
উচ্ছসি হৃদয় নীর ছুটে আসে আনন্দের বাণ,
দুকূল প্লাবিয়া সিন্ধু বহে যদি প্রেমের উজান
সৃষ্টি ধারা শত কল্পনায়;
বিলোল তরঙ্গ ভঙ্গে ভেসে যায় জলবিম্ব প্রায়।

(৫)

লুব্ধ নেত্রে মুগ্ধ পান্থ দাঁড়াইয়া শূন্য সিন্ধু তটে
আঁকিতেছি চিত্র চিত্ত পটে,
ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ পূর্ণ হৃদয়ের তপ্ত অশ্রুধারা
দূর দূরান্তরে ভাসে, আমি হেথা যেন আত্মহারা।
মৃদুমন্দ সমীরণ অনন্তের বারতা বহিয়া,
স্নিগ্ধ শান্ত করি নিত্য বসুধার তপ্ত ক্লান্ত হিয়া
মুক্ত পথে আসি বলি যায়—
ওরে পান্থ চলে আয়—আয়—দিন ওই চলে যায়!

(৬)

বিধাতার আদি সৃষ্টি, অনন্তের বিরাট মুরতি,
পান্থ আজ করিছে প্রণতি !
পৃথিবীর পান্থশালা সংসারের নিত্য পরবাস,
জীবনের যাত্রা পথে চাহিনা সে আশার আশ্বাস।
আবছায়া পরপারে দেখাও কি রহস্যের খেলা,
জীবন মরণ তার কোন অঙ্ক ওই নাট্যশালা—
খুলে দাও নীল যবনিকা ;
চক্রবাল রেখা প্রান্তে ঘুচে যাক যত প্রহেলিকা।

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

কুলাঙ্গার।

(১)

আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান। সাত পুরুষেরও অধিক হইতে আমাদের বাটীতে টোল চলিয়া আসিতেছে। কত বড়লোক—সুদখোর পেটমোটা মহাজন, তৈলাক্তদেহ জমিদার, উষ্ণীষধারী ব্যাকুব রাজা আমাদের বংশের শিষ্য। পিতৃদেব পণ্ডিতপ্রবর রাসমোহন তর্কলঙ্কারের নাম কে না জানে ?

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশ কিন্তু দরিদ্র নই। কল্যাণপুরের রাজবংশের সহিত আমাদের বংশসৌভাগ্য বিশেষরূপে জড়িত। রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ পিতার মন্ত্রশিষ্য। অর্থাভাবতো নাই বরং আমরাও সঙ্গতিসম্পন্ন তালুকদার সদৃশ ; বৎসরে নানাদিক হইতে হাজার তিন চারি টাকা আয় হইয়া থাকে।

এমন গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশ এ গোঁড়ার দেশেও বিরল। সন্ধ্যা, মন্ত্র, যপ, তপ, ব্রত, পূজা, পার্ব্বণ সকল সময়ই লাগিয়া আছে। লোকের পিতৃদেবের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। তাঁহার প্রভাবে শুধু আমাদের গ্রামে কেন, পার্শ্ববর্ত্তী কয়েক গ্রামেই ব্রাহ্ম খৃষ্টানি নব মতাবলম্বীরা এ পর্য্যন্ত মাথা উঠাইতেও সাহস পায় নাই।

ঋজু, দীর্ঘবপু, উন্নতললাট, মুণ্ডিতশ্মশ্রু, গৌরকান্তি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে যিনি দেখিয়াছেন—তিনিই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, এমন পবিত্র ভাবোদ্দীপক মুর্ত্তি কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পড়ুয়ায় আমাদের টোল সকল সময়ই পূর্ণ থাকিত। এই টোলই আমাদের ভাগ্য মন্দিরের মূল ভিত্তি, তাই ইহার জন্য সর্ব্বক্ষণই বিশেষ যত্ন নেওয়া হইত।

অধিক বয়স পর্য্যন্ত সুসন্তানের মুখ দেখেন নাই বলিয়া, পিতা কাশীতে বিশ্বেশ্বরের কাছে ধর্ণা দিয়া পড়েন। দেবতা প্রসন্ন হইলেন। শুভক্ষণে (?) নয়নাভিরাম (?) আমি ধরাতলে অবতীর্ণ হইলাম। কাশীর সহিত সম্পর্কিত বলিয়া আমার নামাকরণ হইল কাশীকুমার। কিন্তু হায় ! তাঁহারা যদি জানিতেন, এই কাশীকুমার নামে তাঁহাদের পবিত্র বংশে কে জন্মগ্রহণ করিল, তাহা হইলে বোধ হয় আমার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতেন।

সে যাক্।

বংশের নিয়মানুসারে পাঁচ বৎসর বয়সেই কলাপাতায় হাত খড়ি হইল। তাহার পর যে পাঁচ বৎসর গিয়াছে, তাহার ভিতর গাছে চড়িতে, পাখীর বাসা ভাঙ্গিতে, সাঁতার কাটিতে, নারিকেল চুরি করিতে সমবয়স্ক সকলকে পরাস্ত করিয়াছি কিন্তু—লেখা পড়া ?

ওটী হয় নাই।

আমার দোষ ? তা নয়, দোষ ঐ সংস্কৃত ভাষার ও দোষ তার কন্যারূপিণী বাঙ্গালা ভাষাটার। অর্দ্ধশত অক্ষর তো আছেই, তার উপর তাদের ঘাড়ে লেজে যেখানে সেখানেই বা কত অক্ষর—য ফলা, ল ফলা, ম ফলা।

অতি কষ্টে দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়াছি, অমনি বাবা বলিলেন চাণক্যশ্লোক ও মুগ্ধবোধ মুখস্থ করাও।

সে কি সোজা ব্যাপার ? মুগ্ধবোধ তো না বাক্যরোধ ! তাহাই হইল। আমার দ্বারা এ সব হইয়া উঠিল না। দশম বৎসর যখন বয়স, তখন পিতার হাতে একদিন বিষম ভাবে প্রহারিত হইয়া—পড়া ছাড়িয়া দিলাম।

কিছুতেই নয়, পড়িব না,—পড়িব না—ও বিদঘুঁটে ভাষা আর নয়। বাবা বলিলেন, ছেলেটা বলে কি ? সাতপুরুষের টোল শেষে কি উঠিয়া যাইবে ? তাহা হইলে যে ভিটার ইটখানাও থাকিবে না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রমানন্দ তর্কবাগীশের সময় হইতেই আমাদের বংশের প্রতিপত্তি। যে কুশাসনে বসিয়া তিনি শিষ্যসমূহকে পাঠ

দিতেন এখনও প্রতিদিন ধূপধুনা ঘণ্টা সহযোগে তাহার পূজা হইয়া থাকে। আমরা ঘুম হইতে উঠিয়া সেখানেই যাইয়া প্রথম প্রণাম করিয়া আসিতাম। বাবা চীৎকার করিয়া বলিলেন, শেষে কি এ আসন এ বাড়ী হতে উঠিয়ে দিতে হবে? —আমি নিরুত্তর।

মা কত বুঝাইলেন, দিদিরাই বা কত সাধাসাধনা করিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম—যে বিদ্যার সহিত এমন প্রহার জড়িত, তাহাতে আর আমি নাই—পড়িব না।

ধরিয়া থাকিলেই কাজ হয়। বাবার স্বর ক্রমেই নরম হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে খোসামোদ আরম্ভ হইল। তার পর, বংশের একমাত্র সন্তান, ওর জন্যই তো সব, দেবতা মুখ চেয়ে দিয়েছেন তাইতো—ইত্যাদি কত কথাই শুনিতে লাগিলাম। শেষে হুকুম বাহির হইল—যা তা হলে ইংরেজীই পড়্ যেয়ে। ইংরেজীর সঙ্গেও তো সংস্কৃত পড়া চলে।

বাঁচিলাম! নন্দীগ্রামের রায়দের বাড়ীর সদর দরজার কাছে এণ্ট্রান্স স্কুল। ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম—কত ফূর্ত্তি, হাসি খেলা, মারবেল, ফুটবল, ক্রিকেট, নৌকা বেড়ান, আমি যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলাম।

বেশ দিনগুলি যাইতে লাগিল—ক্লাশে প্রথম হইয়াই প্রমোশন পাইতে লাগিলাম। এ বংশে কেহ এ পর্য্যন্ত ম্লেচ্ছভাষা পড়ে নাই। হইলে কি হয়?—রাজভাষা। দিদিরা আমার গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন।

(২)

পনর বৎসর পর্য্যন্ত জীবনটী বেশ নির্ব্বিবাদে চলিয়া গেল। ষোলতেও পদার্পন করিয়াছি, এমন সময় কোথা হইতে একটা নূতন ঢেউ আসিয়া ধাক্কা দিল।

আমাদের বাড়ীর কাছেই দীনবন্ধু বসুর বাড়ী। সাধারণ গৃহস্থ, সংসারে স্ত্রী ও কয়েকটী কন্যা, সকলেরই বিবাহ হইয়াছে বাদে বিমল। তাহার ভ্রাতষ্পুত্র নবীন আমাদের সঙ্গে একত্র পড়িত।

বিমলের বয়স বছর নয় দশ। বড় বড় কালো চোখ দুটী, ফুটফুটে হাসিভরা মুখখানি, স্কুলে যাইতে প্রায়ই দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতাম, যেন মল্লিকা ফুলটী ফুটিয়া আছে। আমাকে কাশীদা বলিয়া ডাকিত। বাবা কি বিশ্রি নামই রাখিয়াছিলেন? সে যাক্, তাকে যেন বেশ ভাল লাগিত। প্রণয়ের সূত্রপাত? উপন্যাস? কি জানি কি বলিতে পারিব না—লাগিত ভালই।

কখনও জলপানের, কখনও পেয়ারা পাড়িবার জন্য, কখনও অন্যকত কি কারণে নবীনদের বাড়ীতে কতবারই না গিয়াছি। মাঝে মাঝে পেয়ারার ভাগ বিমলকেও কি দেই নি?

এণ্ট্রান্সে কুড়িটাকার বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিলাম। পিতৃদেব মহাখুসী, লোকের কাছে বলিতে লাগিলেন—বংশ পরম্পরায় সঞ্চিত জ্ঞান, সুফল না ফলিবে কেন?

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান, মাথায় টিকি বর্ত্তমান, জেকেট আস্তিনের পিরাণ গায়, চটী পায়। কিন্তু উপায়ন্তর নাই, মেছেই থাকিতে হইল।

প্রেসিডেন্সীতে ভর্ত্তি হইলাম। কয়েক দিন মধ্যেই নানা প্রকার অশান্তি আসিয়া জুটিল। টিকি লইয়া চলা অসাধ্য হইল। প্রথম আমাকে দেখিয়া ছাত্রমহলে চাপা হাসির ভাব দেখিলাম, শেষে প্রকাশ্য ছোটখাটো ঠাট্টা তামাসা চলিতে লাগিল। মেছেই কি শান্তি, কেবলই ঠাট্টা বিদ্রূপ।

ছাড়িলাম প্রেসিডেন্সী। তখন মনে মনে ঠিক করিলাম—যদি ইংরাজীই পড়িলাম, খাঁটি ইংরাজের কাছেই পড়িব। ডাভটন কলেজে যাইয়া ভর্ত্তি নিলাম। সে দিনই বৈকালে গঙ্গার ধারে যাইয়া পকেটকাঁচির সাহায্যে টিকি কাটিয়া গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিলাম। মাথার সঙ্গে দেহ ও মন উভয়ই পাতলা বোধ হইতে লাগিল। মেড়ুয়াদের হতে প্রাপ্ত এই টিকির উপকারিতা আমি কখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। শশধর তর্কচূড়ামণি তাও একটা ইলেকট্রি-সিটির ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, তাও হায়। কেহ মানিল না। কোথায় এর উৎপত্তি? চীনের লম্বা বেণীই কি কালে ভারতে আসিয়া ক্ষুদ্র টিকিতে পরিণত হইয়াছে?

তার পরদিন, বিলাতীজুতা কিনিয়া, কোট গায়ে কলেজে উপস্থিত হইলাম। কেমন নূতন নূতন ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু তাতেও রক্ষা নাই। হুকুম শুনিলাম, এখানে পড়িতে হইলে ঠিক সাহেবী পোষাকেই আসিতে হইবে। তথাস্তু।

যখন ঝাঁপই দিয়াছ. দেখিয়া লইব ইংরেজী বিদ্যার সাগরের তলটা কত দূর।

কলেজে হেরিসের সহিত আমার বড় সৌহার্দ্দ জন্মিয়া গেল। দোঁয়াশেলা নয়, খাঁটী ইংরাজের ছেলে, ধপ্‌ধপে গায়ের রং, পোষাক পরিচ্ছদ সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কেমন সাহসী, স্ফূর্ত্তিভরা প্রাণ। সে কলেজ-বোর্ডিংএ থাকিত। আমাকেও সেখানে থাকিতে বলিতে লাগিল। বিশেষ আপত্তি ছিল না, তবে জাত যায়, এই ভয়। সে শুনিয়া বলিল, জাত আবার যাবে কেমন করে? তোমাদের কিম্ভুত কিমাকার ধর্ম্ম? এইজন্যইতো তোমরা কিছু করে উঠ্‌তে পার না। আমি তাকে প্রায়ই আমাদের প্রাচীন ভারতের গৌরবের কথা বলিতাম। সে তদুত্তরে একদিন আমার কাছে পৃথিবীর ম্যাপখানা ধরিয়া বলিল, দেখতো ইংলেণ্ড কতটুকু আর পৃথিবীর কতটা জায়গা লাল? আমাদের তুলনায় তোমরা? এই আর্য্যসভ্যতার আবার বাহাদুরী নেও, তোমাদের দুর্ব্বুদ্ধিতায় কি দেশকে তোমরা কি অবস্থায় এনেছ?

তাইতো—আমরা কি? কতকগুলি কুসংস্কারে ভরা অন্তঃসারশূন্য অপদার্থের সমিষ্টি।

কয়েকদিন পরে, ডাভটন্ বোর্ডিংএ হেরিসের পাশের ঘরে স্থান নিলাম। বাবা চটিয়া মটিয়া পত্র লিখিলেন, নানাপ্রকার ভয় দেখাইলেন, খরচ বন্ধ করিবেন ইত্যাদি। শেষে পুত্রেরই জয় হইল। এখন হইতে সাহেবি নানাবিধ অখাদ্য খানা খাইয়া সাহেব পোষাক পড়িয়া মিষ্টার চক্রবর্ট্টি রূপে পরিচিত হইতে লাগিলাম। হায়! রমানন্দ তর্কবাগীশ! তোমার বংশের কি শেষ এই ছিল!

এফ, এ, পরীক্ষার শেষে বাড়ী আসিলাম, অবশ্য দেশী পরিচ্ছদে। তাতে কাজ নাই। ভাবিলাম মেয়েদের পড়াইব। রমণীদিগের সঙ্গেইতো দেশের উন্নতি জড়িত। বৈঠকখানার পাশের ঘরে স্কুল খুলিলাম। নান্নাবাড়ার ছোট ছোট মেয়েদের জড় করিলাম। বিমলও আসিল। কেমন তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, যা বলি, কেমন সহজে শিখিয়া ফেলে?

এমন সময় নন্দীগ্রামের রাধিকাপ্রসাদ রায়ের পুত্র তারাপদ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসা উপলক্ষে চারিদিকে মহাগোলমাল বাধিয়া গেল। প্রাচীন দল পিতৃদেবকে নেতা করিয়া আসরে নামিয়া গেল। রাধিকা প্রসাদকে একঘরে করার চেষ্টা হইতে লাগিল। তারাপদের ইচ্ছা ছিল, সমাজে থাকে। বেগতিক দেখিয়া সে কলিকাতায় চলিয়া গেল। সংবাদে মহাসন্তুষ্ট হইয়া বাবা বলিলেন, কেমন জব্দ! অনাচার!

বন্ধশেষে কলিকাতায় আসিয়া আবার বি, এ ক্লাশে যোগ দিলাম আসিবার সময় বালিকাদের পুরস্কার দিয়া আসিলাম। বড় ও খুব ভাল পুরস্কারটি কে পাইল?

কয়েক দিন পরেই শুনিলাম, আমার বিবাহ। কোথায়? নিতাইগঞ্জের হরি ভট্টাচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী দিগম্বরীর সহিত। মার পত্রে জানিলাম, তারিখ পর্য্যন্ত ঠিক। ২০শে আষাঢ় বিবাহের দিন। খুব জাঁকজমকের সহিত কার্য্য সম্পন্ন হইবে, রাজা মহারাজাদের নিমন্ত্রণ হইবে, এইতো বংশের শেষ কাজ।

হেরিসকে খুলিয়া সব কথা বলিলাম। সে তো হাসিয়া কুট্‌কাট্। এত অল্প বয়সে বিবাহ। মেয়ে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলাম, কিছুই জানি না, তবে শুনিয়াছি, সুশ্রী নয়। সে বলিল, বল কি? যার সাথে সারাটী জীবন কাটাবে, তাকে না দেখেই পরের কথায় গ্রহণ করবে? কোর্টসিপ্ ইত্যাদি কিছুই নাই? কিছুই না? সব শুনিয়া সে বলিল, না, তোমাদের আর্য্য সভ্যতা আমরা বুঝি না।

নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, দিগম্বরী অর্থাৎ she who has the horizon for her garment। সে হাসিয়া উত্তর করিল, Then it must be something grand indeed! You must go in for it, Chakravarti. কথায় কথায় বিমলের কথা উঠিল। জাতের জন্য বিবাহ করা যায় না—সে বুঝিতেই পারিল না। বয়সের কথা বলিলে, বলিল wait। কিন্তু, তাকে বলিলাম wait করিতে গেলে, আর কেহ হয়তো তাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবে। হইতে চলিলও তাহাই। বাড়ীর চিঠিতে জানিলাম, কোথাকার কে সদানন্দ ঘোষের পুত্র দোজবর মহানন্দের সহিত তাহার বিবাহ ধার্য্য হইয়াছে। সেই ২০শে আষাঢ় তারিখেই।

খাওয়া দাওয়া, লেখা পড়া, কলিকাতা সহর কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। পড়া শেষ না হইলে কিছুতেই বিবাহ করিব না, লিখিয়া পাঠাইলাম। বাবা ও মা অনেক পত্রাদি লিখিলেন, লোক পাঠাইলেন, আমি অচল, অটল। বিবাহ প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া গেল। এমন ঘর নাকি পাওয়া ভবিষ্যতে দুষ্কর হইবে, চুলায় যাক্ ঘর কন্যা। বাবা বিষম রাগান্বিত হইলেন।

১৮ই আষাঢ়। বাড়ী আসিয়াছি। বিমলদের বাড়ী গেলাম। তাকে দেখিয়া মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। বছর চৌদ্দ বয়স—ব্রীড়াময়ী, আয়তলোচনা, অপরূপরূপা। পুষ্পমালিকার ন্যায় কেমন সুন্দর দেখাইতেছিল। আমাকে আসিয়া প্রণাম করিল, মুখ উঠাইতে মনে হইল চোখে একফোটা জল। সজল নয়নে মার অঞ্চল ধরিয়া চলিয়া গেল—আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী ফিরিলাম।

বৃদ্ধ দীনবন্ধু বসুকে নির্জ্জনে আনিয়া পরামর্শ দিলাম—বিবাহ প্রস্তাব ভঙ্গ করিতে। সে কথায় কানই পাতিল না। গরীব, এত কষ্টে যে একস্থানে যোগাড় হইয়াছে এই ভাগ্যি—ইত্যাদি মামুলি কথা। কে তোমায় গরীব হইতে বলিয়াছিল? কেই বা কায়স্থ হইতে বলিয়াছিল?

আহা! আর একটু যদি সাহসী হইতাম। কেন বিমলকে লইয়া পলাইলাম না? লোকে মন্দ বলিত, সমাজে কুৎসা রটিত—কিন্তু তাতে আমার কি হইত? আমার প্রাণের ক্ষুধাতো মিটিত। আর এমন সমাজ—যার পদে পদে এমন অন্যায় বাঁধন—তাতে আমার কি প্রয়োজন? এই সাহসের অভাবেই তো কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

(৩)

আরও দুই বৎসর গিয়াছে। এম্-এ, পড়িতেছি। এখন দস্তুর মত সাহেব সাজিয়াছি। তবে দেশীভাব কি একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি? তাও কি সম্ভব? মানুষ যে, সে কি তা পারে? বিশেষতঃ, এমন দেশে জন্মগ্রহণ করে?

রাধানগর ষ্টেসন হইতে আমাদের বাড়ী আসিতে বিমলদের বাড়ী পড়ে। কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিতেছি। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা—ফুরফুরে বাতাস। দেখিলাম, সন্ধ্যাপ্রদীপ হস্তে সে দণ্ডায়মানা। কি সুন্দর! ক্ষীণ কটী, তন্বাঙ্গী, কমলাননী—কনক-লতার ন্যায় দ্বারে শোভা পাইতেছে। এই দুই বৎসরে সে আরও কত মনোহারিণী হইয়াছে। কিন্তু তাহার দিকে চাহিতে আমার আর কি অধিকার আছে? একবার ইচ্ছা হইল ডাকিয়া দুটী কথা জিজ্ঞাসা করি কিন্তু হইল না।

কয়েক দিন পরে গ্রামে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। একজন দুজন করিয়া শেষে বেশ সংক্রামক আকার ধারণ করিল। আমি গ্রামবাসিগণকে খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে সাবধান করিতে লাগিলাম। অবশেষে একদিন প্রাতে বিষম সংবাদ পাইলাম—বিমলের স্বামীর পীড়া। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, বৃদ্ধ দীনবন্ধু বৎসরেক হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছে।

আমি আমার হোমিওপ্যাথিকের বাক্স লইয়া দৌড়াইলাম। যেখানে যে ডাক্তার পাইলাম, একত্র করিলাম। সারাদিন ধরিয়া কত চেষ্টা হইল, কত ঔষধ খাওয়াইলাম, সেবা শুশ্রূষা করিলাম। কিছুই হইল না, সন্ধ্যার আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে মহানন্দের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

আত্মীয় স্বজন মৃতের কাছে পড়িয়া চীৎকার করিয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। আমি বিমলকে খুঁজিতেছিলাম। সারাদিন তাহাকে পার্শ্বের কক্ষে বসিয়া জল গরম, বালু গরম করিতে, অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া দিতে দেখিয়াছি, চক্ষু জলে ভরা, কিন্তু কর্ত্তব্য কার্য্যে একটুও ক্রটী নাই। তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। কোথায় গেল সে? অবশেষে, যে গৃহে মহানন্দ পীড়ার অবস্থায় শায়িত ছিল সেখানে প্রবেশ করিলাম। অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ। খালি তক্তপোষের উপর হইতে গোঁ গোঁ কিসের শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি 'বিমল' 'বিমল' বলিয়া ডাক দিতে, সেই অন্ধকারের ভিতর কে আসিয়া সবেগে আমার পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, দাদা! আমার উপায় কি হবে? উপায়? উপায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে—মৃত্যু। কি উত্তর দিব? কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

(৪)

দিন কয়েক পরে বাবাকে বলিলাম, বিমলকে কি আবার বিয়ে দেওয়া যায় না? তিনি তো শুনিয়াই অবাক, বলিস্ কি? ইংরাজী শিখে সকলকে হাসালি। তোর চা'ল চলনে এম্‌নই আমার চলা দুষ্কর হয়ে উঠ্‌ছে তার উপর আবার এ সব। পাগলামি এখন রাখো। বিধবার বিয়ে? মহাপাপ, মহাপাপ।

আমি ও নাছাড়বন্দা। বিদ্যাসাগরের কথা উঠাইলাম। তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ! ও আবার একটা পণ্ডিত! দেশটা রসাতলে দিবার চেষ্টাই করেছিল। কলিকাল, ধর্ম্ম এখন ও এক পাদ আছে, তাই বিধবা বিবাহ টিকিল না।

আমি বলিলাম, বিমলের এই তো বছর ষোল মাত্র বয়স। এর মত কচি বালিকার পক্ষে সারাটী জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা কি ভয়াবহ আর এ অবস্থা কি বিপদসঙ্কুল ও নয়?

তিনি উত্তর করিলেন, কষ্ট কি? বিধবার বিয়ে না হলে কি, জীবন যাপন করা চলে না? হিন্দু বিধবা, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করুক, শাস্ত্রের কথা শুনুক, সে ভাবে চলুক, দেব দ্বিজে ভক্তিমতী হোক, ভগবানে মন সমর্পণ করুক, কিসের কষ্ট?

(৫)

মাস পাঁচেক পর আমার মাতৃদেবী, ভাগ্যবতী, আমাকে শোক সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। বাবা বড়ই যেন বিপদে পড়িলেন। কাকা কালাচাঁদ বিদ্যাবাগীশের মুখে কয়েকদিন পরে শুনিতে পাইলাম, বিবাহের আবার যোগাড় হইতেছে। এত বড় সংসার কে দেখে? শাস্ত্রে এমন স্থলে দ্বিতীয় দার গ্রহণের বিধি আছে। তাই? বটে? বাবার বয়স তখন পঞ্চাশ পার হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞা করিলাম, এবার একটু সাহসী হইব, আর ভুল করিব না। সংবাদ পাইলাম, রামপুরের নীলরতন রায়ের কন্যার সহিত তলে তলে সম্বন্ধ ঠিক হইয়াছে। নীলরতনের সহিত দেখা করিয়া বলিলাম, দেখ ঠাকুর! যদি এ সকল গোলমালে যাও, মাথা ভাঙ্গিয়া দিব। কিন্তু লোকটা শোনে না, টাকার লোভ। উপায়ান্তর না দেখিয়া একদিবস রাত্রিতে কয়েক ঘা বসাইতে হইল, বাপরে বাপরে করিয়া সে আমার পায় পড়িয়া বলিল, আর না যথেষ্ট হয়েছে। ইহার পর আরও গোটা দুই সম্বন্ধ উত্থাপন হইল, ভাঙ্গিয়া দিলাম। নীলরতনের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, বাবাও জানিতেন, শুনিলাম ভয়ানক চটিয়াছেন, কিন্তু হইলে কি হয়? বিবাহ প্রস্তাবাদি বন্ধ হইল। ষোল বছরের অসাহায্য বালিকার বেলা ব্রহ্মচর্য্য, আর পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধের বেলা কিছু নয়। ইহাই ধর্ম্ম? এখন হইতে বাবার মতামতের দিকে না চাহিয়া, বিমলের বিবাহ দিতে লাগিয়া গেলাম। নানা জায়গায় অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু হতভাগ্য দেশ। বিধবার আবার বিবাহ? কোথায়ও পাত্র জুটিল না।

এম, এ পাশের শেষে বাড়ী ফিরিয়াছি। বিমল এখন সপ্তদশ বর্ষের যুবতী, চিত্তহারিণী, অনুপমা। কিন্তু এমন হতভাগিনীই বা কোথায়?

অবশেষে একজন যুবক পাইলাম, সে বিবাহ করিতে রাজী হইল কিন্তু কি জানি কার কথায় শেষে সেও সরিয়া পড়িল।

ইহার কয়েক দিন পরে এক ভয়ানক সংবাদ পাইলাম। আমার ও আমার বাল্যবন্ধু বিনোদের সহিত বিমলের নাম জড়িত হইয়া গ্রামে একটা বিশ্রি জনরব উঠিয়াছে। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম, রাগে শরীর গড় গড় করিতে লাগিল। এই সমাজ?

একি? কি শুনিতেছি? বিমল ও তাহার মাতাকে একঘরে করিয়া গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। অবশ্য বাবাই দলপতি। কথা বিমলদের কাণেও পৌছিয়াছে। বৈকালে তাদের বাড়ীতে গেলাম। বিমলের মা কাঁদিয়া কাটিয়া বলিল, বাবা! এ কি বিপদে ফেল্লে? কোথায় যাই আমরা এখন?

আমি মনে মনে কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম। ম্লানমুখী অশ্রুময়ী বিমলের কাছে যাইয়া বলিলাম, তুমি নির্দ্দোষ, তোমার ভয় কি? এখন যাহা বলিব, সাহসে ভর করিয়া করিতে পারিবে কি? আরও অনেক কথা বলিলাম, সে বিশেষ উত্তর করিতে পারিল না।

পরদিন অপরাহ্নে, আমাদের বৈঠকখানায় সভা বসিয়াছে। গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদিতে গৃহ পরিপূর্ণ। পড়ুয়াগণ চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে ছাড়িয়া বিনোদের নামই উত্থাপিত হইয়াছে। সে নিরীহ শান্ত বেচারী গোলমাল দেখিয়া গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছে।

আমি সকল সংবাদই রাখিতেছিলাম। সভা যখন জমিয়া উঠিয়াছে এবং বিমল ও তাহার মাতাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতগণ নস্য নাকে দিতে দিতে উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় আমি ধীর পদবিক্ষেপে সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, আপনারা শুনুন, আমি বিমলকুমারীকে বিবাহ করিব।

হঠাৎ বজ্রপাত হইলেও বুঝি লোক সকল এমন স্তম্ভিত চমকিত হইতনা। রাম, রাম করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উঠিয়া পড়িলেন। কুলাঙ্গার, বের হ আমার বাড়ী হতে, বলিতে বলিতে সরোষে গর্জ্জন করিতে পিতৃদেব আমার দিকে দৌড়াইয়া আসিলেন। মহা গোলমালের ভিতর সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

(৬)

বংশের কুলাঙ্গার আমি কলিকাতায় আসিয়া বিমলকে বিবাহ করিয়াছি। বন্ধুবর হেরিস বলিল, এইতো মানুষের মত কাজ।

লাহোরে প্রফেসারী করিতেছি। বিমলের জন্য শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া দিয়াছি। বৎসরেক কাল চলিয়া গিয়াছে।

সংবাদ পাইলাম, বাবার বিষম পীড়া। তিনি আর আমাকে ক্ষমা করেন নাই। বাঁকিপুর আসিয়াই টেলীগ্রাম পাইলাম, তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে।

বিমলকে লইয়া বাড়ী আসিলাম। পিতৃদেবের বিষয় ভাবিয়া প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। দেব! আমি আপনার মতানুযায়ী চলিতে পারিলাম না; আপনার অভিসম্পাত মস্তকে বহন করিয়াই আমাকে আজীবন চলিতে হইবে। সেও ভাল, নিজ অন্তরাত্মার কাছে কপটাচারী হওয়া অপেক্ষা সেও শ্রেয়ঃ।

আরম্ভ যখন করিয়াছি সাহসে ভর করিয়া শেষ করিতে হইবে। পূজাপার্ব্বন বন্ধ করিয়া দিলাম; লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ গৃহ হইতে অপসৃত হইল; পুরোহিত ঠাকুর তাহার বহু যুগের তন্ত্র মন্ত্রাদি, তাহার বিল্বপত্র ও গঙ্গাজল, কোষা কোষি, কুসংস্কারের আবর্জ্জনার ঝুলি লইয়া জন্মের মত বিদায় হইলেন। টোল, অন্ধ কুসংস্কার সমূহের দুর্গ, দেশের নানা সৎকাজ ও সদুদ্দেশের প্রতিবন্ধক, উঠাইয়া দিলাম, পড়ুয়াগণ অভিসম্পাত করিতে করিতে চলিয়া গেল। সর্ব্বশেষে, রমানাথ তর্কবাগীশের আসন, কুসংস্কারের পীঠস্থান, অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। এসব করিয়া যেন আমি নিজকে মুক্ত মনে করিতে লাগিলাম।

রজনী প্রহরেক অতীত। চারিদিক জ্যোৎস্নালোকে হাসিতেছে। দোতালার বারান্দায় বিমল আমার পার্শ্বে উপবিষ্টা। বাটীতে আসার পর হইতে সে যেন কেমন ভীতিগ্রস্তা হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ, আমার কয়েক দিনের কাণ্ড কারখানায় সে কেমন ভবিষ্য অমঙ্গলের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, ভয় নাই বিমল! সাহসে ভর করিয়াই তোমায় পাইয়াছি, আজীবন সাহসে ভর করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, কিসের ভয়, কাহার ভয়? এমন সময় মনে হইল, বিভাবিমণ্ডিত কোন্ দেবীর মূর্ত্তি যেন আকাশপটে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারই দিব্য ছটা সম্মুখস্থ খাল, বিল, তৃণলতা, জলস্থল, সুদূর নদনদী, পাহাড় পর্ব্বত সকলের উপর বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহারই সন্তানগণ, বাঙ্গালার নরনারী, শত শত যুগের কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফলে ছিন্নভিন্ন, দুঃখক্লিষ্ট। আমার হৃদয়াভ্যন্তরেও সেই বিষাদম্লানা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীরই মূর্ত্তি! দেখিলাম, তাঁহার আহ্বানে এতদিন পরে তাঁহার পুত্র কন্যাগণ, নব জ্ঞানে বলীয়ান হইয়া এক সাম্যের প্রেমের ভাবে তাঁহার ক্রোড়ে মিলিত হইতেছে। ভক্তিভরে, তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। বিমল আমার দিকে লতাইয়া পড়িল। তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলাম, যাহা করিয়াছি, ভালই করিয়াছি, মিথ্যাকে লইয়া আর কতকাল থাকিব?

১৮।১৭।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত।

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত, সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সৌরভ

ষষ্ঠ বর্ষ। ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩২৪। ৩য় সংখ্যা।

অঙ্গিরাগণ।

ঋগ্বেদে পণি নামক এক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের সহিত আর্য্যদিগের অত্যন্ত অসদ্ভাব ছিল। এক্ষণে হিন্দুর নিকট ম্লেচ্ছশব্দ যে ভাব উদ্রেক করে, বৈদিক যুগে পণি শব্দ আর্য্যদিগের নিকট সেইরূপ ভাব উদ্রেক করিত। বেদে তাহাদের যে সকল বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয়, পণিজাতি বাণিজ্য প্রধান ও কুসীদজীবি ছিল। [১] ইহাও মনে হয়, তাহারা পশু পালন করিত [২]। পণিগণ আর্য্যদিগের যজ্ঞে বিশ্বাস করিত না এবং তাহারা দাতাও ছিলনা। [৩] পণিগণ আর্য্যদিগের গাভী হরণ করিয়া লইয়া যাইত। অঙ্গিরাদিগের নাম বেদে পণিহৃত গাভী উদ্ধারের জন্যই প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে যে পণিগণ অতি প্রাচীনকালে সূর্য্য, উষা, গো এবং অর্ক হরণ করিয়াছিল। এই সকলকে উহাদের দলপতি বল পর্ব্বতে লুক্কাইত রাখে [৪]। ইন্দ্র তাঁহার সরমা নামক কুক্কুরীকে উহাদের সন্ধানে প্রেরণ করেন। সরমাই প্রথম বলের ঐ পর্ব্বত আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয়।

[১] ইন্দ্রঃ। বিশ্বান্। বেকনাটান্। অহঃদৃশঃ। উত। ক্রত্বা। পণীন্। অভি। ঋগ্বেদ, ৮।৫৫।১০

অর্থ :—ইন্দ্র কুসীদজীবি, দিবস গণনাকারী, পণিদিগকে কার্য্যদ্বারা অভিভব কর।

[বেকনাটান্ অর্থে এক গুণ দিলে যে দ্বিগুণ আদায় করে। অহঃদৃশঃ অর্থে যে দিনে দিবার কড়ার থাকে সেই দিন যে গণনা করে।]

[২] ত্রিধা। হিতং। পণিভিঃ। গুহ্যমানং
গবি। দেবাসঃ। ঘৃতং। অনু। অবিন্দন্।
ইন্দ্রঃ। একং। সূর্য্যঃ। একং। জজান
বেনাৎ। একং। স্বধয়া। নিঃ। ততক্ষুঃ॥ ৪।৫৮।৪

অর্থ :— পণিদিগের দ্বারা গাভীতে তিনপ্রকার (দ্রব্য) গোপনে নিহিত হইয়াছিল। দেবতাগণ ঘৃতকে লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র একটী, সূর্য্য একটী উৎপন্ন করিয়াছিলেন। বেন হইতে একটী স্বধা দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

[৩] ন রেবতা পণিনা সখ্য মিন্দ্রো সুন্বতা সুতপাঃ সংগৃণীতে। ৪।২৫।৭।

অর্থ :—অভিষুত সোমপানকারী ইন্দ্র সোম দ্বারা যে যজ্ঞ না করে [এরূপ] ধনবান্ পাণির সহিত সখ্য উচ্চারণ করেন না।

পণেশ্চিৎ বিম্রদা মনঃ। ৬।৫৩।৩

অর্থ :—পণির মনও (দানার্থ) মৃদুকর।

(৪) ইন্দ্রঃ। বলং। রক্ষিতারং। দুঘানাং
করেণ ইব। বি। চকর্ত্ত। রবেণ।
স্বে দাঞ্জিভিঃ। আশিরং। ইচ্ছমানঃ
অরোদয়ৎ। পণিং। আ। গাঃ।
অমুষ্ণাৎ॥ ১০।৬৭।৬

অর্থ :—ইন্দ্র দুগ্ধবতী গাভীদিগের রক্ষক বলকে, যেমন হস্ত দ্বারা কর্ত্তন করে সেইরূপ শব্দের দ্বারা কর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্বেদচিহ্নযুক্ত দিগের সহিত আশির ইচ্ছা করতঃ পণিকে কাঁদাইয়াছিলেন (ও) গো সকল কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

এইজন্য সরমা তাহার পুত্রের জন্য অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিল। [১]

ইন্দ্র ও বৃহস্পতি অঙ্গিরাদিগের দলপতি হইয়া বলের পর্ব্বত আক্রমণ করেন। অঙ্গিরাদিগের দুইটী সম্প্রদায় ছিল। এক সম্প্রদায়ের নাম নবগ্ব। ইঁহারা সংখ্যায় ৭ জন এবং বৃহস্পতি তাঁহাদের দলপতি ছিলেন।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের নাম দশগ্ব; ইঁহারা সংখ্যায় দশজন; ইন্দ্র ইঁহাদের দলপতি হইয়া যুদ্ধ যাত্রা করেন। (১) এই

কিং, ইচ্ছন্তী, সরমা, প্র, ইদং, আনট্। ১০।১০৮।১
ইন্দ্রস্য, দূতীঃ, ইষিতা, চরামি
মহঃ, ইচ্ছন্তী, পণয়ঃ, নিধীন্, বঃ। ১০।১০৮।২
অয়ং, নিধিঃ, সরমে, অদ্রিবুধ্নঃ
গোভিঃ, অশ্বেভিঃ, বসুভিঃ, নিঋষ্টঃ। ১০।১০৮।৭
আ, ইহা, গমন্, ঋষয়ঃ, সোমাশিতাঃ
অযাস্যঃ, অঙ্গিরসঃ, নবগ্বাঃ।
তে, এতং, উর্বং, বি, ভজন্ত, গোনাং
অথ, এতৎ, বচঃ, পণয়ঃ, বমন্, ইৎ। ১০।১০৮।৮

অর্থ:—সরমা কি প্রার্থনা করিয়া এখানে আসিয়াছ? ১

হে পণিগণ! (আমি) ইন্দ্রের দূতী; (তাঁহার) দ্বারা প্রেরিতা হইয়া তোমাদিগের মহৎ গুপ্তধন সকল ইচ্ছা করিয়া ভ্রমণ করিতেছি। [২]

হে সরমে! পর্ব্বতে রক্ষিত হইয়া এই ধন লুকায়িত (আছে); গো, অশ্ব, (ও) বহুমূল্য ধন সকলের দ্বারা পরিপূর্ণ। (৭)

সোমপানে মত্ত অযাস্য (অর্থাৎ স্তোত্র স্বামী বৃহস্পতি) ও নবগ্ব অঙ্গিরা ঋষিগণ এখানে আসিবেন। তাঁহারা এই বহু পরিমাণ গাভী ভাগ করিয়া লইবেন। হে পণিগণ! তখন তোমাদের এই সকল বাক্য উগ্‌রাইতে হইবে। (৮)

(১) বিদৎ। যদি। সরমা। রুগ্নং। অদ্রেঃ
মহি। পাথঃ। পূর্ব্যং। সধ্র্যক্। কঃ।
অগ্রং। নয়ৎ। সুপদী। অক্ষরাণাং
অচ্ছ। রবং। প্রথমা। জানতী। গাৎ॥ ৩।৩১।৬

অর্থ:—সরমা যখন অদ্রির ভগ্নদ্বার লাভ করিল, পূর্ব্বকালীন মহৎ অন্ন শীঘ্র (লাভ) করিয়াছিল। অক্ষয়দিগের (অর্থাৎ দেবতাদিগের) সুন্দর পদযুক্তা (গাভীদিগের অবরোধ স্থান) প্রথম জাত্রী, শব্দের অভিমুখে গমন করিয়াছিল", অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছিল।

ইন্দ্রস্য। অঙ্গিরসাং। চ। ইষ্টৌ
বিদৎ। সরমা। তনয়ায়। ধাসিং। ১।৭২।৩

অর্থ:—ইন্দ্রের ও অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে সরমা নিজ পুত্রের নিমিত্ত অন্ন পাইয়াছিল।

[২] সখা। হ। যত্র। সখিভিঃ। নবগ্বৈঃ
অভিজ্ঞু। আ। সত্বভিঃ। গাঃ। অনুগ্মন্।
সত্যং। তৎ। ইন্দ্রঃ। দশভিঃ। দশগ্বৈঃ
সূর্য্যং। বিবেদ। তমসি। ক্ষিয়ন্তং॥

৩।৩৯।৫

অর্থ:—যথায় সখা [অর্থাৎ বৃহস্পতি] নবগ্ব সখা সকলের সহিত নতজানু হইয়া গো সকলের অনুগমন করিয়াছিলেন; দশজন দশগ্বদিগের সহিত ইন্দ্র অন্ধকারে অবস্থিত সেই সূর্য্যকে সত্যই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সঃ। সুস্তুভা। সঃ। স্তুভা। সপ্ত। বিপ্রৈঃ
স্বরেণ। অদ্রিং। স্বর্যঃ। নবগ্বৈঃ।
সরণ্যুভিঃ। ফলিগং। ইন্দ্র। শক্র।
বলং। রবেণ। দরয়। দশগ্বৈঃ॥

১।৬২।৪

অর্থ:—সেই সুন্দর স্বামী [বৃহস্পতি] সুন্দর স্তোত্রের দ্বারা, তিনি স্তব দ্বারা ও "স্বরের দ্বারা" সাতজন নবগ্ব বিপ্রের সহিত অদ্রিকে [এবং] হে শক্র ইন্দ্র! [তুমি] দশগ্বদিগের সহিত, সরণ্যুদিগের সহিত যুক্ত ফলিগ বলকে শব্দের দ্বারা বিদারণ করিয়াছে। [বৃহস্পতি যে অঙ্গিরা বংশীয় এবং অদ্রিভেদকারী তাহা নিম্নোদ্ধৃত ঋকে বর্ণিত হইয়াছে।

যঃ। অদ্রিভিৎ। প্রথমজাঃ। ঋতাবা
বৃহস্পতিঃ। আঙ্গিরসঃ। হবিষ্মান্। ৬।৭৩।১

অর্থ:—যে বৃহস্পতি অদ্রিভেদকারী, অঙ্গিরা বংশে প্রথম জাত, ঋতাবা [ও] হবিষ্মান্ (অর্থাৎ যজ্ঞভাগী)।

তং। উঁ। নঃ। পূর্ব্বে। পিতরঃ। নবগ্বাঃ
সপ্ত। বিপ্রাসঃ। অভি। বাজয়ন্তঃ। ৬।২২।২

অর্থ:—আমাদিগের প্রাচীন পিতা ৭জন বিপ্র নবগ্বগণ তাঁহাকে [ইন্দ্রকে] যজ্ঞ প্রদান করিয়াছিলেন।]

যুদ্ধ যাত্রাকে গবিষ্টি নাম দেওয়া হইত। (২) গো লাভের সঙ্গেং বৃহস্পতি উষা, সূর্য্য ও অর্ক প্রাপ্ত হন বর্ণিত হইয়াছে। অনেক ঋকে বৃহস্পতিকে অদ্রিভিৎ ও গো উদ্ধারকারী বলা হইয়াছে। কোনং ঋকে বর্ণিত হইয়াছে যে বৃহস্পতি বলের গো দেহ হইতে উষা, সূর্য্য প্রভৃতি বাহির করিয়াছেন। (৩)

এই সকল বর্ণনা হইতে অনুমান হয় যে অদ্রি ও বল একই। পণিগণ পর্ব্বতকে তাহাদের প্রধান দেবতা মনে করিত এবং বল নাম দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

বৃহস্পতি যখন পণিদিগের নিকট হইতে সূর্য্য, উষা, গো এবং অর্ক উদ্ধার করেন, তখন হইতে রাত্রি ও দিবার বিভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন। অঙ্গিরাগণ সূর্য্যকে দিবসে তখন হইতে উঠাইয়া দিতেছেন এবং রাত্রে অন্ধকার স্থাপন করিয়াছেন। সেই সময়ে অঙ্গিরাগণই দিব্যলোককে চন্দ্র ও নক্ষত্র দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। [৪] অঙ্গিরাগণই প্রথম মাস সকলের দ্বারা সংবৎসর কাল নির্দ্দেশ করেন।

ঋগ্বেদের কোনং স্থানে দেখা যায় নবগ্বগণ দশ মাস যজ্ঞ করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আবার অন্যস্থলে বর্ণিত হইয়াছে যে তাঁহারা ঋত দ্বারা মাসসকলকে সংযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। (৫) ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়—অঙ্গিরাগণ দশ মাসে সাংবৎসরিক যজ্ঞ শেষ করিতেন। আমরা অনুমান করি বৃহস্পতি প্রমুখ নবগ্বগণই গো লাভ করিয়াছিলেন এবং দশমাস ব্যাপী সংবৎসরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তৎপরে ইন্দ্র প্রমুখ দশগ্বদিগের কালে দ্বাদশ মাসে বৎসর নির্দ্দিষ্ট হয়। তাঁহারাই প্রথম সূর্য্য দ্বারা ঋতুর জ্ঞান লাভ করেন। সেইজন্য সূর্য্যকে অনেক স্থলে দশজন বা সুদানবগণ উঠাইয়া দেন বর্ণিত

---

[২] ত্বং । কুৎসেন। অভি। শুষ্ণং। ইন্দ্র
অশুষং। যুধ্য। কুযবং। গবিষ্টৌ
দশ। প্রপিত্বে। অধ। সূর্যস্য
মুষায়ঃ। চক্রং। অবিবেঃ। রপাংসি॥ ৬।৩১।৩

অর্থ:—হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসের সহিত যুক্ত হইয়া গবিষ্টিতে [অর্থাৎ গোজয়ের যুদ্ধে] প্রবল শুষ্ণ কুযব সহিতযুদ্ধ করিয়াছ; এবং দশজনের [অর্থাৎ দশগ্বগণের] যুদ্ধে সূর্য্যের চক্রকে হরণ করিয়া পাপকারীদিগকে হনন করিয়াছ। [সায়ন এই ঋকের অন্যরূপ অর্থ করেন; তিনি 'দশ' শব্দ 'অদশঃ' মনে করিয়া হিংসিতবান্ অর্থ করেন।]

[৩] সঃ। উষাং। অবিন্দৎ। সঃ। স্বঃ। সঃ।
অগ্নিং। সঃ। অর্কেণ। বি। ববাধে। তমাংসি।
বৃহস্পতিঃ। গোবপুষঃ। বলস্য
নিঃ। মজ্জানং। ন। পর্বণঃ। জভার॥ ১০।৬৮।৯

অর্থ:—তিনি (অর্থাৎ বৃহস্পতি) উষাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি স্বকে তিনি অগ্নিকে (প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)। তিনি অর্কের দ্বারা অন্ধকার সকল দূর করিয়াছিলেন। বলের গো দেহ হইতে, অস্থি হইতে মজ্জার মত (ইহাদিগকে) বৃহস্পতি বাহির করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিঃ। ভিনৎ। অদ্রিং। বিদৎ। গাঃ।
সং। উস্রিয়াভিঃ। বাবশন্ত। নরঃ॥ ১।৬২।৩

অর্থ:—বৃহস্পতি অদ্রি ভঙ্গ করিয়া গোলাভ করিয়াছিলেন; নেতাগণ গো সকলের সহিত হর্ষ সূচক শব্দ করিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিঃ। উষসং। সূর্যং। গাং। অর্কং
বিবেদ। স্তনয়নইব। দ্যৌঃ॥ ১০।৬৭।৫

অর্থ:—বৃহস্পতি দিব্য লোকের গর্জ্জনের মত গর্জ্জন করিয়া উষা, সূর্য্য, গো, এবং অর্ক প্রাপ্ত হইলেন।

৪। হিমাইব। পর্ণা। মুষিতা। বনানি
বৃহস্পতিনা। অকৃপয়ৎ। বলঃ। গাঃ।
অনমুকৃত্যং। অপুনঃ। চকার
যাৎ। সূর্য্যমাসা। মিথঃ। উৎচরাতঃ॥ ১০।৬৮।১০

অর্থ:—হিম দ্বারা যেমন বৃক্ষ সকল পত্র শূন্য হয়, সেইরূপ বৃহস্পতি দ্বারা বল গো শূন্য হইয়াছিল। অনমুকরণীয় কার্য্যকে পুনর্ব্বার না করিতে হয় (এরূপ ভাবে) করিয়াছিলেন। যাহা হইতে সূর্য্য চন্দ্রমা দুইটী ঊর্দ্ধে বিচরণ করিতেছে।

অভি। শ্যাবং। ন। কৃশনেভিঃ। অশ্বং
নক্ষত্রেভিঃ। পিতরঃ। দ্যাং। অপিংশন্।
রাত্র্যাং। তমঃ। অদধুঃ। জ্যোতিঃ। অহন্
বৃহস্পতিঃ। ভিনৎ। অদ্রিং। বিদৎ। গাঃ॥ ১০।৬৮।১১

হইয়াছে। (১) অঙ্গিরাগণ প্রথম যজ্ঞের ধাম মনন করেন বর্ণিত হইয়াছে। (২) এই যজ্ঞ, সত্র যজ্ঞ অর্থাৎ সাংবৎসরিক যজ্ঞ বলিয়াই অনুমান করি।

অঙ্গিরাদিগের মধ্যে কুকুরের সমাদর ছিল। অঙ্গিরা বংশীয় অজীগর্ত্ত ঋষির পুত্রদিগের নাম ছিল শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ ও শুনঃলাঙ্গুল। (৩) দেখা যাইতেছে কুকুরের বিভিন্ন অঙ্গের নামে পুত্রদিগের নাম করণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শুনঃশেপ ঋগ্বেদের একজন শ্রেষ্ঠ সূক্তদ্রষ্টা ঋষি। ইন্দ্রের দুইটী কুকুর ছিল—একটী সরমা, অপর তাহার পুত্র শ্বা। সেইরূপ যমেরও দুইটী কুকুর ছিল। (৪) ইহারা সরমার বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইজন্য সারমেয় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঋগ্বেদীয় এই সকল কিম্বদন্তী হইতে আমরা অনুমান করি বৃহস্পতি প্রমুখ নবগ্ব অঙ্গিরাদিগের কালে গো গৃহ-পালিত হইয়াছিল। গো রক্ষা কার্য্যে তাঁহারা কুকুর রক্ষা করিতেন। সেই জন্য কুকুর তাঁহাদের সমাজে এত উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা গো দুগ্ধ হইতে দধি ও ঘৃত বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই কালেই ঊষা পূজার্হা বলিয়া গৃহীতা হইয়াছিলেন। মাস সকল মিলিত হইয়া যে বৎসররূপ কাল উৎপন্ন হয়, তাহা অঙ্গিরাদিগের কালেই আবিষ্কৃত হইয়াছে অনুমান করি। তবে নবগ্বদিগের কালে যে সংবৎসর দশ মাস ব্যাপী ছিল ইহার যুক্তি পূর্ব্বে প্রদর্শন করা গিয়াছে।

অর্থঃ—যেমন শ্যামবর্ণ অশ্বকে স্বুবর্ণ আভরণে (অলঙ্কৃত করে), পিতাগণ (অর্থাৎ অঙ্গিরাগণ) দিব্য লোককে নক্ষত্র দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি (যখন) অদ্রিভেদ করিয়া গো সকল প্রাপ্ত হন, (পিতাগণ) রাত্রিতে অন্ধকার (ও) দিবসে জ্যোতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

অপ। জ্যোতিষা। তমঃ। অন্তরিক্ষাৎ
উদ্‌ঃ। শীপালং ইব। বাতঃ। আজৎ।
বৃহস্পতিঃ। অনুমৃশ্য। বলস্য। অভ্রং ইব
বাতঃ। আ। চক্রে। আ। গাঃ॥ ১০।৬৮।৫

অর্থঃ—যেমন বায়ু জল হইতে শৈবাল অপসারিত করে, বৃহস্পতি (সেইরূপ) জ্যোতি দ্বারা অন্তরিক্ষ হইতে অন্ধকার (অপসারিত করিয়াছিলেন)। যেমন বায়ু মেঘ ছড়াইয়া দেয়, (বৃহস্পতি) বলের গাভী সকলকে অবগত হইয়া তদ্রূপ করিয়াছিলেন।

(৫) ধিয়ং। বঃ। অপ্সু। দধিষে। স্বঃ সাং
যয়া। অতরন্। দশ। মাসঃ। নবগ্বাঃ। ৫।৪৫।১১

অর্থঃ—(হে দেবগণ!) তোমাদিগের স্বর্গাধীকে জলের মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলে। যে (ধী) দ্বারা নবগ্বগণ দশমাস উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

নি। গব্যতা। মনসা। সেদুঃ। অর্কৈঃ
কৃণ্বানাসঃ। অমৃতত্বায়। গাতুম্।
ইদং। চিৎ। নু। সদনং। ভূরি। এষাং
যেন। মাসান্। অসিসাসন্। ঋতেন॥ ৩।৩১।৯

অর্থঃ—গো লাভ করিবার ইচ্ছা যুক্ত মনের দ্বারা, স্তোত্র সকল দ্বারা, দেবত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত পথকারিগণ (যজ্ঞে) আসীন হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের (অর্থাৎ অঙ্গিরা-দিগের) এই সদন [অর্থাৎ যজ্ঞ] ভূরি [ছিল;] যে ঋতের দ্বারা (তাঁহারা) মাস সকলকে একীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

(১) সনেমি। চক্রং। অজরং। বি। ববৃতে
উত্তানায়াং, দশ, যুক্তাঃ, বহন্তি। ১।১৬৪।১৪

অর্থ:—সমান নেমিযুক্ত অজর চক্র বিশেষরূপে বর্ত্তমান হইতেছেন; উদয় সময়ে দশ (জন) যুক্ত হইয়া বহন করে।

সূর্য্যং, দিবি, রোহয়ন্তঃ, সুদানবঃ
আর্য্যা, ব্রতা, বিসৃজন্তঃ, অধি, ক্ষমি॥ ১০।৬৫।১১

অর্থ:—সুদানবগণ সূর্য্যকে দিব্যলোকে আরোহণ করাইয়াছেন, পৃথিবীর উপরে আর্য্য ব্রত সকল সৃজন করিয়াছেন।

(২) ঋতং, শংসন্তং, ঋজু, দীধ্যানাঃ
দিবঃ, পুত্রাসঃ, অসুরস্য। বীরাঃ।
বিপ্রং, পদং, অঙ্গিরসঃ, দধানাঃ
যজ্ঞস্য, ধাম, প্রথমং, মনন্ত॥ ১০।৬৭।২

অর্থ:—ঋত উচ্চারণ করত, কল্যান কর্ম্মধ্যান করত, দিব্য লোকের পুত্র (ও) অসুরের বীর (বা পুত্র)

দশগ্ব অঙ্গিরাদিগের কালে ইন্দ্র সূর্য্যকে উদ্ধার করেন এবং সেই কাল হইতে দ্বাদশ মাস ব্যাপী সংবৎসরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল মনে হয়। এই সংবৎসর যজ্ঞই সত্র যজ্ঞ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই কালেরও পূর্ব্বে অগ্নিপূজা প্রচলিত হইয়াছিল মনে করি।

আঙ্গিরাগণ বেদে ঋষি নামে অভিহিত। তাঁহারা অগ্নির বংশে উৎপন্ন। [১] বৃহস্পতিদেব যে অঙ্গিরা বংশীয় তাহা দেখান গিয়াছে। তিনি বিপ্র। আমরা অনুমান করি যে অঙ্গিরাবংশীয়গণই প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন ও দেব বলিয়া গণ্য হন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতেছি বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় বংশীয়। যাহাতে নিজ বংশকে ব্রাহ্মণ বংশে পরিণত করিতে পারেন, সেইজন্য অঙ্গিরাবংশীয় অজীগর্ত্ত ঋষির পুত্র শুনঃশেপকে নিজ পুত্রদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠপদ প্রদান করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে বিশ্বামিত্র ভরতবংশীয় ছিলেন দেখিতে পাই। ঋগ্বেদেও বিশ্বামিত্রকে ভরতদিগের সেনাপতিরূপে পাই।

অঙ্গিরাগণ বিপ্রপদ (অর্থাৎ বৃহস্পতির পদ) অনুসরণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা যজ্ঞের ধাম প্রথম মনন করিয়াছিলেন।

(৩) সোহ অজীগর্ত্তং সৌযসি মৃষি মশনয়াপরীতমরণ্যু উপেয়ায় তস্যহ এয়ঃ পুত্রা আসুঃ শুনঃপুচ্ছঃ শুনঃশেপঃ শুনোলাঙ্গুল ইতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩৩।৩।১৫

অর্থ :—সুযবসের পুত্র ক্ষুধাপীড়িত অজীগর্ত্তকে দেখিতে পাইলেন। সেই অজীগর্ত্তের শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেপ ও শুনোলাঙ্গুল নামে তিন পুত্র ছিল।

৪। অতি। দ্রব। সারমেয়ৌ। শ্বানৌ
চতুঃ অক্ষৌ। শবলৌ। সাধুনা পথা।
অথ। পিতৄন্। সুবিদত্রান্। উপ। ইহি
যমেন। যে। সধমাদং। মদন্তি॥ ১০।১৪।১০

[হে অগ্নে]! চারি চক্ষু বিশিষ্ট, কর্বুরবর্ণযুক্ত, সরমার পুত্র কুকুরদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া সাধুপথ দ্বারা [মৃতকে] দ্রুত লইয়া যাও; অনন্তর সুন্দর জ্ঞানযুক্ত পিতাদিগের সমীপে গমন কর যাঁহারা যমের সহিত সোমপানে মত্ত হন।

যৌ। তে। শ্বানৌ। যম। রক্ষিতারৌ
চতুঃঅক্ষৌ। পথিরক্ষী। নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যাং। এনং। পরি। দেহি। রাজন্
স্বস্তি। চ। অস্মৈ। অনমীবং। চ। ধেহি॥১০।১৪।১১

হে যম! তোমার যে চারি চক্ষুবিশিষ্ট, দেবতাদিগের মত উজ্জ্বল পথরক্ষক দুইটী কুকুর প্রহরী [আছে], হে রাজন্! ইহাকে [অর্থাৎ মৃতকে] [রক্ষার্থ] তাহাদিগকে [অর্থাৎ কুকুরদিগকে] প্রদান কর; এবং ইহাকে মঙ্গলে ও অয়োগে স্থাপন কর।

(১) ত্বং, অগ্নে, প্রথমঃ, অঙ্গিরাঃ, ঋষিঃ
দেবঃ, দেবানাং, অভবঃ, শিবঃ, সখা।
তব, ব্রতে, কবয়ঃ, বিদ্মনা, অপসঃ
অজায়ন্ত, মরুতঃ, ভ্রাজৎ ঋষ্টয়ঃ॥ ১।৩১।১

হে অগ্নে! প্রথম অঙ্গিরা, ঋষি, দেব তুমি দেবতাদিগের শিব সখা হইয়াছ; তোমার ব্রতে [কর্ম্মে বা যজ্ঞে] কবি, জ্ঞানমণ্ডিত, দীপ্যমান আয়ুধযুক্ত মরুৎগণ জন্মিয়াছেন।

ত্বং, অগ্নে, প্রথমঃ, অঙ্গিরস্তমঃ।
কবিঃ, দেবানাং, পরি, ভূষসি, ব্রতং॥ ১।৩১।২

হে অগ্নে! তুমি প্রথম, অঙ্গিরশ্রেষ্ঠ, দেবতাদিগের কবি ব্রত অলঙ্কৃত কর।

যে, অগ্নেঃ, পরি, জজ্ঞিরে, বিরূপাসঃ, দিবঃ, পরি
নবগ্ব। নু। দশগ্ব। অঙ্গিরতমঃ। সচা। দেবেষু।
মংহতে। ১০।৬২।৬

অর্থ :—যাঁহারা অগ্নি হইতে জন্মিয়াছেন, [তাঁহারা] দেবলোকে বিবিধ রূপযুক্ত; নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; দেবতাদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দান করেন।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

সাধক রামপ্রসাদ
ও
কবি রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদী সঙ্গীতের প্রসার এদেশে যতখানি তেমন প্রসার আর কাহারো অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। শুভ্র-তুষার কিরীটী হিমাদ্রি পাদমূল হইতে বঙ্গোপসাগরের নীলোর্ম্মি-প্রদেশ পর্য্যন্ত রামপ্রসাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত। যেখানে বাঙ্গালী জাতি সেখানেই রামপ্রসাদের উপনিবেশ। আর কোনরূপে না হোক "প্রসাদী সুর" সকলেরই কাণে ঝঙ্কৃত হইয়া থাকে। অতবড় শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের বিবরণ অবগত হইবার ইচ্ছা একান্ত স্বাভাবিক।

বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম—

"জংলার মধ্যে ভাঙ্গা ঘরে, এক্‌লা গো মা থাকি পড়ে,
চম্‌কে উঠি বাঘের ডাকে।"

শ্রবণ করিয়া ভয় হইত—না জানি একটা মানুষ কেমন করিয়া সেখানে থাকিত। আর ভাবিতাম—আহাম্মক বেটা দিনের বেলায় কেন সেস্থান ছাড়িয়া যায় না। ঠাকুরমার বুকে মুখ লুকাইয়া ভয়ে ভয়ে শুনিতাম—

"কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে,
আহার লোভে সদাই ফিরে"

ভাবিতাম, বেটা কি বিট্‌কেল, বাঘ কুম্ভীরের দেশে থাকে কেন? সেই সময় হইতেই রামপ্রসাদের কথা শুনিবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। অবশেষে বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকে পড়িলাম—

"গিরিবর! আর আমি পারি না হে
প্রবোধ দিতে উমারে।"

নীচে লেখকের পরিচয় "কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।" ইনিই কি "রামপ্রসাদী" গান তৈয়ার করিয়াছেন? এই একটা প্রশ্নও মনে উঠিত।

কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রসাদের জীবনী আলোচনার দ্বার খুঁজিতেছিলাম। বহু চেষ্টায় স্বর্গীয় দয়ালচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত রামপ্রসাদী গানের বহি হাতে পাইয়া বড় আনন্দ হইল। আকুল আগ্রহে বহিখানি পড়িয়া দেখিলাম, ইহাতে দুইজন রামপ্রসাদ চিহ্নিত হইয়া আছেন। একজন কবিরঞ্জন আর একজন দ্বিজ রামপ্রসাদ। সেই সময় হইতে রামপ্রসাদের সম্বন্ধে জানিবার আগ্রহ হয়। যতদূর জানিলাম তাহার বিবরণ লইয়া ১৩১৯ সালের মাঘ মাসে ঢাকা সাহিত্যপরিষদে উপস্থিত হই। ঐ প্রবন্ধ ঐ সালের চৈত্র সংখ্যা "প্রতিভায়" প্রকাশিত হয়।

তাহার পর রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিয়াছি। আজ সেই সকল বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার এখানে উপস্থিত করিতে প্রয়াস পাইব।

বাবু দয়ালচন্দ্র ঘোষ—

"ধরাতলে বিখ্যাত কুমারহট্টগ্রাম,
তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণ ধাম।"

এই সন্ধান লইয়া রামপ্রসাদের 'ভিটা' আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন। দয়াল বাবু প্রসাদী সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া কেবল মাত্র কবিরঞ্জনই উহার রচয়িতা এমন বলেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গেও এক রামপ্রসাদের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর অধিক অনুসন্ধান না করিয়াই দয়াল বাবু কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনকেই 'দ্বিজ' রামপ্রসাদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। এজন্য দয়াল বাবু অতি দুর্ব্বল কতিপয় প্রমাণও উপস্থিত করিয়াছিলেন। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। ১৩০২ সনের শ্রাবণ সংখ্যা "নব্যভারতে" শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ও 'দ্বিজ' ভনিতা অর্থহীন প্রমাণিত করিয়া রামপ্রসাদকে "কায়স্থ" প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ঐ সালের পৌষের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত রসিক বাবুর লেখার প্রতিবাদ করেন। 'প্রসাদ পদাবলী'তে আমরা তৃতীয় এক রামপ্রসাদেরও সংবাদ পাই, ইনি "নীলুর কবির দলে রামপ্রসাদ।"

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক। "প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের" চাকরী করিবার সময় খাতার পৃষ্ঠায় লিখিলেন—

"দে মা আমায় তবিলদারী"।

গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি এবং ৩০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি দিলেন। এখনকার দিনের কবিরা হাসপাতালে "উপসী" থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। রাজা মহারাজারা টাকা দিয়া খেতাব ক্রয় করেন।

কবিরঞ্জন ১৬৪০—৪৬ শকাব্দার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করেন। বর্ত্তমানে ১৮৩৯ শকাব্দা চলিতেছে। সুতরাং দেখা যায় রামপ্রসাদ অনধিক ১৩০—৪০ বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলেন।"

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ কালী সঙ্গীত, শিব সঙ্গীত, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। তিনি অর্থাভাবে কোন ক্লেশ ভোগ করেন নাই। সন্তান সন্ততিতে ঘর ভরা—সুখের সংসার! অপর দিকে বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় দার পরিগ্রহ করায় "আজু গোঁসাই" টিটকারী দিয়াছেন—

"তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা
কাঁচায়েছ পাকা গুটী।"

বৃদ্ধকালে পুত্র পৌত্রাদি পরিবৃত রামপ্রসাদের জীবলীলার অবসান হইল।

কবিরঞ্জনের মোটামুটী পরিচয় এইরূপ।

দ্বিজ রামপ্রসাদের সাধন পীঠস্থান ঢাকা জিলার চিনিসপুর গ্রাম। টঙ্গী ভৈরব রেলপথের নরসিংহদী বা জিনারদী ষ্টেসন হইতে অনতিদূরেই উক্ত স্থান অবস্থিত। দ্বিজ রামপ্রসাদকে কেহ কেহ নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের সহোদর ভ্রাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এ কথার সত্যতা দৃঢ় প্রমাণ সাপেক্ষ। কুমারপুর নিবাসী অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত জয়নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় জীবনের দীর্ঘকাল মুড়াপাড়া জমিদার বাড়ীতে চাকরী করিয়াছেন। ইনি বহুবার চিনিসপুরে গিয়া রামপ্রসাদের তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন "প্রবাদ এই যে রামপ্রসাদ শিশুকাল হইতেই উত্তম গান করিতে পারিতেন এবং বৃদ্ধগণের মুখে শুনিয়াছি রামপ্রসাদের সঙ্গীতে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইত। একদিন রামপ্রসাদ স্নান করিয়া গৃহে আসিলে তাঁহার মাতা জানাইলেন 'এক অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা আমাকে বলিয়া গেল "ওগো প্রসাদের মা, তোমার প্রসাদকে বলো কাশী গিয়ে যেন আমায় গান শুনায়।" প্রসাদ মায়ের নিকট এই কথা শুনিয়াই বালিকার অনুসরণ করিলেন আর গান ধরিলেন—

"তোমরা নি কেউ দেখেছরে ভাই, তোম্‌রানি চিন তারে।
এই পথে মোর জগদম্বা মা গেছেন কত দূরে।
মা আমার জগৎকর্ত্রী, জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী
মায়ের রূপে জগৎ আলো শমন পলায় যার ডরে॥

[এই গানের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায় নাই]

পথে এক শঙ্খ বণিকের সঙ্গে দেখা হইল। শঙ্খ বণিক কহিল 'ও ঠাকুর, তুমি যে মেয়েকে তালাস কর, সেত ঐ একটু আগে যায়। সে আমার নিকট একজোড়া শাখা নিয়াছে। তুমি নাকি তার বাপ। তোমার কাছে দাম চাইতে সে বলিয়া গিয়াছে।' রামপ্রসাদত শুনিয়া অবাক্ ক্ষণেক পরে কহিলেন 'ওহে ও শঙ্খবণিক্, আমার নিকটত টাকা পয়সা নাই।' "হা ঠাকুর, আছে। মেয়ে বলেছেন তোমার মালার পেরীর মধ্যে দুইটী টাকা আছে। বিস্মিত রামপ্রসাদ মালার পেরীর ভিতর হইতে দুইটী টাকা দিয়া দ্রুত পদে মেয়ের অনুসরণ করিলেন।"

উক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট এবং চিনিসপুরের কালীবাড়ীর সেবায়েৎ বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট ও এতদ্দেশীয় জ্ঞানশীল অন্যান্য লোকের নিকট যাহা জানিয়াছি, এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্বিজ রামপ্রসাদ যথারীতি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া চিনিসপুরে পঞ্চমুণ্ডী আসন স্থাপন করতঃ "জংলার মাঝে ভাঙ্গা ঘরে" বাস করিতেন। সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে রামপ্রসাদের গানগুলি লঘু ভাবাত্মক। যথা—

১। দেখি মা, কেমন করে, আমারে ছাড়ায়ে যাবা।
ছেলের হাতের কলা নয় মা ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খাবা॥
এমন ছাপান ছাপাইব[১] [মাগো] খুঁজে ২ নাহি পাবা।
বৎস পাছে গাভী যেমন, তেম্নি পাছে পাছে ধাবা॥
প্রসাদ বলে ফাঁকি ঝুঁকি[২] দিতে পার, পেলে হাবা।
আমায় যদি না তরাও মা শিব হবেন তোমার বাবা॥

২। কেবা বুকের কেবা পিঠের বদ নিয়তিয়া [৩]
কাণীর কাণী
কেহ সারা দিনে পায় না খেতে [হেদে গো করুণাময়ী]
কেহ দুধে খায় সাঁচি চিনি॥ [৪]

---

[১] লুকাইব! [পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা] [২] ছলনা [৩] বদ [মন্দ] নিয়ত [ইচ্ছা] এদেশে "নিয়ত" ব্যবহার আছে] [৪] সাঁচি চিনি—খাঁটী উৎকৃষ্ট সাফ চিনি।

কেহ শুতে তেতালাতে পালঙ্কেতে মশৈর [৫] টানি।
আমরা ঘুরি পুড়্পুরায়ে,[৬] ভাঙ্গা ঘরে নাইকো ছানি।
কেহ পরে শালদুশালা, কেহ পায় না ভাঙ্গা ছালা,
অনুভবে বুঝি তারা, তেলা মাথায় তেল ঢালানী।"

৩। থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে।
ভয় পাইয়া ডাকি তোরে॥
ইঁয়লে[৭] হালিয়া পড়ে, আছে কালীর নামের জোড়ে।
রাত্রে আইসা ছয়টা চোরে, ভাঙ্গাবেড়া ডেঁইয়া পড়ে[৮]
চমকি উঠি বাঘের ডাকে, থাকি মায়ের নামটী
ভরসা করে।"

৪। প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী; বোঝা নামাও খানিক জিরাই [৯]

৫। চুরিদারী করলে পরে উচিত মত সাজা পাবা॥

৬। যা পড়াই তা পর মন, পড়্লে শুন্লে দুধিভাতি।
জান নাকি ডাকের বচন, না পড়িলে ডেঙ্গার গুঁতি॥

৭। কেহ গায় দেয় শাল দুশালা কেউ পায় না মা
ছেঁড়া তেনা। [১০]

৮। সে যে সময়সির [১১] নাড়িতে নারে।

৯। যখন দিনে নিরাই করে,[১২] শিকারী সব রয়না ঘরে,
জাঠা টেঁটা হাতে করে, নাও না পাইলে চলে তরে।"

প্রভৃতি সঙ্গীত তেমন মূল্যবান নহে। এসকল সঙ্গীতে আমাদের সাধক রামপ্রসাদের কোনও গৌরব না থাকিলেও, তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলিয়া ধরিতে পারি।

সাধক অবস্থায় প্রসাদের সঙ্গীত ক্রমে উচ্চভাবে রচিত হইতে থাকে। ভাব ও ভাষায় রামপ্রসাদের গানগুলি ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইয়া উঠিল। ক্রমে আত্ম নির্ভরতা, মায়ের সঙ্গে সখ্য, মায়ের উপর অভিমান, অনুযোগ, মায়ের রূপ বর্ণনা প্রভৃতিতে প্রসাদের গানগুলি আরও মনোরম হইয়া উঠিল। নির্ভয়ে রামপ্রসাদ বলিয়া বসিলেন "আমি উক্তিতে কিনিতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী।" যমকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

আমি কি যমের ভয় রেখেছি?
কালী নাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এবার সমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব তাই ভেবে আছি॥
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি॥

আবার বলিয়াছেন—

"তিলেক দাঁড়াওরে শমন আমি বদন ভরে মাকে ডাকি।"

মায়ের উপর অভিমান করিয়া প্রসাদ গাইলেন—

"মা হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল প্রসব কর্লেই হয় না মাতা॥"

আবার বলিয়াছেন—"মা মা বলে মা আর ডাক্‌ব না।
ওমা, দিয়াছ দিতেছ কত যন্ত্রণা॥
ছিলাম গৃহবাসী বানাইলে সন্ন্যাসী।
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী।
না হয়, দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা মলে কি তার ছেলে বাঁচে না॥"

এতখানি অভিমান বড় সহজে হয় না! এত বড় কথা বলা যার তার পক্ষে শোভা পায় না, সম্ভবও নয়। আর ইহাতে কি অপূর্ব্ব আত্ম নির্ভর! "ছিলাম গৃহবাসী, বানাইলে সন্ন্যাসী আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী" মা, তুমি যতখানি পারিয়াছ করিয়াছ, আর কি করিবে? দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া ভিক্ষা মাগিয়া খাইব। যে ছেলের মা থাকে না সেও ত বাঁচে। মার উপর ছেলের এই অভিমান কি সুন্দর! মা ছাড়া এমন কথা, এমন রাগ করা আর কার উপর চলে? রাগ করিয়াই সাধক কহিয়াছেন—

"আমি ছিলাম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী
আমায় সন্ন্যাসী করেছে।"

মার উপর অভিমান করিয়া প্রসাদ কহিতেছেন:

"আমি কি দুঃখেরে ডরাই!
ভবে দাও দুঃখ মা আর কত তাই॥
আগে পাছে দুঃখ চলে মা যদি কোনো খানেতে যাই।
তখন, দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুঃখ দিয়ে মা
বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই,
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই।"

কি উচ্চ গ্রামে হৃদয় বাঁধিয়া কবি এ অভিমান করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারেন কয়জন?

[৫] মশারী। [৬] জর্জ্জরিত। [৭] ইঁয়ল অর্থ হিল্লোল। এদেশে শিশিরপাতকেই সাধারণতঃ ইঁয়ল কহে। [৮] ডিঙ্গাইয়া। [৯] বিশ্রাম করি। [১০] নেকড়া। [১১] সময়মত। [১২] নির্ব্বাত।

তিনি স্বচ্ছন্দে সগর্ব্বে বলিলেন :—

"সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে, আমি কর্ম্মি দুখের বড়াই"

এই শ্রেণীর উক্তিও সাধক ছাড়া সাংসারিকের পক্ষে অসম্ভব।

একটী গানে প্রসাদ বলিয়াছেন :—

"শিশুকালে পিতা মৈল রাজ্য নিল চোরে"

ইহাতে বোধ হয় প্রসাদ সম্পন্ন গৃহস্থের সন্তান ছিলেন।

উভয় রামপ্রসাদের মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। একজন কবি ও ভক্ত, আর একজন সাধক। একজন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজকিশোর ও বৈদ্য শ্রীনাথের নাম পর্য্যন্ত গানে যোজনা করিয়াছেন। ইনি কৃষি, মামলা মোকদ্দমা, ডিগ্রীজারী, খাস তালুক, জমি জিরাত, চাকলা, চৌকীদার, মহাজন প্রভৃতির সংবাদ রাখেন।

"রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় যে বিষের বাটী।

আগে ইচ্ছা সুখে পান করিয়ে বিষের জ্বালায় ছটফটি"।

"এই সংসার ধোকার টাটী" "দেখরে সব মাগীর মেলা"

প্রভৃতি গানে আপনাকে কতকটা ধরা দিয়াছেন। "ইনি দারা সুতের বেগার" খাটিয়াছেন।

"যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দেশ বিদেশে
তখন ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই ছিল আপন বশে।
এখন ধন উপার্জ্জন না হইলে দশার শেষে
এখন ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন বলে সবাই রোষে।"

বলিয়া আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। আর সাধক রামপ্রসাদ বলিতেছেন—

"মিছে কেন দারা সুতের বেগার খাটি মর ?"

কবিরঞ্জনের জন্মভূমি গঙ্গার তীরে; সুতরাং তাঁহার সঙ্গীত "কেন গঙ্গাতীরে যাব" প্রভৃতি পদের কোনও সার্থকতা নাই। সাধক রামপ্রসাদ একমাত্র কালী নামে আত্মহারা। বিভিন্ন সঙ্গীতেই তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি গয়া গঙ্গা বারাণসী পর্য্যন্ত উপেক্ষা করেন।

[১] কেন গঙ্গাতীরে যাব।
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব।
মায়ের চরণতলে কত শত গয়া গঙ্গা দেখতে পাব॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, কালীর পদে শরণ লব।
আমি, এমন মায়ের ছেলে নই যে বিমাতাকে মা বলিব।

[২] তীর্থ গমন মিছে ভ্রমণ, মন উচাটন করোনা রে।

[৩] এ ভব সংসারে আসি না করিলাম গয়া কাশী।
যখন শমন ধরবে আসি ডাকব কালী কালী বলে॥

[৪] আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘটে পদে গঙ্গা গয়া কাশী॥

[৫] কাজ কি আমার কাশী ?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥"

[৬] কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান কাজ কি হয়ে কাশীবাসী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥

তারপর যখন মায়ের আদেশে রামপ্রসাদ তীর্থ গেলেন, সেখানে গিয়া গান ধরিলেন :—

[১] "অন্নপূর্ণার ধন্য কাশী।"

কাশী হইতে রামপ্রসাদ বৃন্দাবনে গেলেন। সাধক কালীময় জগৎ দর্শন করিতেছেন। বৃন্দাবনে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

"নটবর বেশে বৃন্দাবনে এসে কালী হলি মা, রাসবিহারী"

সাধক রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সঙ্গীত আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয়, ইনি সংসারের সর্ব্বপ্রকার জঞ্জাল ছাড়াইয়া নির্জ্জনে নিভৃতে জঙ্গলের ভিতর বাসা করিয়াছিলেন।

'হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে' ডুবিয়া 'ধন' পাইবার আকাঙ্ক্ষা মাত্র যার—তাহার ত অন্য ধনের পিপাসা থাকে না। প্রসাদ সেইখানে বসিয়া পূজার বন্দোবস্ত করিলেন—

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বস্ রে ধ্যানে॥
জাঁক জমকে কর্‌লে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে কর্‌বে পূজা জান্‌বে নারে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটীর মূর্ত্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥

তিনি নৈবেদ্যের ঘটা, আলো বাতির আয়োজন, বুলির বন্দোবস্ত ঢাক ঢোলের বাদ্য অনাবশ্যক মনে করেন। নির্ধনের যা আছে—তাই ঢের। হৃদ্‌কমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ স্থানত তার নাই! তিনি জানেন—'তারা নামে সর্ব্বাদি ঘুচায়'। কেবল অনিত্য ঝুলি কাঁথা মাত্র থাকে। সাধক দ্বৈত ভাব ছাড়িয়া কহিলেন—

"কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী।

সাধক পরম উৎসাহে মাকে কহিলেন—

"এখন সন্ধ্যে বেলায় কোলের ছেলে ঘরে লয়ে চল।"

সাধক রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সিদ্ধপীঠ চিনিসপুরের নাম এদেশের আবালবৃদ্ধ বণিতার নিকট পরিচিত। এই তীর্থে প্রতি বৎসর বৈশাখী অমাবস্যায় মেলা হয় এবং শত সহস্র ভক্ত নরনারী পূজা লইয়া উপস্থিত হয়েন। ঢাকার সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' প্রবন্ধ পাঠ কালে আমি উপস্থিত সভ্যগণকে এবং পরিষদকে—রামপ্রসাদের তীর্থপীঠে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তখন যথেষ্ট উৎসাহও দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তারপর সব নীরব। এবার পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের সম্পাদক কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আহ্লাদের সহিত প্রস্তাবটী গ্রহণ করিয়াছেন। দেখা যাউক কার্য্যক্ষেত্রে কতদূর গড়ায়। এইখানেই পশ্চিম বঙ্গের সহিত আমাদের ব্যবধান অত্যন্ত পরিস্ফুট। তাঁহারা খুঁজিয়াই রামপ্রসাদের ভিটা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সদলবলে সেখানে যাইয়া অতীতের চিত্র সকলকে দেখাইতেছেন, কৃত্তিবাসের দেশে সভা করিয়া কবির প্রতি সম্মান দেখাইতেছেন। আর আমাদের এতবড় গৌরবের সামগ্রী রামপ্রসাদের সঠিক সংবাদ পাইয়াও আমরা একটু কিছু করিতে রাজী নহি। কেবল পরের ঘারে বন্দুক রাখিয়া গুলি ছুঁড়িতে পারিলে আমরা বাঁচিয়া যাই।

রামপ্রসাদ কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গের গৌরব নহেন—সমগ্র বঙ্গের আদরের সামগ্রী। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের আপন স্বত্ব সংরক্ষণে প্রচেষ্টার আশ্চর্য্য ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া কষ্ট হয়। সাধক রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সঙ্গীত প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট, সরল এবং গভীর ভাব পরিপূর্ণ। এ সম্বন্ধে সাক্ষী সাবুদ অনাবশ্যক। বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই রামপ্রসাদের নামে মুগ্ধ। আর সেই রামপ্রসাদের গর্ব্ব করার অধিকারী আমরা। অথচ আমরা তাহার সংম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ কবি এবং ভাবুক। আর ব্রহ্মচারী রামপ্রসাদ ভাবে বিভোর। একজন দুনিয়ার সংবাদ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। মায়ের নিকট সংসারের কথা জানাইয়া আপনার দুঃখ দুর্গতি বারণ করিতে চাহেন। আর দ্বিজ রামপ্রসাদ ইহ জগতের কোনও অভাব অভিযোগের ধার ধারেন না। তিনি সদর্পে বলিয়া উঠিলেন—

"আমি ভক্তিতে কিনিতে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারী।"

তিনি সুখ দুঃখের অতীত এক পরম শান্তি ভোগ করিতেছেন। রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে এ অঞ্চলে বহু অপূর্ব্ব এবং রোমাঞ্চকর কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। সময়ান্তরে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

চিনিসপুরে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, "এই থানে মায়ের পূর্ণ অধিষ্ঠান"। অনুপযুক্ত সেবাইতের ত্রুটীতে এবং দেশে সাধকের অত্যন্তাভাবে স্থানের মাহাত্ম্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। চিনিসপুরে এখন আর কি আছে?—যে রামপ্রসাদ পূর্ব্ববঙ্গের নিবিড় অরণ্যের ভিতর বসিয়া আপনার অসামান্য সাধনার বলে জগন্মাতাকে দিয়া "বেড়া বাঁধাইয়া" লইতেন, যে রামপ্রসাদ বাঘের ভয়ে মার শরণাপন্ন হইতেন, যে স্থান নির্জ্জন নীরব—মহাসাধন'র স্থান ছিল আজ সেখানের নীরবতা নাই! দুর্ভিক্ষ্য প্রপীড়িত নরনারীর মত বুভুক্ষিত কৃষকের—ততোধিক অর্থ লিপ্সু ভূম্যধিকারীবৃন্দের অতৃপ্ত পিপাসার শান্তির জন্য চিনিসপুরের চারিদিকে দিগন্ত প্রসারী মাঠ ধূধূ করিতেছে। দীন রামপ্রসাদের এই তীর্থপীঠ, আজ সংস্কারের অভাবে ধ্বংসের দিকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে যেন একটা বিভীষিকাগ্রস্ত ধ্বংসোন্মুখ স্মৃতি নিস্ফল করুণনেত্রে অন্তিম শ্বাস রোধের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিয়াছে। এই হিন্দুর দেশে এই অগণিত হিন্দু জমিদারের দেশে রামপ্রসাদের তীর্থ আজ উপেক্ষার দৃষ্টিতলে যেন বড় লজ্জায় মাটীতে মিশিয়া যাইতেছে। ঢাকা জিলায়, পূর্ব্ববঙ্গে কি এমন ধর্ম্মপ্রাণ কেহ নাই যে এই গৌরব রক্ষা করেন? আজ রামপ্রসাদের স্থাপিত পীঠ নিতান্তই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। যেন শত ছিন্ন মলিন বসনে মা লজ্জা নিবারণ করিতেছেন। আজ মায়ের মন্দির, পূজার মন্দির, ভগ্ন প্রায়, যাত্রীর অসুবিধা প্রচুর, মায়ের ঘাট অসংস্কৃত। কথিত আছে, এই পুষ্করিণী হইতে মা জগজ্জননী রামপ্রসাদকে হাত দেখাইয়া ছিলেন। এই চিনিসপুরে মায়ের পাদপীঠে সম্ভবতঃ ১২৫৬ সালে

নরবলি হয়।

সম্প্রতি আমরা রামপ্রসাদের চিনিসপুরের সম্পর্কীয় একটী সঙ্গীত একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি।

"একবার চেয়ে দেখ মা এলোকেশী,
কে তোরে মা বলে কাল, তুই যে আমার পূর্ণশশী॥
হৃদাকাশে কি শোভা তোর
দূরে যায় মা তমঃ রাশি।
মাগো, পাপের মলায় পুণ্যের আলো
স্বর্গ চরণ সেবার দাসী।
প্রসাদ ভাবে নয়ন মুদে হৃদাকাশে কালশশী
তার, চিনিসপুরের ভাঙ্গা ঘরে বার মাসই পূর্ণমাসী।

রামপ্রসাদ হিমালয়ে সাধনা করিয়া মায়ের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। আদেশ হইল, "তুমি স্বদেশে প্রস্থান কর, যেখানে যাইয়া তুমি পশ্চাদ্দিকে ফিরিবে, সেইখানেই আমি স্থায়ী হইব।" রামপ্রসাদ চলিতে চলিতে এইস্থানে আসিয়া যেন পেছনে পায়ের শব্দ শুনিলেন না। সহসা পেছন দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দৈববাণী হইল— "আমি এখানে রহিলাম।" পূতসলিল ব্রহ্মপুত্রের তটে আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের তীর্থ চিনিসপুর। আশা করি কোনো মহাপ্রাণ হিন্দু জমিদার এই স্মৃতির সংরক্ষণে আপনার যৎ-সামান্য অর্থ ব্যয় করিবেন। এবং অনধিকারী পূজকের পরিবর্ত্তে যোগ্য লোকের হাতে মায়ের অর্চ্চনার ভার অর্পণ করিবেন। আমরা ঢাকা, ময়মনসিংহ, হিন্দু জমিদার মহোদয়গণকে সানুনয় এই কার্য্যে যোগদান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রসাদ পদাবলীযুক্ত তিনখানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। একখানি বাবু দয়ালচন্দ্র ঘোষ, একখানি বঙ্গবাসী আফিস হইতে ও একখানি স্বর্গীয় বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ সংগৃহীত। কৈলাস বাবু তাহার সাধক সঙ্গীত প্রথমভাগে দ্বিজ রামপ্রসাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনিও দ্বিজ রামপ্রসাদকেই কবিরঞ্জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আসন প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বাঙ্গলার সমাজ।

(২)

কর্ণেল অলকট্ আমেরিকা দেশবাসী ব্যবহারজীবী ও সংবাদপত্রের লেখক। এডি নামক কোন একজন লোকের বাড়ীতে ভৌতিক আশ্চর্য্য কাণ্ড হইতেছিল। এডিরা, দুই সহোদর নিম্নশ্রেণীর লোক, ভাল লেখাপড়া জানিত না কিন্তু তাহাদের বাড়ীতে পরলোকের আত্মাগণ, তাহাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে যে স্থূল দেহ ছিল তাহা ধারণ করিয়া লোকের সম্মুখে আসিয়া তাহাদের সহিত কথা বলিত; সেই জন্য প্রত্যেক দিন তাহাদের বাড়ী অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক, পণ্ডিত, ধনী তাহা দেখিবার জন্য যাইতেন। অলকট্‌কে কোন এক বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক সেখানে সংবাদদাতা করিয়া পাঠাইলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া সংবাদপত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত। সে পত্রগুলি "পরপারের লোক" (Peoples from the other world) নাম দিয়া পরে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে। যে সময় তিনি এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিলেন সেই সময় সেই এডিদের বাড়ীতে তাঁহার সহিত এক স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ হইল; ইনি রুশ দেশীয় এক সম্ভ্রান্ত রমণী। রাজ বংশের সহিত ও ইহার সম্বন্ধ ছিল। এই রমণী বলিলেন যে কর্ণেল যে আশ্চর্য্য দেখিতেছেন ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্য তিনি দেখাইতে পারেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে বন্ধুতা ও পরে ঘনিষ্ঠতা হইল। তাঁহারা চিকাগো নগরে ফিরিয়া গেলে ম্যাডাম ব্লাভিভাস্কি তাঁহাকে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখান এবং ভারতবর্ষীয় এক যোগীর শিষ্য করিয়া দেন। এই যোগী বা মহাত্মা সূক্ষ্মদেহে কর্ণেলকে আমেরিকায় দেখা দিতেন। ম্যাডাম ব্লাভিভাস্কি ইহার পূর্ব্বে ভারতে আসিয়া এক যোগীর শিষ্যা হইয়াছিলেন ও তিব্বতে যাইয়া যোগ সাধনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের গুরু পৃথক ছিলেন। মহাত্মাদিগের পরামর্শ অনুসারে তাঁহারা প্রথমে আমেরিকায় তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সভা (Theosopical Society) স্থাপন করেন এবং সেই মহাত্মা-দিগের আজ্ঞাক্রমে সেই সভার কেন্দ্র প্রথমে বোম্বাই ও পরে মাদ্রাজ লইয়া যান। উপরে যে ঘটনা লেখা হইল এ তাঁহা-দের কথা, সকলে ইহা বিশ্বাস না করিতে পারেন। কিন্তু

এই দুইটি লোকের নিকট বাঙ্গালায় হিন্দু সমাজ বড় উপকৃত। ইহারা বোম্বে আসিবার অল্প দিন পরে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহাদিগের নিকটে যান এবং তাঁহাদের সমাজভুক্ত হন। তাঁহারা শিশির বাবুকে তাঁহাদের সমাজের বাঙ্গলার প্রধান কার্য্যকারক করিলেন। মিররের সম্পাদক ৺নরেন্দ্রনাথ সেন ইহার অনেক পরে, কর্ণেল অলকট্ কলিকাতায় আসিবার পর, এই দলে যোগ দিয়াছিলেন। কর্ণেল অলকট যখন তাঁহার বক্তৃতায় বলিতে লাগিলেন এবং ম্যাডাম তাঁহার প্রবন্ধ ও পুস্তকে লিখিতে লাগিলেন যে হিন্দুদের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সমস্তই ভাল তখন দেশে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। খ্রীষ্টিয়ানেরা ইহাদের প্রতি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মরাও নারাজ হইলেন। এদেশ হইতে "কুসংস্কার" যাইতেছিল ইহারা আবার উহা আনিবার চেষ্টা করিতেছে। যাঁহারা নিষ্ঠাবান হিন্দু তাঁহারা উহাদের সহিত যোগ দিলেন না কিন্তু মনে মনে বড় সুখী হইলেন। আর ইয়ং বেঙ্গলদল যাহারা ধর্ম্মের সহিত কোন সংশ্রব রাখিতেন না তাহারাও হিন্দুদিগের শাস্ত্র, গীতা, বেদান্ত, উপনিষদ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আবার রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নাম করিতে হইল। এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহাদের কৃপায় এদেশে পূর্ব্বে অনুবাদসহ ছাপা হইয়াছিল কিন্তু অল্প লোকেই পড়িত। এখন ঐ সমস্ত গ্রন্থ ও পুরান স্মৃতি ইত্যাদিও লোকে আদর করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। "আমি হিন্দু" একথা বলিতে আর লোকের লজ্জা হইত না।

যে তিনটী ব্রাহ্ম সমাজের কথা বলিয়াছি তাহাদের তখন অবস্থা এই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন সংসার ও সমাজ প্রায় ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মানন্দে থাকিতেন তাঁহার সমাজ একটা মামুলী ব্যাপার হইয়া পড়িল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের তখন খুব প্রতিপত্তি। পণ্ডিত শিবনাথ ও ৺নগেন্দ্রনাথ ঐ সমাজ চালাইতেছিলেন। কিন্তু ইহার প্রধান নেতা পূজ্যপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গয়ায় যোগ সাধনা করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্রের সমাজের আকার তখন অন্যরূপ হইয়াছে। তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপাপাত্র। অনেক সময় সেখানে যাওয়া আসা করিতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণও তাহার নিকট যাইতেন। কেশব বাবুর পূর্ব্ব হইতেই ভক্তিরদিকে ঝোঁক্ ছিল। এই মহাত্মার সঙ্গ পাইয়া তাহার প্রশার হইতে লাগিল। একদিকে (Theosophical Society) তত্ত্বজিজ্ঞাসু সভার বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব (Universal brotherhood) অপরদিকে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গ লাভে তাঁহার অদ্ভুত প্রেম ভক্তি ও বিশ্বজনীন অসম্প্রদায়িক ভাবে ভাবিত হইয়া তিনি তাঁহার সমাজের নাম "নব বিধান "বা" সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়" করিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি ভক্তিরই প্রাধান্য রাখিলেন।

এবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্বন্ধে কিছু বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাপ্রভুর ধর্ম্ম মত আমাদের দেশে অজ্ঞ মূর্খ ও নীচ জাতীর ধর্ম্ম হইয়াছিল ইহা সাধারণ (average) হিসাবে; অবশ্য বৈষ্ণবদিগের মধ্যে তখনও অনেক উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত লোক ছিলেন। এখানে বহরমপুরের ৺রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত এবং বৈষ্ণব দর্শন ইত্যাদি অনেক গোস্বামী গ্রন্থ অনুবাদ সহ ছাপাইয়াছিলেন কিন্তু অল্প লোকেই তাহার সন্ধান রাখিত। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু কেদারনাথ দত্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল গোস্বামীশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি অধিক বয়সে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। দত্ত মহাশয় যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন উহা কলিকাতার একটী প্রসিদ্ধ বংশ ইঁহাদের অনেকে খৃষ্টীয়ান হইয়াছিলেন। রাম বাগানের দত্ত পরিবার খৃষ্টিয়ান হওয়ায় আমাদের এক পক্ষে সৌভাগ্যের কারণ। মহাত্মা রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ যে নূতন পথ ধরিয়াছিলেন, মিশনরীর স্কুলে না যাইয়া অপর স্কুলে বালকগণ শিক্ষা পায় এবং খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম অপেক্ষা বৈদান্তিক মত বড় তাহা জন সাধারণকে বুঝাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তাহার অন্যতম কারণ দত্ত পরিবারের খৃষ্টান হওয়া। এই দত্ত পরিবার ধর্ম্ম ও বিদ্যার-জন্য প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিলেন। কেদার বাবু কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি সাধারণের মন অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। তিনি চাকুরী করিতেন, যেখানে থাকিতেন সেখানে ২।৪ জন তাঁহার কথা শুনিত মাত্র। সাধারণের মন আকর্ষণ

করিতেন শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইনি বোম্বে যাইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ছিলেন। তিনি রাষ্ট্র আন্দোলনের এক জন প্রধান নেতা। বিখ্যাত অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক। দেশের লোকে তাঁহাকে সকলেই চিনিত ও বিশ্বাস করিত, তিনি বোম্বাই হইতে আসিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু মতিলাল ঘোষ মহাশয়কে তত্ত্বজিজ্ঞাসু সম্প্রদায় ভুক্ত করেন এবং তাঁহার হাতে তাঁহার সংবাদ পত্রের সম্পূর্ণ ভার দিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে জ্ঞান চর্চ্চা ও যোগসাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বড় ভাই শ্রীল হেমন্তকুমার ভক্তি মার্গে সাধনা আরম্ভ করিলেন। ইঁহারা যখন যে কার্য্য করিয়াছেন তিন ভাই পরামর্শ করিয়া একমত হইয়া করিয়াছেন। সুতরাং ভাল মন্দ কার্য্যফলে তিন ভ্রাতা তুল্য অধিকারী। হেমন্ত বাবু ভক্তিমার্গে অল্প দিনের মধ্যে এত উন্নতি করিলেন যে শিশির বাবু জ্ঞান ও যোগমার্গ ত্যাগ করিয়া অগ্রজের শিষ্য হইলেন! তিনি যখন যে কার্য্যে হাত দিতেন তাহা আধাআধি করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি "তন্ মন্" দিয়া ভজনা আরম্ভ করিলেন, তাহার ফল এই হইল যে শিক্ষিত সমাজের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে হীন অবস্থা ছিল তাহা অনেক ঘুচিল। যে গোস্বামী সন্তানগণ শাস্ত্রজ্ঞ ও ও সধর্ম্ম নিরত হইয়াও আপনাদিগকে লুক্কাইত রাখিয়াছিলেন তাঁহারা প্রকাশ হইলেন আর অপর যাহারা নিজেদের শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন না তাঁহারাও বৈষ্ণব গ্রন্থ পড়িতে লাগিলেন, ফল ভালই হইল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম আর নিম্ন শ্রেণীর ধর্ম্ম থাকিল না।

প্রত্যেক কার্য্যের ফল দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। কার্য্যটী হইবামাত্রে আশুফল আমরা যাহা দেখি উহাই মুখ্য আর ঐ কার্য্য দ্বারা ক্রমে অপর যে ফলগুলি হয় তাহা গৌণ। খ্রীষ্টিয়ানেরা যে শিক্ষা দেন তাহার ফলে কতকগুলি লোক খ্রীষ্টীয়ান হইয়া গেল—ইহা এই কার্য্যের মুখ্যফল। কিন্তু ঐ শিক্ষার ফলে সমাজে যাহারা থাকিলেন তাহাদের অনেকের মন হইতে পূর্ব্বপুরুষগণের বহু বৎসরের সাধনায় যে কতগুলি জাতীয় ভাব হইয়াছিল তাহা চলিয়া গেল, ইহা শিক্ষার গৌণ ফল। ইংরাজি শিক্ষিত বাঙ্গালিরা যে ইংরাজি সভ্যতার, ইংরাজী ধর্ম্মের, আচার ব্যবহার এমন কি পোষাক পরিচ্ছদের সমস্তই ভাল দেখিতেছিলেন ইহাও সেই শিক্ষার গৌণ ফল।

পূর্ব্বে যাত্রা পাচালি গান কবির গান তর্জ্জা ও রামায়ণ কথকতা ইত্যাদি দ্বারা দেশের সাধারণ লোকে পুরাণের অনেক কথা শিখিত এবং উহা দ্বারা ধর্ম্মও কতকটা তাহাদের মধ্যে সজীব ছিল। ইংরাজি শিক্ষার ফলে সেগুলি অসভ্যতার লক্ষণ হইল, তাহার পরিবর্ত্তে থিয়েটারের সৃষ্টি হইল। প্রথমে কলিকাতায় হইল তাহার পর ক্রমে ক্রমে সমস্ত বাঙ্গালায় উহা ছড়াইয়া পড়িল। আর্য্য সঙ্গীতে বিদ্যার কৌশল (Art) ও বিজ্ঞান (Science) উভয়ই আছে কিন্তু তাহার চর্চ্চা প্রায় উঠিয়া গেল। সঙ্গীতের বদলে আমরা পাইলাম "ঐক্যতান বাদনের" খিচুড়ী। আর রামায়ন মহাভারতের ধর্ম্মকথার বদলে পাইলাম নির্জ্জলা হাসিঠাট্টা ও ইংরাজি অনুকরণের নায়ক নায়িকার প্রেমের (Love) কথা। এক সময়ে নৃত্য দর্শনে ভগবদ্ ভক্তির উদ্রেক হইত। আর ইংরেজী অনুকরণে যে নৃত্যের সৃষ্টি হইল তাহাও আপনারা এখনও দেখিতেছেন। যখন ভালরদিকে গতি হয় তখন যেন সকলেই তাহার সাহায্য করে। এই থিয়েটার ও করিল। তাহারা আবার "আপনাদের দিকে আপনাদের ঘরেরদিকে আপনাদের গৃহস্থালিরদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল" কলিকাতার থিয়েটারে ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্রীচৈতন্য লীলা, বুদ্ধদেব চরিত ইত্যাদি এবং ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের প্রহ্লাদ চরিত ইত্যাদির অভিনয় আরম্ভ হইল। ইহাতে দেশের বড় মঙ্গল হইল, জাতীয় চরিত্রের জাতীয় ধর্ম্মের আবার আদর হইল।

ইংরেজী শিক্ষার জন্যে দেশের লোকের আর একটা ধারণা হইয়াছিল যে সাধু মহাত্মার কথা আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থে যাহা আছে উহা মিথ্যা গল্প মাত্র। কেহ কেহ মনে করিতেন যে সাধু মহাত্মা পূর্ব্বে ছিলেন এখন নাই। এখন সাধুর বেশধারী সকলেই ভণ্ড ও জুয়াচোর। এক সাধু এই সময় ভারতের উত্তর পশ্চিম অংশে সাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি যে সাধারণ লোক অপেক্ষা অনেক বড় তাহা শীঘ্রই লোকে বুঝিতে পারিল এবং বেহার হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত অনেকে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ইনি মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী তিনি কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন কিন্তু বাঙ্গালিরা তাহাকে গ্রহণ করিল না। সেই সময় অলকট্ ও ব্লাডিভাস্কি বলিতেছিলেন যে সাধু মহাত্মা এখনও আছেন এখনও তাহারা তোমাদের উপকারের জন্য ভারতের উপকারের জন্য অনেক করিতেছেন। তোমরা একটু চেষ্টা করিলেই তাঁহাদের দেখা পাইতে পার এবং তাহাদের কৃপা লাভ করিতে পার। এই বাণী অনেকের মনে লাগিল।

সেই সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। তখন লোকে তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরের মহান্ত বলিত। কেশব বাবু ব্যতীত শিবনাথ শাস্ত্রী ও প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ অনেকে তাঁহার নিকট যাইতেন, হিন্দুরাও কেহ২ যাইতেন কিন্তু তখনও দেশের লোকে তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিত না। যখন থিওসফিষ্টরা সাধু মহাত্মার কথার উপর বড় জোর দিতে লাগিল তখন কলিকাতাবাসী শিক্ষিত হিন্দুদিগেরও অনেকে পরমহংস দেবের নিকট যাইতে লাগিলেন। ক্রমে মফঃস্বল হইতেও লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল। তাহারা সেখানে এমন একটা মানুষ দেখিল যাহা পূর্ব্বে আর তাহারা দেখে নাই। ভগবদ্ভক্তি কি পড়িয়াছিল, প্রেম বলিয়া একটা কথাও পড়িয়াছিল, ধর্ম্ম জীবনের নামও শুনিয়াছিল, সেখানে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিল।

দেশে একটা নূতন হাওয়া আসিল। সমাজ যে ভাবে চলিতেছিল তাহা ফিরিল। এই সময় বঙ্গবাসী সংবাদপত্রখানি হিন্দুর কাগজ হইয়া হিন্দু সমাজের জন্য লড়াই করিতে সাহস করিলেন। অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ সহ বঙ্গবাসী প্রেসে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮৮৩। ৮৪ খৃষ্টাব্দে এই নব জাগরিত হিন্দুদিগের মুখপাত্র করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীশশধর তর্ক চূড়ামণিকে কলিকাতায় আনা হইল। তর্ক চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতা তখনকার বালক ও যুবকদিগের একটি প্রধান হুজুকের বস্তু হইল—আর যাহারা পূর্ব্বে "ইয়ং বেঙ্গল" ছিলেন তাহাদের উহা এক বিশেষ চিন্তার সামগ্রী হইল—এতদিন তাহারা যাহা না পাইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন, যাহারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন নাই বা যোগ দিয়া ভাল না লাগায় সে সমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারাও দেখিলেন যে চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মতত্ত্ব ধর্ম্ম ব্যাখ্যা হইতে তাঁহাদের অনেক জিনিষ শিখিবার আছে। এই তর্ক চূড়ামণি মহাশয় বহরমপুরের জমিদার ৺ অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রায় বাহাদুর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং সজ্জনকে মর্য্যাদা করিতে জানিতেন, সেই জন্য তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে তিনি অত্যন্ত আদর যত্ন করিতেন। রায় বাহাদুর অনেক সময় তাহার মুঙ্গেরের করন্ চৌড়া বাড়ীতে থাকিতেন। সে সময় ৺ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন জামালপুরের রেল আফিসে চাকুরী করিতেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট উপদেশ পাইয়া তিনি হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন ও পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী নাম গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা সংবাদপত্রে প্রবন্ধ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজের রচিত পুস্তক দ্বারা হিন্দু সমাজের অনেক কল্যাণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় সুবক্তা বাঙ্গালায় কমই জন্মে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অঙ্গ ভঙ্গি করিতেন না স্থিরভাবে সুললিত হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় শ্রোতাগণকে উপদেশ দিতেন। তিনি বাঙ্গালা ও হিন্দি উভয় ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তিনিও এক সময়ে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সভার সভ্য ছিলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে যাহারা কলিকাতায় আনয়ন করেন তাহার এক জন প্রধান নেতা ৺ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও এক সময়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু সভার সভ্য ছিলেন। এ কথা উল্লেখ করিবার বিশেষ কারণ এই যে অলকট্ ব্লাডিভাস্কির কথায় অনেকের মন ফিরে পরে তাহারা নিজ২ বুদ্ধি বিদ্যা ও ক্ষমতা অনুসারে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।

বায়ু ও ফুল।

বায়ু কহে "ফুল, ওগো প্রভাতের ফুল,
তব সুধাময় হাসি ভুবনে অতুল।
কে শিখালে এত হাসি এত প্রীতিময়,
ও মধুর হাসি যেন এ ধরার নয়।"
ফুল কহে "নাহি জানি, তুমি ভাল জান,
এই হাসি প্রীতি তুমি কোথা হ'তে আন।
আমার এ মৌণ প্রাণ ছিল স্বপ্নসম,
তন্দ্রামাঝে প্রাণ খানি ডুবে ছিল মম।
হাসি গন্ধ কারে বলে নাহি জানিতাম,
মৌন প্রাণে নিতি তব গীতি শুনিতাম।
একদিন নিশাশেষে তোমারি পরশ,
এনেছিল বহিয়া কি আকুল হরষ!
সেই দিন আঁখি মম ফুটিল ধরায়,
দেখিনু সৌন্দর্য্য হাসি ভরা বসুধায়।
অন্ধেরে দিয়েছ দৃষ্টি মূকেরে বারতা,
মৌনীরে দিয়েছ হাসি প্রীতি মধুরতা।
তুমি জান প্রেমময়, আমি কিবা জানি,
কি আমারে দিলে তুমি কোন্ স্বর্গ ছানি।"
বায়ু কহে "নাহি জানি তোমারি মতন,
আমিও, শুধুই তাহা জানে একজন।
এই হাসি এই প্রীতি যে দিয়েছে প্রাণে,
সেই শুধু জানে, আর কেহ নাহি জানে।"

শ্রীবিভাবতী সেন।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভিক্টোরিয়া হ্রদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার তীরে আমাকে কার্য্যোপলক্ষে অনেকবার যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। উহার একস্থানে এক গ্রামে কয়েক শত সোহালি জাতি বাস করিত। একবার উহাদের গ্রামে যাইয়া যে এক ভীষণ ঘটনা দেখিয়াছিলাম, তাহা এইস্থানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। এইস্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে এই কাহিনী বর্ণে২ সত্য। ইহার মধ্যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নাই।

ঐ গ্রামে একজন রাজা বাস করিতেন। ইংরাজ আমলে তাঁহার ক্ষমতা অনেক কমিয়া গিয়াছিল কিন্তু এখনও অনেক বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বপ্রতাপ অক্ষুন্ন ছিল। প্রায় ১৫ ১৬ খানা গ্রামের অধিবাসীরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। এই গ্রামের প্রায় ৪০ মাইল দূরে, আর একজন রাজা বাস করিতেন অতি প্রাচীন কাল হইতে এই দুই রাজবংশের মধ্যে বিষম কলহ চলিয়া আসিতেছিল। ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ লাগিয়া থাকিত। এখন উহা অনেক হ্রাস পাইয়াছে, তবে একবারে বন্ধ হয় নাই। আমার ঐ গ্রামে যাইবার ছইমাস পূর্ব্বে এক বিষম যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। উহাতে যে কত লোক মরিয়াছিল তাহা আমরা ঠিক জানিতে পারি নাই বটে, তবে আমার আন্দাজ যে প্রায় ৩০। ৪০ জন লোক হত হইয়াছিল। এইস্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, এই প্রকার ব্যাপারে ইংরাজ সরকার প্রায়ই নীরব থাকেন। এ ব্যাপারেও তাহাই হইল। তাঁহারা দেখিয়াও দেখিলেন না।

এই গ্রামের রাজার নাম কম্বাসান্। ঘুলেম্বা তাঁহার এক প্রিয় সহচর। ইহার ন্যায় নিপুণ যুদ্ধা গ্রামে খুব অল্পই ছিল। এইজন্য রাজা ইহাকে খুব ভাল বাসিতেন। এই যুদ্ধের পর ঘুলেম্বাকে আর গ্রামে দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার সঠিক সংবাদ কেহই দিতে পারিল না। তখন রাজা গণৎকারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সে বলিল, "রাজা ঘুলেম্বা মরে নাই। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি সে শত্রুর হাতে বন্দী হইয়াছে। তবে শীঘ্রই সে ফিরিয়া আসিবে।" গণৎকারের কথা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না।

ইহার ছয় দিন পরে প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, এক যুবতী ও একটা বলদ গ্রামে প্রবেশ করিল। বলদের উপর ঘুলেম্বা শায়িত। কিন্তু একি ঘুলেম্বা, না তাহার প্রেত যোনি! অঙ্গের কোনও স্থানে তাহার এক বিন্দু মাংস ছিল না। যাহাকে অস্থিচর্ম্ম সার বলে, ইহা অবিকল তাই। গ্রামের সমস্ত লোক অবিলম্বে উহাদের দুইজনকে ঘেরিয়া ফেলিল। সংবাদ পাইয়া আমিও উপস্থিত হইলাম। ক্রমে ক্রমে সকলে রাজ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ইহার পর ঘুলেশ্বার মুখে যে কাহিনী শুনিলাম তাহা এই—আমি অধিক আঘাত পাই নাই কিন্তু একবারে অনেক লোক আক্রমণ করাতে আমি বন্দী হইলাম। চারি দিনের পর আমরা উহাদের (শত্রুদের) গ্রামে উপস্থিত হইলাম। প্রথমে উহারা আমার একটা নিতান্ত ছোট ঘরে রাখিয়াছিল। দিনের মধ্যে একবার দুইখানা রুটি দিয়া যাইত—আর কিছুই দিত না। চতুর্থ দিনে এক যুবতী নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য লইয়া আমার সেই কারাগারে প্রবেশ করিল। রাত্রি তখন প্রায় ১০টা। উহার সঙ্গে আরও দুইজন স্ত্রীলোক ছিল। ভাবে বুঝিলাম উহারা দাসী। তাহাদের মুখে শুনিলাম যে, যুবতী রাজার ছোট মেয়ে। আমি রাজ কন্যার এই অযাচিত দয়ার কারণ ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, ইহার পর সে কিন্তু প্রত্যহ ৩।৪ বার আমার নিকট আসিতে আরম্ভ করিল। এত দিন পর্য্যন্ত কিন্তু খুব গোপনেই এইসব ব্যাপার চলিতেছিল। ছয় দিনের দিন কথাটা রাজার কানে উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজ কন্যাকে বন্দী করাইলেন এবং আমাকে "মৃত্যুর কূপে" ফেলিয়া দিবার হুকুম দিলেন। সে দিন সমস্ত দিন রাতের মধ্যে কেহই আমার সংবাদ পাইল না। রাজকুমারীকে যে আমি কত ভালবাসি তাহা এতদিন বুঝি নাই। আজ কিন্তু স্পষ্ট বুঝিলাম। সমস্ত দিন অনাহারে থাকার জন্য বিশেষ কষ্ট বোধ হইল না। কিন্তু রাজকন্যার অদর্শনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু উপায় কি ?

পর দিবস প্রাতঃকালে আমাকে ঐ স্থান হইতে বাহির করিয়া প্রথমে কিছু আহার করাইল, তাহার পর চারিজন প্রহরী আমাকে লইয়া রওয়ানা হইল। বেলা প্রায় দু'টার সময় আমরা এক পর্ব্বতের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলাম। খানিকক্ষণ পরে আমরা এক প্রকাণ্ড সুরঙ্গ দেখিতে পাইলাম। প্রহরীরা মশাল প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল। এইবার উহা জ্বালিয়া দিল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আমরা একটা খুব বড় কূপের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, উহার চারিপাশে চারিখানা মোটা কাঠ পোঁতা রহিয়াছে। দুইখানা লম্বা কাঠ আড়াআড়ি ভাবে ঐ চারিটা খুঁটির উপর বসান আছে। একজন প্রহরী ঐ আড়াআড়ি কাঠ দুইখানার ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড দড়ির মই বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিল। তাহার পর উহার সাহায্যে নীচে নামিবার জন্য আমায় হুকুম দিল। দেখিলাম, অস্বীকার করা বৃথা। সুতরাং নামিতে আরম্ভ করিলাম। আন্দাজে বোধ হয়, প্রায় ৭০।৮০ হাত নামিবার পর সিঁড়ি শেষ হইয়া গেল। আমার পশ্চাতে পশ্চাতে একজন প্রহরীও নামিতেছিল। তাহার হাতে মশাল ছিল। সে বলিল, "দড়ি ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া পড়্। জমি খুব নিকটে।" মশালের সাহায্যে দেখিলাম যে, কূপের তলা সত্য সত্যই খুব কাছে। কিন্তু তবু লাফাইতে সাহস হইল না। দাঁড়াইয়া রহিলাম। তখন প্রহরীটা আমার ডান হাতের উপর সজোরে লাথি মারিল। হঠাৎ এই ঘটনায় আমি দড়ি ছাড়িয়া দিলাম এবং সজোরে পড়িয়া গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীটা উপরের দিকে চলিয়া গেল।

কূপটা গভীর অন্ধকারে পূর্ণ। কিছুই দেখিতে পাইলাম না। পড়িবা মাত্র আমার গা গভীর কর্দ্দমে ডুবিয়া গেল। যে দিকে ফিরিলাম সেই দিকেই ঐ ভাব। এদিক ওদিক ঘুড়িতেছি, এমন সময় ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। পাথরের মূর্ত্তির মত নীরব নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু ঐ শব্দ থামিল না বরং বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ ঐ কূপের মধ্যে থাকায় এখন অস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছিলাম। এইবার দেখিলাম, কোনও এক অজ্ঞাত স্থান দিয়া ইষৎ আলো উহার মধ্যে আসিতেছে। কূপটা চতুষ্কোণ, লম্বায় চওড়ায় প্রায় সমান ৭।৮ হাত হইবে। তাহার পর যাহা দেখিলাম, তাহা বোধ হয় জীবনে কখনও ভুলিব না। কূপের চারিদিকে, দেওয়ালের গায়ে, মেজের উপর বড় বড় সাপ। যতদূর মনে আছে, সর্ব্বসমেত ২৭টা সাপ দেখিয়াছিলাম।

দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ ঠিক পায়ের নীচে ফোঁস্ ফোঁস্ শুনিতে পাইলাম। চাহিয়া দেখি, কয়েকটা সাপ আমার চারিদিকে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে। প্রথমেই ছুটিয়া পলাইবার কথা মনে হইল কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলাম, পলাইবার চেষ্টা করা বৃথা। যেদিকে যাইব সেই দিকেই যমদূত রহিয়াছে।

কতক্ষণ এই ভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম বলিতে পারি না, হঠাৎ মস্তকের উপর কি যেন একটা দ্রব্য আসিয়া পড়িল। প্রথমে ভাবিলাম একটা বড় সাপ আসিয়া পড়িল। কিন্তু চাহিয়া দেখি, একটা বড় কোড়া আমার মস্তকের উপর ঝুলিতেছে উহার মধ্যে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য ও এক ঘটি জল রহিয়াছে। উহা যে রাজকুমারীর কাজ তাহাতে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই ঘোর বিদেশে মর্ত্তকা ছাড়া আমার যে আর দ্বিতীয় বন্ধু ছিল না তাহা আমি ভাল করিয়াই জানিতাম। আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহার করিলাম এবং তাহার পর ঝোড়াটা খুব জোরে নাড়িয়া দিলাম। উহা উপরে উঠিয়া গেল।

ইহার ঘণ্টাখানেক পরে একগাছা মোটা দড়ি নামিয়া আসিল। উহার এক হাত অন্তর গাঁট দেওয়া। আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমি উহার সাহায্যে উপরে উঠিতে লাগিলাম। সে সময়ে আমার শরীরে যেন এক অদ্ভুত শক্তির আবির্ভাব হইল। কোথাও কিছুমাত্র বিশ্রাম না করিয়া আমি একবারে উপরে উপস্থিত হইলাম। রাজকন্যা মর্ত্তকা ও দুইজন দাসী এবং একজন দাস উপরে অপেক্ষা করিতেছিল। উপরে আসিবা মাত্র আমার সমস্ত শক্তি লোপ পাইল—আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। ইহার চারি দিন পরে আমার জ্ঞান হয়।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

বিজ্ঞান-মন্দিরে অভিভাষণ।

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সেদিন যে মানস করিয়াছিলাম, এতদিন পরে তাহাই দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য, পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই-একটী মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্যে ছিল, তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। এই আলোটা চক্ষুর অদৃশ্য ছিল, তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করিতে হইবে। শরীর-নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয়, তখন ধাতুনির্ম্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোক রাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্য-নির্ম্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আরো অনেক ঘটনা আছে, যাহা ইন্দ্রিয়েরও অগোচর। তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে, তাহা দুই-একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবন-ব্যাপী সাধনা আবশ্যক। সেই সত্যপ্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহাসত্য, যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও সমস্ত আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না; যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা কর্ত্তব্যসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়াছেন আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদের জন্য।

পরীক্ষা।

যে পরীক্ষার কথা বলিব, তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটী ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদ-জীবনের প্রকৃত সত্য আবিস্কৃত হয়, সেইরূপ একটী মনুষ্য জীবনের বিশ্বাসের ফলদ্বারা বিশ্বাস রাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্য সম্বন্ধে যে দুই-একটি কথা বলিব, তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ,

পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া, তাহা অর্দ্ধ-শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনি শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। তিনি জনহিতকর নানাকার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখ-সম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্রের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল, শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু-দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষাকার্য্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে, সেইসকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারত বাসীরা যে কেবলই ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য্য কোনদিনই তাহাদের নহে, এই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণও এদেশে কোনদিনও হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে, কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে এইসকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথ প্রদর্শক কেহ ছিল না। বিশ বৎসরেরও অধিক একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়-পরাজয়।

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জর্ম্মানীতে আচার্য্য হর্টস বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ কার্য্য আরম্ভ করিয়া-ছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোন প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ যখন পাঠ করি, তখন সভাস্থ কোন সভ্যই আমার কার্য্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না; বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্ত্তমান কালের সর্ব্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার উত্তর পাইলাম; তাহাতে অবগত হইলাম যে, আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এইসকল তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায় হইবে বলিয়া পার্লিয়া-মেন্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণা কার্য্যে নিয়োজিত হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল, তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল! আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সেদিন যে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম; দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একইরূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে

লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল, এবং বিষ প্রয়োগে তাহার সাড়া চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটীর সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত মত বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ব বিদ্যার দুই একজন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, আমার স্বীয় গণ্ডী ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ব বিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতি বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরো দুই-একটী অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধপক্ষে ছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, দ্বাদশ বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল একদিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এইসকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর. বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী পর্য্যটন।

ভাগ্য ও কার্য্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে—তাহার নিয়ম,—উত্থান, পতন আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দ্দিন আমাকে ম্রিয়মাণ করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সেই দুর্যোগও একদিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। বিলাত হইতে আগত জনৈক ইংরেজ একদিন আমার পরীক্ষাগার দেখিতে আইসেন; উদ্ভিদ্‌জীবন সম্বন্ধে যেসকল পরীক্ষা হইতেছিল, তাহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং যে সকল কর্ম্মকার আমার শিক্ষা অনুসারে এইসকল কল নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে চাহিলেন। সাক্ষাৎ হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া বলিলেন, তোমাদের জীবন ধন্য হউক, তোমরাই প্রকৃত স্বদেশসেবক! জানিতে পারিলাম, সেই দিনের আগন্তুক আজ আমাদের ভারতসচিব মণ্টেগু। ইহার পর ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য আমাকে পৃথিবী পর্য্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালিফর্ণিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এইসকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটী দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী; অদৃষ্টে কেবল সহায় ছিলেন, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরম বান্ধব হইলেন।

বীরনীতি।

বর্ত্তমান উদ্ভিদ বিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জর্ম্মাণ অধ্যাপক ফেফারের অর্দ্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোন কোন আবিষ্ক্রিয়া ফেফারের কয়েকটী মতের বিরুদ্ধে। ইহাতে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকটে পৌছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল যে, এ সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই ত চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বীরধর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবান আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি

আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের।

পৃথিবী পর্য্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও দুরূহ। ইহাতে আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যেস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়! আমার কার্য্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন, তাঁহাদের পথ যেন কোনদিন অবরুদ্ধ না হয়।

বিজ্ঞান প্রচারে ভারতের স্থান।

বিজ্ঞান ত সার্ব্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে, যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্য্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে, তাহা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণী আর এই চিরমৌন নিস্তব্ধ অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড় উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক, কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য, পরীক্ষাপ্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে, যে তাহার দুইটি চক্ষু এক সময়ে জাগরিত থাকে না, পর্য্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্ম্মাণকৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য্য ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎঊর্ম্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্ব্বাণ জীবনের বেদনাচাঞ্চল্য মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। স্থিরবৃক্ষের অদৃশ্যবৃদ্ধির মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে, সেই বৃদ্ধি মাত্রা পরিবর্ত্তন, মুহূর্ত্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয় তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ প্রয়োগদ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুসূত্র ও স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে, যে, যে-সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয়, সেই একই কারণে উদ্ভিদস্নায়ুর উত্তেজনা উত্তেজিত অথবা প্রসমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনা প্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান এই স্থানে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম, তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থ-বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন কি মনস্তত্ত্ববিদ্যাও এককেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের যদি কোন বিশেষ তীর্থ বিধাতা ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে এই চতুর্ব্বেণী-সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস।

এই সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহু শাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন ইহাদের বিকাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম, তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটি

মাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্ম্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়, আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞান বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজন মাত্রই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চালয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম হইতে পারে না বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই, এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্য্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তেই আসিয়াছিলাম ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয়, তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্য্যে তাঁহার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ ও পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন, তখনও দুই একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপর এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে আমি যে আশায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। বোম্বাই হইতে দুইজন প্রধান শ্রেষ্ঠী সর্ব্বপ্রথমে মুক্তহস্তে মন্দিরের চিরস্থায়ী ভাণ্ডারে সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপ অপরিচিত ছিলাম। গভর্ণমেণ্টও এবিষয়ে বিশেষ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। এইসকল দেখিয়া মনে হয় আমি যে বৃহৎ সংকল্প করিয়াছিলাম, তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে। জীবিত থাকিতেই হয়তঃ দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রী দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার।

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুই দিক আছে, প্রথমতঃ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এস্থানে কোন বহুচর্ব্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে, সেইসকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্ব্বাগে প্রচারিত হইবে। সর্ব্বজাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকার দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে। এইস্থানে প্রকাশিত আবিষ্কার এইরূপে জগতের সম্পত্তি হইবে এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু এখান হইতে কোন পেটেণ্ট লওয়া হইবে না; কারণ আমি মনে করি, জ্ঞান দেবতার দান, তাহা অর্থলাভের উপায় নহে।

আমার আরো অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎ দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্য্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্চ্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুইদিক আছে, আমরা সেই দুইএর সংযোগস্থলে বর্ত্তমান। একদিকে জীবনের, অপরদিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবন আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি, বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে, তাহা আর উঠিবে না, অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবনব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয়, তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন আমরা। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই আমরা এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্তনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্ত্তনাদবিহীন উদ্ভিদ-জগতে, এই তূষ্ণীভূত, অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতিশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুযন্ত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়ারূপিণী অশরীরী স্বেচ্ছমতা উদ্ভূত হইল। ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজড় কোন্‌টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে, তখন সেইসকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম, তবে ধনধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্ব্বজয়ী নহে; জড়-সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তা প্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্ব্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য, দেশ-বিজয়ে কোন দিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখমোচনের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল, যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্দ্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন, এখন ইহাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্ঘ্য।

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরের গাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্ব্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈবঅস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন, তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্ম্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য, অর্দ্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্ব্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম; কল্য হইতে পুনরায় কর্ম্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি; তাঁহার প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, কিন্তু হৃদয় মন্দিরে। তাঁহার পূজার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বাহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

বিধবার ছেলে।

অন্নপ্রাশনের সময় সকলে পছন্দ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল সুধীর। তখন কিন্তু কেহ ভাবে নাই, যে, পরে ইহার জন্য আপশোষ করিতে হইবে। সে যেন তাহার নামের সার্থকতা ব্যর্থ করিবার জন্যই বদ্ধ পরিকর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সম্পূর্ণ না হউক অনেকটা যে সে সাফল্যলাভ করিয়াছিল একথা স্বীকার করিতেই হইবে। শিশুকাল হইতেই তাহার ধীরতার লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখনই পাড়াটী তাহার প্রভাবে সরগরম ও শঙ্কিত থাকিত।

দ্বিপ্রহরে ছেলেরা যখন ঘুমাইয়া পড়িত, তখন সে নিঃশব্দে রাম চাটুয্যের নস্যির ডিবা হইতে খানিকটা নস্যি লইয়া তাহাদের নাকে গুঁজিয়া ত্বরিতপদে প্রস্থান করিত। রাম শ্যাম গলাগলি ধরিয়া চলিয়াছে, কোথা হইতে সে আসিয়া দুইমাথায় এমনি এক "ঠোক্কর দিল, যে, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বসিয়া পড়িতে হইল। এইরূপ শত সহস্র কার্য্যে সে পাড়ার মধ্যে বেশ একটু খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

কৈলাশ ঘোষ যখন জ্বর প্লীহায় ক্রমাগত দুই বৎসর ভুগিয়া এবং ঘরের ঘটি বাটিটা পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া খাইয়া, অবশেষে হঠাৎ একদিন নেহাত অবিবেচকের মত কোন্ এক অচিন্ দেশে চলিয়া গেল, তখন তাহার বিধবা স্ত্রী বিরজা এহেন সুধীরকে বুকে করিয়া ছিন্নসূত্র ঘুরির মত ভাসিতে ভাসিতে তাহার মামাত ভাই মহেশের দুয়ারে আট্‌কাইয়া গেল।

মহেশ দোকান করিয়া সংসার চালাইত। কন্যা পুঁটী, স্ত্রী চপলা ও নিজে এই তিন জন লইয়া এতদিন তাহার সংসার ছিল। মহেশ লোকটী কিছু ছিটের। মাথায় যে মোটেই উনপঞ্চাশের ভাব ছিলনা একথা কেহ বলিতে পারিবেনা। সময় সময় সে বেশ থাকিত। আবার এক এক সময় একটা ঘূর্ণী বাতাস আসিয়া তাহার লম্বালম্বা চুল শুদ্ধ মাথাটাকে এমন একটা ঝাকুড়া দিয়া যাইত, যে, তখন টিকটিকির ডাকটী পর্য্যন্ত তাহার অসহ্য হইয়া উঠিত।

বিরজার পূর্ব্বজন্মের পুণ্যবলে মহেশের খোস মেজাজের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। মহেশ বিরজাকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, "হাঃ, হাঃ, বিরি, এই এলি? এটী বুঝি তোর ছেলে? হাঃ, হাঃ, হাঃ।" মহেশ খুব হাসিতে লাগিল। ইহাই তাহার খোস মেজাজের লক্ষণ। বিরজা প্রণাম করিয়া বলিল, "বৌ কই দাদা?" "সে তামাক আন্‌তে গেছে। ঘরে তামাক নেই কিনা। তাবোস্, সে এল বলে।" তাহারপর সুধীরের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমার নাম কি, বাবা?" সুধীর এতক্ষণ পুঁটীরপোষা-বিড়ালের পাছে লাগিয়াছিল। বিড়ালটী মেঁও মেঁও করিয়া ঘোরতর আপত্তি করাতেও সুধীর তাহাকে রেহাই দেয় নাই। অকস্মাৎ মামার কথা শুনিয়া যেই সে ফিরিয়া চাহিল, অমনি মার্জ্জারপুঙ্গব পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। সুধীর বড় বিরক্ত হইল; সে মামার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়া পলায়িতের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। তখন বিরজা বলিল, "ওর নাম সুধীর।" "সুধীর— বেশ নাম— সুধীর হাঃ, হাঃ, হাঃ।"

চপলা তামাক লইয়া আসিল। বিরজাকে এইবেশে উপস্থিত দেখিয়া তাহার মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। বিরজা গড়হইয়া প্রণাম করিতেই বলিল, "কখন এলে, ঠাকুর ঝি? তা আমাদের সংবাদ দিতেনেই? তোমার দুঃসময়ের কথাটাপর্য্যন্ত আমরা শুনিনি।" তারপর ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছেলেটি আননি?" "এসেছে বইকি, বৌ, কার কাছে আর রেইখে আস্‌ব?" এমন সময় সুধীরচন্দ্র আসিয়া ভয়ানক উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, পাজি বিড়াল কোথাকার; দেখ, মা, কেমন করে' আচড়ে দিয়েছে, তা আমি আগেই বলে রাখ্‌ছি, এ বিড়াল আমি মেরে খুনকর্ব্ব, তবে ছাড়্‌ব।" বিরজা বলিল, "আচ্ছা; এখন মামীমাকে পেন্নাম কর্।" চপলার ঝিঙ্গা বিচির মত গায়ের রং দেখিয়াই তাহার ভক্তি ছুটিয়া গিয়াছিল। তাই সে বক্র হইয়া দাঁড়াইল। চপলা তাহাকে টানিয়া বুকের কাছে নিল। বেশী দিন হয় নাই সুধীরের মতই তাহার ছেলেটি জলে পড়িয়া মারা গিয়াছে। সুধীরকে দেখিয়া তাহার বুকের মাঝে রুদ্ধ মাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল। চপলা সুধীরের মাথায় হাত রাখিয়া শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চাহিল।

সেই শরতের শান্ত উজ্জল প্রভাতে দ্যুলোকে ভূলোকে একটা মধুর মহিমা ছড়াইয়া পড়িতেছিল। উষার ম্লানিমাটুকু তখন ধীরে ধীরে চক্ষুর সম্মুখে একটা মহান্ স্বপ্নরাজ্য সুনিপুণ চিত্রকরের মত আঁকিয়া দিতেছিল। আর ইহারই মধ্যে শোকসন্তপ্তা পুত্রহীনা জননী তাপিত বক্ষে সুধীরকে চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চপলার চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল। আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিয়া বলিল, "ঠাকুর ঝি, তুমিত এখানে থাক্‌বে বলেই এসেছ?"

"থাক্‌ব বলেই এসেছি, বৌ, নইলে আমার মত অভাগীর জাগা কই?"

(২)

দুইদিন পার হইতে না হইতেই সকলে বুঝিল, সুধীর লঙ্কা ফেরতের একটি রাজসংস্করণ। দুই দিনের মধ্যেই

সে পাড়ার সকলকে তাহার আগমন ও তাহার কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিয়া আসিল। পাড়ার জগৎ চক্রবর্ত্তী আহারান্তে চক্ষু বুজিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিল; সুধীর এক মৃত ভেক সম্বলিত লম্বমান রজ্জু তাহার শিখার সহিত দৃঢ়রূপে সংযোগ করিয়া দিল। পরে "চক্রবর্ত্তী মহাশয়, পেন্নাম" বলিয়া তাহাকে সজাগ করিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া পলায়ন করিল। জগৎ চক্রবর্ত্তী লাফ দিয়া উঠিয়া তখনই মহেশের বাড়ীর দিকে চলিল। পথে সকলে তাহার অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া তাহার ক্রোধের মাত্রাটা আরও কিছু বাড়াইয়া দিল। চক্রবর্ত্তী বাহির বাড়ী হইতেই গলা ছাড়িয়া ডাকিল, "মহেশ, বলি তুমি এসব বানর জুটালে কোত্থেকে? দেখত আমার কি করেছে।" মহেশ হুকা হস্তে বাহির হইয়া আসিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসি দেখিয়া চক্রবর্ত্তীর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল, হাসছিস আমার অপমান দেখে হাস ছস্? ভাল হবে না বলছি, নির্ব্বংশ হবি; তিন রাত্রি পার হবে না।"

মহেশ একেত ছিটের মানুষ, তারপর এই সকল গালি শুনিয়া আর ঠিক থাকিতে পারিল না, "তবেরে বামুন, বের আমার বাড়ী থেকে" বলিয়া নেকড়ে বাঘের মত তাহাকে তাড়া করিল। "কি আমায় মারবি? আঁ্যা আমার মারতে চাস্? তোর হাতে কুষ্ঠ হবে না? জানিস্ এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠে, এখনও দিনরাত হয়।" চক্রবর্ত্তী হাতে পৈতা জড়াইতে লাগিল। এমন সময় চপলা আসিয়া মহেশের হাত ধরিয়া ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। বিরজা এই সকল দেখিয়া আচ্ছান্ন মত দাঁড়াইয়া রহিল। সে লজ্জায় মরিয়া গেল।

দিন কয়েক পড়ে বামুনপাড়ার নিস্তারিনী পিসি কতকগুলি কর্ত্তিত কুমড়া ও লাউ গাছ হাতে করিয়া আসিয়া চপলাকে বলিল, "দেখত, বৌ, তোমার ভাগ্নে আমার কি করেছে—আমি কত কষ্টে এগুলি সৃষ্টি করেছি।" এমন সময় বিরজা আসিয়া বলিল, ওগুলি কি পিসী? এগুলি এমন করে কাট্লে কে?" "দেখ্, বিরি তোর ছেলের কাণ্ডখানা। সবেমাত্র ফুল হয়েছিল, মনে করলুম সবাইকে দিয়ে থুয়ে খাব। তা না, কি করেছে, দেখে শরীর জ্বলে যায় কিনা? ছেলে নাত দস্যি।" এই বলিয়া পিসি রেগে হন্হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

সুধীর রান্নাঘরে বসিয়া খাইতেছিল, আর পুঁটীর থালার মাছখানা কিরূপে আত্মসাৎ করিবে তাহা ভাবিতেছিল। এমন সময় বিরজা যাইয়া তাহার চুল ধরিয়া হিড়্হিড় করিয়া বাহিরে টানিয়া আনিল। তাহার পর কীল, চড় তাহার পিঠে অজস্র বর্ষণ হইতে লাগিল। চপলা আসিয়া তাহাকে ধরিল, নচেৎ তাহার অদৃষ্টে যে কি ছিল বলা যায় না।

এতটা মারিবার ইচ্ছা বিরজার ছিল না। সারা দিন তাহার তাহার চিত্তটা অনুতাপে পুড়িয়া যাইতে লাগিল। রাত্রে কোলের কাছে আনিয়া দেখিল, মারের চোটে সুধীরের সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া গিয়াছে। তাহার পাজর ফাটিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "বল্ত বাবা, কেন এমন করিস্? তুই যে আমার বুকের সোণা। লোকে তোকে মন্দ বলে, এযে আমার বুকে শেল হয়ে বিঁধে। এখন একটু শান্ত হ বাবা। কেন তুই এমন হলি।"

(৩)

দিন পনের পরে জ্বরেরচোটে সুধীর ভুল বকিতেছিল, "মা, আর কখনও এমন কর্‌ব না। এখন হতে ভাল হব মা।"

পাড়ার সকল মেয়েরা তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিল। ক্ষীরোদা বলিল, "তা বলে কি এম্নি করে চুবাতে হয়? এখন ভালয় ভালয় সেরে উঠ্‌লেই হয়।" তারিনী বলিল, "বিরিও কি অন্যায় দেখ দেখি। ছেলে মানুষ না হয় পুটীকে ধাকা দিয়ে ফেলে দিয়েছেই, তা বলে কি এম্নি করে খুন কর্‌তে আছে? সাত দিন ধরে জ্বর; একবারও জ্ঞান হচ্ছে না। ছেলে যদি না বাঁচে তবে এই চুবানের মজা বুঝ্‌বেন।" মেয়েরা যার যার অভিমত প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল।

বিরজার প্রাণের মাঝে তুফান বহিতেছিল। ঠাকুর কুটিয়া বলিতেছিল, ঠাকুর অনাথার ধন ফিরিয়ে দাও। বাছা আমার অভিমান করে চলে যাচ্ছে; তার অভিমান ভেঙ্গে দাও। ঠাকুর আর যে পারিনে। আমার উপর স্বামী যে ভার দিয়ে গেছেন সে যে আমি আপন দোষে হারাতে বসেছি। ঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি, আমার বুকেরধন ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও ঠাকুর, ফিরিয়ে দাও।

সমস্ত রাত্রি সুধীর কেবল বলিল, "মা আর এমন করব না। এখন হতে ভাল হব মা।"

ভোরে কান্নার রোল শুনিয়া জগৎ চক্রবর্ত্তী গলা বড় করিয়া বলিল, তখন বলি নাই যে তিন রাত্রি পার হবে না? ব্রহ্মশাপে স্বর্গ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, এ ত কোন্ ছাড়।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

ময়মনসিংহ সিটিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত দ্বারা মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

সৌরভ

ষষ্ঠ বর্ষ } ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩২৪। { চতুর্থ সংখ্যা।

বেদের সঙ্গে এক নিমেষ।

প্রথম পরিচয়েই কাহারও সম্বন্ধে মনে যে ধারণা হইয়া যায়, অনেক সময় তাহা এতই ঠিক হয় যে, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রথম দর্শনে বস্তুটাকে আমরা সমস্ত ভাবে দেখি, আণবিক বিশ্লেষণের সময় তখন হয় না, এবং সেই জন্যই বোধ হয় প্রথম দর্শনের স্মৃতি এত দীর্ঘায়ু এবং এত ঠিক হয়। কোনও বস্তুর দোষ গুণ রামায়ণের পরীক্ষার মত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গিয়া হয়ত আমরা খুবই বিজ্ঞ হই, কিন্তু তাহাতে অনেক সময়ই বস্তুটার প্রকৃত আমরা হারাইয়া ফেলি। এই কথাটা কোনও সুন্দর বস্তুর সম্বন্ধে আরও সত্য। সুন্দরের গুণ রাশির এক একটী করিয়া বিস্তৃত বিচার করিলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ ঘটে বটে, কিন্তু সুন্দরের সৌন্দর্য্য তাহাতে কোথায় উধাও হইয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই।

তেমনই বেদের সঙ্গে কাহারও যখন প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে তখন তাহার মনে যে আনন্দের ধারা বহিয়া যায়, তাহাই প্রকৃত পক্ষে বেদের সাহিত্যের স্বরূপ। পরে, আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে হয়ত আমরা জানিতে পারি, ইহাতে বহু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে বহু দেশ-বিদেশের বর্ণনা, বহু শ্রেণী ও পরিবারের কাহিনী, বহু আচার নিয়মের বিবরণ, বহু শত্রুতা মিত্রতার বৃত্তান্ত ইহার অঙ্গপুষ্টি করিয়াছে; এবং হয়ত, মানব জাতির আদিম অবস্থা, তাহার আদিম আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষা তাহার সচরাচর অবস্থার দীর্ঘ ভ্রমণ-কাহিনী, তাহার যুদ্ধ বিগ্রহের ও সাম-দানের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন ইতিহাস আমরা ইহা হইতে সংগ্রহ করিতে পারি; এবং এই সকল জানিয়া হয়ত আমরা প্রাজ্ঞ হইতে পারি হয়ত বা পাণ্ডিত্যের বোঝা আমাদিগকে একবারে অভিভূতও করিয়া ফেলিতে পারে; কিন্তু তাহাতে বেদের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইলেও, বেদের প্রাণকে আমরা চিনিতে পারি না। বিশ্লেষণ-জাত অণু জ্ঞান সমষ্টির পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখাইতে পারে না। সুতরাং কাহারও যদি বেদের স্বরূপ জানিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে উহা পূর্ণ সমষ্টি রূপেই দেখিতে হইবে একটী মাত্র সংহত শিল্প বস্তু বলিয়াই ভাবিতে হইবে, পৃথক্ পৃথক্ অংশ পৃথক্ পৃথক্ বাক্য ও উক্তিকে আলাদা করিয়া দেখিলে চলিবে না। এই ভাবে দেখিতে গেলে বেদের সাহিত্যকে কেমন দেখায়? এক কথায় উত্তর, প্রাণময়। এমন জিজ্ঞাবিষা, এমন আনন্দ, এমন 'Joy of life' পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্য দেখাইতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। প্রকৃতির গিরিকন্দর, নদনদী, আকাশ বাতাসের সহিত এমন মৈত্রী, এমন অন্তরঙ্গ ভাব আর কোথাও মানুষের ইতিহাসে দেখা দিয়াছে কিনা, জানি না; শৈশব ও যৌবনের এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ শিশুর হাসি ও আনন্দ এবং যৌবনের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার এমন মিলন আর কোথাও দেখা দিয়াছে কিনা জানি না। চারিদিকে যে সকল বস্তুর সহিত আমাদের সর্ব্বদারতরে সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে সকলের দিকে চাহিয়া এক সঙ্গে এমন বিস্ময় ও ভয়, এমন ভক্তি ও আনন্দ এমন প্রীতি ও বাৎসল্য, আর কখনও মানুষ অনুভব করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

এখনও আমাদের ঘরে বাইরে, কলে কারখানায়, রেলে ষ্টিমারে আগুন বর্ত্তমান রহিয়াছে, এখনও তাহার শক্তিতে আমাদের কাজ হাসিল হইতেছে; কিন্তু বেদের ঋষির নিকট এই অগ্নিই ছিলেন দেবতা, এই অগ্নিকে দেখিয়াই তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া গাহিয়া উঠিতেন

'অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে'

হে অগ্নি, তুমি আমাদিগ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া দেবতাদিগকে হব্য দান করিবার জন্য এবং নিজে পুরোডাশাদি ভক্ষণ করিবার জন্য আগমন কর।

এই অগ্নিকে সম্বোধন করিয়াই তিনি বলিতেন, 'ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ নাহি বিশ্বস্যা অরাতেঃ উত দ্বিষো মর্ত্তস্য'।

হে অগ্নি, তুমি আমাদের পূজা গ্রহণ করিয়া সমস্ত অরাতিকুল হইতে, বিশেষ করিয়া মানুষ শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

বেদের ঋষির নিকট দেবতা ইন্দ্র নিকট আত্মীয় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন,

'ভিন্ধি বিশ্বা অপ দ্বিষঃ পরি বাধো জহী মৃধঃ বসু স্পার্হং তদা ভর'।

হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের সকল শত্রু বিনাশ কর; আমাদের বিরুদ্ধে সকল সংগ্রাম তুমি বিফল (নষ্ট) করিয়া দাও; আর শত্রুদের সকল স্পৃহনীয় ধন তুমি আমাদের হস্তগত করিয়া দাও।

বেদের ঋষির নিকট 'উপহ্বরে, গিরীণাং সঙ্গমে চ নদীনাম্ ধিয়া বিপ্রো অজায়ত'—গিরিকন্দরে ও নদী সঙ্গমে মানব কর্ত্তৃক স্তুত হইবার জন্য ইন্দ্র আবির্ভূত হইতেন। তাঁহার নিকট, 'ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে'—বিষ্ণু তিন জায়গায় পদ স্থাপন করিয়া সমগ্র জগৎ পরিক্রমণ করিতেন এবং তাঁহার পাদক্ষেপোত্থিত রজোরাশির ভিতর সমস্ত জগৎ সমূঢ় হইত।

নিশাশেষে পূর্ব্বদিক্ অরুণরাগে রঞ্জিত হইলে বেদের ঋষি দেবী উষার আবির্ভাব দেখিতে পাইতেন এবং আনন্দে অধীর হইয়া তিনি গাহিতেন,

'এষ উষা অপূর্ব্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ'

এইযে সূর্য্যপ্রিয়া উষা, পূর্ব্বে ইনি ছিলেন না, এখন কিরণ দান করিতে করিতে আবির্ভূতা হইতেছেন।

এমন ভাবে প্রকৃতির সহিত মৈত্রী আর কোনও বড় দেখাইতে পারে নাই। ইউরোপেও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রবেশ করার পূর্ব্বে তেমনই দেবদেবীর লীলায় আকাশ বাতাস সজীব ছিল, লোকের কল্পনায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড একটা প্রাণহীন শুধু বৈজ্ঞানিকের কল কব্জায় ভরা যন্ত্র মাত্র ছিল না। কিন্তু তথাপি সেখানে এমন একটী আনন্দময় সাহিত্য ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। আইস্ল্যাণ্ডের সাগা-সাহিত্য অডিন্ (Odin) থরের (Thor) কাহিনী, এবং প্রাচীন গ্রীক্ সাহিত্য প্রভৃতিতে আমরা মানব জাতির এমনই একটা কৈশোর বয়সের পরিচয় পাই বটে, কিন্তু সে সকলের ভিতর যুদ্ধ বিগ্রহ খুন খরাবি এত রহিয়াছে যে, তাহার আনন্দ ঠিক উষার উদয়ের আনন্দ নয়।

বেদের সাহিত্যের এই বিশেষটুকু ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ইহার সহিত আরও কয়েকটী সাহিত্যের তুলনা করা দরকার। এবং মনে হয়, গ্রীক্ সাহিত্য হিব্রু সাহিত্য, আমাদের দেশের বৈষ্ণব সাহিত্য, ও ইউরোপের বর্ত্তমান সাহিত্য এই বিষয়ে সকলের চেয়ে বেশী উপযোগী।

গ্রীকদের সাহিত্যে যে একটা হাসি, বাঁচিয়া থাকার একটা আনন্দ যে রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু সেখানে ইহার সঙ্গে ট্রাজেডিও (Tragedy) রহিয়াছে—অলঙ্ঘ্য বিধির বিধানে মানুষে সকল উচ্চ আশা, তাহার পূর্ণ আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা যে চূর্ণ হইয়া যাইতে পারে, ইস্কাইলাস (Arschylus), সোফোক্লিস (Sophocles) প্রভৃতি এই সত্যকে লিয়াই ব্যস্ত ছিলেন; জগতের গতি যে ব্যক্তির মতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারে, বড় হইয়া জগতের উপর আধিপত্য করিবার যে লালসা মানুষ হৃদয়ে পোষণ করে, চণ্ডী বিশ্বশক্তি কেমন করিয়া তাহা নিমিষে নিষ্ফল করিয়া দিতে পারে, প্রমিথিউসের (Prometheus) বন্ধন দণ্ডের বর্ণনায় ইস্কাইলাস তাহাই ভীম মূর্ত্তিতে প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হোমারে যদিও দেবতারা মানুষের সঙ্গে মেলা মেশা করিয়া থাকেন, তবু সেখানে ও অদৃষ্টের উপহাস রহিয়াছে, সেখানেও ক্ষুদ্র মানবশক্তি প্রচণ্ড বিশ্বশক্তির সহিত ঘাত প্রতিঘাতে খর্ব্ব হইয়া

আসিতেছে, এবং এই জন্য সেখানেও আনন্দের মধ্যেই একটা বিষাদের ছায়া ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। ভ্রাম্যমাণ ইউলিসিসের (Ulysses) দীর্ঘ, প্রবাস, এবং নানাবিধ অবস্থার ভিতর দিয়া গমন, পাঠকের নিকট বিষাদ মধুর হইলেও লেখকের হৃদয়ের শুধু আনন্দই ইহাতে প্রকাশ লাভ করে নাই। সুতরাং গ্রীক্‌দের জীবনে দেবতাদের লীলা খেলা থাকিলেও তাহা শুধু আনন্দেরই মেলা নহে।

কি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, কি দৃঢ় বিশ্বাস, কি দৃপ্ত আত্ম-নির্ভর এবং যেহোবার সঙ্গে কি একটা প্রকট সৌহার্দ্দ য়ীহুদীদের হৃদয়ে বর্ত্তমান ছিল, তাহা যিনি বাইবেল পড়িয়াছেন তিনিই অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু যেখানেও এক জনের পর আর এক জন প্রেরিত পুরুষ সেই সিনাই পর্ব্বতের প্রথম চুক্তি ভঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন—আর যেহোবার ক্রোধ কেমন প্রচণ্ড, তাহাতে পড়িলে সমস্ত জাতি কেমন ভস্ম হইয়া যাইবে, তাহারই ভীষণ চিত্র জাতিটার সম্মুখে ধরা হইতেছে। অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভগবানের সঙ্গে একটা দৃঢ় মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা ইহুদীদের হৃদয়ে ছিল;—নিজের জীবনটা ভগবানেরই অনুশাসন অনুসারে গঠিত করিয়া, ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিয়া নিজে প্রসন্ন হইবার একটা আকাঙ্ক্ষা যে তাহাদের ছিল, এবং এই হেতু অনেক নীতি-কথাই যে তাহারা বিশ্ববাসীকে শুনাইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তথাপি এ সাহিত্যও শুধু আনন্দের ছবিই নয়—ইহা শুধু আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনারই প্রকাশ নয়;—প্রচ্ছন্ন সলিলা ফল্গুর মত এক ভীতির স্রোত ইহার ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

মানুষের জীবনের সকল সম্বন্ধ, তাহার, সকল অনুভূতি যে ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়াও হইতে পারে তাহা দেখানই বোধ হয় বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশেষত্ব। সুতরাং ইহাতে মানব জীবনের মিলন বিরহ, অনুরাগ বিরাগ, আনন্দ ও বিষাদ, সবগুলই ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং এই জন্যই, ইহা শুধুই একটা সরল নির্ম্মল আনন্দের প্রবাহ মাত্র নহে; ইহাতে মান অভিমান আছে, শঠতা কপটতা আছে, গ্রহণ বিসর্জ্জন আছে; ইহার কেন্দ্র স্বয়ং ভগবান্ হইলেও তিনি 'কি তব' সম্বোধনে অভিহিত হইতে পারেন;—এক কথায়, মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা, সকল অনুভূতি ইহাতে রহিয়াছে, এবং সেই জন্যই, ইহা শুধু শিশুর হাসি নহে, ইহা পূর্ণ বয়সের জীবনের বিস্তৃত ছবি।

শিশু যেমন শুধুই হাসে, অথচ কেন হাসে তাহা সে নিজেই জানে না, তেমন হাসি বৈষ্ণব সাহিত্যে নাই, কিন্তু বেদে আছে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আমরা অনেক জিনিষই পাইতে ইচ্ছা করি' এবং না পাইলে দুঃখিত হই, অভিমান করি,—যে কারণে পাই না,' তাহার উপর রাগ করি; কিন্তু শিশু যাহা চায় তাহারা মূল্য জানিয়া সে চাহে না, এবং একটা না পাইলে ক্ষুব্ধ না হইয়া আর একটা সে গ্রহণ করিতে পারে; তাহার আনন্দের প্রবাহ এতই বেশী, যে, দুঃখ লজ্জা পাইয়া মাথা লুকাইয়া রাখে। ঠিক এমনই অনাবিল আনন্দ বেদের সাহিত্যে পাই। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের আনন্দ প্রৌঢ়ের আনন্দ; সেখানে আকাঙ্ক্ষা তীব্র, কিন্তু কেন্দ্রী ক্বত; যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহার বিহনে তেমনই তীব্র বিলাপের সুর সেখানে বাজিয়া উঠে। ক্ষুদ্র হাসিটী অধরে লইয়া দুই হাত উড়াইয়া শিশু চাঁদ ধরিতে চায়, তাহার আনন্দের ঢেউ দিগন্তে ছুটিয়া যায়,—কিন্তু চাঁদ যে ধরা দেয় না, এই কথা ভাবিয়া শিশু খেদ করিতে জানে না। বেদ ও তেমনই কত কিছু চাহিয়াছেন, তার অন্ত নাই, তথাপি খেদ কখনও করে নাই। কিন্তু প্রৌঢ় বৈষ্ণব সাহিত্য অভিমানের বোঝায় ভারী হইয়া রহিয়াছে; আকাঙ্ক্ষার আঘাত লাগিলে সে মুখ ভারী করিতে জানে।

ইউরোপের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে যিনি বেদের দিকে চোখ ফিরাইবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে, কি একটা নির্ম্মল আনন্দ বেদের সাহিত্যে রহিয়াছে। ইউরোপে আজ একটা দুঃখবাদ সাহিত্যে প্রকাশ লাভ করিতেছে; অস্বাভাবিক উত্তেজনা না হইলে মানুষ আর শুধু বাঁচিয়া থাকিয়াই আনন্দ পায় না; সুতরাং কলা

শিল্প নানা বিসদৃশ উপায়ে মানুষকে সুখ দিবার জন্য ব্যস্ত; আর যেখানে পাপপুণ্যের একটা ভীষণ কলহ রক্ত-রঞ্জিত পটে চিত্রিত হইতেছে; সমাজের অবিচার, আইনের অবিচার, নারীর অনধিকার, পতিত্বের জুলুম, প্রভৃতি সেখানে এখন সাহিত্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা, সহজ প্রবৃত্তির সহিত সমাজ-বন্ধনের সংঘর্ষ সেখানে এখন অত্যন্ত বিবেচ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রবৃত্তি চায় ভোগ; কোনও নিয়মের অধীন ভোগ সে চাহেনা, সে চাহে অনিয়ত অবদ্ধ, স্বাধীন ভোগ সমাজ-বন্ধন তাহা দিতে চায় না; তাই সমাজের শাসন কতদূর মানা উচিত, এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত সম্বন্ধে ব্যক্তির অধিকার কত, ইত্যাদি প্রশ্ন এখন সেখানকার সাহিত্যের বিষয় হইয়াছে। ইংলণ্ডেআর্থার পিনারো গলস্‌ওয়ার্দ্দী হইতে আরম্ভ করিয়া বার্ণার্ড শা পর্য্যন্ত, আর ম্যাটারলিঙ্ক (Materlink) হইতে জোলা (Zola) পর্য্যন্ত টলষ্টয় (Tolstoy) ইব্‌সেন (Ibsen) হইতে আরম্ভ করিয়া স্যুডারম্যান্ (Sudermann) হোপ্টম্যান (Hauptmann) পর্য্যন্ত, সকলেই এখন এই সকল সমস্যাকেই সাহিত্যের বিষয় করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং এ সাহিত্য শুধুই একটা আনন্দ মাত্র প্রকাশ করিতেছেনা, উষার আনন্দ আকাশ বাতাসের আনন্দ লইয়া প্রকৃতির দেবদেবীরা এখন কোথায় সরিয়া গিয়াছেন, তাহার সন্ধান নাই; বৃদ্ধের কূট তর্ক, অভিজ্ঞের জটিল সমস্যা, সামাজিকের বিচার বিতণ্ডা লইয়াই এখন ইউরোপের সাহিত্য ব্যস্ত; শিশুর অকারণ হাসি, অনাবিল আনন্দ লইয়া দেবতাদের সঙ্গে শুধু খেলা করিতে আর এখন সে পারে না।

তাজ দেখিয়া আসিলে কাহাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাজের স্বরূপ কি; তাহা হইলে এক কথায় সে তাহার মনের সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারে না; তেমনই এক নিমেষেই বেদের স্বরূপ বর্ণনাও শেষ করা যায় না। তবে উহার দিকে চাহিবা মাত্রই যে একটা আনন্দের ছবি, যে একটা হাসি খুসি আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেখা দেয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পাপ পুণ্যের বিচার সামাজিক অনুশাসনের মূল্যবিচার প্রভৃতি ইহার এই আনন্দকে বক্রগতি করিয়া দেয় নাই; ঐতিহাসিক তথ্য ইহাতে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলাই ইহার উদ্দেশ্য নহে; সামাজিক আচারের ইতিবৃত্ত লিখিবার উপাদান ইহাতে মিলিতে পারে, কিন্তু তাহাই উহার বিষয় নহে; বাইরের বিশ্ব প্রকৃতির দিকে যখন মানুষ চোখ ফিরাইয়া চাইতে পারিল, তখন যে কি একটা সমস্যার আবিলতা-শূন্য আনন্দ সে উপভোগ করিয়াছিল, যে একটা দেব-লীলা বিশ্ব জুড়িয়া সে দেখিয়াছিল, বেদ তাহারই বর্ণনা।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

..সের সিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এদেশের অনেক স্থানে নরবলি প্রচলিত আছে। আফ্রিকায় অবস্থান কালীন এ প্রকার কয়েকটি ঘটনা আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে দুইটি আমি সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

একদিন আমি কার্য্যোপলক্ষে সেন্‌গো (ইউগণ্ডার রাজধানী) হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে গিয়াছিলাম। তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে বসিয়া আছি, এমন সময় বার তের বৎসরের এক বালককে সঙ্গে করিয়া এক বৃদ্ধা উপস্থিত হইল। বৃদ্ধার মুখে যাহা শুনিলাম তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই :—বালকের বাড়ী ঐস্থান হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে। এক বৃদ্ধা মাতা ভিন্ন সংসারে উহার আর কেহই নাই। একদিন দ্বিপ্রহরের সময় দুইজন লোক বালককে কাজ দিবার লোভ দেখাইয়া সঙ্গে লইয়া যায়। উহারা উহাকে সঙ্গে করিয়া ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হয়। গ্রামের দলপতি এক বৃদ্ধ। বালককে উহারা দলপতির নিকট উপস্থিত করিলে, তিনি উহাকে এক ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখেন।

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় দলপতির বাড়ীতে গ্রামের অন্যান্য অনেক লোক উপস্থিত হইল, এবং সকলে মিলিয়া নৃত্যগীত ও মদ্যপান করিতে আরম্ভ করে। যখন সকলে

বেশ মাতাল লইয়া উঠিল, তখন বালককে ঐস্থানে লইয়া আসা হয়। গ্রাম্য জুজু মহাশয় খানিকটা মন্ত্র পড়িয়া বালকের সর্ব্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিল, এবং কয়েকজন লোক সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া উহার চারিদিকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। অবশ্য বাদ্য করা ঐ সময় নীরব ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে একখানা বৃহৎ ছোরা আনীত হইল। তখন জুজু দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "এ বৎসর আমাদের গ্রামের ফসল ভাল হয় নাই। ইহা ছাড়া গ্রামের মধ্যে বসন্ত দেখা দিয়াছে। আমার উপর দেবতার আদেশ হইয়াছে যে, একটি ছোট ছেলের বুকের রক্ত ভিন্ন তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না। যতদিন পর্য্যন্ত না উহা না পাইতেছেন; ততদিন গ্রামের মঙ্গল নাই।' ইহার পর সে বালককে বলিল, "গ্রামের মঙ্গলের জন্য তোমায় বলি দিতে হইবে। তুমি দুঃখ করিও না। দেবতার জন্য তোমায় বলি হইবে। পরজন্মে তুমি রাজা হইয়া জন্ম লইবে।" বালক এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধভাবে বসিয়াছিল। এক্ষণে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু উহার প্রতি কর্ণপাত করা কেহই আবশ্যক মনে করিল না।

এ দেশের নিয়ম, বলিদানের পূর্ব্বে বলিকে স্নান করাইতে হয়। তদনুসারে জুজু, দলপতি ও আর একজনকে বালককে স্নান করাইবার আদেশ দিল। ঐ স্থানের নিকটেই এক পুষ্করিণী আছে। উহারা দুইজনে বালককে লইয়া প্রস্থান করিল। ঐ স্থানের ঠিক পশ্চাতেই ঐ পুষ্করিণী। উহার চারিদিক জঙ্গলে আচ্ছন্ন। উহারা দুইজনে বালককে লইয়া জলে নামিতেছে এমন সময় একটা বাঘ জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া সবেগে দলপতির উপর পড়িল। অন্য লোকটা এই ব্যাপারে মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রাহল তাহার পর বিকট স্বরে চীৎকার করিতে২ সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইল। অবশ্য ইহার পর বালক আর সেখানে অপেক্ষা করিল না। সেও একদিকে পলায়ন করিল। পথিমধ্যে উপরোক্ত বৃদ্ধার সহিত উহার সাক্ষাৎ হয়। বালক উহার দুই পা জড়াইয়া ধরে এবং ঐ ভীষণ কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করে। তখন পর্য্যন্তও ভয়ে সে কাঁপিতেছিল। বৃদ্ধা তাহাকে অভয় দান করে এবং আমার নিকট লইয়া আসে।

নরবলি কার্য্যে অনেক সময় ইহারা গ্রামের বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদিগকে হত্যা করিয়া থাকে। একবার এক গ্রামে মড়ক আরম্ভ হয়। জুজু মহাশয় স্থির করেন যে গ্রামের দেবতা বিশেষ চটিয়াছেন—নরবলি না পাইলে তিনি গ্রামের সর্ব্বনাশ করিবেন। তখন গ্রামের মোড়ল মহাশয়েরা বলির জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এখন ঠিক ঐ সময়ে প্রধান মোড়লের জননী অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া একবারে অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্য তিনি অম্লান বদনে প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহার মাকে বলি দেওয়া হউক। বলা বাহুল্য তাঁহার ঐ প্রস্তাব অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইল। এইস্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, এ দেশের লোকের বিশ্বাস, যাহাকে এইভাবে বলি দেওয়া হয়, সে অনন্ত কাল দিব্য লোকে বাস করে। তাহাকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। এইজন্য অনেক প্রাচীন লোক স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। আমাদের দেশে দধিচি দেবতাদিগের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে অমর হইয়াছেন। এ দেশে কিন্তু এ প্রকার ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে। বলিদানের জন্য অনেক সময় এ দেশের দরিদ্রেরা নিজের সন্তান বা অন্য কোনও নিকট আত্মীয়কে বিক্রয় করিয়া থাকে।

এ দেশে এক শ্রেণীর জুজুরা নাকি প্রয়োজন হইলে যখন তখন বৃষ্টি আনয়ন করিতে পারে। ইহারা অমাবস্যার রাত্রে জঙ্গল হইতে কতকগুলা বাঁশের পাতা কাটিয়া আনিয়া রাখিয়া দেয়। যখন বৃষ্টি পড়ান প্রয়োজন হয়, তখন উহারা ঐ পাতাগুলাকে মন্ত্রপূত করিয়া জলে ভিজাইয়া দেয় বা উহাদের উপর জল ছড়াইয়া দেয়। ইহার পর নাকি বৃষ্টি না হইয়া থাকিতে পারে না। কেহ কেহ মন্ত্রপূত জল এক ঘটি পান করিয়া ফেলে। তাহার পর সে যতবার প্রস্রাব করিবে ততবার বৃষ্টি পড়িবে।

একবার সংবাদ পাইলাম যে, মেন্‌গো হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে এক নরহত্যা হইয়া গিয়াছে।

ঘটনাটা নূতন ধরণের। ঐ গ্রামে বৃষ্টি না পড়াতে চাষার বড় ক্ষতি হইতেছিল। সেইজন্য গ্রামবাসীরা অন্য এক স্থান হইতে এক প্রসিদ্ধ বৃষ্টি করান জুজুকে আহ্বান করে। বৃষ্টিপাত করাইবার জন্য তিনি কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া নানা প্রকার অনুষ্ঠান করেন। ঐ গ্রামে সমিনো নামক এক যুবক বাস করিত। সে পাদরিদের স্কুলে কয়েক বৎসর পড়িয়াছিল বলিয়া এ সমস্ত ব্যাপারে আদৌ আস্থাবান ছিল না। এইজন্য প্রায়ই গ্রামবাসীদিগের সহিত তাহার খুঁটিনাটি চলিত। গ্রামবাসীরা যখন জুজু মহাশয়কে লইয়া ব্যস্ত, তখন সে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জুজুকে উপহাস করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে জুজু অবশ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েন এবং বলেন যে তাহার ঐ উপহাসের জন্য তিনি এমন ভয়ানক বৃষ্টি আনয়ন করিবেন যে দেশের সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহাতে সমিনো উত্তর দেয়, "তুমি একটি প্রকাণ্ড গাধা তাই এমন কথা বলিতেছ! তুমি কি দেবতা যে, যখন তখন বৃষ্টি করাইতে পারিবে? দেবতা ভিন্ন আর কেহ বৃষ্টিপাত করাইতে পারে না। গ্রামের লোকেরা নিতান্ত মুর্খ তাই তোমার এই সব জুয়াচুরিতে বিশ্বাস করে।" এই প্রকার আরও কতকগুলা বাজে কথা শুনাইয়া সে চলিয়া যায়।

কিন্তু ঘটনা ক্রমে ঐ দিন অপরাহ্ন হইতে ঐ গ্রামে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করে। শেষটা বৃষ্টির, চোটে ঐ গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থানের সমস্ত শস্য একেবারে নষ্ট হইয়া যায় জুজু যাহা বলিয়াছিল তাহা বর্ণে ২ সত্য হইল। তখন গ্রামের লোক একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। তাহারা সকলে মিলিয়া প্রথমে সমিনোর ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল, তাহার পর তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া মাঠের ভিতর অতি নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিল।

যদি দেশে অতিরিক্ত বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বাঁশের পাতা আঁটি বাঁধিয়া উনানের উপর টাঙ্গাইয়া রাখে। এরূপ করিলে নাকি বৃষ্টি পড়া বন্ধ হইয়া যায়। কেহ ২ ধুলা মন্ত্র পড়িয়া আকাশে ছড়াইয়া দেয়। ইহারা মনে করে, এরূপ করিলে অনতিবিলম্বে আকাশে রামধনু দেখা দেয়, এবং তাহা হইলে বৃষ্টিপড়া বন্ধ হইয়া যায়।

বৃষ্টি পড়ান জুজুদের শ্রেণীভেদ আছে। কেহ ২ অল্প পরিমাণ বৃষ্টি আনিতে পারে, কেহ ২ ২।৩ দিন ব্যাপি বৃষ্টি চালাইতে সক্ষম। যাহারা এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ তাহারা নাকি শীতের সময় গ্রীষ্ম বা গ্রীষ্মের সময় শীত করাইতে পারে। কিন্তু এই কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে কয়েকটি দুর্লভ দ্রব্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়। একদিন আমি এদেশের একজন অতি প্রবীণ জুজুকে ঋতু পরিবর্ত্তন করিতে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করাতে সে বলিল, "এদেশে ইংরাজ আসাতে আমরা আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আর বড় একটা পাই না। কাযে কাযেই এখন আর ঋতু বদলান সম্ভব হয় না।" কথাটা আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। ইংরাজ আসাতে কি জিনিষ ইহারা পায় না? কিয়দ্দিবস পরে কিন্তু আমি ইহার অর্থ বুঝিয়াছিলাম। যুবতীর হৃদপিণ্ড এই কর্ম্মে এক অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। পূর্ব্বে যখন ইচ্ছা ইহারা হত্যা করিয়া উহা সংগ্রহ করিত। এখন অবশ্য অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে এই গুপ্ত হত্যা একবারে লোপ পায় নাই। এখনও মধ্যে ২ গুপ্ত হত্যার সংবাদ পাওয়া যায়।

ব্রিটিস ইষ্ট আফ্রিকা ও ইউগণ্ডার অনেক স্থানে এখন পর্য্যন্তও ইংরাজ আধিপত্য স্থাপিত হয় নাই। ঐসব স্থানে আজ অবধি এমন সব প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা শুনিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। আমরা এইস্থানে উহার কয়েকটি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

একবার আমি ইউগণ্ডার রাজধানী হইতে প্রায় ৩২ মাইল দূরে এক গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম। দলপতির বাড়ীতে কয়েক ঘণ্টার জন্য আশ্রয় লইয়াছিলাম। ঐস্থানে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা এ জীবনে কখনও ভুলিব না। দলপতির শয়ন কক্ষটী ছয়টী খাম্বার উপর দণ্ডায়মান। শুনিয়া হয়ত অনেকে বিশ্বাস করিবেন না যে, প্রত্যেক খাম্বা নর মুণ্ডের প্রস্তুত। ঐ ছয়টা খাম্বা ৮২টা মুণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শুনিলাম, যুদ্ধের সময় দলপতি স্বহস্তে যাহাদিগকে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের

মস্তক ঐ ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ ভীষণ কঙ্কটি যে তাহার বিশেষ প্রিয় তাহা উহার কথাবার্ত্তা হইতে বেশ বুঝিতে পারিলাম। দলপতির বাড়ীর ছেলে মেয়েদের অঙ্গের গহনার স্থলে মানুষের ভিন্ন ২ স্থানের হাড় ও দাঁতের মালা দেখিলাম। মাথার খুলি হইতে ভিন্ন ২ আকারের পানপাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। আমার অভ্যর্থনার জন্য যে সমস্ত খাদ্যাদি সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ ঐ প্রকার পাত্রে দেওয়া হইয়াছিল। শুনলাম, অতিথিকে বিশেষ সম্মান দেখাইতে হইলে এইরূপ করা হয়। ইংরাজ অধিকৃত স্থানে এ প্রকার ব্যাপার যে দেখিব তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।

ইউগণ্ডার পশ্চিম দক্ষিণ দিকে আরস্ জাতি বাস করে। ইহারা এখনও ঘোর অসভ্য। ইহাদের মধ্যে এখনও বস্ত্রাদির ব্যবহার বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই দিনরাত্রি উলঙ্গ থাকে। তীর চালাইতে ইহারা কিন্তু সিদ্ধহস্ত। শুনিলাম, সমগ্র আফ্রিকায় ইহাদের ন্যায় তীরন্দাজ আর নাই। ২০০।২৫০ গজ দূরের উড়ন্ত পক্ষী ইহারা অনায়াসে স্বীকার করে। ইহারা তীরের মুখে একপ্রকার বিষাক্ত লতার রস মাখাইয়া দেয়। এই রস এ প্রকার ভীষণ যে কাহারও রক্তের সহিত কণামাত্র মিশ্রিত হইলে তাহার আর রক্ষা নাই। এইজন্য উত্তর আফ্রিকার সকলেই ইহাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থিতি করে—ইহাদিগকে বাঘের মত ভয় করে।

আরস্ জাতির প্রধান দেবতার নাম 'চউকু'। ইহার প্রধান পুরোহিতের (জুজু) মত ক্ষমতাশালী জুজু বোধ হয় আফ্রিকায় আর নাই। সেকালের মোগল বা পাঠান বাদশাহদিগেরও এত ক্ষমতা ছিল না। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেই। পুরোহিত মহাশয় রাস্তায় যাইতেং একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন। অমনি তিনি উহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। আর যায় কোথায়! সে বেচারীকে তৎক্ষণাৎ তাহাকে জুজু মহাশয়ের সঙ্গে ২ যাইতে হইবে, এবং তাঁহার দাসীগিরি করিতে হইবে। এমন ভীষণ ক্ষমতার কথা কেহ কখনও শুনিয়াছেন কি? এই জুজুর সাহায্য লাভের জন্য সকলেই লালায়িত। এইজন্য ইহারা অত্যন্ত ধনবান হইয়া থাকে। শুনিলাম, দেশের শাসনকর্ত্তারা পর্য্যন্ত ইহাদের খোষামোদ করিয়া থাকেন।

দৈব উপায়ে অপরাধের বিচার (trial by ordeal) আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে এখনও যথেষ্ট প্রচলিত। কয়েকটি উপায় এই স্থানে সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। উত্তপ্ত তৈলে হাত ডুবাইয়া দেওয়া এক অতি সাধারণ প্রথা। হাত ডুবাইবার পর কেহ যদি ভাব ভঙ্গি দ্বারা যন্ত্রণা প্রকাশ করে, তবে সে যে দোষী তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকে না। জলন্ত আগুনের উপর দাঁড়াইয়া থাকা গুরুতর অপরাধের জন্য ব্যবহৃত হয়। যদি কাহারও উপর হত্যাপরাধ আরোপিত হয়, তাহাকে অনেক সময় জলে ডুবাইয়া রাখিয়া তাহার দোষাদোষের বিচার করা হয়। শুনিলাম, দুই মিনিট কাল পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখা হয়। ইহাতে যদি তাহার মৃত্যু না হয় তাহা হইলে সে নির্দ্দোষ।

ইংরাজ শাসনের কল্যাণে অবশ্য এইসব বর্ব্বর প্রথার মূলে কুঠারাঘাতের বিশেষ আয়োজন হইতেছে। কিন্তু একবারে লোপ পাইতে অনেক দিন লাগিবে। ইহারা অবশ্য অসভ্য। কিন্তু ভারতের ন্যায় প্রাচীন সভ্যতাভিমানি দেশেও নানাপ্রকার অমানুষিক প্রথা এ প্রকার বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহা দূর করিতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। মোট কথা এই যে, কুসংস্কার হইতে বোধ হয় পৃথিবীর কোনও জাতিই মুক্ত নয়।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

প্রায়শ্চিত্ত।

(১)

গ্রামের হারাধন কর্ম্মকার যখন কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে তর্কালঙ্কার খুড়োর ছেলে প্রফুল্ল সত্য সত্যই খৃষ্টান হইয়াছে, তখন গ্রামে একটা বড় গণ্ডগোল বাঁধিয়া গেল। আবার যখন ইহাও জানা গেল যে সেই ব্রাহ্মণপুত্র এখন হ্যাট কোট পরে, ইংরা-

জিতে কথা কয় ও সাহেবদের সঙ্গে টেবিলে বসিয়া নানা প্রকার অখাদ্য খায়, তখন গ্রামবাসিদের লজ্জার, ক্ষোভের, ক্রোধের আর সীমা রহিল না। এই ঘোর কলিকালেও হরিপুরের আর কেহ সমাজের বুকে এতবড় একটা নিষ্ঠুর আঘাত করে নাই, সুতরাং প্রফুল্লের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদের জন্য সে দিন পাড়ায় পাড়ায় স্ত্রীপুরুষের কমিটি বসিয়া গেল।

গ্রামের স্ত্রীমহলে মজুমদার গৃহিণীরই প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহার কারণ তিনি স্থানীয় তালুকদারের গৃহলক্ষ্মী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের স্বনামখ্যাত পণ্ডিত জগদীশ তর্কবাচস্পতির কন্যা। বাচস্পতি দুহিতা আজ তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে মহিলা কমিটির সভাপত্নীরূপে অধিষ্ঠান করিতেছিলেন, আর ও পাড়ার অভয় ঘোষের স্ত্রী তারামণি টাউনহল বক্তাগণের অনুকরণে তাঁহার সবলয় স্থূল হস্ত দুখানি নাড়িয়া বলিতেছিলেন, "আমি চিরকালটা বলে আসছি বড় বৌ, ছেলেদের বেশী লেকাপড়া শিখিয়ো না, শিখিয়োনা। তা গরীবের কথা কে শোনে বোন্? আমি তো আমার যোগীনকে পেথ্‌ম ভাগ শেষ না হইতেই পাঠশালা ছাড়িয়েছি, তা সেও তো এখন খেটে-খুটে আছে। গাঁয়ে বসে পাঁচটাকা আর কলিকাতায় চল্লিশ টাকা একই কথা। তর্কালঙ্কার খুড়ো তো চিরদিন টাকা টাকা করে পাগল; তা এখন টাকার সাধ মিটুবে। ছেলে খেষ্টান হয়েছে, এখন মেম বিয়ে করবে, ঢের টাকা পাবে, বাড়ীতে টাকার গাদা দেবে—মরণ নেই? বাপ মার ধর্ম্মের চেয়ে ওদের টাকা বড় হ'লো!"

মজুমদার গৃহিণী তারামণির সাপক্ষে একটি অনতিহ্রস্ব শ্লেষপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়াদিলেন যে এক্ষেত্রে পুত্রের অপেক্ষা পিতা মাতারই দোষ অধিক। তাঁহাদেরই অনবধানের ফলে প্রফুল্ল এই অতি গর্হিত আচরণ করিয়া ফেলিয়াছে, সুতরাং পুত্রের যে শাস্তি সমাজ বিধান করিবে তাহা তর্কালঙ্কারের সমস্ত পরিবারের উপরেই প্রযুজ্য। বাচস্পতি দুহিতা বহুদিন হইতে তর্কালঙ্কার গৃহিণীকে অপদস্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এবং এই আকস্মিক সামাজিক বিপ্লবে স্বীয় আধিপত্য আরও একটু বিস্তৃত ও সবল করিবার উপায় দেখিয়া মনে মনে বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহারই প্রস্তাবে স্থির হইয়া গেল যে মধুবোসের মেয়ের বিবাহে যদি তর্কালঙ্কার বাড়ীর কাহারও নিমন্ত্রণ হয় তাহা হইলে গ্রামের অন্য কোনও স্ত্রীলোক সে বাড়ীতে পা দিবে না।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় হারাধনের দাবায় বসিয়া আটদশ ছিলিম কড়া তামাক নিঃশেষ করিতে করিতে মজুমদার প্রমুখ গ্রামবৃদ্ধগণ আর একবার প্রফুল্লের পাপের বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন ও স্থির করিলেন যে যাহার পুত্র সমাজের বিরুদ্ধে এতবড় একটা গর্হিত আচরণ করিতে পারে সে নিতান্তই পাষণ্ড, সুতরাং তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেই সমাজের মঙ্গল। তর্কালঙ্কার একঘরে হইলেন।

প্রফুল্লের স্ত্রী মানসী যখন ক্ষুদ্র পিত্তল কলসটী কাঁখে লইয়া তাহার সই মৃণালিনীর বাড়ীতে যাইয়া ডাকিল, "ঘাটে যাবে না সই, বেলা যে পড়ে গেল?" তখন তাহার সই উত্তর দিলনা কিন্তু মৃণালিনীর মাতা বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "তুমি আর আমাদের বাড়ীতে এসো না বাছা। তোমার সোয়ামী জাত খুইয়েছে, তোমার শ্বশুর শাশুড়ীকে একঘরে করেছে। তুমি আমাদের বাড়ী এলে আমাদের জাত থাক্‌বেনা। তুমি ঘাটে যাও বাছা, মিনু যাবেনা।" মা'র নিষ্ঠুর কথাগুলি বোধ করি কন্যার হৃদয়ে একটু ব্যথা দিয়াছিল, সইয়ের প্রতি সমবেদনার ভার মৃণালিনীর বুকে জাগিয়া উঠিল। ঘরের ভিতর হইতে সে বলিল, "একটু দাঁড়াও সই, আমি আসছি," কিন্তু মাতা বাধা দিয়া বলিলেন, "চুপ্ কর্ পোড়ারমুখি শেষে কি তোর জন্য আমরাও জাতে আটক্ হ'বো?" শুনিয়া মানসী আর দাঁড়াইল না।

ঘাটে তখন গ্রামের কিশোরী নবীনা প্রৌঢ়া বৃদ্ধা সকলে গা ধুইতে ও জল লইতে আসিয়াছিল। তাহারা মানসীকে দেখিয়া সরিয়া গেল, কেহ একটুবিদ্রূপের হাসি হাসিল, কেহবা "খেষ্টানের বউ"য়ের কথাপ্রসঙ্গে সহচরীর সহিত রসিকতা করিয়া একটু নিষ্ঠুর আমোদ উপভোগ করিয়া লইল।

এই একদিনের মধ্যে যে তাহার বিরুদ্ধে এতবড়

একটা ষড়যন্ত্র হইয়া গিয়াছে মানসী তাহার কিছুই অবগত ছিলনা। লজ্জায়, দুঃখে তাহার চক্ষে জল আসিতেছিল, কিন্তু এই নির্মম সহানুভূতিহীন নারীগণের সম্মুখে তাহার ব্যথাজড়িত অশ্রু যে তাহাকে আরও হীন করিয়া ফেলিবে তাহা যেন সে স্বতঃই বুঝিতে পারিল। অতিকষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত চরণে সে গৃহে ফিরিয়া গেল।

তর্কালঙ্কার সব শুনিলেন। ক্রোধে ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য লোপ পাইল। তর্কালঙ্কার যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া পুত্রকে অভিসম্পাত করিলেন যে সমাজে যে আমাকে এত ক্ষতি এত অপমানগ্রস্থ করিয়াছে সে আমার পুত্র নয়। আমার পুত্র প্রফুল্ল মরিয়াছে। আজ হইতে আমি অপুত্রক।

সেই রাত্রে নিজের শয়নকক্ষের কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া মৃৎপ্রদীপের ক্ষীণালোকে বসিয়া মানসী প্রফুল্লকে এক পত্র লিখিল। আঁকা বাঁকা ছোটবড় অক্ষরে মানসী লিখিল,

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু,—

গ্রামে সংবাদ রটিয়াছে তুমি খৃষ্টান হইয়াছ। তুমি কেন খৃষ্টান হইলে তাহা বুঝিলাম না। গ্রামে আমাদিগকে একঘরে করিয়াছে। অপমান, লাঞ্ছনার শেষ নাই। ঠাকুর বড় রাগিয়াছেন, তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং আমাকেও ত্যাগ করিয়াছেন, তুমি যত শীঘ্র পার আমাকে লইয়া যাইবে। আমার এখানে মন বড় কেমন করে। ইতি—

সেবিকা—

শ্রীমতী মানসীবালা।

পুঃ—শুনিয়াছি তুমি সাহেবদের মতো কাপড় পরো, কিন্তু আমাকে লইতে ধুতি পরিয়া আসিয়ো। আমার সাহেবকে বড় ভয় করে।

প্রফুল্লকুমার কলিকাতার কোনও একটী বড় মার্চেণ্ট অফিসে চল্লিশ টাকা মাহিনার কেরাণী। প্রথমে গ্রামস্থ পাঠশালা পরে জেলাস্কুল হইতে পাশ করিয়া সে যখন কলিকাতায় মেসে থাকিয়া সেণ্টজেভিয়ার কলেজে এফ, এ পড়িতে আরম্ভ করিল তখন হইতেই তাহার সহপাঠিরা তাহার সাহেবী ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইত প্রফুল্ল তাহার বাঙ্গালী বন্ধুদিগকে অবহেলা করিয়া ফিরিঙ্গি ছেলেদের সহিত মিশিত, টিফিনের পয়সা বাঁচাইয়া চাঁদনী হইতে সস্তায় সুট্ কিনিত, ফিরিঙ্গি সুলভ বাক্পটুতায় বন্ধুদিগকে চমৎকৃত করিত। পাড়াগাঁয়ের ছেলে অতি অল্প সময়ে অনায়াসে সহরে ছেলেদের সাহেবিয়ানায় অতিক্রম করিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে প্রফুল্লের সাধ মিটিল না। তাহার কেবলই মনে হইত যে তাহার ব্রাহ্মণোচিত পদবীটি তাহার সাহেবিয়ানার একটা প্রকাণ্ড প্রতিবন্ধক, এবং কেবল এই বন্দ্যোপাধ্যায় আখ্যাই যে তাহাকে বাঙ্গালীত্বের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এই বিশ্বাস তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

এফ, এ ফেল হইবার পর তর্কালঙ্কার মহাশয় যখন পুত্রকে জানাইলেন যে তাহার পড়ার খরচ আর বহন করিতে তিনি অসমর্থ, তখন তাহার সাহেবীয়ানাকে পূর্ণতাপ্রদানের পক্ষে প্রফুল্লের একটী বড় সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। প্রফুল্ল কলেজের প্রফেসার ফাদার জনকে বলিল, "আমি খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা করি"। বৃদ্ধ ধার্ম্মিক খৃষ্টিয়ান অধ্যাপক স্বীয় ছাত্রের ধর্ম্মভাব দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে কিছুদিন শিক্ষাধীনে রাখিয়া দীক্ষা প্রদান করিলেন। ব্যাপ্‌টিস্‌মের (দীক্ষার) সময় প্রফুল্ল 'পিটার বনার" (Peter) Bonard নাম গ্রহণ করিল। ফাদারজন তাহাকে একটী চাকুরী লইয়া দিলেন। এতদিনে প্রফুল্ল সম্পূর্ণ সাহেব হইল।

তাহার ধর্ম্মচ্যুতির সংবাদ শুনিয়াও যে মানসী তাহার নিকট আসিতে চাহিবে ইহা প্রফুল্ল ভাবে নাই। সে মানসীর পত্র পাইয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল যে স্ত্রীকে নিজের কাছে লইয়া আসিলেই ভাল হয়। এখন হইতে তাহার নিকট শিক্ষা পাইলে মানসী নিশ্চয়ই ইংরাজী আচার ব্যবহারে পটু হইবে। কালে তাহাকে মেম সাজাইতে পারিবে এ আশাও যে প্রফুল্ল না করিয়াছিল তাহা নহে।

তর্কালঙ্কার মানসীকে যাইতে বাধা দিলেন না, প্রফুল্ল তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গেল। প্রফুল্ল ধুতি পরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া মানসী আশ্বস্তা হইল। তর্কালঙ্কার গৃহিনীকে বুঝাইলেন যে যে বিষবৃক্ষ গৃহ হইতে উৎপাটন করিয়াছেন তাহার শেষ কণ্টক পর্য্যন্ত দূর করিয়া দেও-

য়াই শ্রেয়। মানসীর হরিপুর ত্যাগের পর হইতে প্রফুল্লের সহিত তাঁহাদের শেষ বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। এখন সমাজে পুনঃ প্রবেশের চেষ্টা সফল হইতেও পারে। প্রফুল্ল একবার মাকে দেখিতে চাহিয়াছিল কিন্তু তর্কালঙ্কার সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না।

(৩)

১৮নং বহুবাজার সেকেণ্ড লেন একটী বস্তি। বস্তিতে দশ বারোটী খোলার ঘর, তাহাতে নীচজাতি ফিরিঙ্গিরই বাস অধিক, দু এক ঘর মুসলমানও আছে। ইহারই একটী ক্ষুদ্র ঘরে প্রফুল্ল ওরফে মিষ্টার বনাড্ মানসীকে লইয়া আসিল। গলিটি অন্ধকার অপ্রসর এবং অত্যন্ত অপরিষ্কার। ঘরের মেঝে ভিজে স্যাঁৎসেতে, বৃষ্টির দিন সিঁড়ির সাম্‌নে একহাত জল দাঁড়াইত। শীতের সন্ধ্যায় কলিকাতার ধূম্ররাশি মেঘের মত জমাট বাঁধিয়া ঘরটীকে ঘেরিয়া থাকিত। মানসীর তখন নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইত। বস্তির মধ্যে একপাল হাঁসমুর্গি ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের দৌরাত্মে মানসীকে তাহার ক্ষুদ্র গৃহ প্রাঙ্গনটুকু পরিষ্কার রাখিতে বহু চেষ্টা করিতে হইত। দিনের মধ্যে কতবার যে তাহাকে উঠানে গোবর ছড়া দিতে হইত তাহার স্থিরতা ছিল না। কিন্তু এইরূপ শত দুঃখ অসুবিধা অপেক্ষা তাহার ফিরিঙ্গি প্রতিবাসিনীগণের সহজ আত্মীয়তা মানসীকে আরও অধিক কুণ্ঠিত করিয়া তুলিত। মিসেস্ টমাস্ মিস্ গোমেজ প্রভৃতি যখন আধ হিন্দি আধ বাঙ্গলায় মানসীকে তাহার পূর্ব্ব জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিত তখন তাহার মনে হইত যে এই বিজাতীয়া রমণীগণ যেন তাহার স্মৃতির পবিত্র মন্দিরে নিতান্তই অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। সঙ্কোচে সে আপনাকে আপনার মধ্যে লুকাইয়া রাখিত, মিসেস্ টমাস্ শত প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিত। মিঃ বনাড একটী নিতান্ত বোকা, পাড়াজরা নেটিভ্ স্ত্রীলোককে লইয়া কেমন করিয়া সংসার করিতেছেন ইহা লইয়া বস্তির ফিরিঙ্গি মহলে অনেক তর্ক বিতর্ক চলিত কিন্তু চেষ্টা করিয়াও প্রফুল্ল মানসীকে মেম সাজাইতে পারিল না। নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া মানসী ফার্ষ্ট-বুকের দু চার পাতা পড়িয়াছিল কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার উদাসীনতা দেখিয়া প্রফুল্ল আর তাকে পড়াইত না। ইহাতে মানসী অতিশয় সুখী হইয়াছিল।

প্রফুল্লের খাদ্যদ্রব্যাদি মানসী রন্ধন করিত বটে কিন্তু নিজে তাহা কদাচ গ্রহণ করিত না। নিত্য রন্ধনের পর স্নান করিয়া নিজের জন্য পাক করিত। গঙ্গাস্নান করিতে যাইবার উপায় ছিলনা, এক উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ সপ্তাহে এক কলসী গঙ্গাজল আনিয়া দিত। স্নানান্তে তাহারই একটু মাথায় দিয়া মানসী পবিত্র হইত।

(৪)

প্রায় দুই বৎসর পরে তর্কালঙ্কার প্রফুল্লের পত্র পাইলেন। প্রফুল্ল জানাইয়াছে যে মানসী বড়ই পীড়িতা, বাঁচিবার আশা নাই। মানসী কিছুদিন পূর্ব্বে বাড়ীর পিচ্ছিল প্রাঙ্গণে পদস্খলিত হইয়া পতিত হয়; তাহাতে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার এক সপ্তাহ মধ্যে একটী মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করে সম্প্রতি নিতান্তই কাতর। এদিকে অফিস কামাই করার জন্য সাহেব প্রফুল্লকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন। হাতে একটী পয়সা নাই যে রোগিনীর সেবা হয়। ঔষধ দূরের কথা মানসীর পথ্যের জন্য অপরের নিকট ভিক্ষা করিতে হইয়াছে। যদি এই দুর্দ্দিনে পিতা কিছু সাহায্য করেন তাহা হইলে সে নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইবে ইত্যাদি।

পত্র পাইয়া তর্কালঙ্কার একবার ভাবিলেন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন। আবার কি মনে করিয়া গৃহিনীর সঙ্গে একবার পরামর্শ করাই উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন।

দুই বৎসর পরে প্রফুল্লের সংবাদ পাইয়া তর্কালঙ্কার গৃহিনীর মাতৃহৃদয়ে স্নেহরাশি উথলিয়া উঠিল। এই বিপদের সময় তিনি পুত্র ও বধূমাতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবেন না ইহা স্বামীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। তর্কালঙ্কার কিছুতেই তাঁহার স্ত্রীকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। সেই রাত্রে ত্রিশটী টাকা কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গরুর গাড়ীতে রেলওয়ে ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলেন, যাইবার সময় গৃহিনীকে বলিয়া গেলেন "ভাবিয়ো না, আমি শীঘ্রই ফিরিব"।

কলিকাতায় পৌঁছিয়াই প্রফুল্লের বাটীর অনুসন্ধানে গ্রামবাসী বৃদ্ধের অনেকটা সময় ব্যয় হইল। তর্কালঙ্কার প্রফুল্লের গৃহে বাস করিতে সম্মত হইলেন না, নিকটস্থ হিন্দুহোটেলে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। প্রফুল্ল তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে জানাইল যে তাহার বন্ধু মিষ্টার টমাস্ খৃষ্টীয় রীত্যানুসারে রোমানক্যাথলিক সমাধিভূমিতে তাহার পুত্রের মৃতদেহ সমাহিত করিয়াছে। তাঁহার পৌত্রের এই অহিন্দু সৎকারের বিষয় শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্ষোভের পরিসীমা রহিল না, কিন্তু তিনি তাহার কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কেবল সজোরে তামাক টানিতে টানিতে নিতান্ত উদাস ভাবে একবার বলিলেন—"হুঁ"।

(৫)

মানসী বাঁচিল না। ডাক্তার রোগিনীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন যদি তিনদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে ডাকা হইত তাহা হইলে তিনি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারিতেন, কিন্তু এখন মানুষের আর হাত নেই। মানসী সব শুনিল। শুনিয়া প্রফুল্লকে নিজের কাছে ডাকিয়া বলিল, "আমি মরিতেছি তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর আমার মৃত্যুর পর বাড়ী ফিরিয়া যাইবে"। প্রফুল্ল প্রতিজ্ঞা করিল। মানসী বলিল, "আমার গা ছুইয়া তিন সত্য কর"। প্রফুল্ল মানসীর গা ছুঁইয়া তিন সত্য করিল।

তখন মানসীর রোগক্লিষ্ট শুষ্ক মুখে হাসি দেখা দিল। মানসী হাসিয়া বলিল, "আজ আমার বাসর। আমার বিবাহের চেলীখানি আমাকে পড়াইয়া দাও, আমাকে ফুল দিয়া সাজাও।" প্রফুল্ল বহুবাজারের মোড় হইতে ফুলের মালা কিনিয়া আনিয়া মানসীকে সাজাইল, তাহাকে লাল চেলী পরাইয়া দিল। তখন মানসী শ্বশুরের পায়ের ধুলা মাথায় লইল—তারপর সধবার গৌরবচিহ্ন সিন্দুরবিন্দু মাথায় পরিয়া স্বামীর পায়ে হাত রাখিয়া মানসী স্বর্গে চলিয়া গেল।

অনেক দিন পর প্রফুল্ল আজ আবার ধুতি পরিল। তাহার মনে হইল সেই দুই বৎসর পূর্ব্বে মানসীর অনুরোধে ধুতি পরিয়া তাহাকে হরিপুর হইতে আনিতে গিয়াছিল, আজ আবার ধুতি পরিয়া তাহাকে কোথায় রাখিতে যাইতেছে।

পিতাপুত্রে মানসীর শবদেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইল। সেই বিরাট জনপূর্ণ মহানগরীতে এমন কেহ ছিল না যে এই বিপদের দিনে তাহাদের সাহায্য করে। শবদেহ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া পিতাপুত্রে রুদ্ধস্বরে একবার ডাকিল, "বল হরি, হরি বোল।" মিষ্টার টমাস্ প্রমুখ ফিরিঙ্গিগণ মিঃ বনার্ডের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু অর্দ্ধনগ্নদেহ, শোককাতর, শববাহী যুবককে কেহ প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না।

চিতাভস্ম গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া পিতাপুত্রে গঙ্গায় অবগাহন করিলেন। স্নান সমাপনান্তে তর্কালঙ্কার আর্দ্রবস্ত্রেই ষ্টেসনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রফুল্ল পশ্চাতে চলিল। তখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শেষ রশ্মিগুলি গঙ্গার ঢেউয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিয়া গঙ্গার জলকে আলো ছায়ায় বাঘডোরা করিয়া তুলিতেছিল। কর্ম্মক্লান্ত বিরাট জনসঙ্ঘ তখন দিবসের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম খুঁজিতে গৃহের অভিমুখে ফিরিতেছে। এই সন্ধ্যাবেলাটির একটা মোহ, একটা আবেশ আছে যাহা স্বগৃহের চারিটি কোণের মধ্যে মানুষের মনকে টানিয়া লয়। ব্যবসায়ী তখন দিনব্যাপী লাভের চেষ্টা ভুলিয়া যায়, ভৃত্য প্রভুর নিগ্রহ মনে রাখে না, প্রবাসীর মন তখন সকল ব্যবধান তুচ্ছ করিয়া মানস চক্ষে সেইখানে গিয়া পৌঁছে যেখানে স্নেহপ্রবণ কয়েকটী হৃদয় তাহারি উপর অসীম নির্ভর রাখিয়া অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। পিতার পশ্চাতে চলিতে চলিতে আজ প্রফুল্লের মনে পড়িতেছিল বাড়ীর কথা, মায়ের স্নেহকোল। এমনি হতভাগা সে যে নিজের হাতে সে সংসারের সবচেয়ে বড় স্নেহের বন্ধন ছিঁড়িয়া আসিয়া শেষে সকলই হারাইল। ফিরিবার পথ সে নিজে বন্ধ করিয়া, এই স্নেহহীন পথে যাত্রা করিয়াছে। আজ মানসী সেই যাত্রায় তাহাকে একা ফেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া গেল। নিষ্ঠুর মানসী! মায়ের বুকের অসীম ক্ষমা তাহার মত অপরাধীকে কি আবার তাঁহার স্নেহের অন্তরালে সংসারের সকল আঘাত হইতে লুকাইয়া রাখিবে? তর্কালঙ্কার দ্রুতপদে চলিতেছিলেন পশ্চাৎ হইতে প্রফুল্ল ডাকিল, "বাবা!" তর্কালঙ্কার মুখ ফিরাইলেন না, তাঁহার গতি মন্দ হইল না, এমনি

ভাব তিনি দেখাইলেন যেন পুত্রের ডাক তিনি শুনেন নাই অথবা শুনিলেও তাহার উত্তর প্রদান তিনি প্রয়োজন মনে করেন না। পিতাকে প্রফুল্ল জানিত, তাঁহার মর্ম্মভেদ অভিসম্পাতও প্রফুল্লের অজ্ঞাত ছিল না, তবুও আজ তাহার গৃহের জন্ম, জননীর ক্রোড়ের জন্ম স্নেহাতুর ক্ষুধিত হৃদয় তাহাকে এমনি ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল যে সে আজ পিতার ক্রোধকে উপেক্ষা করিয়া আবার ডাকিল, "বাবা, আমি বাড়ী ফিরে যাবো" তারপর আর একটু গলা উঠাইয়া আবার বলিল, "বাবা, বাবা, আমি বাড়ী ফিরে যাবো। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এতক্ষণ নির্ম্মমতার বাঁধ বাঁধিয়া তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের সকল উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পুত্রের সকরুণ প্রার্থনার জোর তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল অনেক বৎসরের পুরাতন স্মৃতি, প্রফুল্ল তখন শিশু। মজুমদার বাড়ীতে সন্ধ্যার পর তখন পাশার আড্ডা জমিত, তর্কালঙ্কার তখন গ্রাম্যসমাজের একজন পদস্থ নেতা ছিলেন, পাশার মজলিশে তখন তাঁহার স্থান ছিল প্রধান। প্রফুল্ল তাঁহার সঙ্গে নিত্য খেলার আড্ডায় যাইত। এক একদিন পাশার খেলায় সকলে মজিয়া আছে, রাত্রি অধিক হইয়া গিয়াছে, কাহারও খেয়াল নাই, তখন ক্ষুধাতুর নিদ্রাকাতর শিশু তর্কালঙ্কারের কোলে উঠিয়া কাঁদিত, "বাবা, আমি বাড়ি যাবো।" তর্কালঙ্কার তখন খেলা ছাড়িয়া পুত্রকে কাঁধে চড়াইয়া বাড়ী ফিরিতেন। আজ বিশ বৎসর পরে প্রফুল্ল আবার তাঁহাকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্ম কাঁদিতেছে। আজ তিনি একা ফিরিয়া যাইবেন কেমন করিয়া? তর্কালঙ্কার প্রফুল্লের কথার কোনো উত্তর দিলেন না, কেবল মাত্র তাঁহার হাতখানি বাড়াইয়া পুত্রের হস্ত ধরিলেন, তাহার পর পিতাপুত্রে নিঃশব্দে ষ্টেসনাভিমুখে চলিলেন।

"সাত দিন পরে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া তর্কালঙ্কার সপরিবারে কলিকাতা যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইতেছিলেন। অন্ত উপায় আর ছিল না। অহিন্দু, স্লেচ্ছ পুত্রকে গৃহে স্থান দিয়া সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এই কলিকালেও বাঙ্গলার কোনো গ্রামে বাস করা হিন্দুর পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। গৃহত্যাগের দিন প্রত্যুষে প্রফুল্ল পিতাকে প্রণাম করিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা, একটা কথা" "কি কথা বাবা?" "মজুমদার খুড়ো যা বল্ছিলেন; প্রায়শ্চিত্ত করে এখানেই থাক্বার বন্দোবস্ত কর্লে—" বাধা দিয়া তর্কালঙ্কার বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত? না বাবা, তোকে আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্তে দিতে পার্বো না। একদিন তোকে মন থেকে ক্ষমা কর্তে না পেরে বৌমাকে হারিয়েছি, খোকাকে হারিয়েছি।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের দুই চক্ষু গড়াইয়া জল পড়িতে লাগিল। প্রফুল্ল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "না বাবা, প্রায়শ্চিত্ত তোকে কর্তে হ'বে না, তোকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়ে যে পাপ করেছিলাম আজ সাত পুরুষের, সেই বাড়ী ছেড়ে তোর নিষ্ঠুর বাবা তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেল।" স্বর্গগত পিতৃ পুরুষদিগের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণ গ্রামত্যাগ করিবার জন্ম উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রফুল্ল সজলনয়না মাতাকে ডাকিয়া কহিল, "মা, এসো যাই।"

শ্রীযতীন্দ্র কুমার বিশ্বাস।

বিবিধ সংগ্রহ।

চুম্বন।

স্নেহ কিম্বা ভালবাসা দেখাইবার জন্ম মানবেতর জীবের মধ্যেও চুম্বনের প্রথা দেখা যায়; কোন কোন কীট কিম্বা শামুকের মধ্যেও স্ত্রী, পুরুষ সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বে সম্মুখস্থ শুড়ের দ্বারা আদর করিতে দেখা যায়। কুকুর তাহার মনিবকে কিম্বা কুকুরীকে আদর করিবার সময়ে তাহার গাত্র লেহন ও আঘ্রাণ করে ইহাও একরূপ চুম্বনের অনুরূপ।

মানুষ চুম্বনের দ্বারা স্পর্শ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া থাকে। মণ্টেগেজা (Montegazza) বলেন শিশু যাহাকে ভালবাসে কখন কখন সেই ভালবাসা দেখাইবার জন্ম, সে তাহার গাত্র লেহন করে।

ষ্টেনলী হল (Stanly Hall) ও এই মত সমর্থন করেন। নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যে দেখা যায় মাতা নবজাত শিশুকে লেহন করিয়া থাকে। মানব শিশুরও হয়ত এই লেহন কার্য্য জন্মগত সংস্কার হইতে পারে।

মৃদুদংশন ও চুম্বনের অংশবিশেষ। ইতর প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষ সংযোগের সময় কখন কখন এইরূপ দংশন করিতে দেখা যায়।

ইউরোপে যেরূপ চুম্বনের প্রথা দেখা যায় উহাতে ঘ্রাণ অপেক্ষা স্পর্শেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই অধিক পরিলক্ষিত হয়। এই চুম্বন অশিক্ষিতদের মধ্যে খুব কমই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরাকালে আর্য্য ও সেমিটিক জাতির মধ্যেই মাত্র ইহা বিদ্যমান ছিল। হোমার কিম্বা গ্রীক কবিদের মধ্যে ইহার উল্লেখ খুব কমই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে লেপ্‌লেণ্ড ব্যতীত ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা বিদ্যমান দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইউরোপেও ইহা অল্পদিন হয় আবির্ভূত হইয়াছে। কেল্টিক ভাষায় ইহার কোনরূপ প্রতিশব্দ নাই। এশিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তেও ইহা অজ্ঞাত ছিল। জাপান ভাষাতে ইহার কোন প্রতিশব্দ নাই। জাপানে শিশু হাটিতে শিখলে পিতামাতাও তাহাকে চুম্বন করিবে না। ইহাদের মধ্যে করমর্দ্দনের প্রথাও বিদ্যমান নাই। হিয়ার্ণ (Hearn) বলেন, বহুকাল পরে ইহাদের কোন আত্মীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইহারা হাস্য সহকারে উভয়ে উভয়কে মৃদু মৃদু আঘাত ও কখন কখন একরূপ মৃদু মৃদু শব্দ করে এই মাত্র।

আফ্রিকায় কৃষ্ণজাতির মধ্যে ভাবপতি পত্নীকে কিম্বা মাতা শিশুকে চুম্বন করে না।

উত্তর কুইনল্যেণ্ডে মাতা শিশুকে এবং স্বামী স্ত্রীকে মাত্র চুম্বন করিয়া থাকে।

পৃথিবীর অনেক স্থানেই এমন স্পর্শ সুখজনিত চুম্বন কেবল মাতা সন্তানেই বর্ত্তমান আছে এবং মাতৃ চুম্বন হইতেই প্রেমিকের চুম্বন আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া লম্‌ব্রোসোর (Lombroso) অভিমত।

মধ্যযুগে ইউরোপেও সম্ভবতঃ এই চুম্বনের সহিত ইন্দ্রিয় সুখের সম্বন্ধ ছিল না। ইহা কেবল উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই ভালবাসার নিদর্শন বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল।

পূর্ব্বদেশে চুম্বনটী অতি পবিত্র জ্ঞান করাতেই উহা কামগন্ধ বিবর্জ্জিত ছিল। পূর্ব্বকালে আরবগণ চুম্বনের দ্বারা ঈশ্বর উপাসনা করিত। রোমেতেও চুম্বন ইন্দ্রিয় উত্তেজনার পন্থা না হইয়া উহা দ্বারা ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। আদি খৃষ্টানদের নিকট ইহা একটী ধর্ম্মের অঙ্গ ছিল। পূর্ব্বে যেরূপ গ্রীকগণ দেব মূর্ত্তির পাদ চুম্বন করিত সেইরূপ খৃষ্টানগণ পোপের পাদদেশ ও বিশপের হস্ত চুম্বন করিত। বর্ত্তমানেও খৃষ্টানগণ আদালতে তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়া থাকে।

এ যাবৎ আমরা স্পর্শ সুখজনিত চুম্বনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহা ভিন্ন জগতের বহু স্থানে আর একরূপ চুম্বন প্রচলিত আছে। তাহাকে আমরা ঘ্রাণেন্দ্রিয় জাত চুম্বন বলিতে পারি।

ডি এন্‌জয় চীনদেশে একরূপ চুম্বনের কথা বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে প্রথমতঃ প্রেম পাত্রের গণ্ডদেশে নাসিকা সংলগ্ন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ নয়ন পল্লব অবনত করিয়া দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করা হয়। তৎপরে গণ্ডদেশে ওষ্ঠ সংলগ্ন না করিয়া চুম্বনের মত শব্দ করা হয়। চীনাগণ পাশ্চাত্য দেশের চুম্বনকে ঘৃণা করে কারণ ইহাতে তাহাদিগকে নরখাদকদের কথা মনে করাইয়া দেয়। কখন কখন মাতা ইউরোপীয় চুম্বন দিবে বলিয়া শিশুকে ভয় দেখায়। এইরূপ চুম্বনকে তাহারা অশ্লীল বলিয়া মনে করে।

দক্ষিণ পূর্ব্ব ভারতে কোন কোন পার্ব্বত্য জাতি কাহাকেও অভ্যর্থনা করিতে হইলে গণ্ডদেশে নাসিকা সংলগ্ন করিয়া দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে।

সিংহল দ্বীপ হইতে কোন একজন ডাক্তার লিখিয়াছেন যে তামিলগণ স্ত্রী পুরুষ সম্মিলনে, চুম্বন না করিয়া নাসিকার সহিত নাসিকা ঘর্ষণ এবং একে অন্যের মুখ ও জিহ্বা লেহন করিয়া থাকে।

আঘ্রাণ-জনিত চুম্বন আফ্রিকাতেও প্রচলিত আছে। গেম্বয়া দেশে যখন কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে অভিবাদন করে তখন স্ত্রীলোকের হস্তখানা গ্রহণ করিয়া তাহার পশ্চাৎ দিক সজোরে ছুঁইবার আঘ্রাণ করে।

প্রশান্ত মহাসাগরের একদ্বীপে একরূপ অদ্ভুত চুম্বনের প্রথা বর্ত্তমান। তথায় বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক অতিথি আসিলে বাড়ীর শিশু বালক তাহার বস্ত্র উত্তোলন করিবে এবং আগন্তুক আমোদের ছলে শিশুর শিশু অঙ্গ আঘ্রাণ করিবে। এই প্রথাকে তথায় বালকের তামাক দেওয়া বলে।

পৃথিবীতে সাধারণ চুম্বন অপেক্ষা ঘ্রাণজনিত চুম্বনই

অধিক প্রচলিত। এবং ইহা মঙ্গোলিয়ান জাতির ভিতরেই বিশেষভাবে আবদ্ধ ও সম্পূর্ণ বিকশিত।

আশ্চর্য্য ধূমকেতু আবিষ্কার।

লিক (Lick) মান মন্দিরের ডাইরেক্টার কেম্বেল সাহেব যুক্ত রাজ্যের "দর্শন" নামক পত্রিকার জ্যোতিষের অদ্ভুত সংঘটন সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছেন। কোন জ্যোতির্ব্বিদকে তারযোগে আকাশের কোন স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে বলা হইল, তিনি হয়তো টেলিগ্রাফের ভুলে আকাশের অন্যস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলেন এবং সেই স্থানেই একটী ধূমকেতু দেখিতে পাইলেন। যে ধূমকেতুর জন্যে টেলিগ্রাম করা হইয়াছে সেটী নহে তদনুরূপ অপর একটী। কেবল ইহাই আশ্চর্য্য নহে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ শুনিলে আরও আশ্চর্য্য হইতে হয়।

লিক মান মন্দির হইতে ১৮৯৫ সনের ১৭ই নবেম্বর অধ্যাপক পেরিন তাঁহার বহু আবিষ্কৃত ধূমকেতুর প্রথমটী দেখিতে পান। তিনি রাত্রির পর রাত্রি, ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন অবশেষে ইহা সূর্য্যের সন্নিধ হওয়াতে সূর্য্যের আলোতে অদৃশ্য হইয়া পরে। এই ধূমকেতু এত সুন্দররূপে ইহার নিরূপিত পথ চলিতেছিল যে ডাইরেক্টার কেম্বেল সাহেব এই সম্বন্ধে ভিন্নদেশের পণ্ডিতদের নিকটে টেলিগ্রাম করিয়া অর্থব্যয় করা প্রয়োজন বোধ করিলেন না। অতঃপর ১৪ই ফেব্রুয়ারী জর্ম্মণির কিএল (kiel) মান মন্দির হইতে তার আসিল যে সেইদিন ভোরে লেম্বসাহেব পেরিনির ধূমকেতু দেখিতে পাইয়াছেন। কিয়েল হইতে সাঙ্কেতিক চিহ্ন কেবেলগ্রাম (cablegram) যথা সময়ে ঠিক ভাবে লিকমান মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি এই সঙ্কেত, ভাষায় পরিণত করেন তিনি ২৪ মিনিট অথবা ৬ ডিগ্রি বেশ কম করিয়া ফেলেন। এই ভুল তরজমাই অধ্যাপক পেরিনির হস্তগত হইল। তিনি তাঁহার নিজ আবিষ্কৃত ধূমকেতুর গতির সহিত সময় মিলাইয়া দেখিলেন যে প্রায় ২৪ মিনিট সময় বেশকম হয়।

তরজমা শুদ্ধ মনে করিয়া তিনি ভাবিলেন যে, ধূমকেতুটী দেখিয়াছেন উহা হয়তো অপর একটী ধূমকেতু হইবে। পরদিন সকাল বেলা আকাশ পরিষ্কার থাকাতে তিনি টেলিগ্রাম অনুযায়ী ভুলস্থানে তাঁহার ১২" ইঞ্চি পরিধির দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করিয়া নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপথে একটি অষ্টমশ্রেণীর ধূমকেতু পতিত হইল। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। তিনি বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহা কিয়েল মানমন্দিরের লেম্ব সাহেব দ্বারা আবিষ্কৃত নূতন ধূমকেতু বলিয়া চতুর্দ্দিকে তার করিয়া দিলেন ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে কিয়েলের তারের সাঙ্কেতিক চিহ্ন তরজমার ভুল বাহির হইল এবং দেখা গেল যে ট্রান্সিষাকে সময়ে পরিণত করিতে ২৪ মিনিট সময় বেশকম হইয়া গিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ভ্রমের দ্বারা একটী নব ধূমকেতু আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু এই ঘটনাতে ইহা হইতে আরও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে। ভোরে যে সময়ে কিয়েলে টেলিগ্রাম লিখা হয় সে সময়ে ধূমকেতুটী উল্লিখিত স্থান হইতে ৬। ৭ ডিগ্রী তফাতে ছিল। টেলিগ্রাম পেরিণির হস্তগত হইবার সময়ে উহা প্রকৃত পক্ষে ৩ ডিগ্রি দূরে অবস্থিত ছিল। পরদিবস ভোরে নভোমণ্ডলের ভুল স্থান পর্য্যবেক্ষণের সময়ে ঐ ক্রমগামী ধূমকেতু দূরবীক্ষণের দৃষ্ট স্থানের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। অপর কোন সময়ে নভোমণ্ডলের ঐ স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিলে আর ঐ নবাবিষ্কৃত ধূমকেতু পরলক্ষিত হইত না, সে অজ্ঞাত ও অদৃষ্ট ভাবে তাহার গন্তব্য পথে চলিয়া যাইত। ফলতঃ এই দ্বিতীয় ধূমকেতুটীও অধ্যাপক পেরিণি দ্বারা আবিষ্কৃত হইল।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

দ্যূত ক্রিয়ার ফল।

বাজী রাখিয়া খেলিবার প্রবৃত্তি সকল দেশের লোকেরই আছে বলিয়া দেখা গিয়াছে। পূর্ব্বে কেহ কেহ ইহার সার্ব্বভৌমত্বে অস্বীকার করিবার সাহস রাখিতেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল ইহার অধিকার শীত প্রধান দেশের জলবায়ুর সীমায়ই বদ্ধ; কারণ তথাকার লোকের পক্ষে স্নায়ুতন্ত্বকে কাঁপাইয়া রক্তকে উষ্ণ রাখার প্রয়োজন তাহাতে দেহে কর্ম্ম করিবার উত্তম জন্মে এই সমস্ত কারণে তথায় উত্তেজক ক্রীড়াশক্তি স্বাভাবিক।

কিন্তু এই অনর্থকর খেয়াল শীত প্রধান দেশের হাড় কাঁপান এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশের গা-জ্বালান জল বায়ুতে সমভাবে মানুষকে নাচাইয়া ক্ষেপাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। বিশেষ লেখা পড়া জানা লোককেও ইহার মোহিনী শক্তির টানে পড়িয়া বিনা কায়ক্লেশে রাতারাতি বড় মানুষ হইবার আশায় বসিয়া থাকিতে দেখা যায়।

বারবেরিক্ বাজী রাখিয়া খেলার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে অনেক লিখিয়াছেন। মুরের লিখিত আত্মহত্যা, জুয়া খেলা এবং কুস্তি সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলিও তাঁহার লেখার পাশাপাশি রাখা যাইতে পারে। উভয়েই খুব লম্বা লম্বা কথায় উপদেশের বক্তৃতা ঝাড়িয়াছেন কিন্তু জুয়া চোর, আত্মঘাতী, নেশাখোর ইহাদের উপর আবার উপদেশ! উপদেশং হি মূর্খস্য প্রকোপায় ন শান্তয়ে। ঐ সমস্ত কদভ্যাসে আসক্ত হইয়া যাহারা স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিতে বসিয়াছে তাহাদের উপর কার্য্য করিতে পারে কেবল জুয়ার গুটি, পিস্তল আর ছোরা!

একজন প্রাচীন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—পুরাকালে মানুষ একজন মানুষের উপর আর একজনকে হিলাইয়া দিয়া, তাহারা কে কেমন করিয়া কাহাকে আগে মারিতে পারে এই রঙ্গ দেখিবার জন্য আকুল-নেত্রে প্রতীক্ষা করিত। ইহাও নাকি একটা খেলা! কি বর্ব্বরতা!

কিন্তু আধুনিক সভ্যযুগেও যে বর্ব্বর স্বভাব সুলভ ভৌতিক ক্রীড়া না হইতেছে তাহা নহে। তবে, ক্রীড়া ক্ষেত্র প্রশস্ততর হইয়াছে। মল্ল সমাবেশ প্রচুর এবং ক্রীড়া পদ্ধতি সমধিক নৃশংস হইয়াছে এই মাত্র। ঐ যে সাম্মুখ জনসঙ্ঘ পরস্পরের প্রতি সম্মুখীন হইয়া 'কেহ না রাখিব তোর বংশে দিতে বাতি' বলিয়া তর্জ্জন করিতেছে তাহাদের বর্ব্বরতা কি পূর্ব্বগদিগের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্টতর?

চিন্তাশীল ব্যক্তিরা প্রাচীন বর্ব্বর এবং আধুনিক সভ্য এতদুভয়ের উদ্ভট রক্ত লালসার মূলে শতমুখী জ্বালার ধ্বংসময়ী তীব্রতায় স্বার্থপূর্ত্তির উপাদান লাভ করিবার জন্য উন্মাদ বর্ব্বরতার সন্ধান পাইবেন। ইহাতে মানবের দুষ্প্রবৃত্তি রাজী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহারা মানুষের বুদ্ধি লোপ করিয়া ফেলে, তাহাকে আত্মনাশের লোলিহান জিহ্বার কাছে ঠেলিয়া দেয়।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে একেলু নামক একজন ফরাসী চিকিৎসক ভাগ্য পরীক্ষার খেলা ও তাহার প্রতীকার নামক একখানা পুস্তক বাহির করেন। ইহাতে লক্ষ্য করিবার একটী বড় আশ্চর্য্য বিষয় আছে; লেখক নিজেই একজন পাকা জুয়া খেলার ওস্তাদ। বইখানা তাঁহার নিজের মূর্খতার জন্য নাকে খৎ দেওয়ার সামিল। কিন্তু ধর্ম্মের নামে শতবার শপথ করা সত্ত্বেও তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহার মুখের উপরই বলিয়াছেন, যে উক্ত মহাত্মা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জুয়ার গুটির চাল ঝাড়িয়া গিয়াছেন।

Montaigu লিখিয়াছেন—আমার পূর্ব্বে পাশ, তাস ইত্যাদির সাহায্যে বাজী রাখিয়া খেলিবার বেশ নেশা ছিল কিন্তু এ বদনেশা হইতে বহুদিন হইল আমি পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি। লোককে দেখাইবার জন্য আমি মুখের ভাব যথাসাধ্য অবিকৃত রাখিতে চেষ্টা পাইতাম কিন্তু যখনই হারিয়াছি তখনই আমার মনে খেলার উপর মহা বিতৃষ্ণা আসিত। গোল্ড স্মিথ ও এই পাগলামির পাল্লায় পড়িয়াছিলেন এরূপ যে কোন খেলা ভাল করিয়া খেলিতে হইলে বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও যথেষ্ট সময় খোয়াইয়া খেলার কায়দা গুলি বুঝিয়া উঠা চাই নতুবা ফিকিরী লোক বা পাকা ওস্তাদের হাতে পড়িলে মহা মহা পাণ্ডিতেরাও মুহূর্ত্তে বোকা বনিয়া বসেন।

তাস, পাশা এবং কুক্কুট এই কয়েকটি জিনিষ এশিয়াবাসীদিগকে এই নেশায় মাতিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইবার উপাদান স্বরূপ। চীনের পাকা জুয়া চোরেরা তাসে ভারী মজবুত। কোন ইংরাজ লেখক বলেন 'প্রাচ্য দেশবাসীরা বাজী হারিয়া হারিয়া সর্ব্বস্ব ফুরাইলে তাহাদের স্ত্রী পুত্র কন্যাকেও বাজী রাখে। তাহাতেও যদি না কুলায় সর্ব্বশেষে বাজী ধরে নিজকে। লেখক বোধ হয় মহাভারত হইতে তাঁহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই ত বাস্তবিক বীরত্ব এবং একন্যই বোধ হয় দ্যূত ক্ষত্রব্রত!

সিংহল দ্বীপে মোড়গের লড়াই পুরাদস্তুরে চলে। সুমাত্রা দ্বীপের খেলুড়েরা পাশা পিটিতেই বেশী পছন্দ করে। মালয় দ্বীপ বাসীদের খেলায় একটু রংদার রকমওয়ারী আছে। যথা সর্ব্বস্ব স পয়া খেলায় হারিয়া গেলে মালয়বাসীরা নৈরাশ্যে এবং শোক দুঃখের চাপে এক অদ্ভুত ভয়াল মূর্ত্তি ধারণ করে। কোন খেলুড়ে মাথার বাঁধা চুলের গোছা খুলিয়া দিলেই বুঝা গেল যত লোক জুয়ার আড্ডায় জুটিয়াছে তাহাদের সর্ব্বনাশ!

কারণ সে তখন একগুলি আফিম ঠুকিয়া নেশার চোটে পাগলের মত হইয়া পড়ে; আর নেশার চোটে ঝোঁকের মাথায় যাহাকে পায় আঁচড়ে কামড়ে তাহাকেই ক্ষত বিক্ষত করিয়া ধাওয়া ধাওয়ি করিতে থাকে। ইতস্ততঃ পাশার ঘোঁট ও গুটি হস্তে পলায়মান ঝুঁটি বাঁধা মালয়ীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রক্তচক্ষু অ'লুলায়িত কেশ, ভৈরববেশ, বিকশিতদন্ত, বিজিত, বিহীনসংজ্ঞ ব্যক্তির প্রধাবন; সে এক সুমহান্ বিরাট দৃশ্য!

মালয়ীদের এই মত্ততা হইতে ইংরেজী To run a muck কথাটি হইয়াছে। জনসন Muck শব্দটির ব্যুৎপত্তি গত অর্থ কিছুতেই খুজিয়া বাহির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু মালয়ী য়্যামক (Amuck) শব্দটিই ইহার গোত্রস্থানীয় ইহা আজকাল সুনির্দ্ধারিত হইয়াছে। Dryden লিখিয়াছেন—

> Front less, and satire-proof,
> he scowes the streets.
> And runs an gudian muck
> at all he meets.

জুয়াখেলার দেনা পরিশোধ করিবার জন্য শ্যামীয়েরা তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব, পরিবারবর্গ, এমন কি আপনাকেও দাস খতে লিখিয়া দেয়। চীনারা সমস্ত দিনরাত খেলিয়া যখন হাতে-পাতের-যা-কিছু-সব খোয়ায় তখন যাইয়া ফাঁসি লটকায়। জাপানীদের এই সর্ব্বনেশে খেলার দিকে এমন বেজায় ঝোঁক যে জাপান গবর্ণমেণ্টকে এজন্য আইন করিতে হইয়াছে যে, যে কেহ খেলায় টাকা বাজী রাখিবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইবে'। প্রশান্ত মহাসাগরের নবাবিষ্কৃত দ্বীপপুঞ্জে যাহারা বাস করে তাহাদের হাতকুড়ুলি বড় সখের জিনিষ, তাহারা দৌড়ে ইহা বাজী ধরিয়া থাকে।

কাপ্তেন কুক লিখিয়াছেন—আমি একটি লোককে তিন থামা হাতকুড়ুলি বাজিতে হারিতে দেখিয়া ছিলাম, লোকটা রাগে বুকে চাপড় মারিতেছিল এবং চুল ছিঁড়িতে ছিল। লোকটা নাকি তাহার প্রায় অর্দ্ধেক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঐ জিনিষগুলা করিয়াছিল।

প্রাচীন জাতি সমূহের জুয়াখেলার নেশা কম ছিলনা। পারসীক, গ্রীক, রোমীয়, হিন্দু, গথ এবং জার্ম্মাণ, ইহারা সকলেই জুয়ার নেশায় প্রমত্ত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজ' পর্য্যন্ত লোকে এই দুষ্ট দোষেপি বিষয়ে মমতাকৃষ্ট মানসঃ। সেদিনও ত জুয়ার খেলায় পাল্লায় পড়িয়া ধনী দরিদ্র, ইতর ভদ্র বেশ্যা বিবাম্ ছাত্র-শিক্ষক সকলকে সমভাবে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে দেখা গিয়াছে। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ডেইলি জর্ণালে কোন পাকা জুয়ার আড্ডার আমলা কয়লাদের একটি ফর্দ্দ বাহির হয়—

(১) কমিশনার সত্বাধিকারীর কাজের ভার সর্ব্বদা ইহারই উপর। ইনি রাত্রিতে সিহাব কিতাব দেখাশুনা করেন। সপ্তাহান্তে হিসাব অপর দুইজন সত্বাধিকারীকে বুঝাইয়া দেওয়াও ইঁহার কাজ।

(২) ডিরেক্টর ইনিগৃহের তত্বাবধান করেন।

(৩) অপারেটর ইনি খেলার তাস পাশা ইত্যাদি যোগাইয়া থাকেন।

(৪) দুই জন লোক, ইঁহারা তাসগুলি দেখে আর ব্যাঙ্কের জন্য টাকা সংগ্রহ করিয়া আনে।

(৫) দুইজন দালাল; ইহারা লোক ভুলাইয়া আনিয়া খেলায় লাগাইতে পারিলে কিছু টাকা পায়।

(৬) একজন কেরাণী; ইঁহার কাজ যাহাতে দালালেরা ফাঁকি দিয়া তাহাদিগকে খেলার জন্য যে টাকা দেওয়া হয় তাহা না খায় তাহার উপর লক্ষ্য রাখা।

(৭) একজন স্কুইব; সে শিক্ষা নবীশরূপে অর্দ্ধেক বেতন পাইয়া থাকে।

(৮) একজন ফ্লাশার (flasher) ইহার কার্য্য হইল কেবল যাহারা খেলিতে আসিবে তাহাদের নিকট বলা যে বহুবার খেলোয়ারদিগকে টাকা দিয়া ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে।

(৯) একজন ডানার; বাহিরে ঘুরিয়া লোক জুটাইয়া আনা ইহার কাজ।

(১০) একজন যোগানদার, পান, তামাক, মদ, ভাং, গাঁজা ইত্যাদি আসরে যোগান ইহার কাজ।

(১১) একজন এটর্ণী। মামলার পরামর্শ দাতা।

(১২) একজন কাপ্তেন; ইহার কাজ দালালেরই মত; তবে তর্কবিতর্কে লোককে বাগে আনিতে ইহার দক্ষতা সমধিক।

(১৩) অভ্যর্থক। ইনি ভদ্রলোকদিগকে অভ্যর্থনা করেন।

(১৪) পাহারাওয়ালা।

(১৫) আর্দ্দালী। পুলিশের উপর দৃষ্টি রাখা ইহার কর্ত্তব্য।

(১৬) হরকরা, গাড়োয়ান, কোচম্যান ইত্যাদি পৃষ্ঠ পোষক বর্গ।

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র সেন।

নিয়তির উদ্দেশে।

(Thomson হইতে)

কতকাল—কতকাল—রে নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা নিয়তি,
প্রেমের পরম শত্রু, কত আর ঘটাবে দুর্গতি ?
বার বার এসে তুমি প্রেমমুগ্ধ দুটী হৃদি মাঝে
বিভক্ত করিয়া দিয়া জ্বলাইছ বল' কোন্ কাজে ?
দুটী হৃদয়ের শুভমিলনের শত্রুতা সাধিয়া
বাড়াইবে দীর্ঘশ্বাস ? যাবে দিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া
এম্‌নি করিয়া কি গো ? বৃথা যাবে মধুর যৌবন ?
'যৌবন ফিরে না আর বঁধু মিলে থাকিলে জীবন।'
আকর্ষণ নাহি যেথা প্রাণে প্রাণে, নাহিক প্রণয়,
নিশি দিন মিলাইছ কতশত এমনো হৃদয়।
সুন্দরে কুৎসিতে আর সতী শঠে রসিকে নীরসে
কত অবাঞ্ছিত মিল ঘটাতেছ খেয়ালের বশে।
সমান সমান মিলে কেন তব শত্রুতা সাধন ?
আর কভু জ্বলাবো না শুন মোর এক নিবেদন।
আমার প্রিয়ার সাথে শুধু মোরে মিলাও মিলাও
হবো না কাতর কভু আর কিছু দাও বা না দাও।

শ্রীকালিদাস রায়।

অঙ্গিরাগণ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্র ভরতবংশীয় ছিলেন দেখিতে পাই। পাদ টীকায় তাহা উদ্ধার করিয়া দেখান গেল। (১)

প্রাচীন অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিবংশীয়গণ কোন্ দেশে বাস করিতেন জানিবার জন্য স্বতই মনে প্রশ্ন উদয় হয়। এই প্রশ্নের সমাধান দুরুহ হইলেও মনে হয়, ইহার সন্ধান কিছু প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমরা অনুমান করি দেবোপাধিক ঋষিবংশীয়গণ, যাঁহারা প্রথমে অগ্নি উপাসনা জগতে প্রচার করেন, হিমালয়ের পরপারে সম্ভবতঃ তিব্বতে বা তাহারও উত্তরে বাস করিতেন। নানাশাস্ত্রে ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ আমরা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে জানিতে পারি যে উত্তর কুরু নামে একটী রাজ্য হিমালয়ের পরপারে ছিল। তাহাকে দেবক্ষেত্রও বলা হইয়াছে। (২)

(১) স হোবাচ শুনঃশেপঃ স বৈ যথানোজ্ঞাপয়া রাজপুত্র তথাবদ যথৈবাঙ্গিরসঃ সন্নুপেয়াং তব পুত্রতামিতি স হোবাচ বিশ্বামিত্রোজ্যেষ্ঠো মে ত্বং পুত্রাণাং স্যাস্তব শ্রেষ্ঠা প্রজাস্যাৎ। উপেয়া দৈবং মে দায়ং তেন বৈ ত্বোপমন্ত্রয় ইতি !

স হোবাচ শুনঃশেপঃ সংজ্ঞানানেষু বৈ ব্রূয়াৎ সৌহার্দ্যায় মে শ্রিয়ৈ। যথাহং ভরতঋষভোপেয়াং তব পুত্রতামিত্যথহ বিশ্বামিত্রঃ পুত্রানামন্ত্রয়ামাস মধুচ্ছন্দাঃ শৃণোতন ঋষভো রেণুরষ্টকঃ যে কেচ ভ্রাতরঃ স্থ নাস্মৈ জ্যৈষ্ঠায় কল্পধ্বমিতি। ৩৩।৫।১৭

অর্থঃ—সেই শুনঃশেপ বলিলেন, হে রাজপুত্র (বিশ্বামিত্র) তিনি (অজীগর্ত্ত) যেরূপ আমাদিগকে জানাইয়াছেন, যথা আঙ্গিরস হইয়া কিরূপে তোমার পুত্রত্ব লাভ করা যায়, সেই বিষয়ে বলুন। সেই বিশ্বামিত্র বলিলেন, তুমি আমার পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হও; তোমার পুত্রগণই শ্রেষ্ঠ হইবে। আমার দৈবদায় প্রাপ্ত হও, তাহার দ্বারাই কিন্তু (পুত্রত্বে) বরণ করি। [উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ আমি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অনুবাদ গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিলাম না। প্রথমতঃ এই স্থানের কতক অংশের অনুবাদ বোধ হয় ভ্রমক্রমে মুদ্রিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার অনুবাদে অর্থ সামঞ্জস্য নাই।)

সেই শুনঃশেপ বলিলেন হে ভরতশ্রেষ্ঠ! সংজ্ঞানদিগের মধ্যে (অর্থাৎ আপনার পুত্রদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগের মধ্যে) আমার সৌহার্দ্য (ও) শ্রীলাভের জন্য এই বলুন যে আমি আপনার পুত্রত্বলাভ করিয়াছি! অনন্তর বিশ্বামিত্র পুত্রদিগকে ডাকাইয়াছিলেন। হে মধুচ্ছন্দা, ঋষভ, রেণু (ও) অষ্টক! তোমরা শ্রবণ কর। যে কয়জন ভ্রাতা আছ, (তোমরা) ইঁহা হইতে জ্যেষ্ঠত্ব কল্পনা করিও না।

(২) উদীচ্যাং দিশি বিশ্বেদেবাঃ ষড়্ভিশ্চৈব পঞ্চবিংশৈ রহোভিরভ্য ষিঞ্চন্নেতেন চ তৃচেনৈতেন চ যজুষৈ তাভিশ্চ ব্যাহৃতিভিবৈরাজ্যায় তস্মাৎ এতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কেচ পরেণ হিমবন্তং জন পদা উত্তর কুরব উত্তর মদ্রা ইতি

মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে অর্জ্জুন উত্তরদিক জয় করিতে গমন করিয়াছিলেন। এই দিগ্বিজয় বর্ণনায় দেখা যায় অর্জ্জুন উত্তর হরিবর্ষে গমন করিয়া উত্তর কুরুদেশের প্রধান নগর—যাহা গন্ধর্ব্বনগরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—তাহা হইতে কর আদায় করিয়াছিলেন। (১) রামায়ণে ও আমরা উত্তরকুরু নাম প্রাপ্ত হই। যখন সুগ্রীব সীতা অন্বেষণে নানাদিকে বানরদিগকে পাঠাইতেছিলেন, তিনি তাহাদিগকে কোন্‌দিকে কি কি দেশে উপস্থিত হইতে হইবে তাহার বিষয় উপদেশ দেন। তিনি উত্তরকুরুর যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে উহা উত্তরদিকে অবস্থিত। (১) গুহ্যকদিগের অধিপতি কুবেরের রাজ্যের

বৈরাজ্যায়ৈব……। বিরাড়িত্যেনা নভিষিক্তান চ ক্ষত।
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩৮।৩।১৪।

অর্থ :— উত্তরদিকে বিশ্বদেবগণ ছয়গুণ পঁচিশ (বা ছয়যুক্ত পঁচিশ) দিনে এই তৃচ দ্বারা, এই সকল যজুদ্বারা ও ব্যাহৃতি দ্বারা বৈরাজ্য লাভের জন্য অভিষেক করিয়াছিলেন। সেইজন্য উত্তরদিকে হিমবানের ওপারে যে উত্তর কুরু ও উত্তর মদ্র নামক জনপদ সকল (আছে) তাহারাই বৈরাজ্য নিমিত্ত (অর্থাৎ তাহাদের রাজ্যই বৈরাজ্য নামে অভিহিত)। যাহারা অভিষিক্ত হয় তাহাদিগকে বিরাট বলে।

ব্রাহ্মণোত্তর কুরূঞ্জয়েয়মথত্বমুহৈব পৃথিব্যৈ রাজাস্যাঃ সেনাপতিরেব তেঽহং স্যামিতি সহোবাচ বাসিষ্ঠঃ সাত্যহব্যো দেবক্ষত্রং বৈ তন্ন বৈ তন্মর্ত্ত্যো জেতুমর্হতি।

ঐঃ ব্রাঃ ৩৯।৯।২৩

অর্থ :— হে ব্রাহ্মণ! আমি যখন উত্তরকুরু জয় করিব, তুমি তখন এই পৃথিবীর রাজা হইবে, আমি তোমার সেনাপতি হইব। বাসিষ্ঠ সাত্যহব্য বলিলেন, ঐ দেশ দেবক্ষত্র, মর্ত্ত্য ইহা জয় করিবার অযোগ্য।

(১) মহাবীর অর্জ্জুন ধবলগিরি অতিক্রম করিয়া… কিম্পুরুষবর্ষ পরাজয় ও অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে সসৈন্যে গুহ্যক পালিত হাটকদেশে উপস্থিত হইলেন, তথায় গুহ্যকদিগের নিকট জয় লাভ করিয়া তিনি মানসসরোবর ও সমস্ত ঋষি কন্যা অবলোকন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মানসরোবরের নিকটস্থ হইয়া হাটকের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গন্ধর্ব্ব রক্ষিত দেশ সকল অধিকার করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তর হরিবর্ষে সমুপস্থিত হইয়া জয়লাভ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন। এই অবসরে মহাবীর্য্য মহা[illegible] অর্জ্জুন সন্নিধানে উপনীত হইয়া [illegible] হে কুন্তীনন্দন মহাভাগ অর্জ্জুন! আপনি এই গন্ধর্ব্বনগরী অধিকারে কদাচ সমর্থ হইবেন না। অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান করুন। এই নগরী অপর্য্যাপ্ত সৈন্যসামন্ত সম্পন্ন যিনি এই নগরে প্রবেশ করেন তিনি নিঃসন্দেহ সামান্য মনুষ্য নহেন। এক্ষণে আমরা আপনার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি। যখন আপনি এই নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আপনার জয়লাভই হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! এস্থলে কোন বিষয়ই জেতব্য লক্ষিত হয় না। এই দেশের নাম উত্তরকুরু। এ স্থানে যুদ্ধের প্রসঙ্গও নাই। আপনি নগরে প্রবেশ করিয়াছেন, তথাপি স্থান প্রভাবে কোন বস্তুই আপনার প্রত্যক্ষ হইতেছে না। এস্থলে কোন বিষয়েই মনুষ্যমাত্রের সাক্ষাৎকার-সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে আপনার যদি কোন কার্য্য সংসাধন করিবার অভিলাষ থাকে বলুন, আজ্ঞা পাইলে আমরাই সমস্ত অনুষ্ঠান করিব। তখন অর্জ্জুন সহাস্য মুখে প্রত্যুত্তর করিলেন, আমি ধীমান ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, এতএব যদি তোমাদিগের এই প্রদেশ সকল নরলোকের সঞ্চার বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যৎকিঞ্চিৎ কর প্রদান কর। তখন দ্বারপালেরা অর্জ্জুনকে দিব্যবস্ত্র, দিব্য আভরণ দিব্য অজিন ও মহার্হ ক্ষৌম বস্ত্র এই সমস্ত বস্তু কর প্রদান করিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, সভা পর্ব্ব ২৭ অধ্যায়।

(১) আর সেই উত্তরদিকে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, প্রস্থল, ভরত, কুরু, মদ্রক, কাম্বোজ, যবন এবং শকদিগের পত্তন সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বরদা ও হিমবান্‌কে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবে। … তৎপরে দেব গন্ধর্ব্ব সেবিত সোমাশ্রমে গমন করিয়া কাল নামক সানুবিশিষ্ট পর্ব্বতে গমন করিবে। হেমগর্ভ মহাগিরি শৈলেন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া সুদর্শন পর্ব্বতে যাইবে। তৎপরে দেবসখা পর্ব্বতে …… তৎপরে

ও উত্তরে উত্তর কুরু অবস্থিত। এই স্থানে সিদ্ধগণ ও কৃত পুণ্য-গণ আশ্রয়প্রাপ্ত হন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত ও রামায়ণ হইতে উত্তরকুরুর স্থান হিমালয়ের উত্তরে জানা যাইতেছে। ঐ স্থানে যে সিদ্ধ ও পুণ্যবানগণ বাস করেন এবং তাঁহাদের আচরণ ঋষিদিগের মত তাহা বেশ উপলব্ধি করা যাইতেছে। মহাভারতে উহাকে গন্ধর্ব্বদিগের আবাস-স্থান দেখি এবং উহার প্রধান নগরকে গন্ধর্ব্ব নগর বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐ স্থানের রাজা বিরাট নামে অভিহিত ও ঐ স্থান দেবক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই আদিত্য বরুণ গন্ধর্ব্বদিগের রাজা ছিলেন। (১) কুবের রাক্ষসদিগের রাজা, এই ব্রাহ্মণেই দেখিতে পাই। (২) যদিও রামায়ণে কুবেরকে যক্ষরাজ বলা হইয়াছে, কুবের রাবণের ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাকে রক্ষরাজও বলা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে গন্ধর্ব্ব শব্দ বর্ত্তমান।৩

পর্ব্বত, নদী বৃক্ষশূন্য সর্ব্ব প্রাণী বিবর্জ্জিত শত যোজন বিস্তৃত স্থানে……। তাহা অতিক্রম করিয়া পাণ্ডুর কৈলাস পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হইবে। তথায় বিশ্বকর্ম্মারচিত জাম্বুনদ (স্বর্ণ) খচিত রম্য কুবেরভবন (আছে)। তাহার নিকটে প্রচুর কমল ও উৎপল শোভিত হংস কারণ্ডবসমূহে সমাকুল অপ্সরাগণ নিষেবিত অতি বিস্তৃত এক সরোবর আছে। সর্ব্বলোক প্রণম্য ধনপতি যক্ষরাজ কুবের গুহ্যকগণের সহিত তথায় নিত্যক্রীড়া করিয়া থাকেন। ……………………আর মৈনাকের সানুপ্রস্থ ও কন্দর প্রভৃতি যে যে স্থানে অশ্বমুখী কিন্নরীদিগের বাসস্থান আছে, তোমরা সেই সকল স্থান অন্বেষণপূর্ব্বক তাহা অতিক্রম করিয়া যে স্থানে সিদ্ধ, বৈখানস এবং বালখিল্য পুণ্যাত্মা তপস্বিগণ বাস করিয়া থাকেন, সেই সিদ্ধগণ সেবিত আশ্রমে যাইয়া পুণ্যাত্মা তপস্বিগনকে বন্দনা করিয়া সবিনয়ে সীতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। এই সিদ্ধাশ্রমে সুবর্ণময় পদ্মরাজি পরিবৃত তরুণ সূর্য্যের ন্যায় সঞ্চরণশীল হংসসমূহে সেবিত, বৈখানস নামক সরোবর আছে। কুবেরের বাহন সার্ব্বভৌম নামক গজরাজ হস্তিনীদিগের সহিত নিয়ত সেই দেশে বিচরণ করিয়া থাকে। তোমরা সেই সরোবর অতিক্রম করিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা এবং মেঘশূন্য প্রদেশে যাইবে। সেই প্রদেশ সূর্য্যকিরণের ন্যায় স্বয়ম্প্রভ দেবতুল্য সুখোপবিষ্ট তপস্বী সিদ্ধগণদ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। পরে সেইস্থান অতিক্রম করিয়া শৈলোদানাম্নী নদী দেখিতে পাইবে। সেই নদীর দুই তীরে কীচক নামক বেণুগণ (বাস করে); তাহারা সিদ্ধদিগকে পারে লইয়া যায় ও পুনরায় ফিরাইয়া আনে। উত্তর কুরুগণ সেই স্থানে কৃতপুণ্যদ্বারা আশ্রয়প্রাপ্ত। ………… কুরুদিগের উত্তরদিকে কাহারও গন্তব্য নহে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪৩ সর্গ।

---

(1) 'King Varuna Aditya,' he says ; 'his people are the Gandharvas and they are staying here' ;—handsome youths have come thither it is these he instructs ;—The Atharvans are the Veda ; this it is'.

Satapatha-Brahman XIII, 4-3-7.
Part V. P. 365.

(2) 'King Kubera Vaisravana,' he says ; 'his people are the Rakshas and they are staying here ; evil-doers, robbers, have come thither ; it is these he instructs ;—The Devagana Vidya is the Veda ; this it is'.

Satapatha—Brahman. XIII, 4-3:10.
Part V. P. 367—68.

(৩) বিশ্বাবসুঃ। সোম! গন্ধর্বং। আপঃ
দদৃশুষীঃ। তৎ। ঋতেন। বি। আয়ন্।
তৎ। অনু অবৈৎ। ইন্দ্রঃ। রুরুহাণঃ।
আসাং। পরি। সূর্যস্য। পরিধীন্। অপশ্যৎ॥

১০।১৩৯।৪

অর্থঃ—হে সোম! বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বকে আপ সকল দর্শন করিয়াছিলেন, অনন্তর ঋতদ্বারা বিশেষরূপে আগমন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের (অর্থাৎ জল সকলের) বহিষ্কর্ত্তা ইন্দ্র জানিয়াছিলেন (ও) সূর্য্যের পরিধি সকল সম্যক্ দর্শন করিয়াছিলেন।

বিশ্বাবসুঃ। অভি। তৎ। নঃ। গৃণাতু।
দিব্যঃ। গন্ধর্বঃ। রজসঃ। বিমানঃ। ১০।১৩৯।৫

দিব্যলোকের গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু রজলোকের নির্ম্মাণকর্ত্তা আমাদিগকে তাহা বলুন।

এই শব্দ যেখানে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সূর্য্যকে বুঝাইতেছে। নিম্নে ঋক উদ্ধার করিয়া দেখান গেল। দিব্যলোকের গন্ধর্ব্ব বলায় বুঝা যাইতেছে আর্য্যদিগের মধ্যে মর্ত্ত্যলোকের গন্ধর্ব্বও ছিল। সূর্য্য বা বিবস্বান একজন আদিত্য। অতএব গন্ধর্ব্ব শব্দ আদিত্যদিগকে বুঝাইত। বরুণ আদিত্যদিগের প্রধান ছিলেন। সেইজন্য শতপথ ব্রাহ্মণে বরুণকে গন্ধর্ব্বদিগের রাজা বলা হইয়াছে। অতএব হিমালয়ের পরপারে উত্তর কুরুদেশে গন্ধর্ব্বগণ বাস করিতেন। তাঁহাদিগের রাজা ছিলেন বরুণ। বরুণ ও প্রধান আদিত্যগণ রাজন্য ছিলেন এবং ভৃগু, অঙ্গিরা, অথর্ব্ব প্রভৃতি ঋষি তাঁহাদের পুরোহিত ছিলেন। অনুমান করি ভৃগুবংশীয় ঋষিগণ বরুণ রাজার পুরোহিতবংশ ছিলেন। সেইজন্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বরুণ ভৃগুকে গ্রহণ করেন উল্লেখ দেখিতে পাই। (১) আঙ্গিরস বৃহস্পতি ইন্দ্ররাজের

[বিশ্বাবসু অর্থে 'সকল ধন যার'; সবিতাকে 'রায়োবুধ্ন' (অর্থাৎ ধনের মূল) এবং "বসুনাং সংগমনঃ" (ধনের প্রাপক) অর্থে, ১০।১৩৯।৩ ঋকে বলা হইয়াছে. অতএব এস্থলে বিশ্বাবসু অর্থে—সবিতাকে বুঝাইতেছে বলিতে হইবে।]

এস্থলে বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বকে দর্শন করিয়া জল সকল ঋত দ্বারা আগমন করিয়াছিল বর্ণিত হইয়াছে। অপর একস্থলে বারি সমূহ সূর্য্যের আগমন শ্রবণ করিয়া নিম্ন মুখ হইয়াছে বর্ণিত হইয়াছে দেখি।

আ। সূর্যঃ। অরুহৎ। শুক্রং। অর্ণঃ
অযুক্ত। যৎ। হরিতঃ। বীত পৃষ্ঠাঃ।
উদ্ন। ন। নাবং। অনয়ন্ত। ধীরাঃ
আশৃণ্বতীঃ। আপঃ। অর্ব্বাক্। অতিষ্ঠন্॥৫।৪৫।১০

অর্থ:—যখন সূর্য্য কমনীয় পৃষ্ঠযুক্ত হরিত (নামক অশ্বদিগকে) যোজন করিয়া উজ্জ্বল উদকের দিকে আরোহণ করিয়াছেন, উদকের দ্বারা (গমনশীল) নৌকার মত (তাঁহাকে) ধীরগণ (অর্থাৎ দেবগণ) আনয়ন করিতেছেন, (তাহা) শ্রবণ করিয়া আপসকল নিম্নমুখ হইয়াছে।

ঊর্ধ্বঃ। গন্ধর্বঃ। অধি নাকে। অস্থাৎ
বিশ্বা। রূপা। প্রতিচক্ষাণঃ। অস্য।
ভানুঃ। শুক্রেণ। শোচিষা। বি। অদ্যৌৎ
প্র। অরুরুচৎ। রোদসী। মাতরা। শুচিঃ॥
৯।৮৫।১২

দিব্য লোকের উপরে, উর্দ্ধে গন্ধর্ব্ব ছিলেন; বিশ্বরূপ-সকল দেখাই তাঁহার (কার্য্য)। দীপ্ত ভানু (অর্থাৎ সূর্য্য) দীপ্ত তেজ দ্বারা যুক্ত হইয়া উজ্জ্বল হইতেছেন, রোদসী মাতাদ্বয়কে (অর্থাৎ দ্যাবা পৃথিবীকে) আরক্ত করিতেছেন

সায়নাচার্য্য ইহার টীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন; ঊর্ধ্ব উন্নতো গন্ধর্বো রশ্মীনাং ধারকঃ সোমো নাকে আদিত্যে অধ্যস্থাৎ অধিতিষ্ঠতি কিংকুর্বন্ অস্য আদিত্যস্য বিশ্বানিরূপাণি প্রতিচক্ষাণঃ প্রতিপশ্যন্ ভানুরাদিত্যঃ সোমাধিষ্ঠিতঃ স নশুক্রেণ দীপ্তেন শোচিষা তেজসা বিদ্যোততে। অতএব গন্ধর্ব্ব অর্থে সায়নসোম করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এখানে গন্ধর্ব্ব অর্থে সূর্য্য করি। কারণ এই ঋকে ভানু উঠিতেছেন বর্ণনা হইতেছে অতএব ইহার পূর্ব্বে রাত্রি ছিল। রাত্রি কালে, গন্ধর্ব্ব সূর্য্য নাকের (অর্থাৎ স্বর্গের) উপর ছিলেন—এক্ষণে সেইস্থান হইতে নামিয়া দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যে আসিতেছেন। নাক অর্থে যে দ্যুলোক তাহা সায়নাচার্য্য ইহার পূর্ব্ব ঋকে ও অপর বহুস্থানে লিখিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে তিনি আদিত্য অর্থ করিয়াছেন কেন বুঝা যায় না। বিশ্বসংসার দর্শন করাই সূর্য্যের কার্য্য—চন্দ্রের ইহা কার্য্য নহে। অতএব অনুমান করি এস্থানে গন্ধর্ব্ব নাম সূর্য্যকে দেওয়া হইয়াছে।

(১) তদ্বা ইদং প্রজাপতে রেতঃ সিক্ত মধাবৎ তৎ-সরোঽভবৎ তে দেবা অব্রুবন্ মা ইদং প্রজাপতে রেতো দুষৎ ইতি ... ... । তদগ্নিনা পর্য্যাদধু স্তন্ মরুতোঽ ধুন্বং র্ণ প্রাচ্যাবয়ৎ তদগ্নিনা বৈশ্বানরেণ পর্য্য দধুস্তন্ মরুতোঽধুন্বং স্তদগ্নির্বৈশ্বানরঃ প্রাচ্যাবয়ৎ তস্য যৎ-রেতসঃ প্রথমং উদদীপ্যত তদসাবাদিত্যোঽভবৎ যদ্ দ্বিতীয় মাসীৎ তদ্ভৃগুরভবত্তং বরুণো ন্যগৃহ্নীত তস্মাৎ স ভৃগু বারুণি রথ যৎতৃতীয় মদীদেদিব ত আদিত্যা অভবন্ যেঽঙ্গারা আসন্ স্তেঽঙ্গিরসোঽভবন্ যৎ অঙ্গারাঃ পুনরবশান্তা উদদীপ্যন্ত তৎ বৃহস্পতি রভবৎ।

অর্থ:—প্রজাপতির সেই এই সিক্তরেত বহিয়া গিয়াছিল; তাহা এক সরোবর হইল। সেই দেবগণ বলিলেন,

পুরোহিত ছিলেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। (২)

নানা শাস্ত্র হইতে যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে এই অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না যে হিমালয়ের উত্তরে ঋষি বংশের আদি পুরুষগণ ও ক্ষত্রিয় প্রধান আদিত্যগণ বাস করিতেন। তাঁহারাই পরে ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেন। উত্তরকুরু দেশে অবস্থানকালেই অগ্নির উপাসনা প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি। যেকালে অঙ্গিরাগণ দক্ষিণদিক্‌বাসী পণিদিগের বিরুদ্ধে গোযুদ্ধে বহির্গত হইতেন, তখন সূর্য্য সরমা নক্ষত্রে আসিলে শীতায়ণ বা Winter solstice হইত অনুমান করি। সরমানক্ষত্র ইংরাজী Serius বা Dogstar হইলে এবং পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে সরমার স্থান হইত বলিয়া ঐ নক্ষত্র Winter solstice হইত দেখা যায়। ইহা প্রায় ১৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিত। আমরা অনুমান করি কিম্বদন্তীরূপে অঙ্গিরাদিগের বিষয় ঋগ্বেদে বর্ত্তমান। এই কালের বহু পরে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছে।

পণিদিগের বিষয় ঋগ্বেদে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে অনুমান করি উহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী। উহাদের সহিত আর্য্যদিগের ধর্ম্মে, কর্ম্মে, মতে মিলিত না। তাহারা অগ্নিপুজক ছিল না। তবে তাহারা বাণিজ্য প্রধান জাতি ছিল ও তাহার দ্বারা ধনবান্ হইয়াছিল।

ইহাও অনুমান করা যায় যে ভারতীয় আর্য্যগণ কেবল যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আগমন করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহারা হিমালয়ের পরপারে তিব্বত, কৈলাসপর্ব্বত প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন। তাহা হইতে নানা পথে দক্ষিণদিকে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত আমরা ভৃগু বংশকে আসামে দেখিতে পাই; বশিষ্ঠকে অযোধ্যায়, ভরদ্বাজকে প্রয়াগে, গৌতমকে বিহারে—অর্থাৎ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তেই ঋষিদিগের উপনিবেশ দেখিতে পাই।

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়।

প্রজাপতির এই রেত যেন দূষনীয় না হয়। (দেবগণ) তাহা অগ্নিদ্বারা বেষ্টন দিলেন। তাহা মরুৎগণ আলোড়ন করিতে লাগিলেন; অগ্নি তাহার ক্ষয় করিতে পারেন নাই। তাহা বৈশ্বানর অগ্নিদ্বারা বেষ্টিত করা হইয়া ছিল। মরুৎগণ তাহা বিধূনিত করিতে লাগিলেন। তাহা বৈশ্বানর অগ্নিদ্বারা ক্ষীণ হইয়াছিল। তাঁহার রেত হইতে যাহা প্রথম উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তাহা ঐ আদিত্য হইয়াছিল; যাহা দ্বিতীয় ছিল তাহা ভৃগু হইয়াছিল; তাহাকে বরুণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি বারুণি ভৃগু। যে তৃতীয় (অংশ) দীপ্তি পাইয়াছিল, তাহা আদিত্যগণ হইল। যে সকল অঙ্গার ছিল তাহারা অঙ্গিরাগণ হইলেন। পুনরায় যখন অবশেষে অঙ্গারসকল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল তাহা বৃহস্পতি হইয়াছিল।

(২) ইন্দ্রায় বৈ দেবা জ্যৈষ্ঠ্যায় শ্রৈষ্ঠ্যায় নাতিষ্ঠন্ত। সোহব্রবীৎ বৃহস্পতিং যাজয় মা দ্বাদশাহেনেতি। তং অযাজয়ৎ। ততো বৈ তস্মৈ দেবা জ্যৈষ্ঠ্যায় শ্রৈষ্ঠ্যায় অতিষ্ঠন্ত। ঐঃ ব্রাঃ ১৯:৩।২৫

অর্থঃ—দেবগণ ইন্দ্রকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি বৃহস্পতিকে বলিয়াছিলেন, আমাকে দ্বাদশাহের দ্বারা যাজন কর। তাঁহাকে যাজন করিয়াছিলেন। তৎপরে দেবগণ তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

নববধূ।

কে তুমি ছুইছ ওরে পুরুষ প্রবর
আরত কহেনা কথা,
মুদে রাখে আঁখি-পাতা।
অভিনব ছবিখানি সচেতন জড়।

চকিত চপলা প্রায়
দেখিতে পালায়ে যায়।
আঁধার কোণেতে তার সাম্রাজ্য সুন্দর।

সে দিনের কচি ছুঁড়ি,
সেজেছে সেকেলে বুড়ি,
অপরূপ ছোট বউ কাপড়ে কাঁপর।

সেদিন পুতুল লয়ে,
কত সাধে দিছে বিয়ে,
দলে দলে কণে কত, দলে দলে বর।

সে ই এসো পুরোহিত,
গেয়েছে মঙ্গল গীত,
পড়িয়াছে নিশি দিন মিলন মন্তর।

কানে কানে চুপ্ চাপ্,
শিখায়েছে প্রেমালাপ
রচিয়া রচিয়া কত ফুলের বাসর।

আজ যে তাহারি পালা—
জীবন্ত পুতুল খেলা,
ঘোমটা সত্তর হাত মাথার উপর।

কে তুমি ছুইয়ে তারে
ফেলিলে অবাক্ করে,
কোমল কুসুমটীরে করিলে কাতর।

জানিত সে কত কথা,
আজ জিভে কি জড়তা,
অবশ হয়েছে ছুয়ে পরশ পাথর।

আদর্শ পুতুল বধু,
ঢেকেছে বদন বিধু।
মুদিয়া ফেলেছে ঐ আঁখি ইন্দিবর।

অথবা বিশ্বের কাছে,
সব তার রোধিয়াছে,
ঢালিতে আবেশ শুধু তোমার উপর।

প্রতিজ্ঞা তোমারে বিনা,
কথা আর শুনাবেনা,
চাপিয়া রেখেছে মধু, মধুর অধর।

ও নয়ন দরপনে
তব প্রতি বিম্ব বিনে
ধরিবে না কিছু আর ধরণী ভিতর।

প্রীতির নৈবেদ্য থাল
ও মুখ কমল লাল
দেখাবে না বিনে তার প্রিয় মধুকর।

অন্যে সম্ভাষিলে তারে,
সে উত্তরে মাথা নেড়ে;
আবিষ্কার করিয়াছে ভাষা মনোহর।

সে সম্ভাসে দিয়ে তুড়ি,
কিম্বা চুক্ চুক্ করি,
প্রীতির মধুর ডাক সরল সুন্দর।

যে অধর রসনায়,
ডাকে প্রিয় দেবতায়,
যে নয়নে হেরে তার প্রেমের ঈশ্বর;

কেন তা অপর ভাবে
কলুষিত করিবে সে,
অপরের ছায়া কেন করিবে গোচর?

তোমরা যা ইচ্ছা কও—
হাবা মেয়ে বোকা বউ;
আমি দেখি সতী সাধ্বী উজলিছে ঘর।

ও নহে পুতুল খেলা
ছাঁই পাঁশ মাটী ধূলা
এ সতীত্ব সংহিতার সজীব অক্ষর।

৺সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কবি গোবিন্দ রায়।

বঙ্গ সাহিত্যাকাশের আর একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নাম হয়ত সকলে জানেন না; কিন্তু তাহার দুইটী গান বঙ্গের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই জানেন। আজ কাল ভগবানের কৃপায় বঙ্গসাহিত্যে কবিতা, গান বা অন্যবিধ শিক্ষিতব্য বিষয়ের অভাব নাই। কিন্তু ৩০। ৪০ বৎসর আগে ভাষার এত সমৃদ্ধি ছিল না। তবে কথা এই যে তখন এখনকার মত ভাণও বড় বেশী ছিল না। আগে যাঁহারা লিখিতেন;—তাহারা মর্ম্মের বেদনা মুখে হুবহু বলিতেন। তাই মিত্র কবির "ভারত শ্মশান মাঝে আমিরে বিধবা বালা" কবি মনোমোহনের "দিনের দিন সবে দীন" প্রভৃতি কতিপয় সর্ব্বত্র প্রচলিত সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে কবি গোবিন্দ রায়ের দুইটী গানও সকলের নিকট পরিচিত ও আদৃত হইয়াছিল। সেই গান দুইটী শিক্ষিত সমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। একটী—

"কতকাল পরে, বল ভারত রে, দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে"। যে গানটীকে পল্লীর ছেলে মেয়েরাও "হারমোনিয়ম শিখিবার সুর" বলিয়া অভিনন্দন করে।

দ্বিতীয় গানটী—

"নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দরে যমুনে ও"

এই দুইটী গানই নিরবচ্ছিন্ন স্বদেশ প্রেমে পরিপূর্ণ। কেবলি অতীতের গৌরব স্মরণ করিয়া শোকার্ত্ত করিব মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ। কবি গোবিন্দচন্দ্রের ঐ কবিতা দুইটীর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ বঙ্গসাহিত্যে উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত দুইটী গানই দেদীপ্যমান।

অনেকের বিশ্বাস কবি গোবিন্দচন্দ্র ঐ দুইটী কবিতামাত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা সম্প্রতি তাঁহার আরও কবিতার সংবাদ পাইয়াছি। তিনি গীতি কবিতা নামে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করেন। উহা চারি ভাগে বিভক্ত। ১২৮৮ সালে ঐ গীতি কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং ১২৮৯ সালে তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ প্রকাশিত হয়। প্রবাদ, গোবিন্দচন্দ্র বহু কবিতা যমুনা জলে বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আমরা এখানে সংক্ষেপে কবির জীবনী ও কয়েকটী কবিতার উল্লেখ মাত্র করিব।

ফরিদপুর জিলার দক্ষিণ পাড় গ্রামে ১২৪৫ সনের ৬ই কার্ত্তিক গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম গৌরসুন্দর রায়। তিনি নীলকর ওয়াইজ সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। ঢাকার বিখ্যাত উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় কবির কনিষ্ঠ সহোদর। গোবিন্দচন্দ্র ঢাকা পোগোজ স্কুলে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

ব্রাহ্ম ব্রজসুন্দর মিত্র ও তাৎকালিক ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সংস্পর্শে গোবিন্দচন্দ্র ব্রাহ্ম হইয়া যান। ফলে গৌরসুন্দর রায় মহাশয় তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। গোবিন্দচন্দ্র অতঃপর নানাস্থানে শিক্ষকতা ও অন্যান্য চাকুরী করিয়া কাশীধাম প্রস্থান করেন। কাশীতে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়া তিনি জজ আয়রণ সাইডের সঙ্গে আগ্রায় গমন করতঃ এক ঔষধালয় স্থাপন করেন। ইহার পর তিনি আর বঙ্গদেশে আসেন নাই। সেইখানেই গত ১৬ই অগ্রহায়ণ ৭৯ বৎসর বয়সে দারুণ আমাশয় রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে কবির কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব।

(১)

বৃন্দাবন মঞ্জরী।

নিরখি স্মৃতির পট কহরে শুনি,
গত কাহিনী সে বৃন্দাবন ও। ১
খোল সেই আলেখ, কাল হরিয়া যারে
থুইলেক সম্বরি ভূতে ও।
আঁকহ সে পূর্ণিমা, পুনঃ এই অম্বরে
দীপ্তিল যাহা কোনকালে ও। ২
পরি তরু পল্লব শ্যাম চরণে যবে
শোভিতে হই' পট-লেখা ও।
উজলি কালিন্দীর নীলনিভ সলিলে
খচি সৈকত তট রেখা ও॥ ৩
উঠি তব হাসির রব এই গগনে
হাস্তে পলাইত পথিকেও।
সুখে স্বাধীন অহ! ছিল সব যখনে
ভারত সে কোন কালেও॥ ১৯
নৃতিল এ দেশ যখন সুসজ্জিয়া
গ্রীসের প্রণয়োপহারে ও।
দীপিল চৌদিক ফুল্ল মনোহর
গ্রীক রমণী মুখজালে ও॥ ২৯
নিরখিল কভু এ "হিউয়্ঙাঙ্গে" আহা
যত মঠ মন্দির দ্বারে ও।
বিহারে বিহারে বুদ্ধ পদাঙ্কে
অর্চ্চিতে সে কোন কালে ও॥ ৩৩
নাই কোন লক্ষণ করিতে মুনিখব
বিহরিছে সবে গোমায়ু ও।
কণ্টক গুল্মে শুষ্ক তৃণাঙ্কুরে
বাজিছে স্বন্ বন বায়ু ও॥ ৪০

কবি অতঃপর সুলতান মামুদের ভীষণ আক্রমণ তুলিকায় চিত্রিত করিয়াছেন—

ধবল সৌধ যত রঞ্জিল রুধিরে
লুণ্ঠিত ভারত সম্পদ ও।

পথ গলি প্রাঙ্গন ওই নীল যমুনা
গাহিল কল কল লোহিতেও ॥ ৪৮

বাঙ্গালার বর্ষা।

আসিল বরষা কাল নীল রঙ্ মেঘজাল
ঢাকিল আকাশ যেন দিনে রাত্রি করিয়া।
ক্ষেত খোলা তলে তলে ঢাকিল নূতন জলে
... ... ইত্যাদি।

সঙ্গে সঙ্গে কবি বাঙ্গালার ঘরের সংবাদ দিতেছেন—

কাঁঠালের বীচি ভাজা, তায় মুড়ি ভাজা তাজা,
লবণ মরিচ তেলে, খায় কেহ ঘসিয়া। ৬
সুরস ইলিশ মাছে, কোল গাদা বেছে বেছে
রাঁধে কুলবধু ঝোল সরিষপ বাটিয়া। ৭
কেহ বা করঞ্জ কাটি চড়্চড়ি পরিপাটী
রাঁধিছে মনের সাধে বাটি বাটি ভরিয়া।
শ্বশুর শাশুড়ী ঘরে ভয়েতে না কথা সরে
কাঁদিছে কোণেতে কেহ প্রবাসীরে স্মরিয়া। ৮
পায়ের উপরে পা বাবুদের মোছে তা'
ঘরেতে পোয়াতি কাঁদে ... ইত্যাদি।

কবির যে কয়টী কবিতা আছে, তন্মধ্যে যমুনা লহরী, বৃন্দাবন মঞ্জরী প্রভৃতি সুদীর্ঘ ও অন্যগুলি ক্ষুদ্র। কিন্তু সকলগুলিই হীরকখণ্ডের মত সমুজ্জ্বল। তাঁহার "বিজ্ঞান উৎসব"—কবিতায় গণিত জ্যোতিষে তাঁহার কতখানি প্রীতি ছিল, তাহারই প্রমাণ বর্ত্তমান। তাহাতেও দেশের কথা।

দেখ দেখ আজ, প্রতীচী ভুবনে
কোবিদ কদম্ব উঠিল মাতি।
দেখিতে সকলে সাজিল সদলে
রবির মণ্ডলে ভৃগুর গতি ॥
... ...
সহ দূরবীণ নবীন প্রবীণ
কাতারে কাতারে জ্যোতিষী কত
... ...
অধীর গমনে প্রকৃতি ভবনে
সবে উপনীত হইছে সাজি।
বিধির বিপাকে, কহিব কাহাকে
ভারত খেলিছে পুতুল আজি।
... ...
কীটের উদরে আজি সঁপে ঘরে
প্রখর ভাস্কর ময়ূর ভাটে।
শির বিমুণ্ডিত ভারত পণ্ডিত
মরিছে কপাল ঠিকুজী ঘেটে॥

শুনিয়াছি গোবিন্দচন্দ্রের অপ্রকাশিত কয়েকটী কবিতা আছে। তাঁহার সমুদয় কবিতা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় মুদ্রণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। ঢাকায় এখন ভাল রকম ছাপা হইতেছে। আশা করা যায়, কোনও উদ্যোগী প্রকাশক গোবিন্দ বাবুর "গীতিকবিতা" ভাল করিয়া ছাপাইবেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।

গ্রন্থ সমালোচনা।

নূতন-শিক্ষাপ্রণালী—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দাস গুপ্ত বি, এ, বি, টি, প্রণীত। মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র। প্রকাশক পপুলার লাইব্রেরী, ঢাকা।

বাল্যের শিক্ষাই ভবিষ্যতের পথগঠন করিয়া দেয়। সুতরাং শিশুদিগের শিক্ষার উপরই ভবিষ্যৎ জাতীয় উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। কি উপায় অবলম্বন করিলে শিশুগণ সহজে অল্প সময় মধ্যে সমস্ত বিষয় সম্যক বুঝিতে পারে তাহা প্রমথ বাবু এই গ্রন্থে দেখাইয়া দিয়াছেন। শিশুগণের মনোভাব, সেই মনোভাব অনুসারে শিক্ষাদানের বিভিন্ন অবস্থা, স্মরণশক্তির প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দর ও সহজ ভাষায় বিবৃত করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তিনি সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শিশুগণের মানসিক অবস্থা, গৃহশিক্ষা, শ্রেণী শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের শাসন, শারিরীক শিক্ষা, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়ও পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এই পুস্তক প্রত্যেক শিক্ষকের ও অভিভাবকের পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা শিক্ষা বিষয়ক যে ২।৩ খানা গ্রন্থ আমরা পাঠ করিয়াছি তন্মধ্যে এ গ্রন্থখানি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এ কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। আমরা এই গ্রন্থের অভিনন্দন করিতেছি। গ্রন্থের ছাপা কাগজ বাঁধাইও সুন্দর।

ময়মনসিংহ, লিলিপ্রেস হইতে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সৌরভ

ষষ্ঠ বর্ষ। ময়মনসিংহ, ফাল্গুন, ১৩২৪। ৫ম সংখ্যা।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান মধ্যে এতকাল ধরিয়া বাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসা স্বত্বেও আজকাল তাহাদের মধ্যে একটু সম্প্রীতির শুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই পার্থক্য ও বিরোধ থাকিলেই যে মানিয়া লইতে হইবে, তাহাদের ভিতর সামঞ্জস্য থাকা সম্ভবপর নয় তাহা আজ কাল ততটা কেহও বিশ্বাস করেন না। তবে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের যে জায়গাটায় বিরোধ সেখানে একটা মীমাংসা করা যে খুব সহজ তাহা কেহও বলিবেন না। মূলেই যেখানে বিরোধ সেখানে মিলন যে কতদূর সম্ভবপর তাহা সহজেই অনুমেয়। ধর্ম্ম বলেন জগতের গোড়ায় যে এক সত্য নিহিত আছে তাহা ঈশ্বর। জগতের গোড়ায় একটী বই দ্বিতীয় সত্যও নাই ঈশ্বরও নাই। কিন্তু বিজ্ঞান ধরিয়া লয় যে জগতের মূলে অসংখ্য সত্য নিহিত আছে, ঐ সমস্ত সত্য প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র এবং কেহও ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের ঈশ্বরত নয়ই, ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তীও কিছু নয়। এইরূপ দুইটী বিরুদ্ধ মতের উপর ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যদি বিজ্ঞানের বহুত্ববাদ হইতে ধর্ম্মের একত্ববাদে কোনও বিজ্ঞান সঙ্গত যুক্তি দ্বারা পঁহুছান যায় তবেই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ তিরোহিত হয়। সুবিখ্যাত জর্ম্মন দার্শনিক লট্‌ছা (Lotze) ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে সুচিন্তিত যুক্তি প্রণালীর অবতারণা করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মই সুধীজনের নিকট উপস্থিত করিব।

যাঁহাদের প্রাণ স্বতঃই ধর্ম্মানুবর্ত্তী এবং গভীর বিশ্বাসই যাঁহাদের সম্বল তাঁহারা সচরাচর বলিয়া থাকেন যে—যে জগতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিজ্ঞান তাহার জ্ঞান জাল বিস্তার পূর্ব্বক জয়পতাকা উড়াইয়া দেন, সেই জগতের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অতি সহজে প্রতীয়মান হইবে যে বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু প্রাণী ও ব্যক্তির মধ্যে একটী বুদ্ধিমান পুরুষের অভিপ্রায় লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই বিরাট বিশ্ব কতকগুলি উদ্দাম স্বতন্ত্র অণু-পরমাণুর যথেচ্ছ ঠোকাঠুকিতে কিছুতেই রচিত হয় নাই—এই বিশ্বের যেখানেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় সেখানেই একটী অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য প্রতীয়মান হয় এবং তজ্জন্য বিজ্ঞানের জগৎ হইতে এই অভিপ্রায়ের মধ্য দিয়া আমরা সহজেই একটী মঙ্গলময় অভিপ্রেতায় পৌছিতে পারি—আর সেই অভিপ্রেতাই আমাদের ধর্ম্ম দর্শনের ভগবান। এই যুক্তিটার বিরুদ্ধে যে দুইটী মোটা কথা বলিবার আছে, তাহা এই :—

(ক) প্রথমতঃ জগতের মধ্যে অভিপ্রায় প্রকাশক এত অধিক ঘটনা আছে যাহা হইতে আমরা সকলেই সহজে বুঝিতে পারি জগতের মধ্যে একটী অভিপ্রায় লুক্কায়িত আছে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ অভিপ্রায় ও অভিপ্রেতার মধ্যে বড়ই নিকট সম্পর্ক। যেখানে অভিপ্রায় থাকিবে সেখানে অভিপ্রেতা থাকিতে বাধ্য, আর অভিপ্রেতা ব্যতীত অভিপ্রায় হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ঈশ্বর প্রমাণ করিতে যাইয়া যদি

গোড়াতেই ধরিয়া লই যে জগতের মধ্যে একটী অভিপ্রায় লুক্কায়িত আছে তবে তাহা হইতে অভিপ্রেতাকে প্রমাণ করা অনাবশুক হইবে। কারণ যখনই অভিপ্রায় লুক্কায়িত থাকার কথা বলিব তখনই অভিপ্রেতাকেও সেই সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া লওয়া হইবে এবং তজ্জন্য উহা প্রমাণ নামের অযোগ্য হইয়া পড়িবে। বাস্তবিক আমাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে জগতে একটা অভিপ্রায় আছে, চক্ষু বুঁজাইয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না।

প্রধানতঃ এই দুইটী কারণের জন্ত লটছা এই দলের মতটী ভিত্তি করিয়া ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য আনয়ন করেন নাই। বিজ্ঞানের খাঁটি কথা লইয়া তিনি আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কথা দ্বারাই প্রমাণ করিয়াছেন যে জগতের গোড়াতে এক সত্য বর্ত্তমান আছে, বহু নয়।

আমরা দেখিতে পাই যে জগতে অহরহ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। বস্তু সমূহ চুপ করিয়া বসিয়া নাই, তাহারা কার্য্য করিতেছে—একটী অপরটীর উপর ঘাত প্রতিঘাত করিয়া জগতে একটী অপ্রতিহত পরিবর্ত্তনের ধারা বহাইয়া দিতেছে, নিজেরাও পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে এবং অপর বস্তু সমূহের মধ্যেও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতেছে। অর্থাৎ এক বস্তুর কার্য্য কলাপ অপর বস্তুর কার্য্য কলাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। জগতের বস্তু সমূহের পরিবর্ত্তন ও তাহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধটা কেহও অস্বীকার করেন না—ধর্ম্মও নয়—বিজ্ঞানত নয়ই। এই জাগতিক কার্য্যকারণ সম্বন্ধটাই ধরিতে গেলে বিজ্ঞানের প্রাণ। এখন কথা হইতেছে এই জাগতিক বস্তু সমূহের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ও তদানুসঙ্গিক পরিবর্ত্তন কি করিয়া সম্ভবপর হয়।

বিজ্ঞান যে কয়েকটী মোটা কথা গোড়াতেই ধরিয়া লয় তাহা এই :—

(ক) যে জগতে আমরা বিচরণ করি আর বাস করি তাহা মায়া নয়—তাহাতে সত্য বস্তু নিহিত আছে। এই সত্য বস্তুকে আদিম সত্য বস্তু বলা যাইতে পারে কারণ অপর কোনও বস্তু বা নিয়ম হইতে ইহা উদ্ভূত হয় নাই এবং ইহার ধ্বংসও নাই।

(খ) উল্লিখিত সত্য বস্তুর সংখ্যা দুই একটী নয়। এই জগতের গোড়াতে বিজ্ঞানের মতে অসংখ্য সত্য বস্তু নিহিত আছে। তাহারা প্রত্যেকেই স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও স্বকীয় জন্মদাতা (Causasui) বা স্বয়ম্ভু। উহাদের একটীকে অপরটীতে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত করা যায় না। বিজ্ঞান আরও ধরিয়া লয় যে ঐ সমস্ত সত্য বস্তু নিশ্চল স্থবিরের মত এক জায়গায় একই ভাবে বসিয়া রয় নাই। তাহারা অনাদি কাল হইতে অনন্ত গতিতে ও অসংখ্য প্রকারে চলাফেরা করিতেছে ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিজ্ঞানের এই বিখ্যাত মতটীর নাম বহুত্ববাদ বা Pluralism.

(গ) উল্লিখিত পরিবর্ত্তন বা পরিক্রমণ উদ্দাম অসংবদ্ধ প্রণালীতে সংঘটিত হইতেছে না। কতকগুলি সার্ব্বজনীন নিয়ম প্রণালী দ্বারা তাহারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্দ্দিষ্ট দিকে পরিপর্ত্তিত হইয়া সুফল প্রসব করিয়া বেড়াইতেছে। ঐ সকল নিয়মের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করা কোনও সত্য বস্তুর পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং সেরূপে যথেচ্ছ ফলও কেহ প্রসব করিতে পারে না। এইরূপ অগণ্য সত্য বস্তুর নিয়মবদ্ধ পরিবর্ত্তন ও পরিক্রমণের ঘাত প্রতিঘাত হইতেই এই বস্তু, ব্যক্তি ও প্রাণি সমন্বিত একটী সুদৃশ্য জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। গোড়াতে যেমন প্রত্যেক সত্যবস্তু স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ছিল বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা পরস্পর এমনিভাবে জড়ীভূত হইয়া পড়িল যে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ব্যক্তি ও প্রাণির মধ্যে ঘনীভূত সম্বন্ধে দাঁড়াইয়া গেল। এবং তাহার ফলে একটী অপরটীর উপর ঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল এবং একটীর পরিবর্ত্তনে জগতের অন্যান্য যাবতীয় বস্তু ব্যক্তি প্রভৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল।

এখন কথা হইতেছে এই যদি বিজ্ঞানের এই তিনটী মূল কথা সত্য হয় তবে কি কি অবস্থা ও কারণ সত্য হওয়া সঙ্গত তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা আবশুক। অর্থাৎ আমাদের দেখা উচিত কি কি অবস্থাতে ও কি কি কারণে বিজ্ঞানের উল্লিখিত মূল সত্যগুলি সম্ভবপর।

প্রথমতঃ বিজ্ঞানের তৃতীয় সত্য সার্ব্বজনীন নিয়ম বলিলে আমরা কি বুঝি তাহাই আলোচনা করিব। নিয়ম কথাটা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতে গেলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে

যদি 'ক' ও 'খ' এই দুইটী বস্তু মধ্যে একটী নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তবে তাহাদের দুইটীর মধ্যে যে পুরাতন সম্বন্ধ ছিল তাহা পরিবর্ত্তিত হইবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ক ও খ উভয়েই পরিবর্ত্তিত হইবে। দুইটী নরনারীর মধ্যে যখন বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখন তাহাদের পূর্ব্বতন সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইয়া এক অভিনব সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং তাহার ফলে একটী হয় স্বামী আর অপরটী হয় স্ত্রী। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের কোনও ব্যতিক্রম নাই। এই ব্যতিক্রমশূন্য কার্য্য প্রণালীর ধারাই নিয়ম। এই বিশ্বজগতের প্রত্যেক বস্তুর সহিত অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের অসংখ্য প্রকারের সম্বন্ধ রহিয়াছে। উহাদের একটী পরিবর্ত্তিত হইলে অন্যান্য সকল বস্তুরই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিবে। পরিবর্ত্তনের এই নিয়মটী বিশ্বজগতের উপর একটীবার চক্ষু বুলাইয়া গেলেই বুঝিতে পারা যায়। এখন কথা হইতেছে এই যে বস্তু এই নিয়মমত পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহাদের গোড়াতে নিশ্চয় মিল আছে—তাহারা যেন খানিকটা সমধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের স্বভাবের গোড়ায় যদি একত্ব না থাকিত তবে তাহারা কখনও এক নিয়মের অধীন হইয়া নিজে পরিবর্ত্তিত হইয়া অপরকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিত না। যাহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহারা কখনও এক নিয়মমত কার্য্য করিতে পারে না। যাহার যেমন ভাবে কার্য্য করার স্বভাব সে ঠিক সেইরূপ নিয়মেরই অধীন, কারণ নিয়মত স্বভাবের নামান্তর মাত্র। বিশ্বজগতের পদার্থ নিচয় পরিবর্ত্তনের এই সাধারণ নিয়মটার অধীন। এই মোটা কথাটা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয় যে জগতের গোড়াতে এক সত্য নিহিত আছে। বহুত্ববাদের মতে মত দিয়া যদি জগতের গোড়ায় অসংখ্য স্বতন্ত্র সত্য থাকা স্বীকার করি তবে আমরা পরিবর্ত্তনের যে প্রণালীটা দিন রাত্রি চোখে দেখিতেছি তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হইত না। বিশ্বজগতের মধ্যে একটা সার্ব্বজনীন সম্বন্ধ রহিয়া যাওয়ায় এই বিশ্বের গোড়ায় এক বই বহু সত্য থাকিতে পারে না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লই যে সার্ব্বজনীন নিয়মের সহিত বহুত্ববাদ কোন না কোন প্রকারে মিশ খাইতে পারে। তাহা হইলেও আমাদের মুস্কিল আসান হয় না। বহুত্ববাদ মানিয়া লইলে সার্ব্বজনীন নিয়ম কার্য্যকরী হইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। একটী বস্তু নিজে পরিবর্ত্তিত হইয়া কেমন করিয়া যে অপর বস্তুসমূহের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে এই সমস্যা সমাধান না করিতে পারিলে বহুত্ববাদ টিকিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য কথা হইতে পারে—যে নিয়মের ফলে একটী পদার্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় ঠিক সেই নিয়মের দ্বারাই অন্যান্য পদার্থও তদনুরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য হয়। কথাটা শুনিতে মন্দ না হইলেও উহা যে গলদশূন্য নয়, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোধগম্য হয়। নিয়ম কি পদার্থগুলির মত স্বতন্ত্র স্বাধীন জিনিস?—পদার্থগুলি না থাকিলেও কি তাহা থাকিতে পারে? নিয়ম কি কখনও বস্তুসমূহের বাহিরে অবস্থিত? বাহির হইতেই কি তাহা যাবতীয় পদার্থ নিচয়ের উপর কার্য্য করে এবং পদার্থগুলিকে নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বাধ্য করে? এই সমস্ত প্রশ্নের এক 'না' ব্যতীত আর কোন উত্তর আছে কি না সন্দেহ। নিয়মটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের চিন্তা জগতের কার্য্য প্রণালী মনে করিয়া তাহার সহিত তুলনা করিয়া লইলেই বুঝা যায়। আমাদের চিন্তারাজ্য যে সকল বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন মানিয়া চলে সেগুলি যেমন বাহির হইতে আসে না, সেগুলি যেমন চিন্তা রাজ্যেরই বস্তু এবং ভাবনা চিন্তার সহিত তাহারা যেমন ওতঃ প্রোতঃ ভাবে মিশ্রিত থাকে, চিন্তা রাজ্যের অবলম্বন ব্যতীত তাহারা যেমন মুহূর্ত্তের নিমিত্তও থাকিতে পারে না, ঠিক তেমনই বিজ্ঞান জগতের নিয়ম কাননগুলি প্রতিভাসিত জগতের পদার্থ নিচয়ের সহিত ওতোপ্রোতঃ ভাবে সংমিশ্রিত আছে—জাগতিক পদার্থের বাহিরে তাহাদের কোনও সত্বা নাই। যেদিন জাগতিক পদার্থ নিচয়ের অস্তিত্ব লোপ পাইবে সেই দিনই তাহাদের নিয়ম কানুন গুলি সমাধি লাভ করিবে। নিয়ম ও পদার্থ ভাব-রাজ্যে পৃথক করিয়া বোঝাও যায়, চিন্তাও করা যায়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক জগতে উহাদের মধ্যে একটা রেখা টানিয়া দিয়া পৃথক ও স্বতন্ত্র করিবার সাধ্য আমাদের নাই।

যদি নিয়মগুলি পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র না হইল, তবে

নিশ্চয়ই তাহারা পদার্থের মধ্যে নিহিত (immanent)। এখন দেখা যাউক প্রতিভাসিত জগতের পরিবর্ত্তন কি প্রকারে সম্ভবপর হয়।

অবশ্য এমন একটা মত থাকিতে পারে যে এই প্রতি-ভাসিত জগতের পরিবর্ত্তন সংখ্যা বহুল পরিমাণে লক্ষিত হইলেও—তাহা বিভিন্ন বস্তুর পরিবর্ত্তন প্রতীয়মান হইলেও উহা ঠিক একাধিক বস্তুর পরিবর্ত্তন নয়। উহারা একই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা ও পরিবর্ত্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের প্রত্যেকের মনে হর্ষ বিষাদ ভাবনা চিন্তা প্রভৃতি কত হাজার হাজার কত কি পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সংঘটিত হইতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তন একই মনের বিভিন্ন অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ঠিক তেমনই এই বিশ্ব জগতে যত বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ ও প্রাণী দৃষ্ট হয় তাহাদের কাহারও স্বতন্ত্র ও পৃথক অস্তিত্ব বা সত্ত্বা নাই। তাহারা একই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। বিজ্ঞান কখনও এই মত মানিয়া লইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে বিজ্ঞানের বহুত্ববাদ ও অণুপরমাণু তত্ত্ব বাদ পড়িয়া যায়। জগতের গোড়াতে যদি একই বস্তু রহিল—আর বহু বলিয়া বিজ্ঞান যাহাদিগকে মানিয়া লইল তাহারা যদি কেবল মাত্র একটী বস্তুরই বিভিন্ন অবস্থা হইল তবে আর বহুত্ববাদ রহিল কোথায় ?

যাহা সর্ব্বসাধারণ বিশ্বাস করে ঠিক সেই মতটী বিজ্ঞান মানিয়া লয়। এই প্রতিভাসিত জগতের যে পরিবর্ত্তন দিন রাত্রি আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইতেছে তাহা বাহির হইতেই সংঘটিত হইতেছে। একটী বস্তুর পরিবর্ত্তন অপর বস্তুকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। এই বিশ্ব জগতের প্রত্যেক বস্তুর সহিত অন্যান্য যাবতীয় বস্তু এক সার্ব্বজনীন কার্য্য কারণ সম্বন্ধে বিজড়িত। উহাদের একটীর বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইলে অপর গুলিতেও পরিবর্ত্তনের ঢেউ খেলিয়া যায়। এখন কথা হইতেছে কি করিয়া একটীর পরিবর্ত্তনে অপর একটীর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় ? কি করিয়া একটী বস্তু অপর একটী বস্তুকে আঘাত করিতে পারে ? সাধারণতঃ যাহা লোকে বিশ্বাস করে বিজ্ঞান ঠিক সেই কথাটাই বলে। শক্তি বলিয়া একটা জিনিষকে আমরাও মানি বিজ্ঞানও মানে। এই শক্তি প্রত্যেক বস্তুতেই থাকে। যখন একটী বস্তু অপর একটী বস্তুকে আঘাত করে তখন আঘাতকারী বস্তুটীর শক্তি সেই বস্তুটী হইতে বাহির হইয়া আঘাত প্রাপ্ত বস্তুটীর মধ্যে চলিয়া যাইয়া তাহাকে অনেকটা পরি-বর্ত্তিত করিয়া ফেলে।

সাধারণতঃ এই মতটী বেশ সহজ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু ভাবিলেই মুস্কিলে পড়িতে হয়। কারণ শক্তি জিনিষটা আঘাত প্রাপ্ত বস্তুটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে এবং আঘাতকারী বস্তু হইতে বাহির হইয়া যাইবার পরে নিশ্চয়ই খুব অল্প সময়ের জন্য অবলম্বন বিহীন হইয়া শূন্যে অবস্থান করে। কিন্তু শক্তি জিনিষটা কখন আকাশে নিরলম্ব অবস্থায় থাকিতে পারে না। সাধারণতঃ লোকে শক্তি সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে তাহা কখনও বিজ্ঞান সম্মত নহে। তথাপি বিজ্ঞান তাহা চুপে চুপে ধরিয়া লয়। সাধারণতঃ লোকে ভাবে, শক্তি এমন একটা জিনিষ যাহা 'ক' নামক বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিবর্ত্তন করে, আবার সেখান হইতে বাহির হইয়া 'খ' নামক বস্তুতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া আবার তাহা হইতে বহির্গত হইয়া অন্য একটী বস্তুতে প্রবেশ করিতে চলিয়া যায়। এতগুলি পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াও তাহার গুণের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না। ঠিক মৌমাছি গুলি যেমন ফুল হইতে ফুলান্তরে যাইয়া একটীর পর একটীকে নাড়িয়া দেয় আর তাহাদিগকে মধুশূন্য করিয়া চলিয়া যায় তাহার ফলে ফুলগুলি মধুশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকে আর মৌমাছি মৌমাছিই থাকিয়া যায়। শক্তিও ঠিক এক বস্তু হইতে অপর বস্তুতে প্রবেশ করিয়া এই বিশ্ব জগতের প্রত্যেক বস্তুর পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে—নিজে যে শক্তি সেই শক্তিই রহিয়া যায়। কিন্তু এইরূপ শক্তির উপাখ্যান একটু বিবেচনা করিলেই বিশ্বাস যোগ্য থাকিতে পারে না। কারণ শক্তি জিনিষটা শূন্যে নিরলম্ব অবস্থাতে থাকিতে পারে না। অবশ্য এমন একটী মত থাকিতে পারে যে একটী সার্ব্বজনীন নিয়মে এক বস্তু পরিবর্ত্তিত হইলে অপর বস্তুটীকে পরিবর্ত্তিত করে। কিন্তু এরূপ মত

কখনও যুক্তি সঙ্গত নয়। কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিয়ম জিনিষটার নিজের কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই বা তাহা কিছুই করিতে পারে না—বস্তু বা ব্যক্তি কার্য্য করার বা পরিবর্ত্তিত হইবার স্বভাবই নিয়ম ব্যক্ত করে। বস্তু বা ব্যক্তির মত কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা কোনও নিয়মের থাকা সম্ভবে না।

এখন দেখা যাইতেছে কোন প্রকারেই আমরা বিশ্ব জগতে বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিরাজিত আছে এবং যাহার উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তাহার একটা ব্যাখ্যা বা মীমাংসা বিজ্ঞানের দিক হইতে করা যায় না। উহার একটী যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে হইলে লটছার মতে বিজ্ঞানের বহুত্ববাদ পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও অযৌক্তিকতা আছে তাহা বিজ্ঞানের দুইটী মূল কথা হইতেই প্রতিপন্ন হয়। বিজ্ঞানের মতে আমাদিগকে মানিয়া লইতে হয় যে জগতের গোড়াতে এমন অসংখ্য পরমাণু (atoms) নিহিত আছে যাহারা সকলেই স্বতন্ত্র স্বাধীন ও বিভিন্ন প্রকারের। তাহারা প্রত্যেকেই স্বকীয় জন্মদাতা (causasui) এবং আদি স্থানে অবস্থিত ও তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ বা করণীয় বলিয়া কিছুই নাই। অপরের ধার তাহারা কেহও ধারে না। এই তত্ত্বটীর সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান আমাদিগকে আরও মানিয়া লইতে বলেন যে ঐ সমস্ত পরমাণুগুলির করণীয় কার্য্য অত্যন্ত অধিক—তাহাদের একের প্রতি অন্যটীর কর্ত্তব্য এত অধিক যে একটী পরিবর্ত্তিত হইলে অন্যান্য সকলকেই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে। উহারা পরস্পরের সহিত নানাবিধ সম্বন্ধে বিজড়িত। পরমাণুগণের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন প্রণালী হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাহারা যতই কেন স্বতন্ত্র হউক না, উহাদের স্বভাবের ও গুণের মধ্যে মিল থাকিবেই থাকিবে এবং সেই জন্যই একটী পরিবর্ত্তিত হইলে অন্যান্য গুলিও পরিবর্ত্তিত হয়। এখন দেখা উচিত স্বভাবের সামঞ্জস্য কখন হয়। একাধিকবস্তু যদি কোনও একবস্তু হইতে উদ্ভূত হয়, তবেই তাহাদের স্বভাবে মিল থাকে নতুবা কোনও মিল থাকা সম্ভবপর হয় না। এই হিসাবে বিজ্ঞানের বহুত্ববাদ টিকিতে পারে না। পরমাণুগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বা মিল থাকাতে তাহারা নিশ্চয়ই কোন আদি বস্তু হইতে উদ্ভূত এবং এই আদি স্থান হইতে তাহাদের উৎপত্তি হওয়াতেই উহাদের মধ্যে ঐ মিল ও সামঞ্জস্য টুকু আসিয়া পড়িয়াছে।

বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব হইতে আলোচনা আরম্ভ করিয়া এইরূপে যখন আমরা বিজ্ঞানানুমোদিত যুক্তি প্রণালী অবলম্বন করিয়া বহুত্ববাদ পরিত্যাগ করিয়া একত্ববাদে আসিয়া উপস্থিত হই এবং পরমাণুর আদিতে এক আদিবস্তু ধরিয়া লই, তখন ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান অনৈক্য দূরীভূত হইয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নের পথ সুপরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

এখন দেখা যাউক এই একত্ববাদের দিক হইতে দার্শনিক লটছা কি প্রকারে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেন। তিনি একত্ববাদী হইলেও বিজ্ঞানের বহুত্ববাদটী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন না। বহুত্ববাদের গোড়ায় এক আদিবস্তু কল্পনা করা ব্যতীত একত্ববাদের আর কোনও কথা তিনি বেশী স্বীকার করিতে রাজী নন। তবে লটছার বহুত্ববাদের গোড়ার বস্তুগুলি বিজ্ঞানের পরমাণুর ন্যায় নির্জ্জীব নয় বরং সাংখ্যকারের পুরুষের মত জীবন্ত প্রাণী। লটছা বহুত্ববাদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই বলিয়া এই বিশ্বজগতের বস্তু ও জীবের মধ্যে স্বাধীন ভাবে অর্থাৎ (direct) পরস্পরের উপর কার্য্য করিবার ক্ষমতা অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে এই বিশ্বজগতের প্রত্যেক বস্তুই এক সনাতন আদিভূত বিশ্বসত্ত্বার মধ্যে কোন না কোন প্রকারে অবস্থিত আছে। জীবদেহের কোন স্থানে যদি কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে বা আঘাত লাগে তবে সেই আঘাত বা পরিবর্ত্তন জীব যেমন অনুভব করে ঠিক তদ্রুপ যদি জগতের কোনও স্থানে কোন পরিবর্ত্তন হয় তবে তাহা আদিভূত বিশ্বসত্ত্বা অনুভব করে এবং বিশ্বজগতে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য এবং নিজকে সুব্যবস্থিত অবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য জাগতিক অন্যান্য যাবতীয় পদার্থকে ঐ পরিবর্ত্তনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত করে। এ জগতের কোন স্থানে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইলেও বিশ্বসত্ত্বায় তাহা অনুভূত হয় বলিয়াই এক জায়গায় পরিবর্ত্তনের ঢেউ সমস্ত বিশ্বে

খেলিয়া যায়—সামান্ত একটু পরিবর্ত্তনের ফলে সমস্ত বিশ্বে উলট পালট উপস্থিত হয়। আমরা সাধারণতঃ এক স্থানের পরিবর্ত্তনকে কারণ (cause) বলি ও বিশ্বসত্ত্বায় প্রতিঘাত জনিত অপর স্থানের বিশিষ্ট পরিবর্ত্তনকে কার্য্য (effect) বলি—এবং বিশ্বসত্ত্বার কার্য্যটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ভুলিয়া গিয়া বলিয়া ফেলি যে একটীর পরিবর্ত্তন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবে অন্যটীর পরিবর্ত্তন করিল।

এখন বুঝা গেল লটছার মতে বিশ্ব একটী জীবদেহের ন্যায় প্রাণ ও অনুভব সম্পন্ন সত্তাবস্তু (reality)। জীবদেহে একটু আঘাত পাইলে জীব যেমন তাহার দেহস্থ যাবতীয় অংশ ঐ আঘাত অনুসারে পরিবর্ত্তিত করে এবং ঐরূপ করে বলিয়াই জীব বাঁচিয়া থাকে বিশ্বসত্ত্বাও ঠিক তাহার কোন স্থানে আঘাত পাইলে তদনুযায়ী সে তাহার অন্যান্য সকল স্থান পরিবর্ত্তিত করে।

এই মতটী বিজ্ঞান স্বীকার করিলে ধর্ম্মের সহিত তাহার আর কোন দ্বন্দ্ব থাকিতে পারে না। বিজ্ঞান যে বহুত্ববাদ ও কার্য্য কারণ সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া লটছা দেখাইলেন বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি দ্বারা যদি বহুত্ববাদের দিক হইতে বিজ্ঞানের কার্য্য কারণ সম্বন্ধটা ব্যাখ্যা করিতে যাই তবে আমরা সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া পড়ি এবং একত্ববাদ মানিয়া লইতে বাধ্য হই। সুতরাং দেখা যাইতেছে বিজ্ঞান বাহ্যতঃ বহুত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে একত্ববাদের উপরই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। এই একত্ববাদ না মানিলে কোন জগৎগঠিত বা সৃষ্ট হইতে পারে না, জাগতিক বস্তুর মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না এবং জগতের মধ্যে কোনও নিয়ম বা সামঞ্জস্যও থাকিতে পারে না।

বিজ্ঞানে লটছার সহিত এতদূর আসিয়াও ধর্ম্মের সহিত দ্বন্দ্ব না করিয়া থাকিতে পারে না। তিনি বলিয়া বসেন—হউক না বিজ্ঞান একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু আসে যায় না—কারণ তাহা হইলেও ধর্ম্ম মানব মনের কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে—জগতের আদিতে যে সনাতন সত্তা (reality) আছে তাহা ধর্ম্মের ঈশ্বর নয়—তাহা বিজ্ঞানের জড় পদার্থ (matter)।

বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি দ্বারা লটছা জগতের আদি সত্যের প্রকৃতি কিরূপে নিরূপণ করিয়াছেন তাহা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত।

কবিবর

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রতি।

পল্লীমায়ের বুক-জুড়ানো ওগো কবি বীর্য্যবান্,
তোমার ভাষার গর্জ্জনেতে শিরায় ছোটে রক্তবান।
হৃদয় তোমার সাগর সম, জ্বলছে তাতে বাড়বানল;
হাস্যে তোমার হেসে উঠি, দুঃখে ফেলি নয়নজল।
ব্যঙ্গ তোমার তুচ্ছ নহে, রঙ্‌তামাসা নয়কো মোটে;
সেসব যেন কথার টোটা লক্ষ্য পানে ভীষণ ছোটে।
শাস্তি দিতে অন্যায়েরে পিছ্‌পা কভু হওনি তুমি,
বিশ্বে মহা নিঃস্ব তবু ধন্য তোমার জন্মভূমি।
ধনের তুমি ধার ধারনি, তোয়াজ-করা চাওনি মান;
খোস্-মেজাজে যাচ্ছ গেয়ে—মনের গাঁথা প্রাণের গান।
দেশের দুঃখে দুষ্টাচারে কাঁদ্‌ছে প্রাণ আগুন-সুরে;
বিলাসিতার আওতা থেকে আছ তুমি অনেক দূরে।
মাটির মত মানুষ আবার, মনুষ্যত্ব বড়ই খাঁটি;
মেয়েলী ঢং নয়কো তোমার ব্যঙ্গ হাসি কান্নাকাটি।
তোমার কথা ভাবি যখন হৃদয় জাগে অনুরাগে;
ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে স্পর্শ করি সবার আগে।
বক্ষ ফেটে কান্না আসে আমার জাতির দুর্দ্দশায়,
অভাবগ্রস্ত কবির পানে কেউ চাহে না হায় গো, হায়।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

রাভাজাতির বিবরণ।

গারোপাহাড়ের উত্তরপার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত সমতল প্রদেশে রাভাজাতির বাসস্থান। এইস্থান গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত। আজকাল ইহারা অনেক স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মঙ্গোলিয় জাতির সহিত ইহাদের কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। গোলাকৃতি মুখমণ্ডলে, চেপ্টা নাক, উদ্‌গত চোয়াল, চুল মোটা মোটা ও রুক্ষ, গায়ের রং পাঙ্গাশে। গারোদের মত ইহাদের দেহ এত বলিষ্ঠ ও রুক্ষ নহে। মেয়েরা গারোমেয়েদের অপেক্ষা দুর্ব্বল। পুরুষদিগের পোষাক অনেকটা বাঙ্গালাদেশের কৃষকদিগের মত হাটুর উপর পর্য্যন্ত কাপড় পরা। স্ত্রীলোকেরা হাটুর নীচ পর্য্যন্ত ঝুলান এক খানা কাপড় পরে এবং আর একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা বক্ষস্থল ঢাকিয়া রাখে। রাভাজাতি সাতটী সম্প্রদায়ে বিভক্ত। (১) পাতিরাভা (২) রংডনিয়া (৩) মৈতোরিয়া (৪) দহুরিয়া (৫) সঙ্গা (৬) কোচ (৭) বৈতলিয়া। রাভা স্ত্রীলোকেরা হাতে রূপার বালা ও গলায় রূপার হার পরে। রংডনিয়া রাভা স্ত্রীলোকেরা উপর কাণে প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা এক প্রকার অলঙ্কার পরিধান করে। এই অলঙ্কারের নাম "বোলা"। কোনও বিশেষ উৎসব উপলক্ষে "বোলা" ব্যবহৃত হয়।

রাভাজাতি কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী নহে। তাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না কিন্তু কুক্কুট ও বরাহের মাংস খায়। তাহাদের কতকগুলি পৃথক দেবতা আছে। দেবতাদিগের কোন প্রকার মূর্ত্তি নাই; তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় কুড়িটী। নিম্নে তাহাদিগের কয়েকটীর নাম দেওয়া গেল।

বাইমাবৈ—ইনি জন্মের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। জলাশয়ের সমীপে এই দেবতার পূজা করিতে হয়। পূজার ছাগল ও হাঁস বলি দিবার নিয়ম আছে। বরাহ কিম্বা কুক্কুট বলি দেওয়া নিষিদ্ধ।

বাইখো বা খোক্‌সিবাই—ইনি শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনি দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া গণ্য। বৎসরে একবার ভাদ্রমাসে এই দেবীর পূজা হয়। এই উপলক্ষে প্রায় ছয় সাত দিন পর্য্যন্ত খুব আমোদ আহ্লাদ হয়। এই সময় তাহারা চাউল হইতে প্রস্তুত এক প্রকার মদ্য পাণ করে। প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন করিবার জন্য ইহারা দেবীর নিকট খুব হৃষ্টপুষ্ট একটা বরাহ বধ করে। বৎসরে একবার মাত্র এই দেবীর পূজা করিবার নিয়ম থাকিলেও অনাবৃষ্টি কিম্বা অতিবৃষ্টি হইলে পুনরায় ইহার পূজা দেওয়া হয়।

হাসংবাই—এই দেবী কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগ নিবারণের জন্য পূজিতা হন। ইনি বোধ হয় আমাদের শীতলা দেবীরই রূপান্তর। গ্রামের পুরোভাগে এই দেবীর অর্চ্চনা করা হয়। একটী বরাহ ও দুই তিনটী কুক্কুট এই দেবীর উদ্দেশে বধ করিবার নিয়ম আছে। দরমংবাই—ইনি ধন ও স্বাস্থ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা। দরমং নামক পাহাড়ে ইহার বাসস্থান বলিয়া কথিত। বিবাহের ভোজের জন্য যে সমস্ত শূকর বধ করা হয় তন্মধ্যে প্রথমটী এই দেবতার নামে উৎসর্গ করা হয়।

কালীবাই—ইনি আমাদের কালীমাতা ঠাকুরাণী; পূজার সময় পাঠা বলি দেওয়া হয়।

মাসী লক্ষীবাই—শস্যক্ষেত্রে দুইটী বরাহ বধ করিয়া লক্ষীদেবীর পূজা করা হয়।

বাহুল্য ভয়ে সমস্ত দেবতার নাম এইস্থলে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। সমস্ত দেবতার নামের পক্ষেই "বাই" শব্দটী ব্যবহৃত হয়। কোন অসুখ বিসুখ হইলে ইহারা মনে করে দেবতা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তখন ওঝার ডাক পড়ে। ওঝা আসিয়া একবাটী জলের মধ্যে দুইটা ধান ফেলিয়া বাটীটা নাড়িতে থাকে। ইহাতে যদি ধান দুইটা একসঙ্গে মিলিত হয় তাহা হইলে বুঝা গেল ঐ রোগ নিবারক দেবতা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তখন তাহার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত পূজা দেওয়া হয়।

স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে গর্ভস্থ সন্তানের সুখ-প্রসবের জন্য "বাই মাবই" দেবতার পূজা দেওয়া হয়। শিশুর জন্ম হইলে ধাত্রী বাঁশের তোয়াল দ্বারা নাড়ীচ্ছেদ করে ও গর্ভের ফুল কলাপাতায় মুড়িয়া মাটীতে পুতিয়া রাখে। শিশুর জন্মের পনরদিন—কোন কোন স্থানে একমাস—পরে একটা

ভোজ দেওয়া হয় ও শিশুর নামকরণ হয়। এইদিন শিশুর ধাইমা তাহার মস্তকে ধান দুর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। শিশুর মাতা কর্ত্তৃক নাম রক্ষিত হয়। কোন কোন রাভা সম্প্রদায়ে নামকরণের এক অদ্ভুত নিয়ম আছে। শিশুর নাভিনাল পড়িয়া যাওয়ার পঞ্চমদিনে পিতা তাহার বন্ধুবান্ধবদিগকে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে। নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইলে শিশুর পিতা একটী কুক্কুট কোন আত্মীয়ের হস্তে প্রদান করে। আত্মীয়টী একটা কলার ডাঁটা দিয়া কুক্কুটটাকে একএকটী আঘাত করে ও একএকটী নাম উচ্চারণ করে। যে আঘাতে কুক্কুটটীর প্রাণ: বায়ু বহির্গত হয় সেই আঘাতের সময় উচ্চারিত নামটীই শিশুর রাখা হয়। শিশুর নাভিনাল না পড়িয়া যাওয়া পর্য্যন্ত মাতা অশুচি থাকে; অশুচি অবস্থায় স্ত্রীলোক রান্নাঘরে যাইতে পারে না। ইহাদের বিশ্বাস কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সে পুনরায় সেই বংশেই জন্মগ্রহণ করে। কোন মৃত আত্মীয় নবজাত শিশুরূপে পুনরাগমন করিল কিনা তাহা তাহারা কোন প্রক্রিয়া দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করে না। শিশুকে মন্দ বলিলে কিম্বা প্রহার করিলে সে যদি ক্রন্দন করে তাহা হইলে কোন মৃত আত্মীয় পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করে।

রাভাদিগের মধ্যে বিবাহে পণ লওয়ার প্রথা আছে। বরপক্ষ কন্যা পক্ষকে পণ প্রদান করে। পিতামাতা কিংবা আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃকই বিবাহ স্থির হয়। বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইয়া গেলে বরপক্ষ চাউল, সরিষার তৈল ও সিন্দুর লইয়া বিবাহের শুভ দিন স্থির করিবার জন্য কন্যাপক্ষের বাড়ী যায়। চাউল কনেকে প্রদান করিবার রীতি আছে। বিবাহে কন্যার কোন প্রকার অমত না থাকিলে চাউল গ্রহণে আপত্তি করে না। সরিষার তৈল কনের চুলে মাখিয়া দেওয়া হয় ও কপালে সিন্দুরের টিপ দেওয়া হয়। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেলে বরপক্ষ ফিরিয়া আসে। বিবাহের দিন বরের আত্মীয়স্বজন স্ত্রীপুরুষ সকলেই কনের বাড়ীতে যায় ও তাহাকে পাত্রের বাড়ীতে লইয়া আসে। বিবাহ পাত্রের বাড়ীতেই সম্পন্ন হয়। বিবাহের দিন কুক্কুট মাংস ও চাউলের মদ্য দ্বারা গ্রামস্থ সকলকে ভোজ দিবার নিয়ম আছে।

ইহাদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। যে কোন বিধবা তাহার দেবরকে বিবাহ করিতে পারে, ভাসুরকে পারে না। রাভাদিগের মধ্যে বিবাহভঙ্গের প্রথাও আছে। স্বামী স্ত্রী উভয়ের সম্মতি থাকিলে বিবাহ ভঙ্গে কোন অসুবিধা নাই কিন্তু স্বামী ইচ্ছা করিয়া স্ত্রী ত্যাগ করিলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু টাকা দিতে হয়। বিবাহ ভঙ্গের পর সে পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে। ইহা-দিগের মধ্যে বহু বিবাহ কচিৎ দেখা যায়; প্রথমা স্ত্রী নিঃসন্তান কিংবা গৃহকার্য্যে অসমর্থা হইলে স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। রাভাদিগের কোন কোন সম্প্রদায়ে স্বগোত্র বিবাহও প্রচলিত আছে। অনেককে মাতুলকন্যা বিবাহ করিতে দেখা যায়। কোন কোন সময় মাতুল ভাগিনেয়ের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে গৃহজামাতা করিয়া রাখে।

স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে পোড়ান হয় কিন্তু কলেরা, বসন্ত কিংবা অপমৃত্যু হইলে মৃতদেহ গোর দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাঘ্র দ্বারা কোন ব্যক্তি হত হইলে তাহাকে দাহ করা হয়। মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে পিতৃপুরুষ দিগকে চাউলের মদ্যদ্বারা তর্পণ করে। দাহকার্য্য শেষ হইয়া গেলে মৃতব্যক্তির অস্থি লইয়া আসে। চিতার চারিদিকে ঘরের চাল বসাইয়া দেয় ও চারি কোণে চারিটী বাঁশ পুতিয়া একটা বস্ত্রখণ্ডের চারিকোণা চারিটী বাঁশের আগায় বান্ধিয়া দেয়। পূর্ব্বে অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃত-সৎকার খুব ধুমধামের সহিত হইত। এবং নানাপ্রকার নৃত্যগীতাদি সহকারে অস্থি বহন করিয়া "তুরাহাকারে" লইয়া যাইত। "তুরাহাকার পর্ব্বতগাত্রে খোদিত গর্ত্ত। এইস্থানে মৃত ব্যক্তির ভস্মাব-শেষ রক্ষিত হইত।

মৃতসৎকার করিয়া আত্মীয় স্বজন মৃতব্যক্তির বাড়ীতে আসিয়া ঘরের মেজে একখানি কাপড় বিস্তৃত করে। মৃতব্যক্তি পুরুষ হইলে কাপড়খানা পুরুষের, আর স্ত্রীলোক হইলে স্ত্রীলোকের হওয়া চাই। কাপড়ের উপর মদ্য ও খাদ্য দ্রব্য রাখিয়া মৃতব্যক্তির আত্মাকে সেগুলি আহার করিবার জন্য আহ্বান করা হয়। ইহার এক মাস পর পুনরায় এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া মৃতব্যক্তির আত্মার

উদ্দেশে এই বলা হয় যে, সে যেন এই পরিবারকে কোনরূপ ভয় প্রদর্শন না করে এবং তাহাদের কথা একেবারে ভুলিয়া যায়। ধনী পরিবারে বৎসরান্তে আত্মীয় স্বজন-দিগকে আহ্বান করিয়া গৃহজাত চাউলের মদ্য দ্বারা ভোজ প্রদান করে। আহারান্তে স্ত্রী-পুরুষ সকলে একসঙ্গে নৃত্য করে এবং মৃতব্যক্তির আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া এই বলিয়া গান করে "রাভাদিগের ধনী-পরিবারে তুমি জন্মগ্রহণ করিও, কোন প্রকার বৃক্ষলতাদি হইয়া জন্মগ্রহণ করিও না, তাহা হইলে লোকে তোমাকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে, কোন প্রকার পশু পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিও না, তাহা হইলে লোকে তোমাকে মারিয়া খাইবে, তুমি গরু হইয়া জন্মগ্রহণ করিও না, তাহা হইলে তোমাকে লাঙ্গল টানিতে হইবে ইত্যাদি।"

ছোট ছেলেপেলের মৃত্যু হইলে তাহার হাতের কিম্বা পায়ের অঙ্গুলী একটু কাটিয়া পরে সৎকার করে। তাহাদের বিশ্বাস যদি সেই মৃত শিশুর আত্মা পুনরায় সেই পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার অঙ্গের কাটা চিহ্নদ্বারা তাহাকে চিনিতে পারা যাইবে। যদি কোন নবজাত শিশুর অঙ্গুলীতে ঐরূপ কাটা চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাহারা মনে করে সেই মৃত শিশুর আত্মা পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

রংডনিয়া রাভা সম্প্রদায় পূর্ব্বে গারো পাহাড়ে বাস করিত। গারোদিগের সহিত তাহাদের কয়েকবার যুদ্ধ হইয়াছিল; পরিশেষে রংডনিয়া সম্প্রদায় পরাজিত ও গারো পাহাড় হইতে সমতলপ্রদেশে বিতাড়িত হইয়াছে। তাহারা বলে তাহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান 'সুমংসাং' নামক স্থানে ছিল। সোমেশ্বরী নদী ও উপত্যকাকে গারো ভাষায় সুমংসাং বলে। গারোদিগের 'অন্টাং' সম্প্রদায়ে ও রংডনিয়া রাভাদিগের ভাষায় অনেক সাদৃশ্য আছে। গারো পাহাড়ের দক্ষিণ অংশে 'অন্টাং' সম্প্রদায়ের বাস আর গারো পাহাড়ের উত্তর প্রান্তে রংডনিয়া রাভাদিগের বাস। বহুদূর ব্যবধানে স্থিত এই দুই জাতির ভাষায় অনেক সাদৃশ্য দেখিয়া তাহারা পূর্ব্বে একস্থানে বাস করিত এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

রাভাজাতি খুব সরল। বিশেষ ভাবে সভ্যজাতির সংস্পর্শে আসে নাই বলিয়া এখনও খুব বিশ্বস্ত, প্রতারণার বিষয় মোটে অবগত নহে। ইহারা খুব মদ্যপ্রিয়। নিজ গৃহেই চাউল হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করে, ইহার নাম 'চোকো'। বিবাহই হউক আর পূজা পার্ব্বনই হউক মদ্য অত্যাবশ্যকীয়। রাভাজাতি খুব অতিথি-পরায়ণ। অবসরের সময় ইহারা মদ্য পান কিম্বা গল্পগুজব করিয়া কাটায়। প্রত্যেক পরিবারেই কুক্কুট বরাহ প্রভৃতি প্রতিপালিত হয়, কিন্তু ইহাদের দৈনিক খাদ্য ডাল ভাত মাছ শাক শব্জী। ইহারা দুধ খায় না এমন কি স্পর্শ পর্য্যন্ত করে না। প্রায় প্রত্যেক দিনই স্ত্রীলোকেরা মাছ ধরে, কোন কোন দিন গ্রামের সমস্ত পুরুষ একত্র হইয়া মাছ ধরিতে যায়। রাভা-জাতি খুব শিকারপ্রিয় কিন্তু শিকার করিতে বন্দুক ব্যবহার করে না। বনের মধ্যে জাল পাতিয়া দূর হইতে হরিণ শূকর প্রভৃতি জালের দিকে তাড়াইয়া আনে এবং শিকার জালে বদ্ধ হইলে লগুড়াঘাতে মারিয়া ফেলে।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী।

গ্রীক—বনাম—বঙ্গ-রমণী।

ভুবন আমার বাল্য বন্ধু। এক গ্রামেই বাড়ী।

বাবা অবসরপ্রাপ্ত সবজজ—বিষয়সম্পত্তিও যথেষ্ট—মহা আদরের ভিতর লালিত পালিত হচ্ছিলুম।

আমাদের বাড়ীর কিয়দ্দূরেই ভুবনদের বাড়ী। খান কয়েক কুঁড়ে ঘরের সমষ্টিবিশেষ। অবস্থা ভাল নয়—সহরের ভিতর কয়েক বিঘা জমি। তার উপসত্ব ও দাদা বিশালাক্ষীর জমিদারের অধীনে মোহরের কাজ করে যে দশ পাঁচ টাকা উপার্জ্জন কত্তো—তা দিয়েই কোনও প্রকারে সংসার চল্‌তো।

লোক গরীব। ক্লাসে রাজাই সে— অপ্রতিহত-প্রভাব। পড়ায় যে বিশেষ ভাল ছিল—তা নয়। তবে কি যেন কি কারণে—সকলেই তার কাছে অবনতমস্তক হয়ে থাক্‌তো। লোকের ক্ষমতার উৎস যে কোথায় তা এখনও ভাল করে বুঝে উঠতে পাল্লুম না।

কথা সে এক রকম বল্‌তোই না। অধিকাংশ সময়ই নিজ মনে চুপ করে কাটাতো—কিন্তু যখন দরকার হতো— তার মুখের কাছে দাঁড়ান দুষ্কর হতো—বড় বড় চোখ দুটী তখন তীব্র জ্যোতিতে জ্বলে উঠতো—যার দিকে চেয়ে লোক আপনা আপনিই আকৃষ্ট হয়ে পড়্‌তো। আর সাহস? শুন্‌বে তার কথা?

(২)

থার্ড মাষ্টার মাধব বাবুর চরিত্র সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বল্‌তো। মাঝে তার সম্বন্ধে বড়ই একটা বিশ্রী জনরব লোক মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। লজ্জায় আমরা মরে যাচ্ছিলুম। ভুবনের কর্ণে যেতেই সে বলে উঠ্‌লো—না, এমন মাষ্টারের কাছে আর পড়া হবে না।

তার কথা মতই কাজ হলো। পরদিন অর্দ্ধবৃদ্ধ মাষ্টার মশায় ক্লাসে আস্‌লেন—নিয়মমত নাম ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। আমরা সব নিরুত্তর। একবার, দুবার, তিনবারের পরও যখন কোন উত্তর পেলেন না, তখন রাগান্বিত হয়ে চীৎকার করে উঠ্‌লেন—বলি, এ সবের অর্থ কি? উত্তর নেই কেন? ভুবন দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—আপনার কাছে আর পড়া হবে না, কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না। মাষ্টার মহাশয়ের বুঝ্‌তে বাকী রইলো না। চোখ মুখ লাল করে গস্‌ গস্‌ করে ঘরের বাহির হয়ে গেলেন এবং কতটুক পরে বেত্রহস্তে পুনঃ প্রবেশ কল্লেন।

পড়া আরম্ভ হলো—আমরা পূর্ব্বেরই ন্যায় নিরুত্তর। দুই একজনের পৃষ্ঠে দুই এক ঘাঁ বেত চালালেন। শেষে বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

পরদিন, ভীষণ কাণ্ড। মাষ্টার মশায়ের চেয়ারের বেত কে কেটে রেখেছিলো। বস্‌তে যেতেই চেয়ার নিয়ে চীৎপাৎ পড়ে গেলেন—ছেলেরা খিল্‌ খিল্‌ করে হাতে তালি দিয়ে হেসে উঠ্‌লো।

সব ব্যাপারই রাষ্ট্র হয়ে পড়লো। হেড মাষ্টার এসে উপস্থিত। আমরা সমস্বরে বলে উঠ্‌লুম,—মাষ্টার মশায় কিছুই পড়ান না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দিন কাটান—আফিংএর নেশার ঘোরে চেয়ার হতে পড়ে যেয়ে আমাদের নামে এখন বদ্‌নাম রটাচ্ছেন। এমন ভাবে মিথ্যা কান্নাকাটি জুড়ে দিলুম যেন নিতান্তই নির্দ্দোষ এবং মাষ্টার মশায়ই আগাগোড়া অত্যাচার করে আস্‌ছেন।

হেড মাষ্টার বিশ্বাস কল্লে—কল্লেও না। ভারি গোলমাল বেঁধে গেল। ভুবনের শিক্ষা—শত্রুর সঙ্গে সততা নয়। মিথ্যা বলে বলে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। মোটের মাথায়, শেষটা কিছুই দাঁড়াল না—মাত্র প্রত্যেক ছাত্রের তিন টাকা করে জরিমানা ও সপ্তাহ কাল বেঞ্চে দাঁড়ান। ভুবন তাতেও নারাজ। নদীর ধারে সভা হলো। সংবাদপত্রে হেড মাষ্টারের বিরুদ্ধেও নানাকথা লেখা গেল। মাধব মাষ্টারের তো কথাই নেই।

ফলে—মাস দুই পরে জরিমানা মাপ হ'লো ও মাধব মাষ্টার তাড়িত হলেন। আমরা এই উপলক্ষে মহানন্দে দীনু রায়ের পড়ো বাড়ীতে বনভোজ খেলুম।

(৩)

এণ্ট্রেন্সে জেনারেল স্কলার হয়ে, আমি আমাদের মাঝিলি স্কুলের নাম বঙ্গবিখ্যাত করে তুল্লুম। ভুবন কোনও প্রকারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ কল্লে।

কলিকাতায় যেয়ে প্রেসিডেন্সীতে ভর্ত্তি হব বলেই ঠিক ছিল। ভুবনকে জিজ্ঞাসা করায় বল্লে, আমিও যাচ্ছি সেখানেই। খরচ চল্‌বে কেমন করে? সে হেসে বল্লে, হবে কোন প্রকারে।

প্রেসীতেই ভর্ত্তি হলুম—সেও হলো। তাদের যেপ্রকার কষ্টের সংসার—তাতে কেমন করে চল্‌বে, আমি ভেবেই আকুল। ভাবলুম- যদি এমনই হয়, তা'হলে বৃত্তির টাকা হতে কিছু কিছু সাহায্য করব। কিন্তু সে যেমন মানী, তাকি গ্রহণ করবে?

উভয়ে এক মেসেই স্থান নিলুম। চাল্‌চলতি সবই তার বড় লোকের—কাপড়চোপড়, জুতা—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

রাত্রিতে তার পড়া হতো না—প্রাইভেট টিউটারীতেই কাট্‌তো। মেসে সে বেলা আহারও করত না। শেষে শুনেছি, অর্থাভাববশতঃ অনেক রজনী অনাহারে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু, তার সদা-প্রফুল্ল বদন দেখ্‌লে, কেউ কি মনে কত্তে পারতো, কোন প্রকার কষ্ট আছে? আমি দুই একদিন সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা জানাবার জন্য গিয়েছি—কিন্তু সম্মুখে যেতেই বাসনাকে সংযত কত্তে হয়েছে। সে আবার কার দান গ্রহণ করবে?

(৪)

থিয়েটারের আমি বিপক্ষপাতী। ও সকল কুচরিত্রা নারীদিগের দর্শনে চরিত্রাবনতি ঘটে,—বাল্যকালাবধি গৃহে এবং অন্যত্র এই শিক্ষাই পেয়ে এসেছি।

সে দিন সিটীতে "দেবী চৌধুরাণী"। পূর্ব্ব শনিবার মেসের ছেলেরা সাগর-বৌ'র রূপলাবণ্য ও অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে এসেছে। তা নিয়ে, মেসে মেসে একটা ধুম্ পড়ে গেছে—নানাবিধ তর্ক বিতর্ক হচ্ছে। আমাকে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি কত্তে লাগ্‌লো—আমি নারাজ। বারাঙ্গনা কর্ত্তৃক অভিনীত নাটক-দর্শন?—অসম্ভব!

এমন সময়, ভুবন দিব্যি গিলেকরা ধপ্‌ধপে পাঞ্জাবী গায়ে, পাম্পসু পায়ে, কোঠা থেকে বেরিয়ে এসে হেসে হেসে আমার কক্ষে প্রবেশ করে বল্লে, কি হে, কি বল্‌ছ? থিয়েটারে যাবে না? তা হলে যে কলিকাতা জীবনের অর্দ্ধেকই অন্ধকারাবৃত থেকে গেল। বারাঙ্গনার অভিনয়—তাই আপত্তি? তোমার কি ইচ্ছে—ঘরের বোন্ ঝি যেয়ে পাবলিক ষ্টেজে এক্ট করবে? চলো—ওসব সঞ্জিবনী-মার্কা মরেলিটী রেখে দেও। তোমার মত সবলোক হলে—শকুন্তলা বা সেক্সপিয়ার কিছুই হতো না। সাধুদের দ্বারা কোনও কাজ হয়? চলো—অমন goody goody boy হওয়ার দরকার নেই।

কি যেন কেন, আপত্তির কথাটী মুখে এসে জিহ্বাগ্রেই মিশে গেল। মহানন্দভরে সকলে মিলে মিশে থিয়েটারে যাওয়া গেল। সেখানে, অন্যসময় নীরবপ্রকৃতি ভুবনের বাকচতুরতা ও হাস্যরসিকতার ভিতর সময়টী বেশ ফুর্ত্তির ভিতর কেটে গেল। কিন্তু রজনীর শেষভাগে বাসায় ফিরে এসে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ কত্তেই, কেমন এক ধিকারের ভাব মনে ভরে উঠতে লাগ্‌লো। কেবলই মনে হতে লাগ্‌লো, এতদিনের সঙ্কল্প ভুবনের এক কথায় কেমন করে ভুলে গেলুম।

(৫)

আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তারানাথ মিত্রের বাড়ী। শুন্‌তে পেলুম,—তার কন্যা মনোরমার সহিত ভুবনের বিবাহ-প্রস্তাব চল্‌ছে। তাহারা কুলীন, আমরা নই। তাই বোধ হয়, তারানাথ আমাকে ছেড়ে ভুবনের সঙ্গেই সম্বন্ধে নেমেছেন। মনের ভিতর কেমন একটা পরাজয়ের ভাব ক্রীড়া কত্তে লাগ্‌লো। কথাপ্রসঙ্গে ভুবনের সাথে আলাপ হতে বল্লে, তাইতো, শুনেছি বিয়ের নাকি একটা কথা চল্‌ছে। দাদা আর খরচ চালাতে পাচ্ছে না, কিন্তু এত অল্প বয়সে বিয়ে করা, তাই বা কেমন?

মেয়ে দেখবার জন্য কন্যা-পক্ষের লোকেরা পীড়াপীড়ি কত্তে লাগ্‌লো। ভুবন নারাজ। অবশেষে তার হয়ে, আমাকেই যেতে হলো। কি সুন্দর, যেন পরী—ফুট্‌ফুটে রং, নীলাঞ্জনয়নী,—আলতাপরা লালটুকটুক্ পায়ে যখন কাছে এসে দাঁড়াল—তখন বল্‌তে লজ্জা বোধ হয়, বস্তুতঃই এক হিংসার ভাবে হৃদয় ভরে উঠ্‌লো। ভুবন কি ভাগ্যবান?

তাকে এসে বর্ণনা দিলুম। সে তাচ্ছিল্য ভাবে বল্লো, তা হবে, কি বিয়ে করবো এ বয়সে?

দেখ্‌লুম,—তার তেমন আগ্রহ নেই। এদিকে আমার নিজ অবস্থা শঙ্কটাপন্ন।

বড় বৌদি সব টের পেলেন।

কয়েকদিন পরে দেখি, তারানাথ বাবু বাবার সঙ্গে বাহির বাড়ীতে প্রাতে বৈকালে বসে বসে কি জল্পনা কল্পনা কত্তে লাগলেন।

সংশয়ের ভিতর দিন যেতে লাগ্‌লো। শেষে সংবাদ প্রচারিত হলো, আমার সঙ্গেই মনোরমার বিবাহ সুস্থির হয়েছে—অগ্রহায়ণে তারিখ।

তার দাদা তারানাথ বাবুর কাছে খুবই যাতায়াত কত্তে লাগলো। কুলীন হলে কি হয়? তার আমার সঙ্গেই মত। পূর্ব্বে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নি,—তার কারণ বাবার কাছে আস্‌তে তার সাহসে কুলায়'নি। মাসেক পরে মনোরমার সাথে আমার বিবাহ হয়ে গেল।

জয়ের আশা, সঙ্গে সঙ্গে কি একটা আত্মগ্লানির ভাব মনে জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। কাজটা কি ভাল হলো? কিন্তু মনোরমার চাঁদপানা মুখখানা ও আসন্ন-যৌবনপুষ্পিতা মূর্ত্তির দিকে চাহিতেই সমস্ত সংশয়-জাল কেটে গেল।

(৬)

সময় মত মেসে ফিরে এলুম। ভুবনের সঙ্গে দেখা হতেই হেসে বল্লে, বাঁচা গেল। তুমি ভাই! প্রকৃত

বন্ধুর কাজই করেছ। দাদা কি বিপদে ফেলবার যোগাড়ই করেছিল। যদি বিয়ে কত্তেই হয়, তাহলে এসকল বাঙ্গালী মেয়ে কেন,—শুনেছি গ্রীক বিউটীর ন্যায় কেউ নয়, তারই একজন।

মাস কয়েক যেতেই দেখ্‌লুম—বিবাহ করে বুদ্ধিমানের কাজ করিনি। হিষ্টিরিয়া হয়ে, মনো বড়ই জ্বালাতন আরম্ভ কল্লে, বাড়ীর সকল লোক অস্থির হয়ে পড়্‌লো। তা ব্যতীত বৎসরের শেষভাগে সে এক কন্যার জননী হয়ে, আমার ছাত্রজীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন ও লজ্জাচ্ছন্ন করে তুল্‌লো।

সে যাক্। এফ, এতে ফল একরকম দাঁড়িয়েছিল। বি, এর সময় স্ত্রীর বিষম পীড়া। কোনও প্রকারে পাশ-কোর্সে পাশ করে, রিপনে ল পড়্ছি। বাবা মাও যেন আমার উপর আর তেমনি সন্তুষ্ট নন। বাল্যকাল হতে অত্যধিক পাঠাভ্যাসহেতু চশমা ব্যবহার কচ্ছি, তার উপর কলিকাতার পচা ঘিয়ের মিঠাই খেতে খেতে বেশ ডিস্‌পেপসিয়া দাঁড়িয়ে গেছে। দুর্ব্বল শরীর নিয়ে, ততোধিক স্ত্রীর দ্বিবাৎসরিক অত্যাচারে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছি।

(৭)

সে-দিন গোলদিঘীর ধারে নেতাদের বক্তৃতা হচ্ছিল। বিস্তর ছাত্র ও লোক সম্মিলিত হয়েছে। বিষয়—জাতীয় ধনবৃদ্ধি। অনেকেই বক্তৃতা কল্লেন—কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ কল্লে—একজন সুগঠিত-কায় উৎসাহের অবতার নবাযুবক। তার প্রতিশব্দ হতে যেন অগ্নি সঞ্চালিত হচ্ছিল। সকলের হৃদয়ে সে আশাও আনন্দের বাণী বহন করে আন্‌ছিল। কে সে?

ভুবন। সেও বি, এ, পাশ করেছে। বিশ্বাস করবে? ইকনমিক্সে ফার্ষ্টক্লাস ফার্ষ্ট। এখন সে আর মেসে থাকে না। কোথাকার কাড়িলাদহের রাজার ছেলের প্রাইভেট টিউটারী ও গার্জ্জিয়ানি কচ্ছে—সহাস্যবদন, তেজোপূর্ণ।

সভা ভঙ্গের পর—দেখা হলো। সে আমায় বল্লে, তুমিও ভাই! বলোনা কেন? আমি লজ্জা-ভয়ের কথা বল্লুম। সে হেসেই উড়িয়ে দিলে—এসব কথা মেয়েছেলের মুখেই শোভা পায়। কিসের লজ্জা, কিসের ভয়? লোকনিন্দা? ঠাট্টাবিদ্রূপ? দুদিন—তারপরে এসব লোকই পায় লুটাবে।

ভবিষ্যতে সে কি করবে তার কথা উঠ্‌লো। বল্লে—যাচ্ছি এমেরিকাতে কারবার শিখ্‌তে—নূতন পথ ধরতে হবে। বিবাহের কথার উল্লেখে বল্লে, বল কি? এইতো মাত্র একুশ বছর বয়স—এখনই? শেষে মৃদুহেসে বল্লে, যদি কত্তে হয়, তবে তো জানই আমার প্রতিজ্ঞা—গ্রীকরমণী।

এবার এমেরিকার খরচ কি প্রকারে চলবে,—জিজ্ঞাসা আর কল্লুম না, কারণ সে তা একরকম করে যোগাড় করবেই। তবে কি ব্যবসায় শিক্ষা করবে, কোন্ ইউনিভার্সিটীতে পড়্‌বে—ইত্যাদি নানা কথা উঠ্‌লো। শেষটায় কারবারে যে বিপত্তি—বিশেষতঃ আমাদের দেশের লোকের—তার কথাও উল্লেখ কল্লুম। সে তদুত্তরে বল্লে—তজ্জন্য চিন্তা কি? একটা জীবন—না হয় নষ্টই হয়ে গেলো, আকাঙ্ক্ষাতো মিটিয়ে নেওয়া যাক্;

(আমি) হাতে তুলি লব বিজয় বাদ্য
আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য
যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য
তাহারে ধরিব সবলে।

কথাপ্রসঙ্গে সে আমাকেও আমেরিকা বা বিলাত যেতে বল্লে। আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে উত্তর কল্লুম, ইচ্ছা যে একেবারে না ছিল, তা নয়, তবে বাবা বৃদ্ধ, ছেলেপেলে নিয়ে স্ত্রীও অস্থির হয়ে পড়বে। তারপর জানইতো,—বাবা এমন গোঁড়া হিন্দু।

সে উত্তর কল্লো, যুক্তি বুঝে উঠ্‌তে পাল্লুম না। বৃদ্ধ পিতা বা হিন্দুর পুত্রের কি মানুষ হবার অধিকার নেই? স্ত্রীর কথা? তিনি না হয়, বছর দুই বিরহ-জ্বালা ভোগ করুন। চল,—মানুষ হয়ে আসি।

বাসায় ফিরে এলুম—ইকনমিক্সে হঠাৎ কোনওপ্রকারে ফার্ষ্ট হয়ে, ভারি একটা সফলতার ভাব মনে জেগে উঠেছে। তাই, মুখে বড় বড় কথা। যাক্‌না, নন্দীগ্রামের শিবরতন রায়ের ছেলেওতো গিয়েছিল—এমেরিকায়। কি নাকি চামড়ার ব্যবসা শিখে এলো, কত টাকা খরচ, এখন ভাতও জোড়ে না।

৮

'ল' পাশ করে, আলিপুরের আদালতে যাতায়াত কচ্ছি। সারা মাসে টাকা পয়সার সম্পর্ক একরকম নেই। বন্ধু ও আত্মীয় মহলে বড় ভাল লোক বলে পরিচিত। বাবার কল্যাণে অর্থের তেমন অভাব নেই। তাও নিজে কিছু করে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে বলেই বোধ হয়, সংসার অসার ভাবটা ক্রমে জেগে উঠ্‌ছে। সংসারে যে লোক বা জাতির স্থান নেই তারই বুঝি এভাব।

কয়েকদিন যাবৎ গীতা পাঠেও খুব মন দিয়েছি। গীতা-সভার একজন বিশিষ্ট সভ্যরূপে পরিচিত হয়ে উঠেছি। সংসারে কেউ মারেও না, মরেও না, ধনীও কেউ নয়, নির্ধনও কেউ নয়, অর্থ থাকাও যা, না থাকাও তা, সমস্ত জগৎ সমস্ত ব্যাপারই আত্মার রূপান্তর বিশেষ, এ তত্ত্ব জীবনের সার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সত্য কথা, মনে শান্তি নেই। বিশেষতঃ গিন্নীদেবী এবার বৎসরের প্রথম ভাগেই চতুর্থ কন্যাস্বরূপে যে উপহার প্রদান কল্লেন, তাতে যে সংসার শীঘ্র অসার হয়েই দাঁড়াবে তার সুস্পষ্ট সূচনা দেখতে লাগলুম।

যা হোক, আঁধারের ভিতর ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখা গেল। বাবার বিশেষ চেষ্টায় অনেক চাপরাশী, কেরাণী, সাহেবের খোষামোদি করে এক মুন্সেফী চাকরী জুটলো।

শ্রীহট্টের অধীন সুনামগঞ্জে মুন্সেফ হয়ে এলুম। মাস কয়েক মধ্যেই দুর্ব্বল দেহ বেশ সবল হয়ে উঠলো, মন প্রফুল্ল ভাব ধারণ কল্লো। এক্সিং পিড়িয়ডের শেষে যখন দেশে ফিরে গেলুম, তখন দেহের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখে বন্ধুবান্ধব আশ্চর্য্যান্বিত হলো। আমি সকলের উত্তরে বলে বেড়াতে লাগলুম সুনামগঞ্জের হাওয়াই খুব ভাল। তাই কি?

(৯)

আরও বছর কয়েক চলে গেছে।

শীতকাল। কলিকাতায় কংগ্রেস, এক্‌জিবিসন ও কনফারেন্সের ধুম। বাঙ্গলার নানাস্থান হতে দলে দলে লোক আসছে। আমিও এসেছি কিন্তু কনফারেন্সের জন্য নয়। কংগ্রেস তো দূরের কথা। অনেক মাদুলী ধারণ করার পর, কয়েকমাস হলো স্ত্রী একপুত্ররত্ন প্রসব করেছেন। সে উপলক্ষে কালীঘাটে পূজাও পাঠা মানত করেছিলুম। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তা দেওয়া হয়ে উঠেনি। জন্মিবার পর হতে ছেলের শরীর ভাল নয়, স্ত্রীরও নয়। তার মনে বদ্ধ সংস্কার দাঁড়িয়েছে, কালীমাতাকে সন্তুষ্ট না করাতেই এমন হচ্ছে। তাই দুমাসের ছুটী নিয়ে নোয়াখালীর অন্তর্গত সন্দীপ হতে কলিকাতায় এসেছি।

একটী কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। বাবা স্বর্গারোহণ করেছেন। বিষয় আশয় যা রেখে গিয়েছিলেন, মন্দ নয়, তবে চারি ভাইর ভিতর ভাগ হওয়ার দরুণ বিশেষ কিছু পাই নি। বড় কন্যা আমোদিনীর বিবাহে স্ত্রীর উপদেশে শিক্ষিত কুলীন জামাতা জুটাতে যেয়ে অনেকগুলি টাকা খরচ করে ফেলেছি। দ্বিতীয়টীর সময়ও কম যায় নি। আবার সাংসারিক অবস্থা আঁধার হ'য়ে আসছে।

এক্ষণ আমি ঘোর বৈষ্ণব। মাছ মাংস ছেড়ে দিয়েছি। এই অসার সংসারের জন্য কেন হিংসাবিদ্বেষ, কেন প্রাণী হত্যা? কয় দিনের জন্য, কিসের জন্য এসব?

এক্‌জিবিসন্ দেখ্‌তে গেছি। সঙ্গে "গীতা সভার" ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী নিতাই বাবু। দু'জনে খুব আত্মা অনাত্মার তর্ক নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময় বাপ্‌রে! অমনোযোগ বশতঃ কোন্ সাহেবের গায়ে যেয়ে পড়ছি। সেও অম্‌নি আমার হাতখানা খপ্ করে ধরে বল্লে, কি ভবতারণ যে, খবর কি?

কে—?

উপরের দিকে দৃষ্টি কত্তেই দেখলুম—সাহেব নয়, বাঙ্গালী—আমার বাল্যবন্ধু ভুবন। এক রকম সবলে আমাকে টেনে নিয়ে চল্লো। কিয়ৎকাল পরই লোকের ভিড় হতে বের হলুম।

এই ভুবন? কি দিব্যি চেহারা? এই কয় বৎসরে বর্ণের কি পরিবর্ত্তন হয়েছে? কেমন সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ? স্পষ্ট উচ্চারিত কথা হতে যেন শক্তি উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। পোষাক পরিচ্ছদ কেমন মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। সোণার চশমাটী কেমন তাকে মানিয়েছে। তার কাছে যেন আমি সূর্য্যালোকে জোনাকীর ন্যায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়্‌ছিলুম।

অল্পক্ষণ আলাপ হলো। বিদায়ের সময় একখানা কার্ডে ঠিকানা লেখে তার গৃহে পরদিন সন্ধ্যায় নিম-

গ্রহণ করে গেল।

কি করে সে? মাঝে শুনেছিলুম, এমেরিকাতে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। কোথায় ছিল সে এতদিন?

কাল কালীঘাটে পাঁঠা দিতে হবে। জিনিসপত্রের কি যোগাড় কত্তে হবে তার জন্য গিন্নী-ঠাকুরাণী প্রাতঃকাল হতেই গরম-মেজাজ হয়ে উঠেছেন। আমার যেন তেমন ভাল লাগছিল না। কেন?

সন্ধ্যাবেলা ক্লাইভষ্ট্রীটে ভুবনের গৃহে যেয়ে উপস্থিত হলুম। মস্ত বাড়ী—অতি পরিপাটীরূপে সাজানো। দেখলুম, হেটে যাওয়াটা ভাল হয় নি। কার্ড দিতেই ক্ষণেক পরে বেয়ারার উপরে নিয়ে গেল।

প্রকাণ্ড হল। উজ্জ্বলালোকোদ্ভাসিত। দেয়ালের গায়—সুন্দর সুন্দর ছবি। নীচটা কারপেট মণ্ডিত। টেবিলে, চেয়ারে, আয়নায়, চিত্রে, পুষ্পস্তবকে কক্ষটী সুসজ্জিত। ভুবন এসে আমাকে ধরে নিয়ে বসালো। বুঝতে পাচ্ছিলুম, আমার পোষাকটী আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল। কেমন যেন বেমানান বোধ হচ্ছিল।

আলাপ হলো। ভুবনের তেমনি উদার প্রশস্ত মন, চিন্তাশূন্য উচ্চ আশায় পরিপূর্ণ। কোথায় আছি, ছেলেপেলে কি, কেমন,—স্ত্রী কেমন আছেন—ইত্যাদি অনেক কথাই জিজ্ঞাসা কল্লো। সে কি কচ্ছে—জিজ্ঞাসা কত্তে লজ্জা বোধ হচ্ছিল। তাও সাহস করে বল্লুম,—কি কচ্ছ? ব্যবসা?

সে উত্তর কল্লো, তা বৈ কি? তোমরা ভাই চাকরী কচ্ছ, দেশ ভরেই তো চাকরী—একটা নূতন কিছু করা চাই।

ব্যবসায়ে যে তার কেমন হচ্ছে, তা আর জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন ছিল না। কথা প্রসঙ্গে জাপানের কথা উঠতেই সে বল্লে, ইটোকিটুসিনের নাম শুনেছ? আমি তাদের ইণ্ডিয়ার এজেন্ট হয়ে এসেছি।

শুনেছি বৈ কি?

বৎসরের অধিক হতে চল্লো সংবাদপত্রে ইয়াকোহামার ইটোকিটুসিন দোকানের যেখানে সেখানে বিজ্ঞাপন দেখ্‌ছি। শুনতে পাচ্ছি—তারা এদেশে দেয়াশেলাইর ব্যবসা একচেটে করে ফেলবার যোগাড় করেছে। এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কল্যাণেই নাকি তাদের ব্যবসার এমন অভূতপূর্ব্ব উন্নতি। সে ভুবন?

আমি। কত হয় তাতে?

ভুবন। হয় কিছু—প্রথম কয়েক বছর বড়ই কষ্টে গিয়েছে। গত বছর পঁচিশ হাজারের উপর পেয়েছিলুম—এবার বোধ হয় কিছু বেশী হবে।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে তার দিকে চেয়ে রইলুম। বলে কি?

এমন সময় পার্শ্বের কক্ষের দরজার সম্মুখে একটু খস্‌ খস্‌ শব্দ শুন্‌তে পেলুম। ভুবন সেদিকে ত্রস্তগতিতে যেয়ে দরজা খুলে দিলো এবং ক্ষণেক পরেই একটী রূপসী যুবতীর হস্ত ধারণ করে সহাস্য বদনে উপস্থিত হলো। আমাকে উদ্দেশ করে বল্লে,—তোমার বন্ধুপত্নী বিভা।

অনুপম লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি! চারু চিকণ ফেরোজা রঙ্গের রেশমী পরিচ্ছদে কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল! একটু দীর্ঘধরণের দেহ লতিকা—কণ্ঠোপরি হীরক-বিনির্ম্মিত ক্রুচ্‌টী চক্‌ চক্‌ কচ্ছে। এসে আমাদের সম্মুখে বস্‌লো। মৃদুহাসিনী, মিষ্টভাষিনী—কথাবার্ত্তা চাল-চলন সর্ব্ববিষয়েই অপূর্ব্ব, চিত্তহারিণী। ভুবনেরই উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনী।

আমি হাস্‌তে হাস্‌তে ভুবনকে বল্লুম, কি হে? প্রতিজ্ঞা কোথায়? মনে আছে?

সে হেসে উত্তর কল্লো,—আছে বৈ কি? কিন্তু এটী রাখ্‌তে পারি নি। ইয়োরোপ, এমেরিকা, জাপান—পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরেছি—কিন্তু দেখলুম, বঙ্গকুসুমের তুলনায় কেউ নয়—গ্রীক, আর্ম্মেনীয়, ইংলণ্ডীয়—কোনটীই নয়। কবি কি মিছাই বলেছেন,

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গকুসুমে?

কথা শুনে যেন বিভার মুখ-কমল হাসি লজ্জায় রক্তিমাভ হয়ে উঠলো।

বিভা? কোন্‌ বিভা? সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যানার্জ্জির একমাত্র সন্তান, সে-বার যে বি, এ, তে ইংলিশে সেকেণ্ড হয়েছিল?

আহারান্তে অনেক রাত্রিতে গৃহে ফিরলুম। কেবলই মনে হতে লাগলো—ভুল করেছি, ভুল করেছি—জীবনটার

আগাগোড়াই ভুল। কিসের অসার সংসার?

তার পরদিন কালীঘাটে পূজা দিতে যাওয়া ঘটে ওঠে নি।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত।

বাঙ্গালার সমাজ।

(১)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তর্কচূড়ামণি মহাশয় রায়বাহাদুর অন্নদাপ্রসাদের সভাপণ্ডিত ছিলেন। রায়বাহাদুরের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডে গেল। তখন অন্নদা বাবুর আত্মীয় ও ঐ ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব হাই-কোর্টের মোক্তার ৺ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ঐ ষ্টেটের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইলেন। ইনি তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে জানিতেন এবং বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। তিনি থিওছফিষ্ট ছিলেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডের জেনরেল্ ম্যানেজার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট্ ৺নবীনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় বাঙ্গালায় প্রথমে তত্ত্বজিজ্ঞাসু সভার (Theosophical Society) একটী শাখা বহরমপুরে স্থাপন করিলেন। সাতকড়ি বাবু নবীন বাবুর দক্ষিণ হস্ত। তাঁহার অনুরোধে তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে বহরমপুরে লইয়া যাওয়া হইল, এবং তিনি আবার অন্নদা বাবুর পুত্র ৺ রাজা আশুতোষের ষ্টেটে থাকিলেন। নবীনবাবুও একজন অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি চূড়ামণি মহাশয়ের সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ইহার ফল এই হইল যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু সভার সহিত তাঁহার একটু ঘনিষ্টতা হইল। ঐ সভার তিনি সভ্য হইলেন না বটে কিন্তু সভ্যের মধ্যে অনেকের তাঁহার উপদেশ পাইবার সুবিধা হইল। তিনিও যে কিছু না পাইলেন এমন নহে। ঐ সভার মত, এবং ইংরেজীতে লিখা আধ্যাত্মিক বিদ্যা (Spiritualism), (Animal magnetism, Hypnotism) সম্মোহন বিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি জানিতে পারিলেন।

শ্রীযুক্ত-পণ্ডিত শশধরের নিকট বর্ত্তমান সময়ের হিন্দু সমাজ বিশেষ ঋণী। পূর্ব্বে বলিয়াছি কার্য্যের দুটী ফল—মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য হিসাবে ইহাদের কার্য্য ঠিক দেখা যাইবে না কিন্তু গৌণ হিসাবে খুব পাওয়া যাইবে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের চোখ ছিল। সমাজে কি হইতেছে তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন ও দেখাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের উপর শশধরের কার্য্য দেখাইতে তিনি Reformed Hindu গীতে গাহিয়াছিলেন—যে এই সমাজটা "an amalgam of Huxly শশধর and Goose"। ঠাট্টাচ্ছলে বলিয়াছিলেন কিন্তু ইহাতে ভাবিবার, চিন্তা করিবার কথা আছে। যখন তিনি কলিকাতায় বক্তৃতা দেন তখন কলিকাতায় অনেক বৈঠকখানায় চূড়ামণি মহাশয়ের বক্তৃতার আন্দোলন হইত। "কেহ টিকিতে Ilectricity". বলিয়া ঠাট্টা করিত কিন্তু অনেকের নিজেরদিকে তাহার জীবনে তিনি কি করিয়াছেন কি করিতেছেন তাহার কি করা উচিত এ কথা মনে উঠিত। আর নিজ জনকেও সে কথা বলিতেন।

এরূপ এইটী বৈঠকের ফল সাধারণেও পাইলেন। ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে সম্পাদক করিয়া বঙ্কিম বাবুর দল "নবজীবন" বাহির করিলেন।

তখন দেশের মতিগতি কোন্ দিকে তাহার একটী স্পষ্ট প্রমাণ দেখাইতেছি। ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে আমি ঢাকায় ছিলাম। আমার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বহরমপুর হইতে আমাকে পত্র লিখিতেন। তাহার একখানি পত্রে তিনি লিখিলেন যে "ঢাকা এত বড় সহর, সেখানে শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য একটা স্থান হওয়া উচিত। কয়েকজন ভদ্রলোক প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ডাক্তার কালীকুমার দাসের বাসায় বসিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তিনি ঢাকা তত্ত্বজিজ্ঞাসু সভার সম্পাদক ছিলেন। বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাব বলিবামাত্র উপস্থিত সভ্যগণ সকলেই বলিলেন যে ঐ প্রস্তাবটী সুন্দর এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তাহার পর দিন হইতে সভ্যেরা কার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং এক সপ্তাহ মধ্যে ঢাকার হরিসভা স্থাপনা হইল। ইহার প্রধান উদ্যোগীর মধ্যে শ্রদ্ধেয় ডাক্তার কালীকুমার দাস, বাবু অনাথবন্ধু মৌলিক, আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এখনও জীবিত আছেন। জমি যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল; কালী বাবুর একটী মাত্র প্রস্তাবেই উহাতে বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইল।

ইহার কিছুদিন পরে প্রভুপাদ শ্রীল বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য হইয়া আসিলেন। হিন্দু সন্ন্যাসীর গৈরিক পরিচ্ছদ পরিয়া তিনি আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় ‡ ও পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। প্রমথনাথের জন্মভূমি নদীয়া জিলায়। তিনি ডাক্তারী পড়িতে বিলাতে গিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে মহাত্মাদিগের আদেশে দেশে ফিরিয়া আসেন ও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া "পশুপতি" নাম লইয়াছিলেন। যখন তিনি ঢাকায় আসিলেন তখন তিনি যুবা পুরুষ, দেখিতে অতি সুন্দর তেজস্বী ও পণ্ডিত। পণ্ডিত শ্যামাকান্ত প্রভুর একান্ত ভক্ত। পূর্ব্বে তাঁহারই শিক্ষায় উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এখন আবার তিনি তাঁহার অন্য মতের শিষ্য হইয়াছেন। শ্যামাকান্ত যে প্রভুর মন্ত্রশিষ্য একথা তখনও লোকে জানিত না। যখন ইহারা তিনজন আসিলেন তখন ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক নিবাস সম্পূর্ণ হয় নাই—হইতেছে। প্রাতঃকালে গোস্বামী প্রভু আগন্তুকদিগকে মন্দিরের উপরে এক ঘরে বসিয়া উপদেশ দিতেন। সে উপদেশ সকলেরই মনে লাগিত। তিনি, কোথায় কোন্ সাধু কি করিয়াছেন, কোন সাধু তাঁহাকে কি বলিয়াছেন এবং হিন্দুশাস্ত্র ধর্ম্মজীবন লাভের কি উপায় বলিয়াছেন তাহাই বলিতেন। ঘরটা ভরিয়া যাইত। ব্রাহ্ম ও হিন্দু সকলেই আসিত। তাহাদের মধ্যে যে মতের পার্থক্য আছে—দলাদলি আছে সে কথাকাহারও মনে হইত না। বৈকালে কীর্ত্তন হইত। সে এক অপূর্ব্ব মধুর ব্যাপার। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য মঙ্গল পড়িয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময়ের কীর্ত্তনের কথা পড়িয়াছিলেন তাঁহারা যেন সেই ভাবের কীর্ত্তন চোখে দেখিতে লাগিলেন। সেই সময় একদিন কোন এক ভদ্রলোক স্বপ্নে দেখিলেন যেন গোস্বামী প্রভু তাঁহাকে ও আর দুইজন বন্ধুকে মন্ত্র দিতেছেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং তাঁহার এক বন্ধুর সহিত তিনি পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। অতি প্রত্যুষে স্বপ্নের কথা সেই বন্ধুকে বলিলেন এবং অপর যে বন্ধুকেও স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া তিনটী হিন্দু ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ-গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গেলেন। তিনি যে শিষ্য গ্রহণ করেন একথা কেহ জানিত না। লোকজন উঠিয়া গেলে দ্বিতীয় বন্ধু প্রভুপাদের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন এবং সেই কথা শুনিবামাত্র প্রভুপাদের সমাধি হইল। তিনি সেই অবস্থায় বলিলেন যে তাঁহার গুরুদেব এই তিন ব্যক্তিকে মন্ত্র দিতে অনুমতি করিয়াছেন। এই তিনটী লোকই থিওসফিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন এবং তাহাদের কথা পড়িয়া সাধুদিগের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কয়েক দিন পরে প্রভুপাদ ইহাদিগকে দীক্ষিত করিলেন। ৺শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পর ইহারাই প্রভুপাদের প্রথম শিষ্য। তাহার পর প্রচারক নিবাস সম্পূর্ণ হইল। প্রাতঃকালে সেখানে সকল সম্প্রদায়ের লোক থাকিতেন। প্রভুপাদ সাধুদিগের কথা, শাস্ত্রের কথা বলিতেন। কখন কখন কেহ ব্রাহ্ম সঙ্গীত, বৈষ্ণবদিগের গৌর নিতাই সম্বন্ধে, রাধাকৃষ্ণ লীলায় অথবা কালীদুর্গা বিষয়ে কীর্ত্তন ও ভজন ভক্তিভাবে গান করিতেন।

প্রভুপাদের তাহা শুনিয়া ভাবাবেশ হইত আর উপস্থিত সকলেই যেন একটা অভূতপূর্ব্ব আনন্দ পাইত। বৈকালে কীর্ত্তন। তখন ব্রাহ্ম সঙ্গীত, রাধাকৃষ্ণ, কালী ও নিতাই গৌর নামে ব্রাহ্ম ও হিন্দু সকলেই আনন্দ পাইতেন ও করিতেন। ক্রমে ক্রমে প্রভুপাদের মন্ত্রশিষ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাঁহার হিন্দু শিষ্যেরা প্রচারক নিবাসে নানা প্রকার হিন্দু দেব দেবীর পট, সাধু মহাত্মার পট আনিতেন। প্রভুপাদ হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের ভজন মন্দির, দেবালয়, মসজিদ্ ইত্যাদিকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার শিষ্য ও অপর ভক্তেরা তাঁহার পদধূলি লইতে লাগিলেন। যে ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ [illegible]

‡ ইহার সম্বন্ধে বাবু দুর্গানাথ ঘোষ লিখিয়াছেন—"প্রমথনাথ সন্ন্যাসী সমাজে পশুপতি নাথ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইনি মহাত্মাগণের স্থান [illegible] গিয়াছিলেন। ইহার বিবরণ সেই সময়কার ইংরাজী বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং উহা পড়িয়া [illegible] চমৎকৃত হইয়াছিলেন। পূজ্যপাদ স্বামী রামানন্দ ভারতীর সহিত ইহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পশুপতিনাথ একবার ভারতীর অতিথিরূপে কাশীতে কয়েক দিন ছিলেন। এই অধম সেই সময়ে [illegible] হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিল।

খোল্‌ করতাল পৌত্তলিকতা বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিল, সেখানে এ ব্যাপার কি করিয়া চলিবে? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহার ফল এই হইল, যে প্রভুপাদ ঐ সমাজ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ শ্রীল প্রভু অদ্বৈত আচার্য্যের ধর্ম্ম যাজন করিতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দুরা অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যের মধ্যেও অনেকে তাঁহার সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন। ইহা হিন্দু সমাজের পক্ষে যে ভাল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র উপবীত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ হিন্দুমতে দিলেন। হিন্দু সভ্যতা, হিন্দু আচার ব্যবহার, হিন্দু পদ্ধতি যে ভাল তাহা তিনি কেবল মুখে বলিতেন না, আচরণ করিয়া দেখাইয়া ছিলেন। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই নিষ্ঠাবান হিন্দু।

এই মহাত্মা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম নানাস্থানে প্রচার করিয়া কয়েক বৎসর কলিকাতায় বাস করেন, পরে ৺ পুরীধামে যাইয়া দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য নানাস্থানে থাকিয়া তাঁহারই কৃপায় নৈষ্ঠিক হিন্দু মনে জীবন যাপন করিতেছেন। ইহা সেই প্রভুপাদের সাধনার ফল। ভগবান রামকৃষ্ণদেবের ন্যায় ইনিও ভক্তি মার্গের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া ছিলেন। এইটিই বাঙ্গালীর নিজস্ব।

১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে যখন আমেরিকার চিকাগো নগরে ধর্ম্ম সভা হয়, তখন সম্মিলিত সভ্যগণের মধ্যে এক বাঙ্গালী যুবকই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিপত্তি লাভ করিলেন—সেখানে সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসমাজের যে সমুদয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকে স্তম্ভিত করিলেন; তিনি শ্রীল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহার পিতা কলিকাতার একজন এটর্ণি ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ পরমহংস দেবের নিকট কিছুদিন যাতায়াত করিবার পর তাঁহার শিষ্য হইলেন। রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিলেন। আর পরমহংস দেবও তাঁহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন। সৌভাগ্যের কথা এই যে যদিও তিনি বি, এ, পাশ করিয়া ছিলেন তথাপি তখনও তিনি অকৃত দার ছিলেন। রামকৃষ্ণের দেহ রক্ষার পর তাঁহার আর সংসার একেবারেই ভাল লাগিল না।

তিনি "বিবেকানন্দ" উপাধি লইয়া পরিব্রজ্যায় বাহির হইলেন। নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া যখন মান্দ্রাজে গেলেন সেই সময় চিকাগোর ধর্ম্ম সভার কয়েকটী মান্দ্রাজী শিষ্যের যত্নে তিনি আমেরিকায় গেলেন এবং তথায় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কার্য্যে তাঁহার বক্তৃতায় সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম সভ্য স্তম্ভিত হইল। তিনি এমন নূতন কথা শুনাইলেন যাহা তাহারা পূর্ব্বে শুনেন নাই। তিনি আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে যাইয়াও তাঁহার নিজের বিক্রম দেখাইলেন। ঐ দুই দেশে তিনি অনেক বিদ্বান ও অর্থশালী শিষ্য পাইলেন।

যখন স্বামীবিবেকানন্দ নিজের কৃতিত্ব, গুরুদেবের কৃতিত্ব, ভারতের ঋষিদিবের কৃতিত্ব দেখাইয়া নিজ জন্মভূমি কলিকাতায় ফিরিলেন তখন দেশের লোক তাঁহাকে আদর যত্ন করিবার জন্য সকলেই প্রস্তুত। নরেন্দ্রনাথ যখন কলিকাতা ত্যাগ করেন তখন তাঁহাকে কেহ চিনিত না, জানিত না; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যে দিন দেশে ফিরিলেন, সেদিন দেশের সকলেই তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত। ইহার অগ্রণী হইলেন কলিকাতার Theosophical দলের নেতা Mirror সম্পাদক ৺ নরেন্দ্রনাথ সেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দেশে আসিয়া প্রধানতঃ একটী কার্য্যে মন দিলেন। তিনি জানিতেন বাঙ্গালী চাহে "ত্যাগ" ও "ভক্তি"। তিনি এমন একটী দল গঠন করিবার উদ্যোগ করিলেন, যে দল কামিনী কাঞ্চনের মমতা "ত্যাগ" করিয়া জীব সেবা ও দেশসেবা করে। তিনি জ্ঞানী ছিলেন সুতরাং "ভক্তি" মার্গের প্রশ্রয় দিলেন না। কিন্তু তাঁহার দেশে ভক্তির বড় আদর, সেই জন্য তিনি "জীবে দয়াই" ভক্তির মূল্য করিলেন। বিবেকানন্দ নাই কিন্তু তাঁহার কার্য্য আছে; তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য আছে। সত্যকথা বলিতে গেলে ইহারাই এখন সজীব অবস্থায় আছে। ইহা দেখিয়াছি যে যেখানে প্লেগ ইত্যাদির মারিভয় হইয়াছে, জলপ্লাবন বা দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, সেখানেই এই দলের লোক নিজের কথা ভুলিয়া জীবের জন্য প্রাণপণে কার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে। সেই জন্যই বলিলাম যে এই দলটী এখনও সজীব অবস্থায় আছে। কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালীকে, সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে যিনি একপ্রাণ করিবেন সেরূপ নায়কের অপেক্ষা এখন বাঙ্গালী করিতেছে। ব্যক্তিগত হিসাবে অনেকে কাজ করিতেছেন

কিন্তু সকলকে একমন একপ্রাণ যে নায়ক করিবেন তিনি কোথায়? বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে আবার সমাজ নিশ্চেষ্টতার ধারণ করিতেছে। শ্রীভগবানের কৃপা হইলে এভাব থাকিবে না কিন্তু সকলকেই সেই নায়কের প্রতীক্ষা করা চাই। তাঁহার আগমনের জন্য প্রকৃত আগ্রহ চাই। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সমাজের কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য কর্ম্ম করা চাই।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।

বিবিধ সংগ্রহ।

বিবাহ।

সকল সমাজেই বিবাহ এক কি বহু হওয়া উচিত এরূপ প্রশ্ন কোন না কোন এক সময়ে উত্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমানেও পৃথিবীতে এক বিবাহ, বহু বিবাহ, এক স্ত্রীর একধিক পতি গ্রহণ—সমস্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সকল প্রথা দেশ কাল ও অবস্থাভেদে এক সমাজ হইতে অন্য সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপের মহাযুদ্ধের পরেও এই সামাজিক প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহনাই। বহু বিবাহ আইন ও ধর্ম্মসঙ্গত মতে অথবা গোপনে প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কোন না কোনরূপে বর্ত্তমান দেখাযায়।

বহু বিবাহ সমর্থন কারীদের যুক্তি এই যে যখন এক সময়ে এক পুরুষের বহু সন্তান উৎপাদন করার ক্ষমতা রহিয়াছে তখন বহু বিবাহই প্রকৃতির অনুমোদিত। অপর দিকে স্ত্রীলোক এক বৎসরে যমজ সন্তান হইলেও ৪ টীর অধিক সন্তান প্রসব করিতে পারে না।

ব্রিগহাম (Brigham) প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত ভিন্ন ইউরোপের প্রায় সকল সমাজতত্ত্ববিৎই বহু বিবাহের বিরোধী।

সর্ব্বান্তঃকরণে বহু বিবাহের বিরোধীর সংখ্যা বস্তুতঃই কম। কেহ সংস্কার বশতঃ কেহ বা ধর্ম্মের জন্য বহু বিবাহের বিরোধী। বিড়ালকে নিরামিষ খাওয়ার অভ্যাস করান যায় কিন্তু সেজন্য কি বিড়ালকে আমিষ ভোজনে অনিচ্ছুক বলা যায়? আদিম অবস্থাতে স্ত্রীলোক যেরূপই থাক কিন্তু সন্তান সম্ভব হইলে সে যে একজন পুরুষের আশ্রয়ের জন্য লালায়িতা হইয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এইরূপে এক স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া ক্রমে উহা তাহার স্বভাবে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক।

অপরদিকে দেখিতে গেলে পুরুষ একদিন একজনকে ভালবাসিয়াছে বলিয়া অপরকে ভালবাসিতে পারে না এরূপ কখনও হইতে পারে না। মানবচরিত্র সম্বন্ধে যিনি একটু আলোচনা করিয়াছেন তিনিই ইহার সাক্ষ্য দিবেন। একজন ভোক্তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে পাঠার কোর্ম্মা এবং রসগোলা উভয়ের মধ্যে কোনটী উপাদেয়, সে যেরূপ দুটীকেই ভাল বলিবে, এই ভালবাসা সম্বন্ধেও অনেকটা সেইরূপ।

বিষয়টা একটু লজ্জাকর বিধায় ভালবাসা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া পুরুষ কিম্বা স্ত্রী কাহার নিকট হইতে ইহার প্রকৃত উত্তর পাওয়া কঠিন। অনেকে প্রকৃত ব্যাপারটী তলাইয়া দেখেন না। এবং অনেকের হয়ত ইহা বুঝিবার ও ক্ষমতা নাই।

রুষিয়ার বহু বিবাহ সম্বন্ধে পণ্ডিত টলষ্টয় (Talstoe) বলিয়াছেন যে শতকরা একজন পূর্ব্ব বিবাহ গোপন করিয়া বিবাহ করিয়া থাকেন এবং শতকরা ৫০জন তাহাদের পত্নীকে প্রতারিত করিতে চেষ্টা করেন।

পৃথিবীর বহুস্থানে দেখা যায় এক স্ত্রী একাধিক পতি-গ্রহণেও কুণ্ঠিতা নহেন। আবার এক স্বামীর বহু বিবাহেও পত্নিগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে কাল যাপন করেন।

প্রকৃত পক্ষে বহু বিবাহের প্রবৃত্তি অনেক স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই পরিলাক্ষত হইয়া থাকে। কিন্তু আত্ম সংযমের দ্বারা তাঁহারা এই প্রবৃত্তি দমন করিয়া থাকেন।

ইউরোপে যদিও এক বিবাহ প্রচলিত তথাপি কোন কোন মহিলা এই প্রথাটীকে এক কৃত্রিম উপায়ের ফল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভারতের আদর্শ [illegible] সাধ্বী স্ত্রী এক স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের কথা মনেও স্থান দেন না। অপরদিকে হিন্দুদের প্রাতঃস্মরণীয়া সতী অহল্যা, দ্রৌপদী প্রভৃতি একাধিক পুরুষের সংসর্গে আসিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য বুঝা ভার। হয়ত অবস্থা বিপর্য্যয়ে ঐ

সকল আদর্শ সতী যাহাই করিয়া থাকুন কিন্তু অগ্রে তাঁহারা স্বামী ভিন্ন অপর কাহাকেও জানিতেন না।

সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্যই সাধ্বী পত্নী ও সৎপতির প্রয়োজন। সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুরুষের এক কিম্বা বহু বিবাহ প্রচলিত হইয়া থাকে। এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন রোমের মার্ক এণ্টনী (Mark Antony) সর্ব্ব প্রথমে দুই পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত সক্রেটিসেরও (Socratis) দুই বিবাহ ছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতেও ইউরোপের অনেক স্থলে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। সলমনের (Soloman) ৭০০ শত বৈধপত্নী এবং ৩০০শত উপপত্নী ছিল। হিরড (Herod the Great) ৯ পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশের কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও শতাধিক পত্নী গ্রহণের উদাহরণ বিরল ছিল না। কিন্তু এই প্রথা সমাজ ঘৃণিত মনে করাতে উহা একরূপ উঠিয়া গিয়াছে।

১৮৯৬ সনে ইকো (Echo) নামক বার্লিনের (Birlin এক মাসিক পত্রে তুরস্কের সুলতান সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছিল।

সুলতানের পত্নীর সংখ্যা ১৫০০ হাজার। ইহাদের বাসস্থান ভিন্ন আঙ্গিনাতে নির্দ্দিষ্ট। এই স্ত্রীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ রাধান, ইহারাই প্রকৃত বৈধ পত্নী। দ্বিতীয়ত ইকরান্। এই দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে সম্রাটের ইচ্ছানুরূপ পত্নীদিগকে প্রথম শ্রেণীতে নেওয়া হয়। তৃতীয় খিজাদেস্। ইহাদের মধ্যে কেহ সম্রাটের মনোরঞ্জন করিতে পারিলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উপনীতা হইতে পারেন। আইন অনুসারে রমনীগণের বাঁদীভাবে সম্রাটের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হয়। পরে হয়ত কেহ সম্রাজ্ঞী ? কিম্বা অপর কোন খিতাবে ভূষিতা হইতে পারেন। কোন রমনী সন্তান প্রসব করিলে তাহার দাসত্ব মুক্ত হয় এবং তিনি রাজ্ঞীর পদে উত্থিতা হন। সম্রাট দ্বিতীয় মাহামুদ স্নানাগারের এক সুন্দরী যুবতী বাদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাহার গর্ভে সম্রাট আবদুল নাইডগীদের জন্ম হয়।

অন্তঃপুর মহিলাদিগকে সম্রাট জননীর অধীনে থাকিতে হয়। তাঁহার অভাবে সম্রাটের পালয়িত্রী সেই স্থান অধিকার করেন। সম্রাট পত্নীদের মধ্যে খৃষ্টান মহিলারও অভাব নাই। অথচ তাহারা তাহাদের ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন। সম্রাট পরিবারে ইহুদি রমনীদিগকে গ্রহণ করা হয় না।

সম্রাট পত্নীগণ সকলেই পাশ্চাত্য মহিলাদের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পোষাক প্যারিস হইতে প্রস্তুত হইয়া আসে। কেবল বিশেষ ব্যাপারে খাটি তুরস্কের পোষাক পরিধান করেন। মহিলাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা রহিয়াছে। তাহারা বোরখা পরিধান করিয়া বাজার ইত্যাদি যেখানে খুসি যাইতে পারেন। রাজ প্রাসাদে তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য মনোরঞ্জন উদ্যান বর্ত্তমান আছে। নিজেদের মধ্যে আমোদের জন্য নাটক ইত্যাদির বন্দোবস্তও রহিয়াছে। এই মহিলাগণ এসিয়া মাইনর কিংবা ইউরোপে গমন করিলে শকটারোহণে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। সকল দেশের লোকই নিজ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ ঘৃণা করিয়া থাকে।

কিন্তু ইহার ব্যভিচারও দেখা গিয়াছে। এক সময়ে আরবদের মধ্যে মাতা পুত্রের বিবাহ বিরল ছিল না। এমন কি আয়র্লণ্ডেও এই পাপ প্রথা চলিত ছিল।

ফাইস্কোন (Physcon) তাহার ভ্রাতার মহিষীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাহার ভ্রাতার ঔরষে মহিষীর গর্ভজাত কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ৪৪৬খ্রীঃ অঃ দক্ষিণ বৃটেনের রাজা ভর্টিজায়েন (Vartigern) তাহার নিজ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৭৬০ সনে পর্টুগালের রাণী মেরিয়া (Mary) তাহার খুড়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই বিবাহ জাত পুত্র ১৭৭৭ সনে তাহার খুড়ী রাজকুমারী মেরীকে (Mary) বিবাহ করিয়াছিলেন।

ইহা ভিন্ন আর একটী অদ্ভুত ব্যাপার কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ওয়েলস্ (Wales) এবং আইরলণ্ড প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেও পাত্র পাত্রী বিবাহের পূর্ব্বে কয়েক রাত্রি এক শয্যায় যাপন করিত। অতঃপর উভয়ের সম্মতি হইলে বিবাহ হইত। ডাক্তার টি, এল, নিকোলস্ (Dr. T. L. Nichals) বলিয়াছেন যে ইংলণ্ডের কোন কোন স্থানে এই পরীক্ষিকত

বিবাহ প্রচলিত ভিন্ন। গোত্রান্তরের পূর্ব্বে পাত্র ও পাত্রীকে এক শয্যায় যাপন করিতে আমাদের দেশেও দেখা যায়।

এযাবৎ আমরা যতদূর দেখিতে পাইলাম পুরুষ নিজ সুখ সুবিধার জন্যই সমস্ত করিয়া থাকে। দাম্পত্যপ্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি যে সকল মনমুগ্ধকর শব্দ প্রচলিত আছে সকলের মূলেই পুরুষের সুখ বর্ত্তমান। পুরুষ সুখী হইতে না পারিলে বিবাহ প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়। আমাদের শ্রুতিকার বলিয়াছেন

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা
পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনঃ।

এই বচনের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহের দ্বারা ইহ কালের সুখ যাহা হয় তাহাত আছেই, পরকালেও পিণ্ড জলের বন্দোবস্ত হয়।

কোন কোন সম্প্রদায় স্ত্রীলোকের আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। হিন্দুগণও একমাত্র স্বামীকে ভজনা করাই স্ত্রীর ধর্ম্ম বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য এক-রূপ নাই বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বলিয়াই এইরূপে নিগৃহীতা হইয়া থাকেন।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

সমুদ্র।

ইহা বোধ হয় স্কুলের ছাত্র মাত্রেই অবগত আছে যে পৃথিবীর ¾ অংশ জল ও ¼ অংশ স্থল। ইহা ভূগোলের একটি মূল কথা। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে যে সকল ছাত্র ভূগোল পাঠ ছাড়িয়া দিয়াছে তাহারা হয়ত এই মোটা কথাটাও জানে কিনা সন্দেহ। আমরা এস্থলে ভূগোলের সাগর মহাসাগর ইত্যাদি নিয়া একটু আলোচনা করিব।

সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে সাধারণ স্থল ভাগের উচ্চতার গড় ২২৫০ ফিট এবং সমুদ্রের গভীরতার গড় ১৩,১৮০ ফিট। সমুদ্রের উপরিভাগের জলের পরিমাণ স্থলভাগের উপরি ভাগের ২½ গুণ অর্থাৎ সমুদ্রের উপরিভাগের পরিমাণ ১,৪৪,[illegible] বর্গ মাইল এবং স্থলের উপরিভাগের পরি-মাণ ৫৫,০০০০০০ বর্গ মাইল।

কিন্তু সমুদ্রের উপরিভাগে যে স্থল বর্ত্তমান আছে উহা সমুদ্র জলভাগের $\frac{1}{18}$ অংশের অনেক কম। ইহা দ্বারা দেখা যাইবে যে যদি পৃথিবীর উপরিভাগে এবং সমুদ্রের তলদেশে পাহাড় পর্ব্বত গহ্বর ইত্যাদি না থাকিয়া পৃথিবী একটী সমান বর্ত্তুলাকার হইত তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী ২ মাইল গভীর জলের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত।

সমুদ্র জলের ন্যূনাধিক্য হইলে ভূগোলে এক বিপর্য্যয় সংঘটিত হয়। যদি সমুদ্রের জল ৬০০ ফিট কমিয়া যায়, তাহা হইলে শ্বেতদ্বীপ ইউরোপ খণ্ডের সহিত সংযোজিত হইয়া যায়, এবং এাসকা বেয়ারিং প্রণালী দ্বারা আমেরিকার সহিত যোগ হইয়া যায়, আর সিংহল ভারতবর্ষের সহিত এবং পেপুয়া (Papua) টাস্মেনিয়া, (Tasmania) অষ্ট্রেলিয়ার সহিত সংলগ্ন হইয়া যায়। তাহা হইলে সম্ভবতঃ কেবল স্থলপথে সিডনি (Sydney) হইতে পেকিন্ (Peking)র এবং পেকিন্ হইতে ক্লনড্কি (Klondkye) পর্য্যন্ত ভ্রমণ করা যায়। এইরূপ হইলে ১০,০০০০০০ বর্গ মাইল নূতন ভূমি বাহির হইয়া পরিবে। অপরদিকে সমুদ্রের জল যদি ২০০০ ফিট বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলভাগই সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে। সমুদ্রের জলের গভীরতা ও আকা-রের উপরে পৃথিবীর স্থলভাগের পরিবর্ত্তন নির্ভর করে। এক সময়ে এসিয়া মহাদেশ সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল এবং আজ যে অভ্রভেদী হিমালয় শৃঙ্গ জগতের বিস্ময় উৎপাদন করি-তেছে তাহার উপর দিয়াও সমুদ্র জল প্রবাহিত হইত।

ইহা কাহারও মনে হওয়া বিচিত্র নহে যে প্রশান্ত মহা-সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে যে বিশাল গহ্বর ইহার মৃত্তিকা কোথায় গেল।

এ সম্বন্ধে নানারূপ মতবাদ আছে। যে মতটী সব চাইতে সমীচীন তাহাই এখানে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

সৌর জগতের উদ্ভব সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। তাহার মধ্যে নীহারিকাপুঞ্জ হইতে আমাদের এই সৌরজগ-তের উদ্ভব হইয়াছে এই মতটী অনেকটা কল্পনার যোগ্য।

সদা ঘূর্ণীয়মান বাষ্পীয় নীহারিকাপুঞ্জ কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া সূর্য্য ও তাহার গ্রহ উপগ্রহাদির সৃজন করিয়াছে। এই বাষ্পীয় নীহারিকা ক্রমে শীতল হইয়া মৃত্তিকা প্রস্তরাদির সৃষ্টি হইয়াছে। এক সময়ে যখন [illegible]

পৃথিবী কোমল ছিল, তখন প্রবল ঘূর্ণন বেগে কোন কারণে তাহার বিশাল একখণ্ড পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমাদের চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই বিচ্ছিন্ন ক্ষত আরোগ্য হইয়া যে গর্ত্ত রহিয়া গিয়াছে তাহাই প্রশান্ত মহাসাগরের খোল বা তলদেশ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। যে সময়ে এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়, সে সময়ে পৃথিবী কোমল ছিল। কাজেই প্রবল ঘূর্ণন ও মাধ্যাকর্ষণে পৃথিবীর আকারের সহিত সমুদ্রেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তবে প্রশান্ত মহাসাগর যে আদি সমুদ্র ইহা একরূপ স্থির। কিন্তু আদি মহাদেশ আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভূমধ্য সাগরের দ্বারা ভাঙ্গিয়া ভরিয়া অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভৌগলিক মধ্যযুগে (Mesozoic period) উত্তর আমেরিকা, গ্রিণলেণ্ড, আইসলেণ্ড, এবং উত্তর ইয়োরোপ এক মহাদেশের অন্তর্গত ছিল। এবং উহা এক সঙ্কীর্ণ স্থলভাগ দ্বারা পুরাতন মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল। সে সময়ে পুরাতন মহাদেশ গণ্ডওনা (Gondwana) নামে অভিহিত ছিল। সুতরাং আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আরেবিয়া, দক্ষিণ ভারতবর্ষ এবং অষ্ট্রেলিয়া একত্র ছিল। সে সময়ে দক্ষিণ ইউরোপের অধিকাংশ স্থল টিথিস্ (Tethys sea) সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল। এই টিথিস সাগর কেবল যে ইউরোপ হইতে আফ্রিকাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল তাহা নহে, উহার একশাখা উত্তরদিকে গিয়া এসিয়া হইতে ইউরোপ খণ্ডকে বিভক্ত করিয়াছিল এবং অপরশাখা পশ্চিমদিকে বর্ত্তমান হিমালয় পর্ব্বতের উদ্ভূত স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারতবর্ষ ও মালয় দেশকে এসিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল।

এসিয়ার উত্তর পূর্ব্ব অংশ এইরূপে ভারতবর্ষ, ইউরোপ, এবং আফ্রিকা হইতে বিভিন্ন থাকিয়া একটী বিশাল দ্বীপাকার মহাদেশরূপে অবস্থিত ছিল। এই মহাদেশকে অঙ্গারা (Ongara) বলা হইত।

আটলান্টিক মহাসাগর সে সময়ে লারামাই (Laramie) নামে এক বিশাল হ্রদ বলিয়া অভিহিত হইত। যেখানে সুয়েজ যোজক বর্ত্তমান, সেখানে একটী প্রণালী দ্বারা লারামাই হ্রদ প্রশান্ত মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত ছিল।

মেসোজোইক (Mesozoic) সময়ের ভূগোলের সহিত বর্ত্তমান সময়ের ভূগোলের তুলনা করিয়া কি যে অভিনব পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা অবলোকন করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশের দ্বারা অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণাংশের দ্বারা আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা বিভক্ত হইয়াছে। আমেরিকা ও ইউরোপের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গশালী আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর অংশ বিরাজ করিতেছে। যেখানে পুরাতন টেথিস (Tethys) সাগর অবস্থিত ছিল সেখানে এসিয়া মাইনর ও অভ্রভেদী হিমালয় পর্ব্বত উদ্ভূত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে প্রশান্ত মহাসাগরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম সাগরে পরিণত হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ফল ৫৫,০০০০০০ বর্গ মাইল অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ডের পরিমাণ ফলের সমান। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা আটলান্টিক মহাসাগর অপেক্ষা অনেক অধিক ইহার অধিকাংশ স্থানের গভীরতা ১৪,০০০ ফিটের উপরে। পেরুর নিকটে কতকটা সঙ্কীর্ণ স্থানের গভীরতা ২৮,০০০ ফিট। জাপানের নিকটে অনেকটা স্থান প্রায় নিউজিলেণ্ডের সমান, ২৮,০০০ ফিট গভীর। ইহাকে টাস্কেরোরা (Tuscarora) খাদ বলে। কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের নিকটে কোন স্থানের গভীরতা ২৭,৯৩০ ফিট পাওয়া গিয়াছে। ফ্রেণ্ডলী দ্বীপপুঞ্জের নিকটই ইহার গভীরতম প্রদেশ। এই স্থানের গভীরতার পরিমাণ ৩১,০০০ ফিট পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। অপরদিকে বিয়ারিং প্রণালীর গভীরতা মাত্র ৩০০ ফিট। এসিয়া ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিলিপাইন দ্বীপ ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যপ্রদেশের গভীরতা মাত্র ৬০০ ফিট।

আটলান্টিক মহাসাগরের পরিমাণ ফল ও তাহার শাখা ভূমধ্যসাগর ও আর্কটিক সাগর যোগে ৩৩,০০০০০০ বর্গমাইল ইহার মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নদীই পতিত হইয়াছে। আমাজন, মিসিসিপি, অরিনোকা, লাপ্লাটা, ইউরোগুয়া, পারামা, কোঙ্গো, নাইগার, নাইল, ডেনিউব, রাইন প্রভৃতি সমস্ত বৃহৎ নদী ইহাকে অবিশ্রান্ত বারিদান করিতেছে। যদিও ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের মত গভীর নহে, তথাপি

ইহার অধিকাংশ স্থানের গভীরতাই ১৮,০০০ ফুট। আইসলেণ্ড, ফেরোজ, শেটলেণ্ড দ্বীপপুঞ্জ, এসেনসান এবং ট্রিষ্টান প্রভৃতি দ্বীপ সমূহের একটী উচ্চ আইলের দ্বারা এই মহাসাগর দুইটী ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই আইলের নাম ডলফিন আইল (Dalphin)। ইহা উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত, ইহার উপরে সমুদ্রের গভীরতা ১২,০০০ ফুট। পোর্টরিকোর নিকটে এই মহাসাগরের গভীরতম প্রদেশের গভীরতা ২৭,০০০ ফিট।

ভারত মহাসাগরের পরিমাণ ফল, ১৫,০০০ বর্গমাইল অর্থাৎ আটলাণ্টিক মহাসাগরের প্রায় অর্দ্ধেক। যাভা ও অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিম প্রান্তের মধ্যভাগেই ইহার গভীরতম প্রদেশ। তথাকার গভীরতা ১৮,০০০ ফিট। ভূমধ্যসাগর আটলাণ্টিক মহাসাগরেরই একটী শাখা বিশেষ। পূর্ব্বোক্ত মহাসাগর সমূহের তুলনায় ইহাকে অগভীর বলিলেও চলে। যদি ইহার জল ৬৯০ ফিট কামিয়া যায় তাহা হইলে ইউরোপের মানচিত্রে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়। তাহা হইলে ডার্ডনেলিস এবং বস্ফোরাস উপসাগর শুষ্ক হইয়া যাইবে। এড্রিয়াটিক উপসাগর প্রায় তিরোহিত হইবে। মেজেরকা এবং মাইনরকা, কার্সিকা এবং সার্ডেনিয়া ও মাণ্টা এবং সিসিলিতে যোগ হইয়া তিনটী দ্বীপে পরিণত হইবে।

ইহার জল যদি ১২০০ ফিট কমিয়া যায় তাহা হইলে জিব্রাল্টার প্রণালী শুকাইয়া একটী যোজকে পরিণত হইবে এবং ইউরোপের সহিত আফ্রিকা মহাদেশের যোগ হইবে। যদি ইহার জল ১৪৭০ ফিট কমিয়া যায় তাহা হইলে মাণ্টা হইতে আফ্রিকা পর্য্যন্ত একটি আলি উঠিয়া ভূমধ্য সাগরকে দুইটি বৃহৎ হ্রদে পরিণত করিবে। ইহার গভীরতম প্রদেশ পূর্ব্বদিকে ; তথাকার গভীরতা ১০,৮০০ ফিট।

এই সকল সাগর মহাসাগর ব্যতীত হ্রদ রূপি কয়েকটী সাগর বর্ত্তমান আছে যথা--কাস্পিয়ান সাগর, আরাল হ্রদ বা সাগর। কাস্পিয়ান সাগরের গভীরতা ১৮,০০০। ইহাতে ৪টী বেন্‌নেভিস্, (Bennevis) পর্ব্বত উপর্য্যোপরি খারা করিয়াও ডুবাইয়া দেওয়া যায়। এই কাস্পিয়ান সাগরের পরিমাণ ফল শ্বেত দ্বীপের পরিমাণ ফল হইতে অনেক অধিক। কাস্পিয়ান ও আরাল সাগর পূর্ব্বকার ভূমধ্য সাগরের অংশ বিশেষ অথবা পূর্ব্বে ইহাদিগকেই টিথিস্ সাগর বলা হইত।

যদিও আফ্রিকার হ্রদ সমূহ বর্ত্তমানে সমুদ্র হইতে অনেক দূরে অবস্থিত তথাপি ইহারা যে এক সময়ে সমুদ্রের অংশ ছিল তাহার প্রমাণ এই যে বর্ত্তমানেও এই সকল হ্রদে সামুদ্রিক প্রাণী বিদ্যমান আছে।

সমুদ্রের তলদেশ যদিও বন্ধুর তথাপি ইহার পর্ব্বত ও উপত্তকার উচ্চ নীচুভাব এরূকম যে জল না থাকিলে আইর্লণ্ড হইতে নিউফাউণ্ডলেণ্ড পর্য্যন্ত মটর গাড়ীতে যাওয়া যাইত।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

চীনে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান।

সভ্যদেশ সমূহের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে চীন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্বন্ধে যেরূপ হিসাব পত্র রাখিয়া গিয়াছেন অন্য কোন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ তেমন রাখিয়া যান নাই! ইহার কারণ এই যে ইহারা সৌর জগতের চিহ্ন গুলিকে যেমন মানব জীবনের শুভাশুভ এবং দৈব নিগ্রহানুগ্রহের সূচক বলিয়া মনে করিতেন, তেমন অন্য কোন জাতি দৃঢ়তার সহিত ঐ সকল কল্পিত শুভাশুভে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। আর ইহাদের জ্যোতিস্তত্বও অতি প্রাচীন। তাই প্রাচীন চীনবাসিগণ পূর্ব্বাপর গ্রহণ গুলির একটী ধারাবাহিক বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

চীন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদের তালিকায় অতি প্রাচীন কালেরও ২১৯টী গ্রহণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতি পুরাতন কাগজ পত্র নষ্ট হইয়া যাওয়া সত্বেও ইহারা গ্রহণ সম্বন্ধীয় যত পুরাতন নিদর্শন প্রকাশ করিতে পারেন, অন্য কোন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা তেমন পারেন না।

হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নামক নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে টেয়ু নামক জনৈক চীন-রাজ খৃষ্টের জন্মের প্রায় ২২০৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। কথিত আছে যে তিনি গগন পর্য্যবেক্ষক জ্যোতির্ব্বিদ ও তাহাদের সহকারী দিগকে রাজকীয় কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করিয়া আকাশস্থ অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিতেন।

তিনি গগন পর্যাবেক্ষণের কার্য্য সুপ্রণালীসঙ্গত মতে, অতি যত্নপূর্ব্বক সুসম্পন্ন করাইতেন বলিয়া মনে হয়। কেননা ঐ সকল রাজকীয় কর্ম্মচারী ব্যতীত তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চারি প্রান্তে আরও চারিজন অতিরিক্ত কর্ম্মচারী, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারিগণের সাহায্যার্থ নিয়োজিত হইতেন। কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রের মধ্যরাত্রিতে মধ্যাহ্নিন রেখার অতিক্রমের সঙ্গে মিল রাখিয়া চীনবাসিগণ তাহাদের পঞ্জিকা গগণা ও ঋতু নির্ণয় করিতেন। কিন্তু রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদগণকেই গ্রহণ সঙ্ঘটনের কাল নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইত এবং দেশবাসিগণও ঐ সকল সংবাদ জানিবার নিমিত্ত ঐ রাজকর্ম্মচারিগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন। হি ও হো নামক দুইজন চীনদেশীয় রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ সুরাপানে মত্ত হইয়া তাহাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অসমর্থ হওয়ায় কি প্রকারে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন তাহার একটী কৌতুহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত 'সাকিং' নামক চীন দেশের প্রাচীন ঐতাহাসিক সাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে।

রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া হি ও হো কতকদিন বেশ কৃতিত্বের সহিত তাহাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলেন। কিন্তু কিছুকাল যাইতে না যাইতেই ইহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্যের অবহেলা করিতে লাগিলেন, মদ্যপানে গা ঢালিয়া দিলেন এবং তাহাদের গণনা প্রণালী দূষিত করিয়া ফেলিলেন। এই প্রকারে ইহারা গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধির নিয়মগুলিতে গোলযোগ বাধাইয়া তুলিয়া, তাহাদের কার্য্যাক্ষমতার অপব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং চাকুরী একমত পরিত্যাগ করিলেন সুতরাং গ্রহণ সম্বন্ধে কোন প্রকার খোজ খবর নিতে সম্পূর্ণ উদাসীন রহিলেন। এদিকে শরৎকালের তৃতীয়মাসের প্রথমদিনে ফেঙ্ নামক নক্ষত্রপুঞ্জে একটী আংশিক সূর্য্যগ্রহণ অতর্কিতভাবে দেখা দিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পদব্রজেই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, অধস্তন কর্ম্মচারিগণ অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করিতে লাগিলেন এবং অন্ধ গাথকেরা ঢাক বাজাইতে লাগিলেন। কখন যে গ্রহণ হইল হি ও হো তাহার কিছুই জানিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা হতবুদ্ধি হইলেন। চীনদেশের গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রাচীন আইন অনুসারে কোন গ্রহণ কথিত সময়ের পূর্ব্বে বা পরে হইলে তখন তখনই জ্যোতির্ব্বিদকে হত্যাকরা হইত। কিছুদিনের জন্যও দণ্ড স্থগিত রাখা হইত না। হি ও হো দণ্ডিত হইলেন।

চীন বাসিগণ প্রাচীন গ্রহণ সম্বন্ধীয় যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা অতি প্রামাণিক ও সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। এই তালিকাতে ইউ উয়াঙের আমল হইতে অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ১১২২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে যে যে গ্রহণ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কনফিউসিয়াস নামক জনৈক চীন-পণ্ডিত খৃ, পূ, ৭২২ হইতে খৃ পূ ৪৯৪ পর্য্যন্ত যে যে গ্রহণ হইয়াছিল তাহাও ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তিনি লু নামক প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন এবং ঐ প্রদেশের রাজকীয় পুরাতন দপ্তরখানা হইতেই ঐ সকল গ্রহণ সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

লিপ ইয়ার বা মল বর্ষ।

প্রায় সকল দেশেই সাধারণতঃ ৩৬৫ দিনে সম্বৎসর ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিতে সূর্য্যের, অথবা সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর প্রায় ৩৬৫¼ দিন লাগিয়া থাকে।

বিষুবদ্‌বৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত যে দুই বিন্দুতে অবচ্ছেদ করিয়াছে তাহাদের নাম ক্রান্তিপাত বা সম্পাত। ঐ সম্পাতিক বিন্দুদ্বয় নিশ্চল নহে। ক্রান্তিপাত যে গতিদ্বারা মেষের আদি বিন্দু হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে সরিয়া যায় তাহার নাম অয়ন গতি। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে বার্ষিক অয়ন গতি ৫৪ বিকলা। মেষের আদি বিন্দু হইতে সম্পাতের দূরত্বকে অয়নাংশ বলে। আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদেরা (দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে) বার্ষিক অয়ন গতি ৫০″·২৪ সেকেণ্ড স্থির করিয়াছেন।

এক বাসন্তী ক্রান্তিপাত হইতে তৎপরবর্ত্তি বাসন্তী ক্রান্তিপাত পর্য্যন্ত যে সময় তাহার পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৫

ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫.১ সেকেণ্ড! ইহাকে ক্রান্তিপাতিক, সম্পাতিক বা সৌর বৎসর বলা যাইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অয়ন-চলন বা অয়নগতি নিবন্ধন, রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া আবার নক্ষত্রগণের মধ্যে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে সূর্য্যের (অথবা পৃথিবীর) আরও একটু দীর্ঘতর সময়ের দরকার হইয়া থাকে। সূর্য্যের (বা পৃথিবীর) এই প্রকারে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিবার সময়ের নাম নাক্ষত্রিক বৎসর (sidereal year)।

সুতরাং সাধারণ সম্বৎসর ৩৬৫ দিনে ধরা হয় বলিয়া ক্রান্তিপাতিক সম্বৎসরের তুলনায় ইহাতে ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫.৫ সেকেণ্ড ভুল আছে। এই ভুল ক্রমে জমাট বাঁধিয়া ৪ বৎসরে (৫—৪৮—৪৫.৫)×৪ অথবা ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ২ সেকেণ্ড অর্থাৎ প্রায় এক দিনে পরিণত হয়। এই ভুল সংশোধিত না হইয়া যদি এই ভাবেই থাকিয়া যাইত তবে সূর্য্যের ক্রান্তিপাত বা সম্পাত বিন্দুতে উপস্থিত হইবার কাল অর্থাৎ বসন্তবাসুবদ্দিন (যখন দিবা রাত্র সমান হয়) এবং সূর্য্যের উত্তরায়ণের ও দক্ষিণায়নের কাল প্রতি চারি বৎসরে এক দিন পশ্চাতে পড়িয়া যাইত, অর্থাৎ এক দিন পরে হইত।

জুলিয়াস্ সীজারের (রোমের বাদশাহ) সময়েই সর্ব্বপ্রথম সম্বৎসর ও সম্পাতিক বৎসরের পরস্পর অনৈক্য সংশোধন করিয়া মিল রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তখনই অবিসম্বাদিতরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে তিন বৎসর পর পর প্রতি চতুর্থ বৎসরে, বৎসরের দিন সংখ্যা ৩৬৫ দিনের পরিবর্ত্তে ৩৬৬ দিন ধরা হইবে। এই ৩৬৬ দিনের বৎসরকে লিপ ইয়ার, বৃদ্ধি বৎসর বা মল বৎসর বলা হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালাদেশের পঞ্জিকাতে চান্দ্র বৎসর সংশোধিত হওয়ায় যে মল বৎসরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার প্রণালীও এই মত। যে সকল বৎসর ৪ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য সেই সকল বৎসরই লিপ ইয়ার বলিয়া গণ্য; যেমন ১৮৯২, ১৮৯৬, ১৯১৬, ১৯২০, ১৯২৪ ইত্যাদি। ইউরোপে যে সকল পঞ্জিকা এই নিয়মে প্রস্তুত হয় তাহাদিগকে জুলিয়ান পঞ্জিকা বলে।

জুলিয়ান পঞ্জিকানুসারে প্রতি চতুর্থ বর্ষে এক দিন বৃদ্ধি করিয়া ভুল সংশোধন করা হয়। কিন্তু এক দিন বা ২৪ ঘণ্টা, ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ২ সেকেণ্ড হইতে প্রায় ৪৫ মিনিট (৪৪ মিঃ ৫৮ সেঃ) বেশী। কাজেই লিপ ইয়ার দ্বারায় পঞ্জিকা সংশোধনে নূতন রকমের অতিরিক্ত একটু ভুল হইয়া থাকে। কিন্তু এই ভুল অতি নগণ্য বা সামান্য। কেননা ইহাতে ৪ বৎসরে ৪৫ মিনিট বা প্রতি বৎসরে প্রায় ১১ মিনিট ভুল হইয়া থাকে। একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া এই ভুল ৪০০ বৎসরে প্রায় তিন দিনে পরিণত হয়।

১৫৮২ খৃঃ ধর্ম্মযাজক পোপ ত্রয়োদশ গ্রীগরি জুলিয়ান পঞ্জিকার এই ভুল সংশোধন করেন। এই প্রণালীতে ১৫০০, ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০, প্রভৃতি যে যে বৎসর ১০০ দ্বারা বা ৪ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ৪০০ দ্বারা অবিভাজ্য তাহাদিগকে লিপইয়ার না ধরিয়া সাধারণ বৎসর বলিয়া ধরা হয়। আর ১৬০০, ২০০০, ২৪০০ প্রভৃতি যে সকল বৎসর ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য সেই গুলিকে লিপইয়ার ধরা হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে জুলিয়ান পঞ্জিকার ৪০০ শত বৎসরে যে ভুল হয় তাহা সংশোধিত হইয়া থাকে।

গ্রীগরির প্রণালীতেও অতি সামান্য একটু ভুল থাকিয়া যায়। এই ভুল এত সামান্য যে ২০,০০০ বৎসরের পূর্ব্বে ইহা কোনমতেই ১ দিনের বেশী হইতে পারেনা। গ্রীগরির পঞ্জিকা-সংশোধন প্রণালী ১৭৫২ খ্রীঃ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে গ্রহণ করা হয় নাই। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত পঞ্জিকার তারিখের সঙ্গে ইংলণ্ডের অসংশোধিত পঞ্জিকার তারিখের প্রায় ১১ দিন তফাৎ ছিল। ঐ ১১ দিন অসংশোধিত পঞ্জিকা হইতে ছাড়িয়া দিয়া ইংলণ্ডের পঞ্জিকা-সংশোধন করা হয় অর্থাৎ ঐ পঞ্জিকায় পূর্ব্বে যে দিন ২রা ফেব্রুয়ারী বলিয়া লিখিত ছিল পরে তাহাই এক লম্ফে ১৩ই ফেব্রুয়ারীতে পরিণত হইল।

রুশিয়াতে এখনও জুলিয়ান পঞ্জিকাই ব্যবহৃত হয়। তাই বর্ত্তমানে তাহাদের মাসের তারিখগুলি ইউরোপের অন্যান্য দেশের পঞ্জিকার তারিখের ১৩ দিন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ময়মনসিংহ সিটিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সৌরভ

ষষ্ঠ বর্ষ } ময়মনসিংহ, চৈত্র, ১৩২৪। { ষষ্ঠ সংখ্যা।

অহঙ্কারের আত্মপ্রকাশ।

মনের মধ্যে যখন যে ভাব প্রবল হয়, তাহারই একটা উচ্ছ্বাস বহিরঙ্গে প্রতিফলিত হয়। গোপন রাখিবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও, তাহার আংশিক প্রকাশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিকট ধরা পড়ে। সাধারণতঃ মুখে মনের ভাবপ্রবাহ স্পষ্ট-প্রতিবিম্বিত হয়। পর্য্যবেক্ষণশীল ব্যক্তি মুখাকৃতির নিয়ত পরিবর্ত্তন অনুধাবন করিয়া অপরের চিত্তবৃত্তির প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

মনোভাব গোপন রাখিবার চেষ্টা অনেক স্থলে প্রয়োজন; অনেকে বহুদিন ধরিয়া তাহার সাধনাও করেন। রাজদূতদিগকে হৃদয়বৃত্তি গোপন রাখিয়াই রাজ্য সম্পর্কীয় বিবাদ বিতর্কে যোগদান করিতে হয়। স্বার্থবিনাশ ভয়ে অভিভূত হইয়াও নিজকে নিতান্ত নিশ্চিন্ত ও নিজ অধিকারে ও রাজবংশে এই স্বার্থোদ্ধার তাহার পক্ষে অতীব সহজ, এইরূপ ভাব তাহাকে দেখাইতে হয়। আশানুরূপ প্রাপ্তি সহজে ঘটিলে তদপেক্ষা অধিক কিছু পাইতে হইবে—এভাব নিয়া অনেক বিষয়-পটু ব্যক্তি তৃপ্তির আনন্দের পরিবর্ত্তে বিরক্তির গঞ্জনা চোখে মুখে প্রকটিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সকলেই হৃদ্বৃত্তির বহিঃপ্রকাশকে আয়ত্ত করিতে পারে না।

মুখ, চোখ, ভ্রূ, ওষ্ঠ ও গণ্ডপেশীর উপর জোর খাটান চলে না। উত্তেজনায় সময় কর্ণের আরক্তিমা নিবারণ সম্ভবপর নহে। অন্যান্য পেশীর সঞ্চালন ও তদুপরি প্রভুত্ব সহজসাধ্য, অনেকেই তাহা পারেন; কিন্তু মুখের এ কয়েকটা দুর্দ্দান্ত পেশী কাহারও আয়ত্ত হয় না। বরং মনোবৃত্তির চররূপে মানুষকে সর্ব্বদাই সতর্ক করিয়া দেয়। মানসিক দ্বন্দ্বে, মনোভাব গোপন রাখিবার প্রয়াস যতই প্রবল হয়, ততই এ সকল পেশী মনের কাতরোক্তি প্রকাশ করিবার ছলে কখনও স্পন্দিত, কখনও বিকৃত, সঙ্কুচিত বা স্ফীত হয়। সাময়িক ভাববৈষম্যেই এই সঙ্কুচন প্রসারণ ঘটিয়া থাকে। কোন বিশেষ ভাব প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত হইলে, উহাদের উপর একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে। এই পরিবর্ত্তন অতি ধীরে আমাদের অজ্ঞাতসারে সাধিত হয়। এ দরুণ মনের সাম্যাবস্থায় মুখাকৃতি দর্শনে মানুষের প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। স্বভাব ও চরিত্রের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকৃতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী; সর্ব্বদাই আমাদের চারিদিকে ইহা পরিলক্ষিত হইতেছে।

মানুষ সর্ব্বদাই ভাবে, বাহিরে সদনুষ্ঠানের আড়ম্বর দ্বারা তাহার অন্তরের মলিনতাকে ঢাকিয়া রাখিবে; বাক্‌বাহুল্য দ্বারা তাহার ক্রটীগুলি অন্যের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিবে; ভিন্ন বিষয়ে কৌশল ও চাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া, কোন এক বিষয়ে অক্ষমতাকে গোপন করিবে; কিন্তু যতই সে তাহার ক্রটি ও অক্ষমতা দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া, উহা গোপন রাখিবার চেষ্টা করিবে, ততই তাহার চিহ্ন দৃঢ় অঙ্কিত হইবে। প্রতিভাশালী ব্যক্তির বিষয় বিশেষে প্রতিভা, জগৎকে মোহিত করে; কিন্তু তাহার ক্রটী নিয়ত উপেক্ষিত হয় বলিয়া ক্রমশঃ উহার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় একারণে অনেক প্রতিভার অন্তরালে দৈন্য দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়।

মনুষ্য মাত্রেরই অন্যের মনোভাব জানিবার সহজ বোধশক্তি আছে। কিন্তু মনোভাবে জটিলতা সাধারণ দৃষ্টির নিকট ধরা পড়ে না। আবার পর্য্যবেক্ষণশীল দৃষ্টির নিকট অধিকক্ষণ লুক্কায়িতও থাকিতে পারে না। আত্মদৃষ্টিকুশল ব্যক্তি সহজেই অন্যের মনোভাব বিশ্লেষণ করিতে পারে। স্নেহময় জীবিত শিশুও স্নেহপ্রবণ ব্যক্তিকে অনায়াসেই চিনিয়া লয়। একটু মাত্র অনুশীলন করিলে অপরের মনোভাব কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারা সকলের পক্ষেই সম্ভব হয়।

সকল মনোভাব সমভাবে আত্মপ্রকাশ করে না। যে সকল বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজন হয় না, আপনিই বর্দ্ধিত ও পুষ্ট হয়, তাহাদের লক্ষণগুলি সহজেই লোকচক্ষু আকর্ষণ করে। সমাজ, দেশ বা শাসন নীতির ফলে যাহাদের সঙ্কোচন প্রসারণ নিয়মিত হয় না, তাহাদিগকে গোপন রাখিবার প্রয়াস প্রায়ই ব্যর্থ হয়।

আনন্দ, বেদনা, ভালবাসা বা ঘৃণা, অহঙ্কার অবমাননা ও প্রতিহিংসার ভাব সহজেই সর্ব্বাঙ্গে প্রকটিত হয়। ইহাদের উচ্ছ্বাসও বড় প্রবল বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের উত্তেজনা মৃদু; সহজে উহা ধরা যায় না। বস্তুতঃ যখন যে ভাবের প্রাবল্য ঘটে মুখাবয়বের বৈরূপ্য দেখিয়া তাহা অনুমান করা যায়। কোন অন্যায়ের প্রতিকারে অক্ষম হইয়া, ক্রোধের বশীভূত হইলে উপরের ওষ্ঠ কেহ দন্তে চাপিয়া ধরে না; নিম্নোষ্ঠ অধরই বলে চাপিয়া ধরে। গভীর জটিলতার মধ্যে পড়িয়া শীঘ্র কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারিলে, উপরের ওষ্ঠকেই নীচের দন্তপাটি দ্বারা বারম্বার আঘাত করিয়া থাকে। উভয় অবস্থাই অধীরতা সংযত করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে; কিন্তু বিভিন্ন কারণ প্রসূত বলিয়া এই দুই উত্তেজনায় সংযমন প্রণালী ভিন্নরূপে প্রকটিত হয়। একটু বাঁকাইয়া বামহস্তে বাম গণ্ড স্থাপন করিয়া এ পর্য্যন্ত কাহাকেও আকস্মিক আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। উহা আনন্দ প্রকাশের অনুকূল নহে। হস্তদ্বয় বক্ষোপরি আড়াআড়ি সম্বদ্ধ করিয়া ও মস্তক বক্ষের দিকে নোয়াইয়া কেহ আনন্দ প্রকাশ করে না।

আনন্দের ভাব মুক্তির ভাব। উহা কোথাও বাধা দেখিতে ভালবাসে না; সঙ্কুচন ইহার বিরোধ মাত্র; প্রসারণ ও অবাধ গতিতেই ইহার প্রকাশ। ওষ্ঠদ্বয়ের বিস্ফুরণ দ্বারা আনন্দ প্রকাশের নামান্তর হাসি। আনন্দ প্রকাশের সময় ওষ্ঠের বিস্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে নাসিকার প্রান্তদ্বয় ও গণ্ডমধ্যের পেশী ঈষৎ প্রসারিত হয়; চক্ষু তারকারও ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত হয়। হাসির বিভিন্ন প্রকাশ হইতেও, তার কারণ অনুমান করা সহজ হইয়া পরে। বিদ্রূপের হাসি, দুঃখের হাসি, তৃপ্তি ও সার্থকতার হাসি— ইহারা প্রত্যেকেই একে অন্য হইতে বিভিন্ন।

যে সকল ভাব মজ্জাগত হইয়া থাকে, তাহার প্রকাশ অল্লাধিক সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যাপিয়া থাকে। আত্মতৃপ্তি ইহার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অর্থ, পদবী বা প্রভুতার আকাঙ্ক্ষা যখন কারো চরিতার্থ হয়, তখন সে অবিরাম তৃপ্তির আনন্দ উপভোগ করে। ফলে তাহার শীর্ণ গণ্ড ভরিয়া উঠে; পেশীগুলি সবল হউক বা না হউক ভূঁড়ি একটু বিস্তৃত হয়। এবং গাত্রবর্ণ চিকণ হয়। তখন ইহার গমনের ভঙ্গীও লক্ষ্য করিবার বিষয় হয়। মনে হয়, অধিক আলো, অধিক বায়ু তাহারই প্রাপ্য, তাই হস্ত পদ বিস্তার করিয়া চলা তাহার প্রয়োজন হইয়াছে। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্ররোচনা হয়ত ইহার অন্তরে বিদ্যমান থাকে। নিম্নপদস্থ ও নিকৃষ্ট পদবীর ব্যক্তিগণের বিস্ময় জন্মাইবার আন্তরিক অভিলাষ হেতু ইহারা সর্ব্বদা নিজ গৌরবে অধিষ্ঠিত থাকিতে ব্যস্ত থাকে। রাস্তায় ঘাটে, ট্রেণে ষ্টীমারে চলিবার সময়ও অনেককে তাহার মানুষটীকে পদমর্য্যাদার আবরণে ঢাকিয়া চলিতে দেখা যায়। তাহাদের "dignity" অন্যে বুঝিল না এটা তাদের অন্তরের বিশ্বাস। মানুষের সঙ্গে কোথায়ও যে তাহাদের মিল আছে, ইহা স্বীকার করা যেন তাহাদের পক্ষে ভয়ানক লজ্জাকর ব্যাপার। বিড়াল কুকুর দেখিলেই সারা শরীর ফুলাইয়া রাখে, তাহারও কারণ হয়ত এরূপই কিছু একটা হইবে। এ কারণে "স্ফীত" অর্থে সকল ভাষাতেই অহঙ্কারীকে বুঝায়। বাঙ্গালায় "যোজন জুড়িয়া চলায়" যে শ্লেষটুকু আছে তাহার মূলে হয়ত ইহাই আছে। গর্ব্বিত ব্যক্তি সর্ব্ব বিষয়ে নিজকে অপর হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে; নিজে

যাহা না জানে, এরূপ কিছু অপরে বলিলে, তাহার গৌরবকে খাটো করিবার জন্য উহার অসম্পূর্ণতা প্রচার জন্য অহঙ্কৃতের চেষ্টা দেখা যায়। অনেক "সুশিক্ষিতের" মধ্যেও এই দোষ পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরটা একটু বিকৃত করিয়া বা 'বিনাইয়া,' ওষ্ঠদ্বয় অসমান ভাবে উঠাইয়া পরাইয়া, সময়ে অযথা কুঞ্চিত করিয়া উপস্থিত আলোচনার প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করায় ইহারা তৃপ্তি অনুভব করে।

অহঙ্কারী ব্যক্তিদিগের সংসর্গ হইতে নিজকে দূরে রাখিবার চেষ্টা সকলেরই জন্মিয়া থাকে। কারণ গর্ব্ব প্রকাশে অন্যকে তুচ্ছ করিবার ভাবটাই বর্ত্তমান থাকে। এই গর্ব্ব বচনে ব্যবহারে, গমনে, ভঙ্গীতে নানাপ্রকারেই প্রকটিত হয়। যে পর্য্যন্ত অন্যের আত্মবোধ ক্ষুণ্ণ না হয়, সেরূপ গর্ব্ব প্রকাশে কেহ অন্যের অপ্রিয় হয় না। যখনই নিজের গৌরব প্রচার করিতে যাইয়া অন্যকে খাটো করিয়া দেখিতে হয়, তখনই অহঙ্কারী ব্যক্তি সকলের ত্যজ্য, পরোক্ষে ব্যঙ্গের, বিদ্বেষের ও বিদ্রূপের পাত্র হইয়া দাঁড়ায়। কি করিয়া যে অপরে তাহার গর্ব্ব টের পায় গর্ব্বিত ব্যক্তি তাহা বোঝে না, বুঝিতে চেষ্টাও করে না। হাটিবার কালে মন্থর ও ধীর পাদক্ষেপে, হঠাৎ থামিয়া একবার চতুর্দ্দিক বিলোকনে, যথাসম্ভব জানু না বাঁকাইয়া পদ বিমোচনে, গর্ব্বিত ব্যক্তিকে চিনিতে পারা যায়। অনেক সময় উচ্ছ্রিত ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টি দ্বারাও অহঙ্কার পরিজ্ঞান হয়। বচনে, ব্যবহারে, দৃষ্টিতে, ভঙ্গীতে আমাদের চরিত্রের ও মানসিক গতির কতটা যে অপরের নিকট পরিব্যক্ত হয়, যিনি জীবনে ক্ষণকাল কোন অহঙ্কারী ব্যক্তির সহিত যাপন করিয়াছেন, তিনিই তাহা বলিতে পারিবেন। অনেকের নিকট এটা হয়ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হইবে, যে, অনেক অহঙ্কারী ব্যক্তির কোথাও এমন একটা দুর্ব্বলতা, এমন কোন সঙ্কোচজনক অভাব আছে, যে বিষয়ে সে সর্ব্বদাই সচেতন, আর সেটুকু ঢাকিবার জন্যই তাহার অহঙ্কার প্রদর্শন প্রয়োজন। আর তাহারাই নীতির সামান্য ব্যতিক্রমে অতিমাত্র অসহিষ্ণু— যাহাদের পূর্ব্ব জীবন আলোচনা করিলে তাহাদিগকে দুর্নীতির অবতার বলিয়াই ভ্রম হইতে পারিত; এবং মানুষের ভুল ও ত্রুটীর জন্য ঘৃণায় তাহাদেরই ওষ্ঠ ও ভ্রূ সবার চেয়ে বেশী কুঞ্চিত হয়; এ অপরাধ যে ক্ষমার অযোগ্য ইহা প্রমাণ জন্য তাহারাই সবার চেয়ে বেশী ব্যস্ত হয়। যাদের পিতা, পিতামহ দরিদ্র অথবা প্রতিষ্ঠাবিহীন তাদেরই ধনগৌরব ও পদমর্য্যাদার অহঙ্কার একটু অতিরিক্ত হইয়া উঠে। আর লোকে হিংসা করিয়া তাহাদিগকে অহঙ্কারী বলে।

কিন্তু তারা ভুলিয়া যায়, পৃথিবীতে তাদের মত অথবা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আরো অনেক আছেন, যাহাদিগকে কেহ এমন করিয়া হিংসা করে না। পৃথিবীটা কেবলই অহঙ্কারীদের বাস ভূমি নয়। সমাজের শিক্ষায় ইহা ছাড়াও মানুষ জন্মে। সময় সময় এমন দু এক জনকে আমরা দেখি যাহাদিগকে স্বাস্থ্য ও আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। তাদের নয়নের উজ্জ্বলতা, বদনমণ্ডলের স্নিগ্ধভাব ও ওষ্ঠদ্বয়ের সহাস্য প্রকাশ দেখিয়া স্বতঃই বলিতে হয়,—আহা এক মধুর মূর্ত্তি, জীবনের কি আনন্দময় পরিগ্রহ! ইহাদের স্মৃতি চিরকাল আমাদের নিকট অভিনন্দিত হয় বলিয়াই, অহঙ্কারীর ব্যবহার আরো অসহ্য হইয়া পড়ে।

আবার কতকগুলি মনোভাব অহঙ্কারের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত হইয়াও অহঙ্কারের মত বিদ্বিষ্ট বা ঘৃণিত হয় না। বরং অপরের শ্রদ্ধা এবং প্রশংসাই পাইয়া থাকে। মর্য্যাদা জ্ঞান, আত্মবিশ্বাস ও উদারতা প্রভৃতি অহঙ্কারের অন্যতর এবং উচ্চতর প্রকাশ বলিয়া আখ্যাত হয়। এ সকলের বর্ত্তমানতা হেতু কেহ অপরের বিচারে হীন হয়েন না; বরং অপরের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। এ সকল বৃত্তি অপরকে খোঁচা দিবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকে না। ইহাদের প্রকাশের উত্তেজনা মৃদু। অপরে সকল সময় ইহা অনুভবও করিতে পারে না। মর্য্যাদাবোধ মানসিক শক্তির পরিচায়ক। আত্মসম্মান-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি পৃথিবীর সকল দুঃখ দৈন্য ও অবিচার সহ্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু কদাপি নিজকে কোথাও হীন করিতে বা হেয় কাজে লিপ্ত হইতে অবসর দেন না। প্রতিভার খর দৃষ্টি ও উন্নত কর্ম্মীর চাঞ্চল্য না থাকিলে, কাহাকেও

আমরা কোনও কাজের ভার দিতে অগ্রসর হই না। কিন্তু স্নিগ্ধ দৃষ্টিও প্রশান্ত বদনের অন্তরালে অনেক সুষ্ঠু মন ও কর্ম্মোপযোগী দৃঢ়তাকে আমরা দেখিতেই পাই না। কদাচিৎ একটী ক্ষুদ্র দৃঢ় বাক্যে, বদনে গাম্ভীর্য্যের সহসা আবির্ভাবে, বিনত স্থির দৃষ্টিতে ইহাদের মানসিক প্রভৃত শক্তির ক্ষণিক বিকাশ হয়। কিন্তু কার্য্যকালে ইহাদের কর্ম্মদক্ষতা, অপরাজেয় অনুরাগ, অপরিমিত অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা দেখিলে মনে হয়, দীনতার আবরণে কি দুর্দ্দমনীয় শক্তিই প্রচ্ছন্ন ছিল।

আত্ম বিশ্বাসের স্থির সঙ্কল্প যখন বাক্যে ও ব্যবহারে সকলের সহিত বিরোধের সৃষ্টি করে, অপরের প্রাপ্য সম্মান দিতে অস্বীকৃত হয়, এবং নিজের বিবেচনায় যাহা একবার ভাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার বিপক্ষে সহস্র প্রতিবাদের কোথায় কোনও সারবত্তা দেখিবার প্রয়োজন বোধ করে না, তখনই তাহা গোড়ামি বলিয়া অন্যের বিরক্তির কারণ হয়। গোড়ামিতে একটা সরলতা আছে, অহঙ্কারে তাহা নাই। অহঙ্কার, পরশ্রীকাতরতায় অন্যের গুণ ও ঐশ্বর্য্যকে অপরের দৃষ্টিতে খাটো করিতে প্রয়াস পায়। আর গোড়ামী প্রতিষ্ঠা পরায়ণ; সে নিজকে সবার সম্মুখে জোর করিয়া ধরিতে চায়।

প্রভুতাভিমান ও অহঙ্কারের মধ্যে যে একটু পার্থক্য আছে, অনেক সময় তাহা ধরিতে না পারিয়া, প্রভুতাভিমানকে অহঙ্কারের শ্রেণীভুক্ত করিয়া লই। কিন্তু প্রভুতাভিমানের ফলে যাহা অর্জ্জিত হয় তাহাকেই আবার আমরা 'সম্ভ্রান্ত' বলিয়া সম্মান করি। যাহারা সমাজে উচ্চপদ অধিকার করিয়া থাকেন, প্রভুত্ব করিতে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের আকৃতির মধ্যে ক্রমে এমন একটু বিশেষত্ব আসিয়া পড়ে যে, তাহাকে দেখিলে আপনা হইতেই একটু সম্ভ্রম জন্মে। বহুকাল যে যে অধিকারে থাকে তাহার আকৃতিতে তদনুকূল লক্ষণাদি উপক্রান্ত হয়। যাজক অধ্যাপক, সৈনিক প্রভৃতিকে দেখিলে নিঃসংশয়ে অনুমান করা যায় ইহাদের কে কি পদ অধিকার করিয়া আছে। ধনী ব্যবসায়ী ও প্রভুতাভিমানী রাজ কর্ম্মচারীর আকৃতিমধ্যে এমন একটু বৈষম্য থাকে, যাহা সহজেই অনুধাবন কিন্তু ইহা বর্ণনা করা কষ্ট কর। প্রভুধর্ম্মী দিগের আকৃতিগত বিশেষত্ব টুকু ক্রমে বংশানুগত হয়। যাহাদিগকে দৃষ্টি মাত্রে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়া ধরিয়া নেই, তাহাদের বংশ পরিচয়ে দেখা যায় যে বহু কাল বংশানুক্রমে তাহারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। আকৃতির এই বৈশিষ্ট্য বা আভিজাত্যের অভিজ্ঞান টুক কেহ নিজে সম্পূর্ণ অর্জ্জন করিতে পারে না, জন্মাধিকার সূত্রেই ইহা সংঘটিত হয়। যখন সমাজে বা দেশে বিপ্লবাদির উপদ্রব থাকে না, তখনই সম্ভ্রান্ত বংশ গড়িয়া উঠা সম্ভবপর হয়। এরূপ একটী বংশ বা পরিবার গড়িয়া উঠিতে বহুবর্ষ ও বহু পুরুষের প্রয়োজন হয়। এজন্য আভিজাত্যকে দেশের শান্তি ও সামাজিক উন্নতির নিদর্শন বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

মনের গঠন যেমন মুখাবয়বে প্রকটিত হয়; আকৃতিগত সাদৃশ্যও তেমন মানসিক ভাব নিচয়ের সাদৃশ্য সূচিত করে। ভ্রাতা ও ভগ্নী গণের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেক সময় একই রূপ হইয়া থাকে। তাহাদের বাহ্য আচার ব্যবহারে অনেক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইলেও চরিত্রের কোনও এক স্থানে একটী সহজ যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের প্রত্যেকের কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার বিশ্লেষণ করিয়া একটী যোগ সূত্র নির্ণয় করা যায়। ঐ খানে তাহারা সবাই এক। ঐটী পিতামাতার ও পরিবারের প্রভাবের ফল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। প্রাচীন ও উচ্চ বংশীয়দের মধ্যে এমন কতকগুলি কুলানুগত প্রথা বিদ্যমান থাকে, যাহা অন্য সকল পরিবার হইতে তাহাদিগকে পৃথক্ করে, এই বৈষম্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে পরিবারস্থ বালক বালিকাদের মনেও একটু বৈশিষ্ট্যের ভাব জন্মিতে থাকে; উহাই কুলগর্ব্বের ভিত্তি স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তারা বংশে ও মর্য্যাদায় যে একটু বড়, এজ্ঞান যে গর্ব্বের সঞ্চার করে তাহা ক্রমে মজ্জাগত হইয়া পড়ে। এই প্রচ্ছন্ন গর্ব্বই আভিজাত্যের নিদর্শন স্বরূপ আকৃতিতে বিকশিত হয়। প্রত্যেক পরিবারেরই এমন একটু বিশেষত্ব থাকে, যদ্দরুণ সে অন্য হইতে পৃথক বলিয়া বিবেচিত হয়। তপঃনিষ্ঠ, স্বাধ্যায় পরায়ণ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। পরিচয় না জানিয়াও সকলেই ইহাদের সম্মান করে। ইহাদের পুত্রদেরও

একটা গর্ব্ব থাকে যে তাহারা এরূপ ব্রাহ্মণের সন্তান। এই গর্ব্ব প্রভাবেই এরূপ ব্রাহ্মণের কুলললনা ও পুত্রগণ আর্থিক অসচ্ছলতা, বিলাস বিহীনতায় কখনও লজ্জানুভব করে না। ইহারা দৈন্যে দুর্দশায় প্রপীড়িত হইয়াও ইহাদের সহজ গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে পারে না। এ জন্য সকল কবি এবং সকল আখ্যায়িকা কারই, অভিজাত বংশীয় চরিত্র গুলির প্রতি একটা পক্ষপাত প্রদর্শন করেন।

আভিজাত্য সর্ব্বদাই সম্মান পায় বলিয়া অন্যের নিকট সম্মান আদায়ের গর্ব্বে স্ফীত হয় না; বরং এই সম্মানের উপযুক্ত হইবার সহজ স্পৃহা ইহাদের মধ্যে বলবতী হয়। আর অহঙ্কারের সম্মান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেশী; ইহা লোভাতুর। এজন্য আভিজাত্যকে অহঙ্কারের প্রকৃষ্টতর প্রকাশ বলিতে পারি।

উচ্চাভিলাষের সঙ্গেও অহঙ্কারের সাধারণ সম্পর্ক আছে। উচ্চাভিলাষ প্রায়ই প্রচ্ছন্ন থাকে; ইহা প্রস্ফুটিত হয় না। আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উচ্চাভিলাষীর মধ্যে সংকল্প ও বেদনার ভাব প্রবল থাকে; কখন কখনও ভবিষ্যতের গৌরব কল্পনায় অহঙ্কারের ভাব জাগরিত হয়। কিন্তু ইহাদের বহিঃ প্রকাশ অত্যন্ত মৃদু বলিয়া, কোন লক্ষণ নিরূপণ করা যায় না।

বিলাসিতা অহঙ্কারের নামান্তর মাত্র। বেশভূষা দেখিয়া লোকের চরিত্র পরিজ্ঞান হয়, একথাটা নূতন নহে। বিলাসিতা দ্বারা যে আমরা আমাদের অন্তরস্থিত অহঙ্কারকেই প্রকাশ করি ইহাতেও অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই। মহিলাগণের এ দুর্ব্বলতা হয়ত সকলেরই লক্ষ্যের বিষয় হইয়াছে। অলঙ্কার অহঙ্কারেরই একটা উচ্ছ্বাস এবং ব্যঞ্জনা মাত্র। ফ্যাসানটা অহঙ্কারিগণের দুর্ব্বল অনুকরণ বই আর কিছুই নয়।

অহঙ্কারে মানুষ নিজকে একটু বেশী লম্বা, একটু বেশী মোটা দেখিতে চায়; উভয় পার্শ্বে দুলিয়া চলাটা কেহ কেহ ফ্যাসান বলিয়া ধরিয়া নিলেও, যে বাতাসে অহঙ্কারের নিশ্বাসটাই আমাদের নাকে বাজে। বাবু পুড়িয়া গাল ফুলাইয়া কথোপকথনে, পা ফাঁক করিয়া দাঁড়ানেতে, চুলের মধ্যে সতর্ক অঙ্গুলি সঞ্চালনে, চশমার ভিতর দিয়া নভঃ নিরীক্ষণে, অহঙ্কারের সঙ্কেত গুলিই আমাদের চোখে পড়ে। অনেক সময় ছোট ছোট ছেলেদের বড় বড় বই নিয়া স্কুলে যাইতে দেখিয়া মনে হয়, অন্যের নিকট নিজকে বড় বলিয়া ধরার প্রবোচনা বুঝি মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক। অনেকে রুমাল নাড়িয়া যে সশব্দ অহঙ্কারটুকু হাওয়ায় ছাড়িয়া দেন, তাহার আওয়াজ আমাদের কাণে পৌছে। কেহই নিজের অবস্থানটুকুতে সন্তুষ্ট নহে। অহঙ্কারী আবার একটু বেশী অসহিষ্ণু। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীটা যে অহঙ্কার পরিজ্ঞাপক এবং তার গাউন ও টুপী যে তারই উপযুক্ত হইয়াছে, ইহা দ্বিতীয়বার বলা নিষ্প্রয়োজন। অধিক আলো অধিক বাতাস উপভোগ করা ও অধিক স্থান জুড়িয়া থাকার আকাঙ্ক্ষাই যেন অহঙ্কারের বিশেষত্ব। সকল দেশের স্ত্রীজাতির পরিধেয়ই পুরুষাপেক্ষা অধিক স্থান জুড়িয়া থাকে; তাহাদের সৌন্দর্য্য ফলানর স্পৃহাই ইহার একমাত্র কারণ। স্ত্রীলোকের চুল বড় করিয়া রাখার মূলেও হয়ত এরূপই কোন কারণ বিদ্যমান। অনেক যুবকের মধ্যে বেশ পারিপাট্য বিলাসিতা প্রবল দেখা যায়; বিশেষতঃ যে সকল সভা সমিতিতে নারী সমাজের দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব, সেখানে ইহাদের বেশ পারিপাট্য অত্যধিক হয়। নারীর দৃষ্টিতে সে অন্য পুরুষ অপেক্ষা অসুন্দর নয়—এই দুর্ব্বল অভিলাষই কি ইহার একমাত্র প্ররোচক নহে? বরযাত্রীগণের নিখুঁত বেশভূষা ও কি এই শ্রেণীর অন্তর্গত? একবার এক বক্তার সম্ভ্রমভাব আমি নিজে লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি বেশ ভাল বক্তৃতা দিয়া থাকেন—তবে নবীন বক্তা। একদিন কোন বিশেষ সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আহূত হন। সেখানে কয়েকটী মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইতেই তাহার ললাটোপরি স্বেদ সঞ্চার হইল। বক্তৃতার সময়ে কোটটাকে ঠিক রাখিতে, গলাবন্ধটাকে সোজা রাখিতে ব্যস্ত হইয়া পরিলেন। কি ভাবে দাঁড়াইলে সব চেয়ে মানানসই হইবে, এ ভাবনায় যেন অস্থির হইয়া পড়িলেন—কখনও হেলিয়া, কখনও পিছনে সরিয়া, কখনওবা পিছনে হাত নিয়া পায়ে ভর করিয়া

উচু হইয়া দাঁড়াইয়া—নানা ভঙ্গীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অন্যান্য দিন বক্তৃতায় তাহার এ সকল মুদ্রাদোষ লক্ষিত হয় নাই। সেদিনকার চাঞ্চল্যের জন্য তাহার বক্তৃতা যে ভাল হইয়াছিল না, ইহা বলাই বাহুল্য। অপরিচিত দৃষ্টির নিকট নিজকে সুন্দর 'Manly' দেখা যায়—এই গোপন অথচ উগ্র আকাঙ্ক্ষাই কি এই চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ নয়? কিন্তু ফলে দেখি আমাদের দুর্ব্বলতা যত বেশী ঢাকিতে যাই, ততই যেন উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অন্যান্য চিত্তবৃত্তির বৈষম্যের ফলে অহঙ্কারের প্রকাশও ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করে। যাঁহারা সৌজন্যের জন্য বিখ্যাত বলিয়া শুনিয়াছি, তাহাদের কাহারও কাহারও দৃপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি; অত্যুচ্চ পদবীর ব্যক্তিদিগের মধ্যেও এ পার্থক্য দেখিয়াছি। কেহ শুধুই দর্পিত ও সৌজন্যবিহীন, কেহ বা অভিমান সম্পন্ন অথচ সৌজন্য পরায়ণ।

আমি প্রভূত গুণসম্পন্ন—এরূপ জ্ঞান এবং এই অহঙ্কার সবারই থাকিতে পারে। যে প্রকাশ করে সেই নিন্দিত হয়। প্রশংসা শুনিয়া কেহ যদি মনে করে, "তা প্রশংসা করিবেই তো," এবং নির্লজ্জের মত সে প্রশংসা গ্রহণ করে, অথচ প্রশংসা কারীকে সাধুবাদ না দেয় অথবা তৎপ্রতি সৌজন্য প্রকাশ না করে, তবে তাহাকে লোকে অহঙ্কারী বলিয়া ঘৃণা করিবেই। পরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনিলে অহঙ্কার পরিতৃপ্ত হয়। সেই পরিতৃপ্তির আনন্দকে যে সংযত না করিতে পারে, সেই অহঙ্কারী বলিয়া উপেক্ষিত হয়। অসঙ্কোচে ও অম্লান বদনে প্রশংসা গ্রহণ প্রশংসাকারীর মনোবেদনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। যিনিই প্রশংসিত হইবেন, তাহাকেই প্রশংসাকারীর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে;—বচনে, ব্যবহারে বা ভঙ্গীতে যিনি ইহা না করিবেন, কিয়ৎকাল পরে তাহার প্রশংসা আর শুনা যাইবে না—তৎপরিবর্ত্তে তাহার ত্রুটীগুলির আলোচনায় সে স্থান পূর্ণ হইবে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের প্রশংসা স্বরূপ করতালির সময় অভিনেতা বা অভিনেত্রী ঈষন্নত মস্তকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া উহা গ্রহণ করে। দেশনায়ক তাহার প্রশংসা বা জয় ধ্বনির সময় মস্তক ঈষন্নত করিয়া জন সঙ্ঘকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। "অত প্রশংসার আমি উপযুক্ত নই," "এ গুরু ভারের উপযুক্ত না হইলেও, আপনাদের ইচ্ছার সমর্থন করিতে হইতেছে," "আমার এ সাফল্য আপনাদেরই আশীর্ব্বাদে (বা শুভেচ্ছায়)" ইত্যাদি—অনেক প্রকারে আমরা যুগপৎ আমাদের প্রশংসায় কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ জ্ঞাপন করি। অহঙ্কারকে একটা আবরণের ভিতরে রাখিতেই হইবে— চিরকালই সমাজের এবং আজকাল সভ্যতার এ উপদেশ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ।

ভারতীয় গণিতের প্রাচীনত্ব।

দশমিক প্রণালী—ভারতবর্ষেই যে সর্ব্বপ্রথম দশমিক প্রণালী সমুদ্ভাবিত হয়, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কিন্তু ভারতের কোন স্থানে, কখন, কাহাকর্ত্তৃক এই প্রণালীটি উদ্ভাবিত হয় তাহা অজ্ঞাত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরব দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ এই প্রণালীটি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহার উপযোগীতাও হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। স্পেন দেশে আরবদিগের সমৃদ্ধিসম্পন্ন উপনিবেশ ছিল। কালক্রমে এই প্রণালীটি ইহাদের দ্বারা ঐ জনপদে প্রচারিত হয়। তৎপর ধীরে ধীরে ইহা ইউরোপের অন্যান্য খৃষ্টিয়ান রাজ্যে গৃহীত হইতে থাকে। নেপিয়ার নামক স্বনামখ্যাত গণিত-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত দশমিক প্রণালীকে ইহার বর্ত্তমান আকারে আনয়ণ করেন। পূর্ব্বে যে সকল সংখ্যার উপরে ভগ্নাংশ জ্ঞাপক একটী মাত্রা দেওয়া হইত, এখন সেই সকল সংখ্যার পূর্ব্বে একটী বিন্দু দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে দশের কোন শক্তিসম্ভূত সংখ্যা দ্বারা হরণ ও পূরণ, কেবল বিন্দু পরিচালনের সাহায্যে, সহজে ও অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই গণনা প্রণালী এতই সুন্দর ও সুসাধ্য যে ফরাসী জাতি তাহাদের সমুদয় পরিমাপ ও গণনার ধারা এই প্রণালীর উপর স্থাপিত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক গণনায় সমস্ত সভ্য

জগতেই, হরণ ও পূরণের সুবিধার্থ, দশমিক প্রণালী সম্ভূত ফরাসী দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র ইংরেজ বৈজ্ঞানিকগণই ইহার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। কিন্তু ইহারাও শনৈঃ শনৈঃ ঐ গণনা প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। এই প্রণালীর বিরুদ্ধে একটী মাত্র আপত্তি এই যে—এই বিধান মতে সকল রাশির $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{7}$ ও $\frac{1}{9}$ অংশ বিশুদ্ধরূপে জানিতে পারা যায় না।

বীজগণিত—ইটালির অন্তর্গত পিসা নগরিতে লিওনার্ডো নামক একজন বিখ্যাত সওদাগর ছিলেন। বাণিজ্য উপলক্ষে তাহাকে মিশর, সিরিয়া, গ্রীস্ ও সিসিলিতে ভ্রমণ করিতে হইত। তাহা কর্ত্তৃক বীজগণিত ইউরোপে নীত হয়। সম্ভবত ঐ সকল স্থান হইতেই তিনি বীজগণিত ও সংখ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মূল সূত্রগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার নিকট ভারতীয় গণিত ও গণনা প্রণালীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইত। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে গ্রীসদেশই বীজগণিতের জন্মভূমি। কেহ কেহ কিন্তু আবার ভারতবর্ষকেই বীজগণিতের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পূর্ব্বে বীজগণিত পাটীগণিতের অংশ বলিয়া গণ্য হইত। আমাদের দেশের আর্য্যভট্ট ভাস্করাচার্য্য, ও শ্রীধরাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ বীজগণিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহাদের প্রণালী ইউরোপ খণ্ডেও ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হইত। সমীকরণের কোন কোন নিয়ম এখনও শ্রীধরাচার্য্যের নামে পরিচিত। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে উক্ত ভাস্কর আচার্য্য, শ্রীধরাচার্য্য প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের লোক।

ডাঃ আর্থার এ, মেকডোনেল আরও বলিতেছেন যে "বিজ্ঞানেও সমুদয় ইউরোপ ভারতবাসিগণের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। ভারতবাসীরাই সর্ব্বপ্রথম ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা লিখন ও পঠন প্রণালীর উদ্ভাবন করেন এবং তাহাদের এই গণনা প্রণালীই এখন সভ্য জগতের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। এই সংখ্যা শাস্ত্রের উপর দশমিক প্রণালী সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। সমুদয় গণিতশাস্ত্র কেন, সভ্যতার ক্রমবিকাশের উপরও যে উক্ত দশমিক প্রণালীর প্রতিপত্তি আছে তাহা অস্বীকার করিতে বা অত্যুক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভারতবাসীগণ আরব্‌গণের বীজগণিত ও পাটীগণিতের শিক্ষাগুরু ছিলেন। এবং এই আরবগণের নিকট হইতেই ইউরোপের অন্যান্য জাতি ঐ বিদ্যা শিক্ষা করেন। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও ভারতবাসীগণ ইউরোপীয় জাতি সমূহের ও গণিতের অধ্যাপক। যদিও Algebra (al—gebr—আলজবর) শব্দটী আরবি ভাষার একটী শব্দ তবুও বীজগণিত ভারতবাসীগণেরই প্রদত্ত একটী উপহার।

"ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে কল্পসূত্র ও গ্রীক জ্যামিতে এত সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় যে গণিত ঐতিহাসিক কেণ্টর মনে করেন—কোন না কোন পক্ষ অপরের নিকট ঋণী। তাহার মতে কল্পসূত্রের উপর আলেকজেন্দ্রিয়া নিবাসী হেরোর (Hero) ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিপত্তি আছে। সম্ভবতঃ ২১৫ খৃ, পূ, হেরোর ক্ষেত্রতত্ত্ব লিখিত হইয়াছিল। এবং ১০০ খৃ, পূ, পরে ইহা ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল"। কিন্তু মিঃ মেকডোনেল অনুমান করেন যে কল্পসূত্র ইহারও অনেক পূর্ব্বের লিখিত গ্রন্থ। কারণ জ্যামিতি ব্রাহ্মণগণের যাগ যজ্ঞাদি ধর্ম্মক্রিয়ার একটী অংশ বিশেষ। ব্যাকরণের ন্যায় ইহারও পৃথক একটী সত্তা বা উদ্দেশ্য ছিল। এবং ইহার জন্মও ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। আয়ুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে পুনঃ পুনঃ যজ্ঞভূমি ও যজ্ঞবেদীকা প্রস্তুতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরিমিত মাপে যজ্ঞবেদীকা প্রস্তুত না হইলে মহৎ অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা ছিল। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন অনুষ্ঠানে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ বিদেশীয়দের নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিতে অনুমোদন করিবেন, একথা কখনও বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না। এখন পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণগণের ঐ বিশেষত্ব টুকু বর্ত্তমান আছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণ বীজগণিতে এত উন্নত ছিলেন যে গ্রীকগণ কোন কালেই ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। সংস্কৃত শাস্ত্রে ইঁহার পাণ্ডিত্য অগাধ। এবং ইনি অক্সফোর্ড খ্রাইষ্ট্ কলেজের সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক। সুতরাং ইহার উক্তি গ্রহণীয়।

আমেরিকার বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্মিথ্ ক্লেয়ার তাহার সুবৃহৎ ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে প্রাচীন কেল্‌ডিয়ানগণ পাটীগণিতে বিশেষ উন্নত হইয়াছিলেন। ইহারা দশমিক ও দ্বাদশিক এই দুই প্রকারের গণনা জানিতেন। কেলডিয়ানগণ কোন সময় হইতে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা কেহই বলিতে পারে না। তবে খৃষ্টের জন্মের ২২৮৬ বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের রাজত্ব অন্য এক জাতি কাড়িয়া লয়। ২০০৪ খৃঃ পূঃ ইহারা আবার রাজত্ব প্রাপ্ত হন এবং ১৫৪৬ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভারতবর্ষই যদি দশমিক প্রণালীর মাতৃভূমি হইয়া থাকে তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে খৃষ্টের জন্মের ১৫৪৬ বৎসর পূর্ব্বে কেলডিয়ানগণ ইহা ভারতবাসিগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তবে এখানে আর একটী কথা হইতে পারে যে ইহাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলেও আনুমানিক আরও ৫০০ পাঁচ শত বৎসর ইহাদের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। তৎপর বোধ হয় ইহারা (এই ক্ষুদ্র জাতি) অন্য জাতির সঙ্গে ক্রমে মিশিয়া ইহাদের স্বকীয় জাতিত্ব হারাইয়াছেন। তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে দশমিক প্রণালী খৃষ্টের জন্মের প্রায় ১০৪৬ বৎসর পূর্ব্বে আরব দেশে (এশিয়া মাইনরে) চলিয়া গিয়াছিল।

আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খৃঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বরাহ-মিহির ৫৭৮ খৃঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মিঃ কেয়্স প্রভৃতি (Mr. Keyes) পণ্ডিতগণ অনায়াসে স্থির করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে ৪০০ খৃঃ হইতে ৬৫০ খৃঃ গণিতের উন্নতি হইয়াছিল। তৎপরে ইহার অবনতি ঘটে।

উল্লিখিত পণ্ডিতগণের মত হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে গণিতশাস্ত্রের সকল বিভাগেই ভারতীয় আর্য্যগণ খৃষ্টের জন্মের বহু বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তখন ইহারা চতুর্দ্দিকে জ্ঞানালোক বিস্তার করিয়া অন্যান্য জাতির অজ্ঞান তিমির বিনাশ করিয়া চমৎকৃত করিতেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নেপালী দরবার।

(১)

নেপালী দরবার, নেপাল রাজ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ বা ইতিহাস। সৌভাগ্য হেতু ভারতের সর্ব্ব স্বাধীন দেশ নেপাল দেখিবার সুবিধা আমার হইয়াছিল। বিগত ১৩০৬ সনের ফাল্গুন মাস, শিবরাত্রি উৎসবের কিছু পূর্ব্বে একদিন গোরক্ষপুর বাঙ্গালী বন্ধুগৃহে থাকিয়া পত্র পাইলাম নেপাল প্রবেশের পাশ বা ছাড়পত্র রক্‌শৌল রাজকাছারীতে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। নেপাল রাজগুরু শ্রীযুক্ত সূর্য্যপ্রসাদ মিশ্র মহাশয় আমার বহু দিনের পরিচিত, তাঁহার কাছে আমি নেপাল প্রবেশের সুবিধা করিয়া দিতে পত্র লিখিয়াছিলাম— ইহা তাহারই ফল। পাশ না হইলে কেহই নেপাল প্রবেশ করিতে অধিকারী হয় না। যদি কেহ জোর করিয়া নেপাল যায়, তবে তাহাকে রাজ্যের বাহির করিয়া দেওয়া হয়, কোন সন্দেহ চরিত্রের লোক হইলে অন্যবিধ দণ্ড দেওয়ারও বিধি আছে। শিবরাত্রির সময় আট দিন মাত্র ইহার ব্যভিচার। সর্ব্বপ্রকার হিন্দু যাত্রীর তখন দ্বার অবারিত।

পাশ পাইলাম, এখন ইংরেজের রাজ্য ছাড়া অচেনা, অজানা স্বাধীন রাজ্যে যাইব কিনা ইহাই হচ্চে তখনকার সাময়িক ভাবনার কথা। গোরক্ষপুরের বন্ধুদিগের আগ্রহে নেপালে নেপালী দরবার দেখিতে যাত্রা করিলাম। ভয় মোটেই হইল না, তবে অনেকগুলা উঁচু নীচু পাহাড় ভাঙ্গিতেহ হবে এই যা কথা। রক্‌শৌলের গায় লাগা বীরগঞ্জে, নেপাল দরবারের কাছারী, বীর হাসপাতাল, বীর লাইব্রেরী অবস্থিত। বীর সমসের জঙ্গের নামানুসারে এ সকল হইয়াছে। রক্‌শৌল ইংরেজের, আর বীরগঞ্জ রাজার। লাইব্রেরীর অবস্থা ভাল নহে। হাসপাতালেরও তথৈবচ। সে দেশে রোগ ও রোগীর সংখ্যা অতিকম সুতরাং কেমন করিয়া হাসপাতালের অবস্থা ভাল হইবে? এক উপদংশ রোগ দেখিলাম সাধারণ। লাইব্রেরীর পুস্তক পড়িবার লোকাভাব সুতরাং ইহার অবস্থা সহজেই বোধগম্য।

নেপাল যাত্রীদের সুবিধার জন্যই লাইব্রেরী, পাহাড়ীরা স্বাস্থ্যসম্পদশালী বলিয়া উহাদের নিকট সাধারণ রোগ বড় আমল পায় না। বাঙ্গালার মত সে দেশ ম্যালেরিয়ায় পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায় নাই।

এখানকার রাজ কাছারীর তহশীলদার বা প্রধান কর্ম্মচারী বাঙ্গালী। বাঙ্গালী বাবু আমাকে পাইয়া সুখী হইলেন। তিনি আমাকে কলিকাতা হইতে আগতায় ডাক্তারবাবু মনে করিয়া আপ্যায়িত করিলেন, তারপর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া আমার পাশ যে তাঁহার নিকট আসিয়াছে,তাহা জানাইয়া কহিলেন"যে যানে যখন নেপাল যাওয়া সুবিধা মনে করেন,আদেশ করিলেই আনিয়া দিব।" একটী যানের কথা শুনিলাম তাহার নাম কাণ্ডেট্ট। উহা একপ্রকার নৌকা বিশেষ, মানুষে কাঁধে করিয়া নেয়। আমাদের দেশের পাল্কীর পরিবর্ত্তে উহা ব্যবহৃত হয়। ইহার মূর্ত্তি দেখিয়াইত আমি অবাক্। অন্য যানের কথা কাহগাম—হাতী, ঘোড়া, মহিষ। শেষ মহিষই চাহিয়া লইয়া যমরাজের মত তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া যাত্রা করিলাম। পথ বড় বন্ধুর, ঘোড়া বা মহিষ তজ্জন্য খুব দ্রুত চলিতে পারে না। মহিষের পীঠ সমান, সুতরাং কোন কষ্ট হইল না। চতুর্দ্দিকে অরণ্যানীর অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে অল্পশ্রমে, আনন্দে পথ চলিতে লাগিলাম।

দূর হইতে বন্যপশুর চীৎকার, বিকট রব আমাদের শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যেখানে সারমেয় বীরের চীৎকার শুনিয়াছি সেখানেই মনে হইয়াছে নিকটে বুঝিবা জনালয় আছে, কিন্তু সঙ্গীয় নেপালী কহিল ইহা বন্য সারমেয়ের উগ্রকণ্ঠ ধ্বনি। ইহারা মনুষ্যকে কিছু ভয় করে বলিয়া বড় বেশী হিংসা করে না; বাগে পাইলে কমও করে না। এখানকার বৃক্ষ লতাদি বড় সতেজ, মনুষ্য পালিত গো মহিষাদি বলিষ্ঠ, গাভীগণ এরূপ দুগ্ধবতী যে সে কথা আমরা ভাবিতেও পারি না। ঘৃত, দুগ্ধাদি অত্যধিক সুলভ।

রাজ কাছারী, পার্ব্বত্য বন্দর ও লোকালয়, যেখানে পাইয়াছি, সেখানেই রাত্রি যাপন করিয়াছি এবং লোকালয়ে দ্বিবাভাগের আহার ক্রিয়াও সম্পাদন করিয়াছি। কত আনন্দে যে পথ চলিয়াছি, তাহা কি বলিব? কাননজাত পুষ্প সৌরভ আমাকে পুলকিত করিয়াছে। আবার স্বাধীন দেশের অরণ্যজাত স্বাধীন পাখীগুলি আমাকে স্বাধীনভাবে স্বাধীনতার গান শুনাইয়াছিল। আমার তেমন আনন্দ ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। চারিদিন পার্ব্বত্য বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া নেপাল রাজধানী কাটামুণ্ডে পদার্পণ করিলাম—বড় আনন্দ। এমন স্বর্গীয় আনন্দ কি ঘরে বসিয়া পাইতাম? কেতাবে পড়িয়াছি পর্ব্বত শিখরে দেবগণই বাস করেন সুতরাং এ প্রদেশ দেবের দুর্ল্লভ।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমের পাহাড়ের পিছনে গিয়া আত্ম গোপন করিবার ইচ্ছায় পলায়ন করিতেছেন— কাহার ভয়ে? আর তিনি অন্ধকারকে স্বীয় রাজ্য ইজারা দিয়া সটান পলায়ন করিতেছেন কেন? হায় জগতের এই অবস্থা সর্ব্বত্রই। সূর্য্যদেবের অবস্থা এমন হইবে কে জানে? অন্ধকার চুপাচুপী চোরের ন্যায় পৃথিবীতে স্বীয় আসন পাতিয়া লইবার আয়োজন করিতেছে। পাখিগণ কলরব করিয়া বিভুগুণ গাহিতে গাহিতে শ্রান্ত দূরের আশায় কুলায় অনুসন্ধানে ছুটিয়া যাইতেছে। ইহাদেরই বা কি প্রকার দেব ভাব, তারাও যেন দেব সেবক, তারাও আনন্দে নাচিয়া উঠিতেছে। পশুদেরই বা কত আনন্দ, উৎসাহ! গৃহপালিত গো-মহিষাদি পালে পালে দল বাঁধিয়া স্বাধীনতার নিশান উড়াইয়া শ্রান্ত লাভার্থ গৃহে ফিরিতেছে —বেশ আনন্দ। অন্ধকার আমাদের পথ আগুলিয়া ধরিয়াছে, তথাপি আমাদের আনন্দ উৎসাহের সীমা নাই। দূর হইতে দেখিতে পাইলাম অসংখ্য আলোক রাশি জ্বলিয়া একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে। সঙ্গীয় নেপালী কহিল "বাবুজী, ওই যে আলোক রাজি দেখিতেছেন ইহাই নেপাল রাজধানী।" আমিত নাচিয়া উঠিলাম। মনে করিলাম রাজধানীতে বোধ হয় বিবাহ উৎসব, বামুন জাত কিনা, নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ। পরে জানিলাম প্রত্যহই নিশাযোগে এমন করিয়া আলোক মালা জ্বলিয়া উঠে। খানিক দূর অগ্রসর হইয়া দেখি প্রকাণ্ড বাজার, বৃহৎ বিপনী শ্রেণী

দ্বারা সজ্জিত। রাত্রেও মাল বেচাকেনা হইতেছে কিন্তু বাজারে তেমন হট্টগোল নাই।

রাত্রে রাজগুরুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমার আগমনে গুরুজী বড় আপ্যায়িত হইলেন। তাঁহার গৃহে রাত্রে লুচি দুগ্ধ, মিষ্টান্ন আহার করিলাম। এখানে ছানার মিঠাই পাওয়া যায় না। নেপালীরা ছানা করিয়া মিঠাই করেনা। ছানাও তাহারা কখনো করেনা। পর দিন প্রাতে সহজ-লভ্য ইন্দ্রচক বাজারে প্রবেশ করিলাম। বাজারের নাম ইন্দ্রচক। রাজ্যটী আমাদের দেশের হইলেও বাজারের যতকিছু দ্রব্য সবই বিলাতি। রাস্তায় আসিতে গরু, মহিষ, ছাগল ও অশ্ব পৃষ্ঠে নানা মাল বোঝাই করিয়া আনিতে দেখিয়াছি। চাউল, দাইল, তেল. পান আমাদের স্বদেশের, আর সব বিলাতি। বিলাতি চুরুট বার্ডস সাই, বিস্কুট, বস্ত্র, কাচের দ্রব্য সবই বিলাতি। মনে হয় যেন বিলাতেরই একটী বাজারে আসিয়া পড়িয়াছি। বাজারে একটীও বাঙ্গালীর দোকান নাই। বাঙ্গালীরা মারোয়ারীদের মত অন্যত্র দোকান করে না। এখানে বহু মারোয়ারী ব্যবসায়ার্থ আছে। বাজার দেখিয়া আসিয়া মধ্যাহ্নে আহার করিয়া নেপাল প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহিত দেখা করিতে গেলাম। এখানকার ডাক্তার, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার বাঙ্গালী। এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় বাঙ্গালী আছেন। আমি তাহাদের আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া কেন সে দেশী ব্রাহ্মণের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি এ কৌফিয়ত আমাকে দিতে হইল।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

অযোধ্যার রাজা।

রামায়ণে তিন জন নৃপতির শাসন কাল বিবৃত হইয়াছে। ১ম দশরথ, ২য় ভরত ও ৩য় রাম।

কোনও আদর্শ শান্তিপূর্ণ রাজ্যের কথা বলিতে গেলেই লোকে "রাম রাজ্যের" কথা উল্লেখ করিয়া থাকে। ভরত বা দশরথের নাম উল্লেখ করে না। মহাকবির রচিত ষড় কাণ্ড রামায়ণে রাম রাজত্বের বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হয় নাই। লঙ্কা কাণ্ডের শেষ একটী মাত্র সর্গে অতি সংক্ষেপে রামের রাজ্য গ্রহণ সম্বন্ধীয় বিবরণ দিয়া রামায়ণ শেষ করা হইয়াছে। অস্মদ্দেশীয় জন সাধারণ যে রাম রাজ্যের সুখ কল্পনা করেন, সেই রাম রাজ্যের চিত্র প্রজারঞ্জন উদ্দেশে সীতা নির্ব্বাসন হইতে উদ্ভূত। তাহা উত্তরকাণ্ড অপেক্ষা উত্তর রাম চরিতে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে।

মহাকবি ভবভূতি রামায়ণ-সংলগ্ন উত্তরকাণ্ড অবলম্বন করিয়া যে "উত্তর রাম চরিত" রচনা করিয়াছেন তাহা হইতেই সকলে রাম রাজ্যে প্রজার শান্তি ও সুখ কল্পনা করিয়া থাকেন।

ভবভূতির রাম অষ্টাবক্রের সমক্ষে বলিতেছেন—

"স্নেহং দয়াং তথা সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য, মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥"

'প্রজারঞ্জন জন্য স্নেহ, দয়া আত্মসুখ কি জানকীকেও বিসর্জ্জন করিতে আমি কোন ক্লেশ বোধ করিনা।"

মহামুনি বাল্মীকির মুখে কিন্তু আমরা সীতা নির্ব্বাসন ব্যাপারটী অবগত হইতে পারি না। রাম রাজত্বের বিস্তৃত বিবরণও রামায়ণে অপ্রকাশ।

রামায়ণের মুখবন্ধে রামের যে আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এবং ভরতকে তিনি প্রশ্নচ্ছলে যে রাজ নৈতিক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা আমরা তাঁহার আদর্শ রাজ্য শাসনের চিত্র কল্পনা করিতে পারি মাত্র। কিন্তু তাঁহার রাজ্য শাসন প্রণালী আমরা গ্রন্থের কোন স্থানেই প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। রামায়ণে রামের আদর্শ চরিত্রের বর্ণনা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

"নিয়তাত্মা মহাবীর্য্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী॥ ৮
বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমান শত্রুনিবর্হণঃ।

* * *

ধর্ম্মজ্ঞ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।
যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিবান্॥ ১২
প্রজাপতি সমঃ শ্রীমান ধাতা রিপুনিষূদনঃ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্ম্মস্য পরিরক্ষিতা॥ ১৩
রক্ষিতা স্বস্য ধর্ম্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।
বেদ বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্ব্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ॥ ১৪
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ স্মৃতিমান প্রতিভাবান্।
সর্ব্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ॥ ১৫
সর্ব্বদাভি গতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্রইব সিন্ধুভিঃ।
আর্য্য সর্ব্ব সমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ॥ ১৬

স চ সর্ব্ব গুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
সমুদ্রইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেণ হিমবানিব ॥ ১৭
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্য্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
কালাগ্নি সদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥ ১৮
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যেধর্ম্ম ইবা পরঃ। * (বাল—১)

রামের এই আদর্শ চরিত্র কেবলই বাক্য মূলক নহে। যাঁহারা রামায়ণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা পদে পদে এই বর্ণনার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং এহেন আদর্শ নৃপতি প্রজারঞ্জনের জন্য স্ত্রী ত্যাগ রূপ বিভৎস কাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিয়াও প্রজারঞ্জক আদর্শ নৃপতি নামের যোগ্য। মহাকবি বাল্মীকিও তাঁহার সেই আদর্শ সৃষ্টিদ্বারা প্রজারঞ্জন জন্য স্ত্রী ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করাইয়া লঙ্কা কাণ্ডের উপসংহারে রামের আদর্শ রাজ্য শাসন ও প্রজা পালনের উল্লেখ করিয়া রামায়ণের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। যথা—

ন পর্য্যদেবন্ বিধবা নচ ব্যাল কৃতংভয়ম্।
ন ব্যাধিজং ভয়ঞ্চাসী ত্রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ৯৮
নির্দ্দস্যুরভবল্লোকোনানর্থং কশ্চিদ স্পৃশৎ।
নচ স্ম বৃদ্ধাবালানাং প্রেতকার্য্যাণি কর্ব্বতে ॥ ৯৯
সর্ব্বং মুদিত মে বাসিৎ সর্ব্বোধর্ম্ম পরোঽভবৎ।
রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্ ॥ ১০০
আসন-বর্ষসহস্রাণি তথা পুত্র সহস্রিণঃ।
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥ ১০১
নিত্যমূলা নিত্যফলাস্তরবস্তত্রপুষ্পিতাঃ।
কামবর্ষী চ পর্জ্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ ॥ ১০২
স্বকর্ম্মসু প্রবর্ত্তন্তে তুষ্টাঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
আসন্ প্রজা ধর্ম্মপরারামে শাসতি নানৃতাঃ ॥ ১০৩
সর্ব্বে লক্ষণ সম্পন্নাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ।
দশবর্ষ সহস্রাণি রামো রাজ্যমকারয়ৎ। ১০৪ (লঙ্কা—১০০)

অর্থাৎ রামের রাজ্যকালে কোন রমণীকেই বৈধব্য ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই, রোগ ও সর্পভয় ছিলনা—রাজ্য দস্যুশূন্য হইয়াছিল, কাহাকেও অনর্থ স্পর্শ করে নাই। বৃদ্ধগণকে বালকের প্রেতকার্য্য করিতে হয় নাই। রামের দৃষ্টান্তে রাজ্যবাসী সকলেই ধার্ম্মিক ছিল এবং মহানন্দে কালাতি পাত করিত। কেহ কাহাকে হিংসা করিত না। সকলেই রোগ শোক বিহীন হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিল। বৃক্ষ সকল প্রচুর ফল পুষ্প প্রসব করিত। ইন্দ্র ইচ্ছানুরূপ বারি বর্ষণ করিত সমীরণ সুখস্পর্শী ছিল। প্রজাগণ হৃষ্টচিত্তে নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিত—এইরূপে রাম বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। (১)

ইহা আদর্শ রাজার রাজ্য শাসনের অমোঘ ফল। সুতরাং রাম আদর্শ নৃপতি ছিলেন, ইহা বলাই বাহুল্য।

ভরতের রাজ্য শাসন সম্বন্ধীয় বিবরণ রামায়ণে না থাকিলেও তাঁহার সম্বন্ধে যে দুই একটী কথার উল্লেখ আছে, তাহা হইতেই ভরত যে একজন ধার্ম্মিক ও আদর্শ নৃপতি ছিলেন তাহা অবগত হওয়া যায়।

রাম চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসে যাপন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতেছেন। তিনি অযোধ্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া ভরতের মানসিক ভাব জ্ঞাত হইবার জন্য ইঙ্গিতজ্ঞ হনুমানকে অগ্রে নন্দীগ্রামে প্রেরণ করিলেন। হনুমান নন্দীগ্রামে উপনীত হইয়া—

---

* এই রচনা রামায়ণ সংগ্রহকারকের রচিত—মুখবন্ধ স্বরূপ রামায়ণে গৃহীত হইয়াছে। পাঠক রামায়ণ পাঠকরিলেই বুঝিতে পারিবেন।

(১) লঙ্কাকাণ্ডের এই ১০৪ শ্লোকেই বাল্মীকির রামায়ণ শেষ হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোক পাঠ করিলেই তাহা বুঝাযায়। যথা—

ধর্ম্মং যশস্যমায়ুষ্যং রাজ্ঞাঞ্চ বিজয়াবহম্।
আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্ ॥ ১০৫
যঃ শৃণোতি সদা লোকে নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
পুত্রকামশ্চ পুত্রান্ বৈ ধনকামো ধনানি চ ॥ ১০৬ ইত্যাদি—

অর্থাৎ ইহলোকে যে ব্যক্তি মহর্ষি বাল্মীকি কৃত রাজগণের বিজয়াবহ এই আদি কাব্য শ্রবণ করিবে সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্ম এবং যশ লাভ করিবে। পুত্রকামী ব্যক্তির পুত্র লাভ হইবে, ধন কামী ব্যক্তির ধনলাভ হইবে। ইহার পর রামায়ণ গৃহে রাখিলে তাহার যে পুণ্য হয় তাহা এবং রামায়ণের পূজাকরিলে যে পুণ্য হয় তাহা, বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং উত্তরকাণ্ড যে পরবর্ত্তী রচনা তাহা সহজেই বুঝা যায়। সীতা নির্ব্বাসন প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেও যে রাম প্রজারঞ্জক ভূপতি ছিলেন তাহা প্রদর্শন জন্যই উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ততার উল্লেখ এখানে করা হইল, নতুবা ইহার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

"দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রম বাসিনম্
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃ ব্যসন কর্শিতম্ ॥ ৩০
ফলমূলাশিনং দান্তং তাপসং ধর্ম্মচারিণম্।
সমুন্নতজটাভারং বল্কলাজিনবাসসম্॥ ৩১
নিয়তং ভাবি তাত্মানং ব্রহ্মর্ষি সমতেজসম্।
পাদুকেতে পুরস্কৃত্য প্রশাসন্তং বসুন্ধরাম্॥ ৩২
চাতুর্ব্বর্ণ্যস্থ লোকস্য ত্রাতারং সর্ব্বতোভয়াৎ।
উপস্থিত মমাত্যৈশ্চ শুচিভিশ্চ পুরোহিতৈঃ॥ ৩৩
বলমুখ্যৈশ্চ যুক্তৈশ্চাক বায়াম্বরধারিভিঃ।
নহি তে রাজ পুত্রং তং চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্॥ ৩৪
পরিভোক্তুং ব্যবস্যন্তি পৌরা বৈ ধর্ম্ম বৎসলাঃ।

(লঙ্কা—১২৭)

হনুমান দেখিলেন ভরত বাস্তবিক ভ্রাতৃ বিরহে দীন ভাবে চীর কৃষ্ণাজিন পরিধান পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, সর্ব্বাঙ্গ মল লিপ্ত—এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পাদুকা দ্বয় সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতেছেন। তাহার সুশাসনে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণই সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত আছে। ভরত রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া চীর কৃষ্ণাজিন ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া পুরবাসিগণ তাহার অনুসরণে ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিয়াছে। পুরবাসিগণ যে রাজার অনুসরণে সর্ব্ব সুখ পরিত্যাগ করিতে পারে, সে রাজা যে প্রজার প্রিয় ইহা বাক্য দ্বারা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় কি?

ভরতের ভ্রাতৃভক্তি আদর্শ স্থানীয়—হনুমান তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন।

রাম ভরতের জন্য বনবাসী হইয়াও সেই বিজন বিপিনে এক দিন বলিয়াছিলেন—

"ন সর্ব্বে ভ্রাতর স্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ"। ১৫

লঙ্কা—১৮

ভরতের ন্যায় ভাই এ পৃথিবীতে সকলেই নহে।

সুতরাং ভরত যে রামের রাজনৈতিক উপদেশগুলি প্রতিপালন করিতে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ইহা কখনই সম্ভব নহে। ঐ উপদেশের ফল যে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য সংস্থাপন তাহা বলাই বাহুল্য।

রাজা দশরথ একজন আদর্শ নৃপতি ছিলেন। রামায়ণের বহু স্থানেই তাঁহাকে "দীর্ঘ দর্শী; মহাতেজাঃ, পৌর জনপদ প্রিয়ঃ। 'মহর্ষি কাল্পো রাজর্ষি স্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুত' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। কার্য্যেও তিনি কিরূপ ছিলেন ও তাঁহার রাজ্য শাসন নীতি কিরূপ প্রণালীর ছিল, তাহা আমরা "রাজ্য শাসন প্রণালী" প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

মানব চরিত্র সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে না। এইরূপ যে আদর্শ রাজা দশরথ, তিনি রাজ ধর্ম্মে আদর্শ হইয়া ও স্ত্রৈন নামে অভিহিত হইয়া সমাজ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইতেছেন। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাঁহার ঐ অপবাদ সম্বন্ধে ২।১ টী কথার উল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

এই হতভাগ্য রাজা "পৌর জনপদ প্রিয়ঃ" হইয়াও সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিলেন না, তাহার কারণ—তাঁহার রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন নীতির ক্রটী নহে; রামের ন্যায় উপযুক্ত পুত্রের প্রতি তরুণী ভার্য্যার প্ররোচনায় অবিচার প্রদর্শন।

দশরথ এক জন ধর্ম্মভীরু রাজাছিলেন। তিনি ধর্ম্মের তৌল দণ্ডে অপত্যস্নেহ অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষাকে অধিক তর গুরুতর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন; তাই ধর্ম্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা পুত্র পরিত্যাগকে শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা স্বার্থ এবং এমন কি জীবন ত্যাগ ও শ্রেয়। ধর্ম্মভীরু দশরথ তাহাই করিয়াছিলেন—ধর্ম্ম-লোক রক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণ সর্ব্বস্ব পুত্র ও শেষ স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ভবভূতির রামও কুলধর্ম্ম এবং রাজ ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাইয়া সীতার ন্যায় আদর্শ সতী ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। উত্তর চরিতের রাম দুর্ম্মুখের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়া বলিলেন—

সতাং কেনাপি কার্য্যেন লোকস্যারাধনং ব্রতম্।
যৎ পূজিতং হিতাতেন মাঞ্চ প্রাণাং সমস্তুতা॥

ধর্ম্মলোকের আরাধনা সাধুদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এবং ইহাই তাহাদিগের পক্ষে মহৎব্রত। পিতা আমাকে এবং স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র দশরথের এই ধর্ম্ম নীতির বিচার করিতে যাইয়া বলিয়াছেন।

"ধর্ম্মনীতির মূল সূত্র, পরের অনিষ্ট যাহাতে হয় তাহা

অকর্ত্তব্য। সত্যভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে যে সত্য পালনে পরের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে ততদূর নহে, তখন সত্য পালনীয় নহে দশরথের সত্য পালনে রামের গুরুতর অনিষ্ট, সত্যভঙ্গে কৈকেয়ীর তাদৃশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্টান্ত জনিত জন সমাজের যে অনিষ্ট তাহা রামের স্বাধিকার চ্যুতিতেই গুরুতর। উহা দস্যুতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্য পালন করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন।"

আমরা বঙ্কিম বাবুর উক্তির প্রত্যুত্তরে সসম্মানে এই কথা বলিব যে, সময়ের আদর্শ দ্বারাই সমসাময়িক নীতির বিচার করিতে হইবে। যে যুগে অযোধ্যার আদর্শ নৃপতি দশরথ সত্য রক্ষার্থ পুত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই যুগে প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও সত্য রক্ষা কল্পে স্বার্থের বিচার ধার্ম্মিক দিগের মনে স্থান পাইত না। যাহা ধর্ম্ম, তাহা অবশ্য প্রতিপাল্য। ধর্ম্মের লঘু গুরু ভেদ তখন ছিল না।

রাজনৈতিক জগতে কৃত্রিমতা ও ছলনা প্রশংসনীয় এবং করণীয়। কিন্তু ধর্ম্মে কৃত্রিমতা বা ছলনা প্রবেশ করিলেই ধর্ম্মের গুরুত্ব হানী হইয়া থাকে। যে জাতি যত ধর্ম্ম প্রবন, প্রতারণা, ছলনা বা ধর্ম্মের গুরুত্ব লঘুত্ব বিচার তাহাদিগের নিকট তত বিরল।

আদর্শ রাজা রাম কুটরাজনীতির অনুসরণে বালীকে বধকরিয়া যে বাক্ চাতুর্য্য তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাতে রাজনীতির হিসাবে তিনি নির্দ্দোষ ছিলেন। রাম যদি ঐরূপ অবস্থায় পড়িয়া বালী বধকে ধর্ম্ম নীতির বিরুদ্ধ জনক বলিয়া মনে করিতেন তাহা হইলে কি তিনি কখন ও ঐরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন ?

তার্কিক বলিবেন—"তা কেমন করিয়া বলিব ?"

আচ্ছা রাম চরিত্র একটু আলোচনা করা যাউক!

পিতৃ সত্য রক্ষার্থে রাম অদ্যই বনে যাইবেন। কিন্তু পিতা দশরথ বলিতেছেন—

অদ্যত্বিদানীং রজনী পুত্র মা গচ্ছ সর্ব্বথা।
একাহং দর্শনেনাপি সাধুতাবচ্চরাম্যহম্॥" ৩০

(অযোধ্যা—৩৪)

"অদ্য রাত্রে তুমি যাইও না। তোমাকে দেখিয়া আমি এক দিনও অন্ততঃ সুখে থাকিতে ইচ্ছা করি।"

কিন্তু রাম—যে রাম পিতাকে সত্য ভঙ্গের পাপ হইতে রক্ষা করিতে যাইতেছেন, যে রামের পিতৃভক্তি জগতের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে, সেই রাম পিতার এই সামান্য অনুরোধটী রক্ষা করিলেন না।

তখন তার্কিক হয়ত বলিবেন—এমন পিতার মৌখিক ভালবাসার কোন মূল্য নাই, রাম তাহা বুঝিয়াছিলেন।

তার্কিক বর্ত্তমানের আদর্শ ধরিয়া বিচার করিবেন। কিন্তু রাম তৎকালীন আদর্শে গঠিত। রাম কৈকেয়ীর নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন—অদ্যই আমি বনে যাইয়া পিতাকে সত্য পাস হইতে মুক্ত করিব"

"ময়া চোক্তং ব্রজামীতি তৎ সত্যমনুপালয়ে।" ৫০

অযো ৩৪

রামও সত্য রক্ষাকে ধর্ম্ম রক্ষা বলিয়া মনে করিলেন, তাই সত্য ভঙ্গ করিয়া এক দিনের জন্যও অযোধ্যায় অবস্থান করিয়া পিতার শেষ সম্মান রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন। দশরথও রামের এইরূপ অঙ্গীকার শুনিয়া নীরব হইলেন।

হেতুবাদ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্মের লঘুগুরু নির্দ্ধারণের তর্ক রামায়ণী যুগের পরবর্ত্তী সময়ে সূচিত হইয়াছিল। ইহার ফলে ধর্ম্ম জগতেও "মধু অভাবে গুড়ের" ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মহাভারতে আমরা দেখিতে পাই যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কর্ণবধে অসমর্থ হওয়ায় ভর্ৎসনা করিয়া গাণ্ডিব ত্যাগ করিতে বলিলে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে উদ্যত হন। তখন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করেন—ধর্ম্মের লঘু গুরুর বিচার বিতর্ক আরম্ভ হয়। (কর্ণপর্ব্ব—মহাভারত)

অন্যত্র যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সঙ্গে অবস্থান কালীন অর্জ্জুন নিয়ম ভঙ্গ দোষে দোষী হইয়া বন গমনে উদ্যত হইলে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের লঘু গুরু বিচার করিতে আরম্ভ করেন ও অর্জ্জুনকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করেন। এবার অর্জ্জুন স্থির—অর্জ্জুন বলিলেন "আমি আপনার নিকট শুনিয়াছি ছল পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমি সত্য হইতে বিচলিত হইতে পারিব না। (২১৪ অধ্যায় আদিপর্ব্ব মহাভারত)

রামায়ণের দশরথ ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রামকে ধর্ম্মের লঘু গুরু বিচারের উপদেশ দেন নাই। দশরথ

নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই।

রামায়ণী যুগে ধার্ম্মিকেরা অন্ধের ন্যায় ধর্ম্মানুশাসন প্রতিপালন করিত। মহাভারতীয় যুগে ধর্ম্মের লঘু-গুরু-ভেদ-বিতর্ক আরম্ভ হয়—ক্রমে বিচার বিতর্কের প্রাধান্যে বর্ত্তমানে ধর্ম্মের সঙ্কোচ ও অধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে—এহেন সময়ের আদর্শ দ্বারা রাজা দশরথের ধর্ম্মাচরণ বিচার করা আমরা সমীচীন মনে করি না।

বঙ্কিম বাবু আরও লিখিয়াছেন—"এখানে দশরথ স্বার্থপরতা শূন্য নহেন। সত্য ভঙ্গে জগতে তাঁহার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকারচ্যুত ও বহিষ্কৃত করিলেন; অতএব যশ-রক্ষারূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিলেন।" (ভালবাসার অত্যাচার)।

যদি বঙ্কিম বাবুর উপরিউদ্ধৃত বাক্যই প্রকৃত হয়, তবে আমরা এই অন্যায় যশআকাঙ্ক্ষী স্বার্থপর রাজাকে কখনই প্রাচীন ভারতের আদর্শ রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

বাস্তবিক কি রাজা দশরথ "সত্য ভঙ্গে কলঙ্ক হইবে এই ভয়ে" রামের ন্যায় পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন? কখনই নহে। দশরথ কৈকেয়ীকে বলিতেছেন—

অনার্য্য ইতি মামার্য্যাঃ পুত্র বিক্রায়কং ধ্রুবম্। ৭৮

দশরথের এই উক্তিতে কি সেরূপ কথা প্রকাশ পায়? বরং তাহার বিরুদ্ধ কার্য্য প্রকাশ পায়। বরং দশরথ বলিতেছেন—"রামকে বনে পাঠাইলেই আমাকে লোকে অনার্য্য বলিয়া নিন্দা করিবে।" সত্য ভঙ্গের জন্য নহে। সত্য যাহা তাহা অপ্রতিপালিত থাকিবে দশরথ এরূপ চিন্তা কখনই করিতেন না—এখানেও করেন নাই। দশরথ কৈকেয়ীকে বলিতেছেন—যদি আমার, ভরতের ও জনসমূহের হিত চাও, তুমি এই সঙ্কল্প ত্যাগ কর; আমাকে এই সত্য রক্ষায় আবদ্ধ করিও না।

বির বৈভেদ ভাবেন ভরতেনাত্মনেন চ।
যদি ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং কার্য্যং লোকস্য ভরতস্য চ॥ ৫১
(অ—১২)

কৈকেয়ী এই সংকল্প ত্যাগ না করিলে—তিনি রামকে বনে পাঠাইবেন না এবং সেই কারণ সত্য ভঙ্গ জন্য তাহার কলঙ্ক হইবে, এইরূপ চিন্তার আভাস রামায়ণের কোথাও পাওয়া যায় না। বরং সত্য যাহা তাহা ধর্ম্ম,—ধর্ম্ম যাহা তাহা প্রাণ দিয়া, অপযশঃ ভাগী হইয়াও রক্ষা করিতে হইবে—এরূপ উক্তিই রামায়ণে পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই জন্যই রামায়ণ হিন্দুর প্রাণের জিনিস, দশরথ প্রচীন হিন্দু রাজ্যের আদর্শ সম্রাট। সেই আদর্শ সম্রাট ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন—

রাঘবেহি বনং প্রাপ্তে সর্ব্ব লোকস্য ধিক্ কৃতম্।
মৃত্যুরক্ষমণীয়ং মাং নয়িষ্যতি যমক্ষয়ম্॥ ৮৭

অতঃপর রাজা কৈকেয়ীকে বিধবা হইবার সম্ভাবনা দেখাইয়াও যখন হতাশ হইলেন, তখন সেই আদর্শ সম্রাট দশরথ স্মৃতির অনুশাসন অবলম্বন করিয়া পতি-কুল কলঙ্কিণী কৈকেয়ীকে ত্যাগ করিলেন—

যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণির্গৃহীতো পাপে ময়া ধৃতঃ।
সন্ত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া॥ ১৪
(অঃ ১৪)

"আমি অগ্নির সমক্ষে মন্ত্র পাঠ করিয়া তোর যে পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা অদ্য পরিত্যাগ করিলাম, তোর গর্ভজাত পুত্র ভরতকেও পরিত্যাগ করিলাম।"

আদর্শ রাজা দশরথ ধর্ম্মপত্নীর প্রতি ইহা অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আর কি করিতে পারেন? কিন্তু দণ্ডে সত্য পরিত্যক্ত হইবার নহে। কৈকেয়ী পণ ছাড়িলেন না। দশরথও আর কৈকেয়ীর সহিত বাক্য ব্যবহার করিলেন না। এর পর রাম আগমন করিলে কৈকেয়ী নিজেই রামকে বলিলেন—তোমার পিতা রাজা দশরথ আমার নিকট সত্যপাসে আবদ্ধ—তুমি রাজ্য কামনা ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলে তিনি সত্য মুক্ত হইবেন—অতএব তুমি তাহাকে সত্য মুক্তকর, পিতাকে সত্য মুক্ত করা পুত্রের কর্ত্তব্য। ইত্যাদি। কৈকেয়ীর এই প্রকার বাক্য শুনিয়া দশরথ ভাবি পুত্র-বিয়োগজনিত দুঃখে অভিভূত হইলেন।

আমরা যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহা পাঠে রাজা দশরথ যে যশ-রক্ষা রূপ স্বার্থের বশীভূত হইয়া রামের অনিষ্ট করিয়াছিলেন, ইহা প্রমাণিত হয় না।

বঙ্কিম বাবু ব্যতীত আরও বহু লেখক দশরথের উপর

তীব্র লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা কেবল বঙ্কিম বাবুর উক্তিরই সসম্মানে প্রতিবাদ করিলাম।

রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যার শাসন প্রণালী যদি আদর্শ শাসন বাচ্যে অভিহিত হইবার অধিকারী হয়, তবে সেই শাসন প্রণালীর নিয়ন্তা রাজা দশরথ, সেই আদর্শ রাজ্যের রাজা।

আমরা বঙ্কিম বাবুর দোষারূপ হইতে রাজা দশরথকে বিমুক্ত করিতে পারিয়াছি কিনা তাহা পাঠকগণ বলিতে পারেন। যাহাহউক এইবার আমরা তাহার 'স্ত্রৈন" অপবাদের আলোচনা করিব।

রামায়ণে লিখিত হইয়াছে রাজা দশরথ জিতেন্দ্রিয় ও ঋষিকল্প আদর্শ রাজা ছিলেন।

এইরূপ আদর্শ ও জিতেন্দ্রিয় রাজার কার্য্যে যদি স্বেচ্ছাচারিতা ও স্ত্রৈনভাব লক্ষিত হয় তবে স্বতঃহ তাঁহার প্রতি ঘৃণার ভাব উদ্রেক হয়।

রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যের কোন স্থলেই আমরা দশরথকে স্বেচ্ছাচারী বা রিপুপরতন্ত্র দেখিতে পাই না।

"দশরথের ৩৫০টী পত্নী ছিল এবং তিনি রূপযৌবন-সম্পন্না কৈকেয়ীর নিকটই অধিকক্ষণ থাকিতেন" ইহা রামায়ণে অবগত হওয়া যায়—ইহাদ্বারা তাঁহার রিপু-পরতন্ত্রতার কোন আভাস পাওয়া যায় কি? বহু-পত্নীকত্ব কামুকের লক্ষণ নহে। রাজা দশরথ বহুপত্নীক হইয়াও যথাসময়েই কামের সাধনা করিতেন—রামায়ণে ইহারও আভাস আছে। সুতরাং ইহাদ্বারা তাঁহার প্রতি কামুকত্বের আরোপ করা যায় না। কৈকেয়ীর প্রতি তাহার যেরূপ ভালবাসা ছিল তাহা কতকটা পক্ষপাত মূলক ছিল সন্দেহ নাই। এইরূপ পক্ষপাত বহুপত্নীক ও বহুপুত্রকের পক্ষে স্বাভাবিক। অধিক পত্নী ও অধিক পুত্র কন্যা থাকিলে সকলের প্রতি ভালবাসা বা স্নেহ সমভাবে প্রকাশ পায় না। দশরথ কৈকেয়ীকে যেরূপ একটু অধিক ভালবাসিতেন—পুত্রগণের মধ্যে আবার সেইরূপ রামকে অধিক ভালবাসিতেন। (১) কৈকেয়ীকে অধিক ভালবাসিতেন বলিয়া যে জ্যেষ্ঠা কৌশল্যার প্রতি রাজা কোন ত্রুটী প্রদর্শন করিতেন তাহা নহে। যজ্ঞের পায়স বণ্টন ব্যাপারই তাহার নিদর্শন। রাজা দশরথ কৌশল্যাকে জ্যেষ্ঠ ভাগ—অর্দ্ধ ভাগ প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধ ভাগ সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজা দশরথ যে কৈকেয়ীর একান্ত ভক্ত ছিলেন, তাহা কার্য্য-কারণে অবগত হওয়া যায় না।

অযোধ্যার অন্তঃপুরে রাজা দশরথের মুখে আমরা একটু স্বেচ্ছাচারিতার আভাস পাই। আদর্শ রাজার মুখে এরূপ বাক্য অশোভন।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে রামাভিষেক বার্ত্তা প্রদান করিতে যাইয়া দেখিলেন—কৈকেয়ী ক্রোধাগারে—ভূমিশয্যায় অবলুণ্ঠিত। রাজা সেই অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৈকেয়ী নিরুত্তর। দশরথ বলিলেন—

> কস্তু বাপি প্রিয়ং কার্য্যং কেন বা বিপ্রিয়ং কৃতম্।
> কঃ প্রিয়ং লভতামদ্য কো বা সুমহদ প্রিয়ম্ ॥ ৩১
> মা রৌৎ সীমা চ কারীত্বং দেবী সম্পরিশোষণম্।
> অবধ্যো বধ্যতাং কোবা বধ্যঃ কোবা বিমুচ্যতাম্ ॥ ৩২
>
> (অযো—১০)

বলিতে গেলে এই উক্তি ঘোর স্বেচ্ছাচারী ও অধার্ম্মিক রাজার উক্তি। "কোন নিরপরাধকে বধ করিতে হইবে, অথবা কোন বধ্য ব্যক্তিকে প্রাণভিক্ষা দিতে হইবে।" কি ভয়ানক কথা। তবে কি দশরথ স্ত্রীর উপদেশে রাজত্ব করিতেন?

এই উক্তির বিচার করিতে যাইয়া যদি আমরা স্থান, কাল, পাত্র ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করি, তবে এই উক্তি মূল্যহীন হইয়া পড়ে।

বৃদ্ধ রাজা তরুণী ভার্য্যাকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া নিতান্ত নির্জ্জনে শুদ্ধান্তঃপুরের ক্রোধাগারে—যে বাক্য

---

(১) "তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতুঃ।"

রাম যে কেবল পুত্রগণের মধ্যেই রাজার অধিক প্রিয় ছিলেন তাহা নহে। রাজা বরপ্রার্থিনী কৈকেয়ীকে সেই দারুণ সত্য পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন—

> কৌশল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ ত্যজেয় মপিবাশ্রিয়ম ।১১
> জীবিতংচাত্মনা রামং ন ত্বেব পিতৃবৎসলম্ ॥

আমি কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং রাজশ্রী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারি এবং নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারি তথাপি রামকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।

প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সে বাক্যের গুরুত্ব নীতিশাস্ত্র অনুসারে অতি সামান্য। এই উক্তিকে রাজনৈতিক গুরুত্বে বা ধর্ম্মনীতির তুলাদণ্ডে তুলিত করা বোধ হয় কখনই সমীচীন নহে। রাজনৈতিক মিথ্যাবাদ (Political lies) যেমন কূট রাজনীতির অঙ্গ, দাম্পত্য প্রতারণা সেইরূপ গার্হস্থ্যধর্ম্মের অনুমোদনীয়। দাম্পত্য প্রতারণায় নীতিশাস্ত্র কলুষিত হয় না—দাম্পত্য ভাবও ক্ষুণ্ণ হয় না—অধিকন্তু ইহা ভালবাসার গভীরতা প্রদর্শন পক্ষে একটি আপাতঃ মধুর অমোঘ অস্ত্র। তবে এইরূপ অসতর্ক উক্তি দ্বারা সত্য পাশে আবদ্ধ হইলে রাম-বনবাসরূপ বিষম বিভ্রাটও ঘটিয়া থাকে বটে!

নীতিশাস্ত্র স্ত্রীপুরুষের কোন কথায় কর্ণপাত করাকে দোষাবহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং আমরা কৈকেয়ীর নিকট দশরথের এই উক্তিকে শ্রবণ-অযোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম।

এক রাম বনবাস ব্যতীত দশরথের চরিত্রে কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় নাই। রাম বনবাসে দৃশ্যতঃ রাজা দশরথের শত অপরাধ পরিদৃশ্যমান হইলেও মহাকবির রচনা পাঠ করিলে—রামায়ণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, উত্তরোত্তর সেই আদর্শ নৃপতির গুরুগম্ভীর ভাব ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র পরিস্ফুট হইতে থাকে। তখন সত্য সত্যই মনে হয়, বাল্মীকির উক্তি অতিশয়োক্তি নহে। রাজা দশরথ সত্য সত্যই হিন্দুর প্রাচীন আদর্শ রাজা।

"স সত্য বাদী ধর্ম্মাত্মা গাম্ভীর্য্যাৎ সাগরোপমঃ।
আকাশ ইব উদারঃ—"

বিবিধ সংগ্রহ।

সমুদ্রগামী জাহাজ।

সমুদ্রগামী জাহাজ সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই পরিষ্কার কোন ধারণা নাই আমরা সাধারণতঃ গোয়ালন্দ নারায়ণগঞ্জ কিম্বা চাঁদপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল জাহাজ চলাফেরা করে তাহা দেখিয়াই অনেকটা জাহাজের ধারণা করিয়া নেই। অনেকে কলিকাতা কিম্বা চট্টগ্রাম ডকে জাহাজ দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরগামী জাহাজের ধারণা কতটা করিতে পারেন জানি না। বাইবেলে লেখা আছে জল প্লাবনের সময়ে নোয়া পৃথিবীর জীবজন্তু সহ এক বিশাল জাহাজে উঠিয়া ভাসিতে ভাসিতে আরারট পর্ব্বত শৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহা যে কত বড় জাহাজ তাহাও আমরা কল্পনা করিতে পারি না ইহা যে বর্ত্তমান জাহাজ হইতে অনেক বড় ছিল তাহার সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর গামী জাহাজ এক সপ্তাহের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী নিয়া রওনা হয়, তাহার হিসাব দেখিলে আমাদের স্তম্ভিত হইতে হয়। ১৫০০ যাত্রী ও কয়েক শত নাবিকের জন্য কি পরিমাণ খাদ্য এক সপ্তাহের তরে সংগৃহীত হইয়া থাকে তাহার তালিকা নিম্নে দিতেছি।

আমরা উদাহরণ স্থলে জার্ম্মাণ লয়েড্‌ লাইনের "ক্রন্‌প্রিঙ্গ উইলহেলম" (Kronpring Wilhelm) জাহাজের কথা উল্লেখ করিব।

ইহাতে ১০৮০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২৪২ মণ টাটকা মাংস, ১৭৩ মণ লবণাক্ত ভেড়ার ও গো মাংস, নিউইয়র্ক হইতে ব্রিমেন আসিতে প্রয়োজন হয়।

এই মাংসের দ্বারা একটি দেয়াল প্রস্তুত করিলে ১০ ফিট লম্বা, ১০ ফিট উচ্চ ও ৫ ফিট চওরা হইতে পারে। ইহা মনুষ্যের সহিত তুলনা করিলে তুলাদণ্ডের একদিকে এই মাংস অপরদিকে ২২৭ জন মনুষ্য দাড়াইলে ওজন ঠিক হয়।

একবারের যাত্রাতে প্রায় ৬০ মণ পাখীর মাংস ভক্ষিত হইয়া থাকে। চাউল, মটর, ছিম এবং টাট্‌কা শাক সব্‌জী প্রায় ৩০০ মণের প্রয়োজন হয়।

একবারের যাত্রায় ২৫,০০০ ডিম্বের দরকার। এই ডিম্ব টুক্‌রিতে করিয়া সাজাইলে কিরূপ বিশাল স্তূপ হইবে তাহা কল্পনা করা সহজ।

ইহার এক যাত্রাতে প্রায় ৪১৫ মণ ময়দা রুটির জন্য খরচ হইয়া থাকে।

এক সপ্তাহে জাহাজে প্রায় ২৫ মণ টাটকা মৎস্য ৮ মণ আন্দাজ লবণাক্ত মাছের প্রয়োজন। এই মৎস্য

একত্র করিলে প্রায় ২০ ফুট লম্বা একটি তিমি মৎস্যের সহিত তুলনা হইতে পারে।

ইহা ভিন্ন যাত্রী ও নাবিকগণ ৭৫১ মণ গোলআলু ভক্ষণ করিয়া থকে। এই আলু একত্র করিলে ১৪ ফুট লম্বা এবং ৭ ফুট পরিধির একটি বৃক্ষের আকার ধারণ করে।

এই বিশাল খাদ্য ভক্ষণ করিতে ৮½ মণ মাখমের প্রয়োজন হয়।

অতিরিক্ত মাংসভোজীদের ফল খাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কাজেই এই জাহাজে ৩২ মণ শুষ্ক ফল ও ১৩৪ মণ টাটকা ফল খরচ হইয়া থাকে।

যে ক্ষুধার্ত্তদের ক্ষুন্নিবৃত্তিতে ক্ষুদ্র একটি পাহাড় প্রমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তাহাদের পিপাসার জন্য ক্ষুদ্র একটি পুষ্করিণীর আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাদের পানের জন্য ১২৬৮৭ মণ পরিষ্কার জলের প্রয়োজন। এই বিশাল জলরাশি দ্বারা ৩০ ফিট উচ্চ এবং ২৫ ফিট পরিধি বিশিষ্ট একটি পিপাপূর্ণ করা যায়।

৮৬ মণ দুগ্ধ এই মহোৎসবে খরচ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশের ভোজন "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিতে মদ্যের প্রয়োজন হয়। এই মদ্যের পরিমাণ দেখিলে অনেক মিতাচারী ইউরোপবাসীর মাথা ঘুরিয়া যাইবে। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

সেম্পেন ———— ৮৫০ বোতল

ক্লেরেট ———— ৯৮০ "

মিডিরা, সেরি ইত্যাদি ———— ১৭০০ বোতল

রোম ———— ৭৬০ বোতল

বিয়ার ———— ৬০০ বোতল

বিয়ারের পিপা ———— ২৯৬০ গেলন

ইহা ভিন্ন যকৃতের কার্য্য যাহাতে ভাল হয় এবং যাহাতে কোষ্ট খোলাসা হয় সেই জন্য ৫২৫০ বোতল প্রস্রবণের জল বা মিনারেল ওয়াটার এর প্রয়োজন।

সেই সকল মদ্য একটি বোতলে স্থাপন করিলে সেই ভিমকায় বোতলটী ২৪ ফিট উচ্চ এবং ৬ ফিট পরিধি বিশিষ্ট হইবে।

এই বিপুল খাদ্য সম্ভারের সমস্তই যে এক সপ্তাহে নিঃশেষিত হইয়া যায় তাহা নহে। যদি পথিমধ্যে কোন আপদ বিপদে পড়িয়া জাহাজ ঠিক সময়ে পৌছিতে না পারে সেজন্য কয়েক দিনের অতিরিক্ত খাদ্য রাখা হয়। জল পথে নির্ম্মল বাতাসে আপনা হইতেই জঠরানল উদ্দীপিত হইয়া থাকে, কাজেই সমস্ত দিন ভোজন ব্যাপারেই সময় কাটিয়া যায়।

এইত গেল আরোহী ও নাবিকদের খাদ্য; ইহা ভিন্ন জাহাজের নিজেরও খাদ্যের প্রয়োজন।

এই জাহাজে প্রতিদিন ৫০০ টন কয়লার প্রয়োজন, কাজেই আপদ বিপদ ইত্যাদির জন্য সম্বল রাখিয়া ১২।১৪ দিনের পরিমাণ কয়লা বোঝাই করিলে কতখানি রেলগাড়ী যে ঐ কয়লা বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হয় তাহা কল্পনা করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

রেল গাড়ী।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে দ্রুতগামী যান বাহনের যে কি প্রয়োজন সুসভ্য ইয়োরোপের লোকেও তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারিত না। ১৬০৯ সনে অক্স্‌ফোর্ড হইতে ইয়র্কে একখানা পত্র লিখিয়া উত্তর আনিতে একমাস সময় লাগিত।

১৬৬০ অব্দে ডাক বিভাগ স্থাপিত হইলেও চিঠি পত্র ইহা হইতে বড় দ্রুত আসিত না।

যখন ঘোড়ার গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল, তখন লোকের ধারণা জন্মিল যে ইহাতেই দেশ নষ্ট করিবে। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রুত জিনিস পত্র পাঠাইতে পারিলে বাণিজ্যের যে কি সুবিধা হয়, লোকে তাহাও উপলব্ধি করিতে পারিত না।

১৬৭৮ সনে ৬ ঘোড়ার গাড়ীতে এডিনবার্গ হইতে গ্লাসগো যাতায়াত করিতে ৬ দিবস লাগিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঐরূপ গাড়ী লণ্ডন হইতে কেম্ব্রিজ—৫৭ মাইল রাস্তা যাইতে ২ দিন লাগিত।

পূর্ব্বে কেবল দিবা ভাগেই গাড়ী চলিত। ১৭৪০ সন হইতে রাত্রিতেও গাড়ী চলিতে আরম্ভ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাহারও শকটারোহণে এডিনবার্গ হইতে লণ্ডন যাইতে হইলে মাস কয়েক পূর্ব্ব হইতেই যাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইত এবং উইল ইত্যাদি

সমাধা করিয়া যাত্রা করিতে হইত। ইহা অনেকটা আমাদের দেশের বৃদ্ধদের পূর্ব্বকালে গয়া, কাশী যাওয়ার মত ছিল। তাঁহারাও দেশ হইতে একরূপ বিদায় ভোজ খাইয়া যাইতেন।

যে সময়ে ইউরোপে কেবল গাড়ীর দোষেই যে মন্থর গতিতে চলিতে হইত তাহা নহে; রাস্তা ঘাটও নিতান্ত কদর্য্য ছিল। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে ১৬৫৮ সনে লণ্ডন ও এডিনবার্গের মধ্যে গাড়ী চলার উপযুক্ত রাস্তা প্রস্তুত হয়।

সে সময়ে লণ্ডন প্রভৃতি নগরের মধ্যস্থিত রাস্তাও অত্যন্ত কম প্রশস্ত ছিল। লোকে পালকীর মত সিডন চেয়ারে যাতায়াত করিত এবং কেহ কেহ পালকীর প্রত্যেক দিকে দুইটী করিয়া ডাণ্ডা লাগাইয়া এবং উহার মধ্যে পালকীর দুইদিকে দুইটী অশ্ব যোজনা করিয়া চালাইত। ইহাই ভারাটিয়া গাড়ীর আদি অবস্থা ছিল।

১৬৬২ অব্দে সমস্ত ইংলণ্ডে মাত্র ৬খানা গাড়ী ছিল এবং উহাকেও কেহ কেহ অত্যন্ত অতিরিক্ত মনে করিতেন।

এডিনবার্গ হইতে সে সময়ে লণ্ডন ডাক আসিতে ৬ দিন লাগিত। এই দুই রাজধানীর মধ্যে ডাকের অবস্থাও তদনুরূপ ছিল। ১৭৪৫খৃঃ অব্দে একদিন বৃটীশ লিগেন কোম্পানীর নামে মাত্র একখানা পত্র আসিয়াছিল। আর একদিন লণ্ডনে মাত্র একখানা পত্র (সার উইলিয়াম পণ্টগির নামে) আসিয়াছিল। ১৭৬৬ সনে দ্রুতগামী ডাকগাড়ী ঘণ্টায় ৪ মাইল চলিত।

ক্রমে রাস্তার উন্নতির দিকে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। পাকা রাস্তায় এক ঘোড়ায় যে কাজ করিতে পারে অন্য স্থলে ৪ ঘোড়াতেও সেই কাজ হওয়া সম্ভব নহে। সেসময়ে ঘণ্টায় ১০ মাইল চলা নিতান্ত বিপদজনক বলিয়া কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ভারাটিয়া গাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়া ৩০০০ হাজার হইল এবং ডাক গাড়ীর সংখ্যাও ১০০শত হইল।

রাস্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকের রেলের রাস্তারদিকে দৃষ্টি পড়িল। এই রেল রাস্তা সর্ব্ব প্রথম কে আবিষ্কার করে ঠিক বলা যায় না। বোধ হয় অনেকের মনেই ইহার কল্পনা উপস্থিত হইয়াছিল।

১৬৭৬ সনের পূর্ব্বে নিউকেসেলের নিকটে একরূপ কাঠের রেলের রাস্তা ছিল উহা কয়লার খনি হইতে নদী পর্য্যন্ত দুইটী সমান্তরাল কাঠের রেল। ইহার উপর দিয়া একটী ঘোটক গুরুতর বোঝাই গাড়ী ও অনায়াসে টানিয়া নিতে সক্ষম হইত। কাঠের রেল সহজে নষ্ট হয় দেখিয়া কাষ্ঠের স্থলে লৌহপাত নির্ম্মিত রেল বসান হইল।

এইরূপে ক্রমে রেল ও ট্রামের রাস্তা প্রসারিত হইতে লাগিল। ইহার কিছুদিন পরে একদা নটিংহামের জেমস্ গ্রে সাহেব এক ট্রামের রাস্তা পরিদর্শন কালে ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে মালপত্র এবং যাত্রী নেওয়ার জন্য অশ্বের পরিবর্ত্তে ষ্টিম ইঞ্জিন কেন ব্যবহার করা হয় না? ইঞ্জিনিয়ার উত্তর করিলেন "মহাশয় দেশের লোকের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া দেখুন, তাহারা কি বলে। তাহারা আপনাকে বিরক্ত করিয়া মারিবে।" তখন হইতে গ্রে সাহেব আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে এই প্রস্তাব প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে অনেকে তাহাকে পাগল বলিয়া মনে করিল।

অতঃপর নিকোলাস নামে এক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার সাধারণ রাস্তায় লোক নেওয়ার জন্য এক ইঞ্জিন তৈয়ার করিলেন।

নিকোলাস ১৭২৯ সনে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তরুণ বয়সে জর্ম্মণীতে সৈনিক বিভাগে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য এবং অন্যান্য কার্য্য করিয়াছিলেন। কার্য্য ত্যাগ করিয়া তিনি ১৭৬৯ সনে বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সাক্ষাতে সাধারণ রাস্তার উপর দিয়া ইঞ্জিন চালাইবার প্রথম পরীক্ষা করেন।

এই গাড়ীটী তিন চাকা বিশিষ্ট ছিল। সম্মুখে একটী এবং পশ্চাতে ২টী। প্রথম যাত্রায় ৪জন মাত্র আরোহী নিয়া ঘণ্টায় ২½ মাইল বেগে গাড়ীখানা চলিয়াছিল।

ইহার পরে ১৭৭০ সনে আর একখানা গাড়ী প্রস্তুত করিয়া নানারূপ পরীক্ষা করার জন্য উহা পেরিশের রাস্তায় বহুবার চালান হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উহা একদিন রাস্তার এক মোর ঘুরিবার সময় কাত হইয়া পড়িয়া যায়। পুলিশ তখন গাড়ীখানা বাজেয়াপ্ত করিয়া নিকোলাসকেও আবদ্ধ করে। কিন্তু পরে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। অতঃপর গভর্ণমেণ্ট নিকোলাসকে পেন্সন দেন।

ইংলণ্ডে সর্ব্ব প্রথমে ষ্টিম গাড়ীর কথা রবিসনের (Dr. Rabison) মনে উদয় হয়। অতঃপর ১৭৫৯ সনে

তিনি ওয়াট (Watt) সাহেবকে উহা ব্যক্ত করেন। ইহার কিছুদিন পরে ওয়াট ১৭৮৪ সনে একটী ইঞ্জিনের নমুনা প্রস্তুত করেন। ১৭৮৭ সনে ওয়াটের বন্ধু (মারডক্) ইঞ্জিনের একটী ক্ষুদ্র নমুনা প্রস্তুত করিয়া তাহার নিজ গৃহের এক কক্ষে চালাইয়া পরীক্ষা করেন। ক্রমে ট্রেভেথিক, সিমিংটন প্রভৃতি অনেকে ইহার উন্নতি সাধনে যত্নবান হন। ১৮০২ সনে ট্রেভেথিক ও ভিভিয়ান কৃত গাড়ী দশ টন মাল সহ ঘণ্টায় ৫ মাইল বেগে চলিতে আরম্ভ করে।

১৮১৬ সনে জর্জ্জ ষ্টিফেনসন ঘণ্টায় ১০ মাইল চলিতে সক্ষম বলিয়া এক গাড়ী পেটেণ্ট করেন।

১৮২৫ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর বহু বিলম্বের পরে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে ডারহাম সায়ারে ষ্টকটন এবং ডার্লিংটনের মধ্যে ১১ মাইল রেল রাস্তা মঞ্জুর হয়। জর্জ্জ ষ্টিফেনসন এই লাইনের ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হন এবং তিনি কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে লৌহ রেল স্থাপন করেন। প্রথম দিন গাড়ী খুলিবার সময় কয়লা ও বহু লোক নিয়া গাড়ী চলিয়াছিল এবং জর্জ্জ ষ্টিফেনসন্ স্বয়ং চালক ছিলেন।

ইহার পরে ১৮৩০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর লিবারপুল হইতে মেঞ্চেষ্টার পর্য্যন্ত লাইন খুলিয়া আরোহী নেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। প্রথম গাড়ী চালাইবার সময়ে ডিউক অব ওয়েলিংটন, মিঃ হাস্কিসন প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন।

১৮৪৪ সনে পার্লিয়ামেণ্টের এক আইনে স্থিরীকৃত হয় যে যাত্রিদের ভাড়া মাইল প্রতি ১ পেনি মাত্র নিতে হইবে। সে সময়ে ইউষ্টন হইতে লিভারপুল ২০১$\frac{1}{4}$ মাইল রাস্তা যাইতে রেলের ১১ ঘণ্টা লাগিত। এখন উহা প্রায় ৪ ঘণ্টাতে যাওয়া যায়।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

একটী অস্ত্র চিকিৎসা।

১৬৮৬ সনে রাজা চতুর্দ্দশ লুই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ফরাসী দরবারে এক হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। রাজা মলদ্বারের নিকটে বেদনা অনুভব করেন। প্রজা সাধারণের মধ্যে নানারূপ আলোচনা হইতে লাগিল। ক্রমে প্রকাশ হইল—রাজা অর্শ রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। অশ্বলোমের পরিবর্ত্তে পালকের গদি ব্যবহার করাতে রাজা অসুস্থ হইয়াছেন বলিয়া কাহারও ২ ধারণা জন্মিল। কেহ ২ মনে করিলেন রাজার দুষ্পাচ্য আহার্য্য গ্রহণই এই রোগের কারণ।

বস্তুতঃ রাজা মলদ্বারের নিকটে একটী স্ফোটক হওয়াতেই কষ্ট পাইতে ছিলেন। ইহাকেই ভগন্দর (Fistula-in-ans) বলা হয়।

রাজ পরিবারের এক মহিলা ঐ স্থানে এক প্রলেপ লাগাইয়া দিলেন। কিন্তু ৫ দিন পরে যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়াতে উহা তুলিয়া ফেলিতে হইল। স্ফোটক হওয়ার ২০ দিন পরে স্থির হইল যে পুঁজ বাহির করিয়া দিতে হইবে। বর্ত্তমান পল্লিগ্রামের চিকিৎসার মত অস্ত্র না করিয়া কষ্টিকদ্বারা পোড়াইয়া স্ফোটক বিদারণ করা স্থির হইল। ইহাতে ছিদ্র হইয়া পুঁজ নিসৃত হইতে লাগিল।

যখন রাজার ভগন্দর হইয়াছে প্রকাশ পাইল, তখন স্ত্রী পুরুষ সকলেই রাজাকে আরোগ্য করিবার জন্য নিজ২ ঔষধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

একজন স্ত্রীলোক আসিয়া বলিলেন যে বোরবোনের (Bourbon) জলে এই রোগ আরোগ্য হয়। তৎক্ষণাৎ ৪জন ভগন্দরের রোগীকে তথায় পাঠান হইল। তাহারা তথায় কোনই ফল না পাইয়া চলিয়া আসিল। এইরূপ কেহ মলম কেহ প্রলেপ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সে সময়ে বহু ভগন্দরের রোগী আনিয়া সর্ব্বপ্রধান ডাক্তার (ডাঃ ফেলিক্স) নানারূপ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে একবৎসর অতীত হইল কিন্তু একটী রোগীও আরোগ্য লাভ করিল না।

পরামর্শের জন্য বিখ্যাত চিকিৎসক সার্জ্জন বেসাএরকে (Surgeon Bessiers) আনা হইল। তিনি বলিলেন অস্ত্রোপচার ভিন্ন ইহার অন্য কোন চিকিৎসা নাই।

তখন অস্ত্র করা হইবে কি অন্য কোন উপায়ে ইহা বিদীর্ণ করা হইবে সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইল।

রাজার সম্মুখে ডাক্তারদের নিজ ২ মতের আলোচনা হইতে লাগিল। অতঃপর রাজা প্রধান চিকিৎসক ডাঃ ফেলিক্সের (Felix) অভিমতে অস্ত্র করাইতে রাজি হইলেন।

ডাঃ ফেলিক্স যদিও চিকিৎসা শাস্ত্রে ভগন্দর সম্বন্ধে যাহা ছিল সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি নিজ হস্তে

এই অস্ত্র কখন করেন নাই। তিনি অভিজ্ঞতালাভের জন্য হাসপাতালের সমস্ত ভগন্দর রোগী অস্ত্র করিবার অনুমতি পাইলেন। সে সময়ে মিঃ গেলেন এই অস্ত্র করিবার জন্য একটী অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন।

ডাঃ ফেলিক্স এই অস্ত্র পরিবর্ত্তিত করাইয়া "রাজকীয় অস্ত্র" নামে একটী নূতন অস্ত্র প্রস্তুত করাইলেন।

১৬৮৮ সনের ১৮ই নবেম্বর রাজাকে অস্ত্রটী প্রদর্শন করাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া বহু আড়ম্বরের সহিত অস্ত্র করা শেষ হইল।

অতঃপর পারিষদগণের মধ্যে প্রায় ৩০ জন তাহাদের ভগন্দর হইয়াছে মনে করিয়া রাজকীয় অস্ত্রোপচারের জন্য ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু চিকিৎসকগণ তাহাদের অনেককে অস্ত্র করিবার কোন প্রয়োজন নাই বলাতে তাঁহারা অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হইলেন.

বহু চেষ্টায় ১৬৮৭ সনের ১১ই জানুয়ারী—অস্ত্রকরার ৫৪ দিন পরে রাজা আরোগ্যলাভ করিলেন।

ইহার পরে চিকিৎসক বিদায়ের পালা। এই চিকিৎসায় যে অর্থ ব্যয় হইয়াছিল তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ডাঃ ফেলিক্স পাইলেন ৩০০০০০ মুদ্রা, প্রচুর ভূসম্পত্তি এবং বিবিধ উপাধি।

ডাঃ ডেকুইন ১০০০০০ মুদ্রা,
ডাঃ কেনন ৮০০০০ „
ডাঃ বেসাএর ৪০০০০ „

এবং অপর ৪জন সহকারী প্রত্যেকে ১২০০০ মুদ্রা পাইলেন।

এই চিকিৎসা সম্বন্ধে এত বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ায় এক উদ্দেশ্য এই যে ভগন্দর চিকিৎসার বর্ত্তমান প্রণালী রাজা চতুর্দ্দশ লুইর সময়েই প্রথম আবিষ্কার করা হইয়াছিল। কাজেই তাহার ইতিহাস অন্ততঃ চিকিৎসকদের অবশ্য জ্ঞাতব্য।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

শাসন।

চৈত্র মাস। পাহাড়ের গায় তখনও আধ সুপ্তির ন্যায় কুহেলির আবরণ খানি লাগিয়া রহিয়াছে। শীতের প্রকোপ কিছু কমিয়াছে বটে কিন্তু আমরা বাঙ্গালীদের জমাট রক্ত তখনও গলে নাই। আমরা লেপ মুড়ি দেই সন্ধ্যার পূর্ব্বে, আর তাহা ছাড়ি পরদিন নয়টায়, নির্জ্জন শৈল নির্ব্বাসনে এ একটা মহাশান্তি। এই শৈলনগর সুলতানপুরে আমরা সম অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী মোটে তিনজন; আমি অর্থাৎ শ্রীনির্ম্মলেন্দু রায় L. M. S., দ্বিতীয় অতুল গুপ্ত, চসমা মণ্ডিত রসরাজ শিরোমণি, গভর্ণমেণ্ট আফিসের ৬০৲ টাকা বেতনভোগী কর্ম্মচারী, তৃতীয়টী হচ্ছে আমাদের বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী, মাথায় আঠার আঙ্গুল লম্বা চৈতন, অল্পভাষী, নিরাক্রিশূন্য, যা কেন না বল নীরবে সহ্য করিবে। চায়ের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি,—দিনরাতে তিনবার সন্ধ্যা করে—আমি বলি সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন; অতুল বলে ভূত ভয়াপন্ন; নইলে নিত্য নিত্য একই বুলি এমন করিয়া আওড়াইতে পারে? অতুল তাহার নাম দিয়াছিল "সার্-ভূম" (সার্ব্বভৌম)। সে অতুলের সহকর্ম্মী। থাক্ যা বলিতেছিলাম।

চৈত্রমাস। সেদিন গুড্ফ্রাইডের বন্ধ। সাহেবদের মহলে একটা স্ফূর্ত্তির জোয়ার বহিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, "একটা কিছু কর্‌লে হয় না অতুল, এমন দিনটা বৃথা যাবে?"

অতুল সোল্লাসে বলিল, "হয় না কি? নিশ্চয় করতে হবে—সাহেবরা আমোদ করবে আর আমরা এম্নি এম্নি বসে থাক্‌ব, কেন আমরা কি ভেসে এসেছি?"

বৈদ্যনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি বল বৈদ্যনাথ?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "আমার আর আপত্তি কি—তবে তোমরা অখাদ্য টখাদ্য খাওত আমায় ছেড়ে দাও ভাই।"

অতুল মুখ সিট্‌কাইয়া বলিল, "আরে রাম রাম, ওকি কথা সার্‌ভূম। আমরা কি অখাদ্য খাই? ছি ছি।"

আমি বলিলাম, 'আমরা যা' খাই তুমি যদি তা না খাও, তবে তোমার জন্য না হয় অন্য বন্দোবস্ত কর্‌ব।"

অতুল বলিল, "হ্যাঁ, তোমার জন্য পুলিপিঠের ব্যবস্থা করা যাবে। তবে ত হল?"

বৈদ্যনাথ হাসিয়া বলিল, "শোন, নির্ম্মল শোন, এখনি অতুল আরম্ভ করে দিলে।"

অতুল বলিল, "কেন তোমার জন্য একটা বন্দোবস্ত করতে হবেত ; তবে যদি পুলিপিঠে তোমার অপছন্দ হয়ে থাকে না হয় অন্য কিছু—"

আমি বলিলাম, "থাম, অতুল থাম, এখন একটা কিছু ঠিক করে ফেল।"

তিনজনে মহা উৎসাহে প্রোগ্রাম ঠিক করিতে বসিয়া গেলাম। তখন ঠিক দ্বিপ্রহর। সহসা রাস্তায় একটি গান শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিলাম। এযে বাংলা গান—যা বহুদিন শুনি নাই ;—

গান হইতেছিল—

"আমি যারে চাই তারে কোথা পাই,
খুঁজে ঠাঁই ঠাঁই ঠিকানা না পাই।"

কি মর্ম্মস্পর্শী বেদনা ভরা করুণ সঙ্গীত! অনেক দিন পরে দেশের প্রাণ ভরা গান শুনিলাম।

অতুল বলিল, "বেশ গলাত, ওকে আমাদের প্রোগ্রামের ভেতর ভর্ত্তি করলে হয় না?"

আমি বৈদ্যনাথকে বলিলাম, "দেখত বৈদ্যনাথ, কে গায়?"

বৈদ্যনাথ একটা জানালা খুলিয়া বলিল "একটা বাঙ্গালী বুড়ো, ফকির বলে বোধ হচ্ছে ; ডাকব?"

আমি বলিলাম, ডাকত ভাই, ডাক ওকে।" অনেক দিন দেশের কথা শুনি নাই ; প্রাণটা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

বৈদ্যনাথ একটি মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত বৃদ্ধকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধকে দেখিয়া মনটা-যেন কেমন করিয়া উঠিল। এযে বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি, নয়নের ধারা এখনও শুষ্ক হয় নাই। সর্ব্ব অঙ্গে যেন একটা বিষাদের কালিমা ছাপিয়া উঠিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমিই গান কচ্ছিলে বুড়ো?" সে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।" অতুল কি একটা রসিকতা করিতে যাইতেছিল, আমি ইঙ্গিতে মানা করিলাম।

বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাড়ী কোথায় বুড়ো?" সে চুপ করিয়া রহিল, পরে বলিল, "বাড়ী ছিল, এখন আর নেই। বাড়ীর সঙ্গে সব তাঁকে দিয়ে এসেছি।"

অতুল জিজ্ঞাসা করিল, "কাকে?" ফকির চুপ করিয়া রহিল। দেখিলাম সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। পরে বলিল, "আমার জীবনের একটা কথা শুনবেন বাবু? এমন একটা মানুষ পাইনি, যাকে সব কথা বলে বুকের বোঝা একটু হাল্কা করে নিই ; আপনারা শুনবেন?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "শুনব বই কি বুড়ো ; তুমি বল!" সে ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল :—

"আমার বাড়ী ছিল বর্দ্ধমান জেলার দুর্গাপুর গ্রামে। ক্ষেত আমার যা ছিল তাতেই এক রকম সংসার চলে যেত। সাতটা ছেলের মধ্যে পাঁচটাকে মানুষ করে তুলেছিলুম। তারাও দুপয়সা আনত। গিন্নী বলত মাধুকে বিয়ে দিয়ে চল বৃন্দাবনে যেয়ে পড়ে থাকি। মাধু আমার বড় ছেলে। আমি বলতাম, 'সবুর কর গিন্নী, ওরা আগে ভাল করে রোজগার করতে শিখুক, নইলে বৌ এনে খাওয়াবে কি?' সে চুপ করে থাকত। তখন এক রকম সুখেই দিনগুলি যাচ্ছিল। কেবল দুঃখের মধ্যে ছিল, মেয়ের জামাইটা মানুষ হ'ল না। সব রকম নেশা করেছিল, আর তার পয়সা যোগাতে হত আমাকে, ঠিক মত খরচ না পেলে, মেয়েটার রক্ষে ছিল না।"

বৃদ্ধ একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "একটু জল দেবেন বাবু, গলাটা বড় শুকিয়ে আসছে।"

"একটু চা খাবে?"

"আজ্ঞে না, একটু জলই দিন।"

বৈদ্যনাথ একটা গ্লাশে করিয়া জল আনিয়া দিল। গলা ভিজাইয়া সে আবার বলিতে আরম্ভ করিল :—

"একদিন এমনি এক চৈত্র মাসে মাঠ হতে ফিরে এসে শুনলুম যে বড় ছেলেটার ভারী জ্বর হয়েছে। একটা অজানা আশঙ্কায় শিউরে উঠলুম ; তখন গাঁয়ে গাঁয়ে বসন্ত। তুলসী তলায় গিয়ে বল্লুম, ঠাকুর, আমার সাজান সংসার ভেঙ্গ না যেন, দেখ আমার কান্না ঠাকুরের কাছে পৌঁছিল না। একমাস সতের দিনে একে একে ছয়টা ছেলেকে ডালি দিলুম। শ্মশানে নিয়ে যাবার পর্য্যন্ত একটা লোক পেলুম না। একা সব কাজ করতে হল—বাপ হয়ে বুকের সন্তানগুলিকে পুড়ে ছাই করতে হল। তখন সব সহ্য করতে পারিতুম।"

অতুল আড়ষ্টস্বরে বলিল "থাম বুড়ো থাম, আর শুনতে চাইনে।" দেখিলাম অতুলের চক্ষু জলে ভর ভর, লোমগুলি সব খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

বৃদ্ধ বলিল, "না বাবু, এখনও শেষ হয়নি। গিন্নীর অবস্থা কি হল তাত বুঝতেই পারছেন। অনেকদিন হতেই ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল। একদিন কম্প দিয়ে জ্বর এল। তিন দিন পরে সেও তার বাছাদের অনুসরণ করল। রেখে গেল শুধু আমাকে—আর তার বুকচেরা ধন নীলমণিকে। তাকে শ্মশানে রেখে দুই বছরের শিশুকে বুকে করে ঘরে আসলুম।

"দশ বছর বুকের রক্ত জল করে তাকে বারটি বছরের করে তুল্লুম। মা মরা ছেলে কিনা তাই একটু আবদারে হয়েছিল। পাড়ার লোকে বলত 'এত আদর দিওনা সাগর, মাটী হয়ে যাবে।' আমার রাগ হত, বলতুম 'তোমাদের তাতে কি? আর আমি এমন আদরই বা কি দি—ওর কত আদর পাওয়া বাকী তাকি তোমরা বুঝতে পার না?' সকলে মুখ ভার করে চলে যেত।

"একদিন প্রতিবেশী নবীন দাস এসে বল্ল 'দেখ সাগর, ছেলেকে একটু শাসন করো। আমার গাছ ভরা পেয়ারাগুলো দল পাকিয়ে চুরি করে খেয়েছে। তুমিত কিছুই দেখ না, আবার বল্লে রাগ কর।' নবীন চলে গেল, মনে বড় দুঃখ হল। আমার বংশের কেউ কখনও কারো কিছুতে হাত দেয়নি, শেষে যাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি সেই একাজ করলে। লোকে বলে আমি আদরই দি। আচ্ছা, আজ এমন শাসন করব যে লোকে বলবে হাঁ শাসন বটে। তখনই তাকে খুঁজতে বেরলুম। সারা গাঁ খুঁজলুম, কোথাও তাকে দেখতে পেলুম না। রাগের মাত্রা খুব বাড়তে লাগল। সন্ধ্যাবেলা তাকে বাড়ী আসতে দেখে শরীর জ্বলে উঠল। চীৎকার করে বল্লুম 'হতভাগা, কোথা ছিলি এতক্ষণ?' আমার রাগ সে এই প্রথম দেখল, ভয়ে ভয়ে উত্তর করল 'খেলছিলুম বাবা।', খেলছিলি, না চুরি করছিলি—বলে ঠাস্ করে গালে এক চড় বসিয়ে দিলুম। তারপর বাইরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে কবাট দিলুম।

"তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। আকাশ মেঘে কালিবর্ণ। দূরে দামোদরের ভীষণ গর্জ্জন শুনা যাচ্ছিল। এমনি সময়ে সে একা বাইরে পড়ে রইল। এক একবার কেঁদে বলতে লাগল 'বাবা, বড় ভয় হচ্ছে; দোর খোল।' আমার পিতৃ হৃদয় কেঁদে উঠল। আবার ভাবলুম, না এখনও হয়নি। দামোদরের গর্জ্জন ক্রমেই বাড়তে লাগল। আর একবার সে কেঁদে বলল 'উঠানে জল বাবা, দোর খোল। আর কখনও করব না বাবা, বড় ভয় কচ্ছে।' আবার মিথ্যে কথা উঠানে জল! থাক বাইরে পড়ে।" মিনিট পনের আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। একি বিছানায় জল কেন? চমকে দোর খুললুম,—দেখি বাইরে একগলা জল। আমার বুকের রক্ত জমাট হয়ে গেল। ডাকলুম 'নীলু বাবা!' সাড়া নেই, শব্দ নেই; আবার চীৎকার কল্লুম 'মণি, বাবা! আমার!' সব নীরব; কেবল জলের ডাক; আর কিছুই শুনা যায় না। ঘরের চালে উঠলুম, আবার ডাকলুম 'মণি, নীলুরে আমার!' এবার শুনলুম 'এই যে বাবা, এই যে আমি।" অমনি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লুম। তারপর কি হল মনে নেই!

"যখন চক্ষু মেলে চাইলুম তখন দেখি আমি একটা ডাক্তারখানায়। দিনকুড়ি পরে ঐখান থেকে বের হয়ে মেয়ের বাড়ীরদিকে চললুম। সেখানে গিয়ে দেখি—কেউ নেই, বাড়ী ঘরের চিহ্ন মাত্র নেই, সবাই আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে। আবার নিজের বাড়ীরদিকে চললুম; সেখানে শূন্য ভিটা আমায় দেখে যেন কেঁদে উঠল। একটা থাম তখনও ছিল, সেইটা ধরে আকাশের দিকে চাইলুম। একটা আগল-হারা-বাতাস হুহু করে বয়ে গেল,—অমনি শুনলুম 'বাবা, এই যে আমি।' তন্ময় হয়ে চারিদিকে দেখলুম—কিছু নেই; কেবল একটা পিরাণ থামের গোড়ায় আটকে রয়েছে; তুলে দেখি এ যে আমার মণির পিরাণ! বুকে চেপে ধরলুম। এখনও যে এতে তার গায়ের গন্ধ লেগে রয়েছে। এই দেখুন বাবু, এখনও একে বুকে করে রেখেছি।" বৃদ্ধ স্বীয় মলিন বস্ত্রের মধ্য হইতে একটা কর্দ্দমাক্ত সাটিনের কোর্ট বাহির করিল।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল "মনে ভাবলুম এ পিরাণ তাকে পরাব; যেখানে থাকে সে, তাকে আমি খুঁজে বার করব। আর সেখানে দেরী করলুম না। সোজাসুজি কলকাতায় আসলুম। ডাক্তারখানার বাবুরা পাঁচটা টাকা দিয়েছিলেন,

তাই সম্বল। কলিকাতার গলি গলি খুঁজলুম কিন্তু তাকেত পেলুম না। তার পর একদিন গাড়ী চেপে বসলুম। দুই দিন পরে একটা ইষ্টিশনে একজন আমার কাছে টিকিট চাইল, মনে হল টিকিট করিনি। তাকে সব বল্লুম। সে হুঙ্কার করে উঠ্‌ল; কত মিনতি করলুম, কিছুতেই শুন্‌লনা। শেষে বলে 'সঙ্গে কিছু আছে? আমার রাগ হল, বল্লুম, জেলে যাব, তবু ঘুষ দেব না, কিছু পাবে না তুমি যাও।" 'তবে চল বেটা' বলে সে আমাকে ইষ্টিশন মাষ্টারের কাছে নিয়ে গেল। মাষ্টার বাবুকে সব বল্লুম, তাঁর দয়ার শরীর, তিনি ছেড়ে দিলেন। তারপর আবার গাড়ীতে উঠলুম। কাল এখানে এসেছি। আমি পাহাড়ের গায়ে উচু জায়গাও খুঁজে দেখ্‌ব—তাকে পাই কি না। আমার মনে হয় তাকে একদিন নিশ্চয় পাব।"

বৈদ্যনাথ ভাঙ্গা গলায় বলিল "নিশ্চয় পাবে বুড়ো, নিশ্চয় পাবে। এমন বুক ভরা স্নেহ কি ব্যর্থ হবে? তুমি নিশ্চয় তাকে পাবে।"

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

সন্ধ্যা-সাধ।

সন্ধ্যারাণী নেমে আসে
অতি ধীরে মৃদু শ্বাসে,
হেমন্তের দিবা শেষে
স্তবধ ধরণী বাসে!
নিথর বিটপী লতা,
নিথর সে নীলাম্বর,
আনন্দে হাসিতে চায়
নবমীর সুধাকর!
মোর শুধু সাধ যায়
দলি বাধা ব্যবধান,
একবার দেখে আসি
আমারি প্রাণের প্রাণ!

২

সেথা কি নামে নি সন্ধ্যা,
সেথা কি ফুটেনি চাঁদ,
সেথা কি রচে নি কেহ
মিলনের প্রেম ফাঁদ?
হোক্ না সে দেবপুরী,
হোক না সে বহুদূর,—
সেথা কি পশে না কভু
প্রাণের করুণ সুর?
মোর শুধু সাধ যায়
একবার—একবার—
নীরবে গোপনে তার
নিয়ে আসি সমাচার!

৩

মধুর সন্ধ্যায় হেন
আমার সে প্রিয়জন,
কি করিছে—কি ভাবিছে—
নিরখিতে আকিঞ্চন!
বুঝিবে না, চিনিবে না,
সে মোর পাবে না দেখা,
আমি শুধু চুপে চুপে
তাহারে হেরিব একা!
পশিব তাহার বুকে,
পশিব তাহার দেহে,
অভিষিক্তা করে দিব
কেবলি আকুল স্নেহে!
সন্ধ্যার অঞ্চল তলে
লুকাইয়ে আপনায়,
খেলিব সমীর হয়ে
অলকে সে অলকায়!
চাঁদ হয়ে চেয়ে রব,
ঢেলে দিব সুধা ধার,
হাজার কিরণ করে
আলিঙ্গিব অনিবার!
ফুল হয়ে গন্ধ দিব,
পাখী হয়ে গাব গান,—
চুমিব আকাশ হয়ে
পলে পলে ও বয়ান!

৫

কোমল হৃদয়ে তার
কভু বা স্মৃতির বেশে,
পশিব আপনা হারা
বুক ভরা ভালবেসে!
কি কথা তাহার মনে
পড়িতেছে অনুক্ষণ,
কি সাধ কি আশা জাগে
পূর্ণ তায় কোন জন?
তেমতি তেমতি হায়,
অতুলন প্রেম তার,
বহে কি দাসের পানে
নিরখিব একবার!

৬

নিঝুম সন্ধ্যায় আজি
নিঝুম গগন তলে,
এমনি যে কত সাধ
উথলিছে অশ্রুজলে!
মরমে গুঞ্জরে তান
শতদলে বদ্ধ অলি,—
ফুটিতে—ছুটিতে নারে,
মরমে মরিছে জ্বলি!
কোথায় ধ্যানের দেবী,
কোথায় জীবন প্রিয়া,
সন্ধ্যার আঁধারে শুধু
আঁধারে লুটায় হিয়া!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গ্রন্থ সমালোচনা।

'আটীয়া পরগণার ইতিহাস—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৌলিক প্রণীত, মূল্য পাঁচ আনা।

প্রত্যেকেই সমান শক্তি ও সম্বল লইয়া কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। যাহার শক্তি ও সম্বল সামান্য তাহার পক্ষে ক্ষুদ্র পরিসর স্থানেই শক্তির সম্যক্ পরিচালনা করা উচিৎ। ইহাতে যেমনি তাহার শক্তি ব্যর্থতা না আনিয়া সাফল্য প্রদান করে, তেমনি শক্তির পরিচালন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াও জীবনে বৃহত্তর সফলতার জয়শ্রী আনয়ণ করে। গ্রন্থকার এই জেলার বার্দ্ধিষ্ণু আটীয়া পরগণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার উদ্যম বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এই গ্রন্থে আটীয় পরগণার একটা ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়। আমরা শুনিয়াছি সুলেখক শ্রীযুক্ত রাসকচন্দ্র বসু আটীয়ার জমিদার মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে আটীয়ার একখানা বিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়ণ করিতেছেন। কতদিনে তাহা আমাদের নয়নের প্রীতিবর্দ্ধন করিবে? একই স্থানের ইতিবৃত্ত যত প্রকাশিত হয়, ততই আমাদের ইতিহাস প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপে একই স্থানের ইতিহাস অনেকেই লিখিয়াছেন ইহা তাহাদের অকৃত্রিম ইতিহাস প্রীতিরই পরিচায়ক। ক্ষুদ্র হইলেও পুস্তকখানা সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থে ভুল না আছে এমন নয়, তবে দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্যই ইহাকে নির্ভুল দেখিতে পাইব।

নদীয়ার চন্দ্র গ্রহণ—শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ তত্বনিধি প্রণীত।

এই গ্রন্থে শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসের করুণ-কাহিনী কবিতাকারে বর্ণিত হইয়াছে। নন্দকুলচন্দ্রের সন্ধান মানসে নবদ্বীপচন্দ্রের সন্ন্যাস ব্রতের কাহিনী শ্রবণে এদেশের নরনারীর নয়ন অশ্রুজলে আপ্লুত হয়। বাংলার জল বায়ু আলোর সঙ্গে নিমাই সন্ন্যাসের করুণগাথা যেন মিশিয়া আছে। এখনও পল্লীর সেই নিভৃত কুটীরে নিমাই সন্ন্যাসের কাহিনী গীত হইলে প্রত্যেক নরনারী নিমাইকে তাহাদের নিকট আত্মীয় মনে করিয়া শোকাভিভূত হয়। কবিভূষণ মহাশয় এই পুরাতন করুণ কাহিনী অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আশাকরি করুণরসাস্বাদকারী করুণার্দ্র হৃদয় বাঙ্গালী এই করুণকাহিনী পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন।

শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী।

ময়মনসিংহ সিটিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত দ্বারা মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সৌরভ

ষষ্ঠ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩২৫। | ৭ম সংখ্যা।

জ্যোতিস্তত্ত্বের ইতিহাসে ভারতীয় জ্যোতিষের স্থান।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এ ক্ষেত্রে করিতে চাই। কিম্বদন্তী আছে, যে এই বিদ্যার সাহায্যে ভারতীয় আর্য্যগণ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালের নির্ভুল তত্ত্ব গণিয়া বলিয়া দিতে পারিতেন। বর্ত্তমান সভ্যজগতের নিকট ইহা অতিরঞ্জিত উপন্যাস বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু কিম্বদন্তীর কথা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক সূর্য্য সিদ্ধান্ত এবং আধুনিক সিদ্ধান্ত রহস্য ও সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি গণিত জ্যোতিষের গ্রন্থনিচয় জ্যোতিষ মন্দিরের অমূল্য রত্নস্বরূপ। কথিত আছে যে "সূর্য্যাংসপুরুষ ময় নামক দৈত্যকে এক সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন"। তাই ইহার নাম হইল সূর্য্যসিদ্ধান্ত। সুতরাং সূর্য্যসিদ্ধান্ত একটী "দৈব" গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতে ভারতীয় জ্যোতিষের প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় জ্যোতিষের অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এ বিষয়ে সহসা কোন মন্তব্য-প্রকাশ করা সহজ নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত খণ্ডাসমূহ (tables) বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখিত গণনা প্রণালী এখনও প্রায় অক্ষুণ্ণভাবে ও সূক্ষ্মরূপে আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে।

প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিদেশীয়গণের কি মত [illegible] আলোচনা করা যাউক। সুপ্রসিদ্ধ "এন সাই[illegible]" লিখিত হইয়াছে—

"প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিস্তত্ত্বের ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা এখনও আমাদের নিকট একটী কৌতূহলোদ্দীপক সমস্যা বলিয়াই বোধ হয়। এবিষয়ে বহুতর মীমাংসা (discussion) হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সন্দেহ সম্যক অপনোদিত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রাচীনত্ব ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থকার যে জ্বলন্ত বর্ণনা (glowing description) প্রদান করিয়াছেন তাহা সপ্রমাণ করিবার বা খণ্ডাইবার এমন কিছু নাই যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। সম্ভবতঃ ইহাদের বর্ণনার ভিত্তি অনেকটা অনুমানের উপরই স্থাপিত হইয়া থাকিবে। ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা যে যে প্রণালীতে গ্রহণ গণনা করিয়া থাকেন এবং যে উপায়ে জ্যোতিষ্কগণের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন তাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এক খানা ভারতীয় জ্যোতিষ গ্রন্থও লিপিবদ্ধ করাইয়াছি। এই গ্রন্থ মতে আকাশস্থ ঘটনাবলী যথাযথ সময়েই সংঘটিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং বিজ্ঞানে বিশেষ উন্নতিলাভ না করিয়াই ভারতীয় আর্য্যগণ এরূপ উৎকৃষ্ট গণনাপ্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন একথা সর্ব্বথা অসম্ভব। কিন্তু এসম্বন্ধে একটী সন্দেহমূলক প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া উঠা সুকঠিন। কখন এবং কোন সূত্রে এই গনণা প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল? যে জাতি এই গণনা প্রণালী অর্থ না বুঝিয়া কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিয়া থাকেন ইহা কি সেই জাতিরই আবিষ্কৃত না অন্য কোন অপরিজ্ঞাত সূত্রে ঐ দেশে নীত হইয়াছিল। কেহ কেহ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানের মাতৃভূমি ও বাল্যক্রীড়ার রঙ্গস্থল। সুতরাং জ্যোতিষ

সম্বন্ধে কথাই থাকিতে পারে না। সম্ভবতঃ স্মরণাতীত কাল হইতেই ঐ বিদ্যার চর্চ্চা ভারতে হইয়া আসিতেছে। আবার অন্য একদল পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে পাইথাগোরাস্ (খৃঃ পূঃ ৬০০) যখন ভারতে ভ্রমণ করিতে যান তখন তিনি গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানের কিছু কিছু তথ্য তথায় রাখিয়া আসেন। আর তৃতীয় পক্ষের মত এই যে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে আরবগণ এই বিদ্যা ভারতে নিয়া যান এবং সুবুদ্ধি ব্রাহ্মণেরা কৃতিত্বের সহিত তাহাদের নিজেদের মতের সঙ্গে আরবদিগের মত মিলাইয়া একটা নূতন রকমের জ্যোতির্বিজ্ঞান গঠন করিয়া তুলেন। ইহাতে যে ব্রাহ্মণগণের বাহাদুরি আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

যাহা হউক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বহুদূর হইতেই ভারতীয় জ্যোতিষের সুনাম শুনিয়া ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাই ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গ্রহণ গণনায় ভারতীয় প্রণালী ও খণ্ডাসমূহ ইউরোপে নিয়া যাইতে ত্রুটি করেন নাই। চতুর্দ্দশ লুইর (Luis XIV) দূত লেলোবার (La Laubere) কতক দিন শ্যামরাজ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম এক প্রস্থ খণ্ডা (tables) ইউরোপে লইয়া যান। এই খণ্ডাগুলি প্যারিস্ মানমন্দিরের তদানিন্তন অধ্যক্ষ কেসিনি সাহেবের হস্তে সমর্পিত হয়। কিন্তু ভারতীয় জ্যোতিষের দুর্ব্বোধ্যতা নিবন্ধন প্রথমে তিনি ইহাতে দন্তস্ফুটই করিতে পারেন নাই। দীর্ঘকাল অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া কি প্রণালীতে ঐ খণ্ডাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই খণ্ডাগুলি পরীক্ষা করিয়া কেসিনি বলিয়াছেন যে ভারতীয় পণ্ডিতেরা দুই প্রকারে বর্ষ গণনা করিতেন বলিয়া তাহার মনে হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রকারের বর্ষের মান ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৫০ মিনিট ৪ সেকেণ্ড এবং দ্বিতীয় প্রকারের বর্ষের মান ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড। তাহার মতে ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষমানে ১ মিনিট ১৫ সেকেণ্ড বেশী ধরা হইয়াছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে "এই খণ্ডাগুলির সাহায্যে সূর্য্য ও চন্দ্রের শর বা বিক্ষেপ (latitude) এবং দ্রাঘাংশ (longitude) অতি সুক্ষ্মরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায়। যে পর্য্যবেক্ষণ অনুসারে এই খণ্ডাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা অতি প্রাচীন কালের বলিয়া মনে হয়। ইহার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতে অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক করে না। ঐ খণ্ডাগুলিই তাহার প্রমাণ যোগাইয়া থাকে। আর টলেমীর খণ্ডাগুলি হইতে এই খণ্ডাসমূহ উৎকৃষ্টতর"।

এই খণ্ডাগুলি পরীক্ষা করিয়া কেসিনি জানিতে পারিয়াছেন যে ১৯ বৎসর বা ২৩৫ চান্দ্রমাস অবলম্বনে চন্দ্রের গতি ভারতে গণিত হইত। সুতরাং ইহারা অনুমান করেন যে মিটনের চক্র শ্যাম, চীন ও ভারতে পরিজ্ঞাত ছিল। এস্থলে বলিয়া রাখা সঙ্গত যে মিটন খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৪৩৩ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পৌনঃপুনিক চক্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিটনের চক্র কেলডিয়ান (বেবিলোনিয়ান) চার্টের উপর সংস্থাপিত। তিনি ঐ তালিকার গণিতশাস্ত্র সঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিথ্যাদি সাধন করিয়াছেন। সুতরাং তাহার গণনা সম্পূর্ণ মৌলিক বলিতে পারা যায় না। তবে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান প্রশংসনীয়।

চীনদেশীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা ১০ ও ১২ বৎসরের চক্র ব্যবহার করিতেন। অথবা এই দুইএর সংমিশ্রণে উদ্ভূত ৬০ ষষ্ঠী বৎসরের চক্রও ব্যবহার করিতেন। ১০ ও ১২ এই দুইটী সংখ্যার লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক ৬০। সুতরাং ভারতীয় জ্যোতিষ চীনদেশ হইতে আগত, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্তটীও ভ্রমাত্মক।

আর এক প্রস্থ খণ্ডা প্রায় ১৭৫০ খ্রীঃ পাদরি ডিউচাম্প কর্ত্তৃক (Father Du Champ) ডি লিসলের (DeLisle) নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ইহারা সংখ্যায় ১৫টী। এইগুলি কর্ণাট রাজ্যের অন্তর্গত কৃষ্ণাবোরাম নামক স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহগণের সমমাধ্যমিক (mean) গতি গণিতে পারা যায়। এই খণ্ডাগুলি ১৪৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ্চ তারিখের সূর্য্যোদয় হইতে গণিত হইয়াছে। এই সময়ে একটী সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল।

তৃতীয় আর এক দফা পাদরি পেটোনিলেট (Father Patonillet) ডিলিসলের নিকটই প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন স্থানের নাম উল্লেখ নাই। কিন্তু ১৬°১৬'

অক্ষাংশের জন্য ইহা গণিত হইয়াছিল। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই বা ১৮ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যরাত্রি হইতে ইহার গণন আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ তখনও একটী গ্রহণ হইয়াছিল।

চতুর্থ ও সর্ব্বশেষ দফা একাডেমি অব সায়েন্সের কার্য্য বিবরণীতে (Memoir of the Academy of Science) প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ লিজেণ্টিল শুক্র কর্ত্তৃক সূর্য্যের উপগ্রহণ* দেখিবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন। করমণ্ডল উপকূলে তির্ভেলোর নামক সহরে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, ঐ ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই উক্ত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ ঐ খণ্ডাগুলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কতকটা অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও ফরাসী পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে পূর্ব্বে ইউরোপে যে সকল খণ্ডা ব্যবহৃত হইত তাহার সঙ্গে এই খণ্ডাগুলির সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এই খণ্ডাগুলির একটা বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ইহা খৃঃ পূ ৩১০২ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সমস্যা এই যে, যে তারিখ হইতে ঐ শেষোক্ত খণ্ডাসমূহের গণনা আরম্ভ হইয়াছে তাহা কি সত্য না কাল্পনিক? খৃষ্টের জন্মের ৩১০২ বৎসর পূর্ব্বে আকাশের অবস্থা কি প্রকৃতই ঐ খণ্ডার লিখিত মত ছিল, না পশ্চাদিকে গণিয়া ঐ সব পাওয়া গিয়াছে? ফরাসী পণ্ডিত বেইলি (Bailly) আধুনিক খণ্ডা সমূহের সঙ্গে ঐ খণ্ডা সমূহের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহেরই কারণ নাই এবং সন্দেহ উপস্থিত হইলেও প্রমাণের অভাব নাই। ইংরেজ জ্যোতির্ব্বিদ অধ্যাপক প্লেফেয়ার (Playfair) সাহেব ও বেইলির মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বের পরিবর্ত্তন হওয়ায় চন্দ্রের গতিরও একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বেইলি বলিতেছেন যে ঐ পরিবর্ত্তিত গতির সংশোধন করিয়া গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে আধুনিক খণ্ডার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় খণ্ডা সমূহের বেশ মিল আছে। যথার্থ পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত এই প্রকার গণনার সূক্ষ্মতা প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

এইত গেল ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের প্রাচীনত্বের কথা। এখন আর একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে এই খণ্ডাগুলি কি আরবদেশ হইতে ভারতে নীত হইয়াছিল না গ্রীস দেশ হইতে ভারতবাসীগণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেইলি গ্রীক আরব ও ভারতীয় খণ্ডা সমূহ গ্রহণ করিয়া পৃথক পরীক্ষা করেন। পশ্চাৎদিকে গণনা করিয়া দেখেন যে ঐ সময়ে (খৃ, পু, ৩১০২ অব্দের ১৭ই ব ১৮ই ফেব্রুয়ারীর মধ্য রাত্রিতে) ভারতীয় খণ্ডানুসারে চন্দ্রের রাশ্যাংস (longitude) যত হয়* টলেমীর খণ্ডানুসারে গণিলে তাহা হইতে প্রায় ১১° ৫২′ ৭″ বেশী পাওয়া যায়। আর সমরখণ্ড হইতে প্রাপ্ত উলুবেগের (১৪৩৭ খৃষ্টাব্দের) খণ্ডানুসারে গনিলে চন্দ্রের রাশ্যাংশ ৬০ বেশী হয়। এই প্রকার গণনাও অন্যান্য পরীক্ষার সাহায্যে মিঃ বেইলি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান মৌলিক। ইহা কাহারও নিকট হইতে ধার করিয়া লওয়া হয় নাই। সুতরাং প্রথম স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। ক্রান্তিবৃত্তের অবনতা, অয়নবিন্দুর মৃদুগতি এবং অন্যান্য উপায়েও গণনা এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত সুধু গণনার উপর নির্ভর করিয়া এই প্রকারের খণ্ডা নির্ম্মাণ করিতে পারা যাইত না। গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধির যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা ধরিয়া গণনা করিলেও একই ফল দাঁড়াইয়া থাকে।

ইহাতেও কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের সন্দেহ দূর হইল না, সুতরাং জবরদস্তি করিয়াই (arbitrarily) ইহারা বলিতেছেন যে হয়ত ভারতবাসিগণ আরবদিগের জ্যামিতি জ্যোতিষ ও যন্ত্রাদির সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। নিজেদের অত্যাশ্চর্য্য গণনা প্রণালীর সাহায্যে পশ্চাৎদিকে গণিয়া যে দিন সূর্য্যের সঙ্গে অন্যান্য গ্রহ এক নক্ষত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন (in Conjunction) সেই দিন স্থির করিয়া খৃঃ পু, ৩১০২অব্দ পাইয়াছেন। তাহারা আরও বলিতেছেন যে "ব্রাহ্মণগণের গণনা প্রণালীও অতি জটিল। তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যোগ, বিয়োগ, হরণ, পূরণ ও লঘুকরণ

* Transit of Venus.

* ৩০৬ ডিগ্রী।

ইত্যাদির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহারা এই প্রণালী মনে রাখিবার জন্য গান (এবং শ্লোক ?) কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। সুমিষ্ট গুণনের নামতা বা খণ্ডা গুলিই ইহার প্রমাণ। ব্রাহ্মণগণের গুণনের নামতা পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের নামতা অপেক্ষা: সুমিষ্ট অথচ আরামপদ। যাহা হউক ব্রাহ্মণগণের এই গণনা প্রণালী মান্ধাতার আমলের হইলেও অতি সহজ ও সরল ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার যথেষ্ট অধঃপতন ঘটিয়াছে। কেন না এখন ভারতীয় পণ্ডিতেরা অন্ধের ন্যায় ঐ খণ্ডা সমূহ অনুসরণ করিয়া থাকেন—প্রণালী ও সিদ্ধান্ত সব ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহাদের জ্যোতিষ দ্বারায় বর্ত্তমান ইউরোপীয় জ্যোতিষের কোন প্রকার উন্নতিই সাধিত হইতেছে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্যই মধ্যে মধ্যে ভারতীয় জ্যোতিষের প্রাচীনগ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন।”

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত ট্রিনিটি কলেজের আরবি ও পারস্য ভাষার অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ রেনল্ড এ, নাইকলসন আরব, পারস্য ও ভারতের এক একখানা প্রাচীন ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে আরব দেশে তখন গণিত জ্যোতিষের সঙ্গে সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষের ও চর্চ্চা করা হইত।... আরবিয় গণিত জ্যোতিষ ও ভৈষজ্যের উপর তিনি ভারতীয় সভ্যতার আধিপত্য বহুল পরিমাণে দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু আরবীয় গণিত ও জ্যোতিষে নাকি গ্রীক্ সভ্যতার পদচিহ্ন তাহা হইতেও গভীরতররূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। অন্য কোনও মুসলমান ভারতীয় বিজ্ঞান, পুরাতত্ত্ব ও রীতি নীতির জ্ঞানে আবু রেহামের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।”

এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীর কথা হইতেছে। এখানে আমরা দেখিতেছি যে তখন ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান যত উন্নত ছিল আরবীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান তত উন্নত ছিল না। সুতরাং আরবীয় জ্যোতিষের নিকট ভারতীয় জ্যোতিষ মস্তক অবনত করে নাই। পক্ষান্তরে আরবীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানই ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের নিকট ঋণী। তখন আরবগণ বহুল পরিমাণে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিতেন। আরবীয় ভাষার গাত্রে ভারতীয় জ্যোতিষের পদচিহ্ন বিশ্বাস করা সঙ্গত, না অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সুষুপ্তিতে ভারতীয় জ্যোতিষের গাত্রে আরবীয় জ্যোতিষের চিহ্ন স্বপ্ন দেখা নিরাপদ কিনা, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। আর একথাও মনে রাখা উচিত যে খৃষ্টিয় ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বে আরবীয় জ্যোতিষের স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্বই ছিল না। মিঃ নাইকলসন ভারতের এবং পারস্যের পুরাতত্ত্ব লিখিতে যাইয়া জ্যোতিষ সম্বন্ধে একেবারে নির্ব্বাক রহিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে ত্রুটি বটে।

ভিনসেণ্ট স্মিথ (Vincent A. Smith) বলিতেছেন যে “মেঘাস্থিনিসের মতে ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ ও যাজ্ঞিক পুরোহিতগণ কূটতর্ক ও দর্শনশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইহাদিগকেও গণনা ঠিক হইলে পুরস্কৃত এবং মিথ্যা হইলে তিরস্কৃত বা দণ্ডগ্রস্ত হইতে হইত। অক্সফোর্ড খৃষ্ট কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক আর্থার এ মেকডোনেল বলিয়াছেন যে “হিন্দুরা জ্যোতিষ গ্রন্থের অংশ বিশেষে গণিতের আলোচনা করিতেন। ব্রাহ্মণগণ বীজগণিতে এত উন্নত হইয়াছিলেন যে গ্রীকগণ কোন কালেই ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। প্রায় ৩০০ খৃষ্টাব্দে ৫খানা সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে মাত্র সূর্য্যসিদ্ধান্তই বর্ত্তমান আছে। আর্য্যভট্ট ৪৭৬খৃঃ পাটলিপুত্রনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এই সকল সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম সংক্ষিপ্তমতে ও ব্যবহারিক প্রণালীতে (করণগ্রন্থ) লিপিবদ্ধ করেন। তিনি পৃথিবীর আহ্নিকগতি স্বীকার করিতেন। সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ অবগত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে গণিত আলোচিত হইয়াছে।”

মিঃ মেকডোনেল আরও বলিতেছেন যে ভারতীয় প্রাথমিক জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে ভারতবাসিগণের স্বাধীন চিন্তার বীজ অতি সামান্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ফিনিসিয়ানগণের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলিত। সম্ভবত এই বাণিজ্য সূত্রে ভারতবাসিগণ কেলডিয়ানগণের নিকট হইতে ২৮ অংশে চন্দ্রকক্ষ বিভক্ত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। রোমক সিদ্ধান্তের নাম শুনিয়াও বরাহমিহিরের হোরা শাস্ত্রে অনেক যাবনিক শব্দ দেখিতে পাইয়া ইনি অনুমান করেন যে ভারতীয় জ্যোতিষ উন্নত হইবার বহু পূর্ব্বে ভারতবাসীরা গ্রীকগণের নিকট

হইতে অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার মতে হোরা শব্দটী গ্রীক ভাষার একটা শব্দ।

এস্থলে মনে রাখা উচিত যে রোমক সিদ্ধান্ত ও বরাহমিহির অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অহোরাত্র শব্দটার আদ্য ও অন্ত অক্ষরদ্বয় ছাড়িয়া দিলে "হোরা" হয়। গ্রীক Hora শব্দের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

যাহা হউক মেক্‌ডোনেল অন্য একস্থানে বলিয়াছেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতবাসীগণ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে অন্যের সাহায্য ব্যতীত স্বাধীনভাবেই গ্রীকগণের অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি করিয়াছিলেন। এবং পরবর্ত্তী সময়ে পাশ্চাত্যদেশ সমূহেও তাহাদের জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। খ্রীষ্টিয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে ভারতবাসীগণ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানেও আরবীয়গণের শিক্ষক ছিলেন। তখন আরবীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা আর্য্যভট্টের গ্রন্থ, ব্রহ্মগুপ্তের অহর্গন এবং অন্যান্য কতকগুলি সিদ্ধান্ত আরবীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। আরবের খালিফাগণ তাহাদের গগণ পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগণকে পুনঃ পুনঃ বোগদাদে আহ্বান করিতেন।"

মেকডোনেলের শেষ কথা এই যে এইরূপে ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান আরবগণের মধ্য দিয়া ইউরোপে প্রবেশলাভ করে। কিন্তু বহু পুর্ব্বে ইউরোপ হইতেই এই বিদ্যা ভারতে আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহার এই সিদ্ধান্তের কোনও যুক্তিই প্রদর্শন করেন নাই। এই মত যে তাহার অন্ধ স্বদেশ প্রীতি সঞ্জাত তাহা অনেকেই স্বীকার করিতেছেন। ভারতীয় আর্য্যগণ জ্যোতিষের নাম রাখিয়াছেন বেদ-চক্ষু। সুতরাং বেদোৎপত্তির সমকালেই ভারতীয় জ্যোতিষের জন্ম হইয়াছে ইহা সুনিশ্চিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গলার সমাজ।

(৪)

ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে যে পল্লিগ্রাম লইয়াই দেশ। ইহা বাঙ্গলার পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম আমলে দেশের লোক গ্রামেই বাস করিত। সহর ও নগর তখন ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও কৃষ্ণনগর। অপর জেলার রাজধানীতে যাহারা থাকিতেন তাহারা "বাসায়" বাস করিতেন। নিজ নিজ গ্রামে তাঁহাদের "বাড়ী" ছিল। রাজকার্য্য বা ব্যবসা উপলক্ষে জেলার রাজধানী বা উপযুক্ত সহর নগরে তাঁহারা সামান্য ঘরে সামান্যভাবে বাস করিতেন; কিন্তু যাহাদের অর্থের সংস্থা ছিল তাহাদের গ্রামে ভাল বাড়ী, বাগান, পুষ্করিণী দেবালয় ইত্যাদি ছিল। ক্রিয়া কর্ম্ম উৎসব, বাড়ী যাইয়া করিতেন শিক্ষার বন্দোবস্ত এইরূপ ছিল:—নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বিক্রমপুর ইত্যাদি স্থানে বড় বড় টোল ছিল, তাহা ছাড়া অন্যান্য স্থানেও ছোট ছোট টোল ছিল। রাজভাষা অর্থাৎ আদালতের ভাষা ছিল পার্শি। সঙ্গতিশালী মুসলমান ও কায়স্থদিগের বাড়ীতে মৌলবি দ্বারা পার্শি ও আর্বি শিক্ষা দেওয়া হইত। টোলের সংস্কৃত মোকতবের আর্বি পার্শি ছিল, উচ্চ শিক্ষা। ইহা অবশ্য প্রত্যেক গ্রামে ছিল না কিন্তু প্রত্যেক গ্রামের ভদ্রলোকের বালকগণের গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষা পাইবার সুবিধা ছিল। সেখানে বালকেরা বাঙ্গলা বর্ণমালা লিখিতে ও পড়িতে শিখিত। প্রথমে উঠানের মাটিতে লিখিতে হইত, তাহার পর তাল পাতায়, তাহার পর কলা পাতায় এবং সর্ব্বশেষে কাগজে। উঠানে খড়িমাটী দিয়া, তাল পাতায় বাঁশের বা খাগের কলম দিয়া, কলা পাতায় খাগের কলম দিয়া এবং কাগজে ময়ূর বা হংস পুচ্ছের কলম দিয়া লেখা হইত। প্রথমে ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণ, পরে "সবিনয় নিবেদন" ইত্যাদি নানা প্রকার পাঠে পত্র লেখা, পরে "কস্য খত পত্র মিদং" কিম্বা "কস্য কবুলিয়ত পত্র মিদং কার্য্যঞ্চাগে ইত্যাদি দলিল লিখিতে পারিলেই ছাত্র উপযুক্ত গণ্য হইত। ইহার সঙ্গে শুভঙ্করের সাহায্যে যোগ বিয়োগ কড়াকিয়া সটকিয়া কাঠাকালী ইত্যাদি অঙ্ক শিখান হইত। এক কথায় পাঠশালায় যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা দ্বারা ছাত্র সাংসারিক সমস্ত বিষয়কার্য্যে পটু হইতে পারিত। যাহারা উচ্চ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিত তাহারা টোলে কিম্বা মোকতবায় যাইত। বর্ত্তমান সময় আমরা স্কুল ও কলেজে শিক্ষা প্রণালী দেখিতে পাই উহা প্রথমতঃ খৃষ্টান মিশনারিরা প্রবর্ত্তন করেন—পরে নানা প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া বর্ত্তমানআকার ধারণ করিয়াছে।

মিশনারিদিগের কার্য্যক্ষেত্র ছিল জেলার সদরে কিম্বা শান্তিপুর প্রভৃতির ন্যায় বড় বড় গ্রামে। কোন কোন স্থানে পল্লী গ্রামের ভদ্র সন্তানেরা অন্য উপায়ে কিছু কিছু ইংরাজি শিখিতে লাগিলেন। নীল কুঠির সাহেবদিগের মেমেরা তাহাদিগের কুঠির কর্ম্মচারিদিগকে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকদিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেন ও অবসর মত তাহাদের বালকগণকে ইংরাজি শিখাইতেন। তাঁহারা কিরূপ শিক্ষা দিতেন তাহার নমুনা দিতেছি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একটী বৃদ্ধ বলিলেন "তুমি কি পড়িতেছ?" আমি বলিলাম "ফাষ্টবুক।" আমার পড়া একটু শুনিয়া তিনি বলিলেন আমরা মেম সাহেবের নিকট অন্য রকমে ইংরাজি শিখিতাম। আমাদের মুখস্থ করিতে হইত :—

How do you do Prem Chand, are you well? Where is your brother" ইত্যাদি। ইহার মর্ম্ম এই যে নীল কুঠিয়ালদের এরূপ কতকগুলি লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল যাহাতে তাহারা সহজ ইংরাজিতে সাহেবদিগকে সামান্য সামান্য কথা বুঝাইয়া দিতে পারে। বালকেরা পণ্ডিত হইয়া ইংরাজি সাহিত্যের রস গ্রহন করিবে সে উদ্দেশ্যে তাঁহারা শিক্ষা দিতেন না। এখনও অনেক ইংরাজ এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে বলেন। তাঁহারা বলেন যে কাজ চালাইবার মত ইংরাজি শিক্ষা অধিক লোকের জন্যে প্রয়োজন। তাহার পর যাহারা উচ্চ উচ্চতর, উচ্চতম শিক্ষালাভ করিয়া ইংরাজি সাহিত্যের রস আস্বাদন করিতে চাহে তাহাদের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত হউক। আমাদের গবর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে গত (Convocation Speach) বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবার বক্তৃতায়ও তাহাই বলিয়াছেন।

ইংরাজেরা যখন দেশের শাসনভার মুসলমানদিগের নিকট হইতে লইলেন তখন প্রথমে মুসলমানদিগের প্রথায় আদালতের কার্য্য হইত। তখন আদালতের ভাষা পার্শি ছিল সুতরাং আমলা, মোক্তার উকিল ও হাকিমদিগকে ঐ ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে হইত। হিন্দুদিগের দায় ভাগের মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্যে প্রত্যেক জেলায় এক জন জজ পণ্ডিত ছিলেন। যাঁহারা সংস্কৃত ভাল জানিতেন এবং রীতিমত স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং পার্শিও জানিতেন এইরূপ পণ্ডিতকে জজ পণ্ডিতের পদ দেওয়া হইত সুতরাং এই পদ ব্রাহ্মণগণের এক চেটিয়া ছিল। কারণ টোলে ব্রাহ্মণেতর জাতিকে সংস্কৃত শিক্ষার সুবিধা দেওয়া হইত না। কোন কোন টোলে বৈদ্য ও কায়স্থদিগকে ব্যাকরণ ও কাব্য পড়ান হইত। কালে অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছিল যে অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ কোন কায়স্থের মুখে সংস্কৃত শ্লোক (দেব ভাষা) শুনিলে বিরক্ত হইতেন। ইহা আমার অনুমান নহে, বাল্যকালে, পল্লিগ্রামে নিজে ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু ইংরাজেরা এই শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া দিলেন। East India Company নামক বণিক সম্প্রদায়ের হাতে যখন এ রাজ্যের ভার পড়িল তখন প্রথমতঃ তাহারা আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধাই দেখিয়াছিলেন কিন্তু ক্রমে যখন দেশের সম্পূর্ণ শাসনভার তাঁহারা নিজের হাতে লইলেন তখন তাঁহারা স্থির করিলেন মুসলমানদিগের অনেক প্রথা ত্যাগ করিতে হইবে এবং নূতন প্রথা বানাইতে হইবে। পার্শি ভাষার পরিবর্ত্তে সেই জন্যে ইংরাজি ভাষা চলিল, সুতরাং দেশের কথিত ভাষা বাঙ্গলাও রাজদ্বারে স্থান পাইল। এই জন্যে শিক্ষা পদ্ধতি সমস্ত বদলাইয়া গেল। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা থাকিল কিন্তু আরবি পার্শি অর্থকরী বিদ্যা না থাকায় উহাদিগের অবস্থা ক্রমে হীন হইয়া পড়িল। যখন রাজপুরুষদিগের এইরূপ শাসন পদ্ধতির প্রয়োজন হইল, যখন ইংরাজিকে সরকারী ভাষা করা প্রয়োজন হইল, তখন তাঁহারা এদেশের লোক যাহাতে ইংরাজিতে শিক্ষিত হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক জেলায় উচ্চ শ্রেণীর স্কুল (Entrance or High School) স্থাপিত হইল এবং কলিকাতা, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, হুগলী প্রভৃতি স্থানে উচ্চতর শিক্ষা দিবার জন্যে কলেজ স্থাপিত হইল। এই কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট অনেক বাঙ্গালীর নিকট সাহায্য পাইয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষা বিস্তারের জন্যে যাহা করিয়াছেন সে জন্যে দেশের লোক ও ইহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বাঙ্গালীর ছেলেরা যাহাতে সহজে ইংরাজি শিখিতে পারে সে জন্যে ৺প্যারীচরণ সরকার First Book ইত্যাদি পুস্তক প্রস্তুত করিলেন। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মানসিক ও শারিরীক পরিশ্রম দ্বারা শিক্ষা বিস্তারের পথ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। আর সেই দয়ার সাগর ৺ঈশ্বরচন্দ্র কায়মনোবাক্যে

শিক্ষা বিস্তারের জন্যে কৃতসংকল্প হইলেন। যুবক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ মফস্বলের যুবকগণের—মুরব্বি--বিদ্যাসাগরের নিকট কোন যুবক চাকুরী ইত্যাদির সাহায্য পাইবার জন্যে গেলে তিনি বলিতেন যে "তুমি শিক্ষা পাইয়াছ, দেশের লোক অধিকাংশ অশিক্ষিত। তোমার কর্ত্তব্য তুমি বিনা বেতনে বা অল্প বেতনে শিক্ষকতা কার্য্য কর এবং দেশে শিক্ষার প্রচার কর।' আমি জানি অনেকে তাঁহার কথা মত অল্প বেতন লইয়া শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছেন পরে তাঁহাদের মধ্যে কেহ দেশের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইয়াছেন। যখন ইংরাজি শিক্ষা আরম্ভ হইল, স্কুল ও কলেজের সৃষ্টি হইল তখন প্রথমে তিনটি পরীক্ষা ছিল, জুনিয়ার (Junior Scholarship) শিনিয়র (Senior Scholarship) এবং লাইব্রারী (Library Examination) পরীক্ষা। তাহার পর ক্রমে, এন্‌ট্রান্স (Entrance) ও বি, এ, (Bachelor of Arts) ফাষ্ট আর্ট (First Art) তাহার পরে হয়। তখন এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া বি, এ, পরীক্ষা দিতে পারা যাইত। কোন পরীক্ষা পাশ না করিয়া স্কুলের ক্লাস হইতে কলেজ ক্লাসে পড়িবার সুবিধা ছিল। আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু (তাঁহার বয়স এখন ৭৬ বৎসর) কোন পরীক্ষা না দিয়া ঢাকা কলেজে কলেজ ক্লাসে পড়িয়াছিলেন। পরে কলিকাতায় যাইয়া হিন্দু স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পাশ করিয়া এল, এ, পরীক্ষা দেন। আমার কোন কোন আত্মীয় এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া B. A. পরীক্ষা দিয়াছিলেন। খ্যাতনামা ৺শিশিরকুমার ঘোষ এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া এল, এ পরীক্ষা না দিয়াই বি, এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এল, এ, পাশ না করিয়া B. A. পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপে দেশের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হওয়ায় বাঙ্গলার সমাজের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে "ইয়ং বেঙ্গল"দের কথা বলিয়াছি তাহারা প্রায়ই কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁহাদিগের নেতা ছিলেন ডি, রোজেরিও (D. Rozario) এবং রিচার্ডসনের (Capt. Richardson) ছাত্রেরা। ইংরাজি শিক্ষার প্রসারের সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার (Culture) আদর বাড়িতে লাগিল; আরবি, পার্শি ও সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্কোচের সহিত প্রাচ্য শিক্ষা ও সভ্যতা হেয় হইল। ইয়ং বেঙ্গলদলের ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একখানি পত্রে লক্ষ্ণৌর কোন এক ভদ্রলোককে লিখিয়াছিলেন "যদি তুলাদণ্ডে কালিদাসের সমগ্র কবিতা একদিকে রাখা হয় এবং অপরদিকে সেক্সপিয়রের একটী মাত্র কবিতা রাখা হয় তাহা হইলে যে পাত্রে কালিদাসের কবিতা রাখা হইবে তাহা উপরে উঠিয়া যাইবে।" দেশের শিক্ষিত লোকের মনেরভাব এইরূপ সুতরাং ইংরাজি শিক্ষা বাঙ্গলা সমাজে কি ভাবে কার্য্য করিয়াছে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী।

চাষার গান।

বাংলার চাষী সম্প্রদায় চিরদিনই মনের আনন্দে নিরুপদ্রব জীবন যাপন করিয়া থাকে। তাহাদের সুখ সোয়াস্তি বাহ্যিক নহে—হৃদয়ের মধ্যেই তাহারা অনাবিল আনন্দের উপলব্ধি করিয়া থাকে। সেই আনন্দ কৃষকের সারাদিন ব্যাপী অবিশ্রাম পরিশ্রমের সময় মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গীতের মিঠান ধ্বনির মাধুর্য্য আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মার্জ্জিত ভাষার গানে বা তাঁহাদের কসরতে পাই না। চাষার মেঠে সুর যখনই শুনি তখনই মনে হয় যেন 'বেওর' 'বন্ধ' হইতে এক অনাহত ধ্বনি লক্ষ্মীরাণীর আশীর্ব্বাদের মত চারিদিকের গ্রামগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। চাড়ভাঙ্গা খাটুনী, জান মারা রৌদ্র, তারদিকে দৃকপাত নাই—সেটা যেন লক্ষ্যের বিষয়ীভূতই নয়, এইভাবে ভরপুর আনন্দে সে গান ধরে—

"ও প্রাণ কানাইও,
তৈলের বাটী গামছা হাতে
চল যাই যমুনার ঘাটে,
কলসী ভাসাইয়া দিব জলে
ও প্রাণ কানাইও—

বাটীতে তৈল, কাঁধে হলদিমাখা গামছা লইয়া ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া একদিন এদেশে চরম বাবুগিরির একটা অঙ্গ ছিল। যে সে লোকে তৈলের বাটী লইয়া ঘাটে যাইত না। ঘাটে হাত পা ধুইয়া তৈল মর্দ্দনের আরাম সুখ, গানের সঙ্গে

সঙ্গে চাষার মনে পড়িল। তখন আর দুঃখ যন্ত্রণা, রৌদ্রের তাপ কিছু নাই! এমনি করিয়া সকল ভুলিয়া বঙ্গের চাষী মাঠে চাষ করে আর দেশের ভাত যোগায়।

চাষার গানের রচয়িতা লইয়া আমরা অনেক সময় গোলে পড়িয়া যাই। পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে চাষীরা যে ধরণের গান গাইত, এখন তাহা ঠিক ঠিক নাই। অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন চাষীরা "নিমিষের তরে, "সুধু সে রেখে গেছে চরণ রেখা" প্রভৃতি গান অভ্যাস করিয়াছে। সে কালে বড় জোড় গাহিত—"ভারত শ্মশান মাঝে আমিরে বিধবাবালা।" এ সকল সঙ্গীত বঙ্গের প্রথিতযশা কবিগণের রচিত এবং ভদ্রগায়ক গণের মুখ হইতে চাষীর মুখে রপ্তানী করা। আর খাঁটী চাষার গানগুলির অনেকগুলিই নিরক্ষর কবির রচিত। সুরের বাঁধনছাড়া এই সকল রচনার কোনও বাঁধাবাঁধি নাই। গানগুলিতে ভাবের প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমরা অবাক্ হই। এমন ভাব লহরী নিরক্ষর বঙ্গ শিশুগণের হৃদয় মধ্যে কি খেলাই খেলে,—ভাবিলে পুলকিত হইতে হয়। দুপুরের রৌদ্রে নিড়ি বাছিতে বাছিতে কৃষক গায়িয়া উঠিল—

"কাইল বলে গেলারে বন্ধু কত যে কাল হইল,
ও বন্ধুরে—
আর কতদিন বাকী সেই কাইলের—বন্ধু
একবার এইসে বল—বন্ধুরে।
তুমিত দূর দেশে গেছ বন্ধু—
আমি রইলাম ঘরে—বন্ধুরে—
তোমার পায়ে আমার বুকে বন্ধুরে
বান্ধা কিসের ডোরে—
যৌবন জোয়ারের পানিরে বন্ধু—ভাটা লাগলেই যাবে,
নারীর জনম মিছা হইলে বন্ধুরে—তুমিও দুঃখ পাইবে।
বন্ধুরে,—
আন্ধাইর নিশিতেরে বন্ধু—আমি তোমার মুখ দেখি
বিজাইতে মাথার বেণীরে বন্ধু ঝরে দুইটী আঁখি
বন্ধুরে!
আইস আইস প্রাণের বন্ধু, তুমি রে
জুড়াও আমার হিয়া—
অভাগিনী নারী তোমার কান্দে পথ চাইয়া—বন্ধুরে।

গানটীতে তাহার কত ভাব, কত মনের কথা, কত আকুল উচ্ছ্বাস! বঙ্গ কবির—

"কালিবলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকী।
জীবন সায়রে লাগিয়াছে ভাঁটা
যৌবন কেমনে রাখি॥"

কবিতার সহিত উপর্য্যুক্ত সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সাদৃশ্য। আমাদের এই গানটী বৃদ্ধেরাও বাল্যকালে গাইয়াছে—এমন প্রমাণ পাই। সে সময় সুদূর কলিকাতার কবির গানটী যে বঙ্গের নিরক্ষর কবি নকল করিয়াছিলেন এমন মনে না করিবারও কারণ আছে। আর একদল কৃষক গাইল—

সুবল কওরে সুবল আমার ঠাঁই,
কেমনে আছে আদরিণী রাই!
আমার তরে—বৃন্দাবনেরে সুবল
ও তার দুঃখের সীমা নাই।

কানু ছাড়া কীর্ত্তন নাই। চাষীর মাঠেই হউক, আর রাখালের গোঠেই হউক,—সর্ব্বত্রই কানু! অন্তঃপুরে বা মজলিসে সর্ব্বত্রই কানুর রাজত্ব। হিন্দু মুসলমান সকলের নিকটই কানুর সমান আদর। চাষীরা এখানে জাতির বিচার করে না। প্রাণারাম সঙ্গীতের মোহে, কানুকে লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে দ্বিধাও নাই। চাষীরা মাঠের গানে, বৈঠকী গানে, সারি গানে বা ঘাটু গানে কানুর ষোড়শ উপচারে পূজা দিয়া থাকে। কানু তখন রাজা।

চাষীরা গাইল—

কোন দেশে গেলারে পরাণ কোন্ দিকেতে গেলা,
তোমার লাগি ভাত বাইরাছি—ভাটি ধরছে বেলা রে
পরাণ,
বাগুন সিদ্ধ দিছিরে পিয়ু (প্রিয়) আর কাঁঠালের হাজি
গরম গরম খাও আইসারে পিয়ু মিছা বাড়াও বেলা॥
নতুন ননী ঘনরে মাঠা, খাওন হৈবে ভাল
আইস আইস বন্ধুরে আমি রইয়াছি একেলা॥
ভাতের উপর তেলের গো হাত মোর বুলাইছি যতনে,
মাছিয়ে বসিছে (পিয়ু) কইর না আর বেলা॥

এ সকল বিরহ বিচ্ছেদের গান ছাড়া, কত নিরিবিলি মনের কথা, চাঁদিনী নিশীথের মিলন মাধুরী, অতীত প্রেমের স্বপ্ন কাহিনী চাষীরা সেই নিঝুম রৌদ্রেপমাঠের কাজের মধ্যে বিলাইয়া দেয়—তাহার ইয়ত্তা নাই।

দুঃখ এই,—চাষীর সেই মেঠো গান, নিরক্ষর বা অতি অল্প শিক্ষিত 'সরকার' 'মোড়ল' বা 'পণ্ডিতের' সরল প্রাণের নির্ম্মল অভিব্যক্তির এখন বড় একটা কাটতি নাই। দিন দিনই মরিচার মত সেগুলি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িতেছে। একটু একটু করিয়া কৃষকের ঘরে বাবুগিরি ঢুকিতেছে—মামলা মোকদ্দমার ঘুরপেঁচ প্রবেশ করিয়াছে; বিনিময়ে সরলতা ও স্বাস্থ্য ঘাটতি পড়িতেছে। এখন আর 'ইয়া জোয়ান' কৃষক যুবক বড় দেখা যায় না। "জ্বরের দাওয়াই খাটাইর আম্বল" এখন আর চলে না। এখন ডাক্তার কবিরাজের অষুদ লাগে। এখন চাষীরা গেঞ্জি ব্যবহার করে, রেলির ছাতি মাথায় দেয়, জুতা খড়ম, মোজা কম্পার্টার, চুরট, সিগারেট, চা সব খরিদ করে। এখন আর সেই গোলগাল মুখ বিরাট পুরুষ চাষী মহাল •নাই। এখন তাহাদের চিবুক উত্তমাশা অন্তরীপের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতে 'ফ্রেঞ্চকাট' দাড়ি, চাষীর ছেলের চোখে যেন চশমাও দেখিয়াছি মনে পড়ে। অবশ্য ইহা নবীন শিক্ষার্থিগণের মধ্যে। তবে এখন ইহারা লাভবান হইতেছে কি তাহাদের বাপ দাদার লাভ বেশী ছিল, আমরা জানি না। তবে ইহা ঠিক যে তখন কৃষক পাড়ায় হাহাকার অসোয়াস্তি ছিল না। এখন আছে। তখন সন্ধ্যার পর কৃষক পল্লীতে বাঁশীর করুণ গীতি উঠিত। তাহা শুনিতে শুনিতে আমরা ঘুমাইয়া পড়িতাম। চাষীদের মধ্যে এমন ওস্তাদ বাঁশী বাজকর ছিল যে তাহাদের বাজনা শুনিয়া পশু পাখী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইত। ভীষণ বিষধর পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিত। এজন্য পল্লিজননীরা রাত্রিতে বাঁশী বাজাইতে দেন না। এমন কি শীশ দিতেও মানা করেন। রাত্রিতে 'শীশ' দিলে নাকি ঘরে সাপ যায়। এখন আর তেমন ওস্তাদী বাঁশী শুনিই না। বাঁশের বাঁশী সম্ভবতঃ লুপ্তই হইয়াছে। তাহার স্থানে নিকেলের বাঁশীর আমদানী হইয়াছে। মাটীর হাঁড়িতে রাঁধাভাত, আর পিত্তলের হাঁড়ির ভাতে যে তফাৎ,—বাঁশের বাঁশী আর নিকেলের বাঁশীতেও সেই পার্থক্য। খাঁটী সোনা—আর গিলটি! এখন চাষীরা বাঁশী বাজায় না, লাঠী খেলেনা; সেই শক্তিও নাই, সেই শান্তিও নাই। জীবন সংগ্রামে ইহাদের 'জান' যাওয়ার মত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিও নাই। দুই হাতে ঠেলিয়া যেন জীবনের দিন গুলি পায়েরদিকে ফেলিয়াদিতেছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী।

তীর্থ-যাত্রী।

(১)

দুই বৃদ্ধ কৃষক এক সময়ে জেরুজালেম্ তীর্থ দর্শন করিতে মনস্থ করিয়াছিল। একজনের নাম এফিম্, অপরের নাম এলিসা। এফিম্ বেশ সঙ্গতিপন্ন কিন্তু এলিসার অবস্থা তত ভাল ছিল না।

এফিম্ স্থির, ধীর ও বুদ্ধিমান। সে কখনও মদ কিম্বা তামাক খায় নাই; এমন কি নস্য পর্য্যন্ত ব্যবহার করে নাই। কাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা অথবা কটু বাক্য বলা তাহার অভ্যাস নয়। জীবনে সে কখনও অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করে নাই।

এলিসা ধনী না হলেও তার কোন অভাব নাই। পূর্ব্বে সে সূত্রধরের কাজ করিত। এখন সে বৃদ্ধ হইয়াছে তাই ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া সে বাড়ীতে থাকিয়া মৌমাছির চাষ করে। তাহার একছেলে কাজের অন্বেষণে বিদেশে গিয়াছে। আর একটী ছেলে বাড়ীতেই আছে। এলিসা অতিশয় দয়ালু, আর সর্ব্বদাই সে প্রফুল্ল। এক সময়ে তাহার মদ্য পানের অভ্যাস ছিল। নস্য ব্যবহার করিত এবং তাহার সঙ্গীতে অতিশয় অনুরক্তি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে খুব শান্তি প্রিয় লোক। নিজ পরিবারের লোকের সহিত তাহার বেশ মনের মিল আছে। প্রতিবেশীদিগের সহিতও বেশ সদ্ভাব। এলিসা দেখিতে একটু খর্ব্বাকৃতি। তাহার মস্তক একেবারে কেশ শূন্য।

বহুদিন হইল দুই বৃদ্ধ এক সঙ্গে জেরুজালেম তীর্থ দর্শনের সংকল্প করিয়াছিল। কিন্তু এফিমের কিছুতেই সুযোগ হইয়া উঠিতেছে না। তাহার এত কাজ যে একটা শেষ করিতে না করিতেই আর একটীতে হাত দিতে হয়। প্রথমতঃ পুত্রের বিবাহের জন্য তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইল, এর পর কনিষ্ঠ পুত্র সৈনিক বিভাগ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় কতকদিন গেল, তারপরই তাহাকে একখানা নূতন ঘর নির্ম্মাণ করিতে হইল।

একদিন একপর্ব্ব উপলক্ষে দুই বৃদ্ধের সাক্ষাৎ হইল। এফিমের গৃহের সম্মুখবর্ত্তী একখানি কাষ্ঠ খণ্ডে উভয়ে উপবেশন করিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এলিসা কহিল—

"আচ্ছা, ভাই কবে আমরা তীর্থে যাত্রা করব?" এফিম্ একটু মুখ বিকৃত করিয়া কহিল—"আমাদের আরও কিছু কাল অপেক্ষা করতে হবে। এবার আমার পক্ষে বড়ই দুর্ব্বৎসর। এই ঘরটা যখন আরম্ভ করি তখন মনে করেছিলাম একশত 'রুবলে' কাজ শেষ করতে পারব, এখন পর্য্যন্ত তিনশত রুবল খরচ করে বসেছি। তবু কাজ শেষ হল না।

এলিসা কহিল—আমার মনে হয় আর দেরী করা ঠিক নয়। এই বসন্তকালই উপযুক্ত সময়।

'তা' বটে, কিন্তু আমার ঘরটা শেষ না করে কিরূপে যাই?

তোমার কি দেখ্‌বার আর লোক নাই? ছেলেই ত আছে!

"আমার বড় ছেলেকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না, জানত তার একটু পান দোষ আছে।"

"বটে! আচ্ছা ভাই আমরা মরে গেলে ত ওরাই সব করবে। এখন থেকেই তোমার ছেলেকে একটু শিখায়ে তুলনা।"

"তা ঠিক বলেছ তবে যে, যে কাজটা আরম্ভ করে সে তার শেষ দেখতেও ইচ্ছা করে।"

"বতই কেন বলনা ভাই, আমাদের যা কর্ত্তব্য তা কিছুতেই সমাধা করে যেতে পারব না।" এফিমের ললাটে চিন্তার রেখাপাত হইল। সে কহিল,—আমি এই ঘরে বহু অর্থ খরচ করে ফেলেছি; খালি হাতে কি করে তীর্থে যাই। অন্ততঃ একশত রুবলের প্রয়োজন। এবড় সামান্য কথা নয়!

এলিসা হাসিয়া কহিল,— "এ সকল কথা এখন রাখ। আমার দশগুণ অর্থ তোমার আছে তবু তুমি চিন্তা করছ। আমার হাতে এক 'রুব্‌লও' নাই, তবু আমি মনে করছি যথেষ্ট অর্থ মিল্‌বে। এখন বল কবে যাবে।" এফিম একটু হাসিয়া কহিল—হা ভাই আগে জানতাম না তুমি এতই ধনী হয়েছ। তুমি কোথায় এত অর্থ পাবে?

এলিসা—"আমার দশটা মৌ'চাক বেচে ফেল্‌ব। আমার প্রতিবেশী মৌচাক কিনবার জন্ত ব্যস্ত।"

এফিম্—"এই চাকগুলিতে ভাল মধু হ'লে শেষে অনুতাপ করবে।"

এলিসা—"নিজের পাপ কাজ ছাড়া অন্ত কিছুর জন্তই অনুতাপ করা আমার অভ্যাস নয়। আত্মার চেয়ে মূল্যবান্ আর কি আছে!

এফিম্—"তা' বটে; কিন্তু বাড়ীর কাজ কর্ম্ম উপেক্ষা করাও ঠিক নয়।

এলিসা একটু উত্তেজিত হইয়া কহিল,—"আমরা যে আমাদের আত্মার উন্নতি উপেক্ষা করছি! ইহা যে অতি গুরু অপরাধ। আমরা তীর্থে যাব বলে শপথ করেছি! আর দেরী করা উচিত নয়। এখন দিন ঠিক করে চল।

(২)

একদিন প্রাতে এফিম,—এলিসার নিকট আসিয়া কহিল,—"ভাই তোমার কথাই ঠিক, আর দেরী করা যায় না। জন্ম মৃত্যু ভগবানের হাতে। এখনই আমরা যাত্রা করব, শরীরে বল থাকতে তীর্থে যাওয়াই উচিত।"

এক সপ্তাহ মধ্যেই দুই বৃদ্ধ প্রস্তুত হইল। এফিমের টাকার অভাব ছিলনা। সে একশত রুবল সঙ্গে লইল এবং দুইশত রুবল তাহার স্ত্রীর হাতে রাখিয়া গেল। এলিসা তাহার প্রতিবেশীর নিকট দশটা মৌচাক বিক্রয় করিয়া সত্তর রুবল পাইল আর তাহার স্ত্রী ও পুত্র বধুর হাতে যাহা কিছু ছিল সবই এফিসাকে দিল।

এফিম যাবার সময় তাহার স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল বিষয় উপদেশ দিয়া গেল। এলিসা ছেলেকে ডেকে বলিল—"যখন যাহা ভাল মনে কর তাই করো। আর তার স্ত্রীকে কহিল-"আমি যে দশটী মৌচাক প্রতিবেশীর নিকট বেচেছি তাতে কখনও হাত দিও না।" তারপর আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া দুই বৃদ্ধ যাত্রা করিল। এলিসার প্রাণে আর আনন্দ ধরে না। গ্রামের সীমা অতিক্রম করিবা মাত্রই এলিসা বাড়ীর কথা একবারে ভুলিয়া গেল। কিরূপে তাহার সঙ্গীকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবে, অন্যের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে, কিরূপে নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌছিবে, নির্ব্বিঘ্নে পুনরায় বাড়ী ফিরিয়া আসিবে—এই তাহার একমাত্র চিন্তা হইল। কখন এলিসা প্রার্থনা করিতেছে, কখন বা সাধু পুরুষদিগের জীবন চরিত মনে মনে আবৃত্তি করিতেছে। সংসারের চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার মনে প্রবেশ করিতে পারিতেছেনা।

এফিমও বেশ প্রশান্তভাবে পথ চলিতে লাগিল। তাহার মুখে কোন অনাবশ্যক কথা নাই, তাহার আচরণে কোন ক্রটী নাই। কিন্তু তাহার মনে মোটেই স্ফূর্ত্তি ছিল না। সংসারের চিন্তায় তাহার হৃদয় ভরাক্রান্ত। তাহার ছেলে কি তাহার উপদেশ মত কাজ করিবে? ছেলেকে একথাটা বলা হয় নাই, ঐ কাজটার কথা বলা উচিত ছিল ইত্যাদি নানা বিষয় ভাবিয়া এফিম সর্ব্বদা মনে অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। মাঠে আলু খেতে কৃষকদের কাজ করিতে দেখিয়া তাহার চিন্তা হইল—তাহার ছেলেকি এদের মত কাজ করিতেছে? এক একবার তার মনে হইতেছিল বুঝি ছেলেরা সব নষ্ট করিতেছে। এইরূপ সংসারের নিদারুণ চিন্তা তা'র অন্তরে সর্ব্বদা দংশন করিতে লাগিল।

দুই বৃদ্ধ অবিশ্রান্ত হাটিয়া পথ চলিতে লাগিল। হাটিতে হাটিতে তাহাদের গৃহ-নির্ম্মিত গাছের ছালের জুতা একবারে ছিড়িয়া গেল। রুসিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে পৌছিয়া তাহারা নূতন জুতা কিনিয়া লইল। এই প্রদেশের অধিবাসীরা অতিশয় অতিথি-সেবা-পরায়ণ। বাড়ী হইতে যাত্রা করবার পর এতদিন সকল জিনিসই তাহাদের ক্রয় করিয়া লইতে হইয়াছে কিন্তু এই স্থানের অধিবাসীরা তাহাদিগকে অতিথি সৎকার করিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল। কোন জিনিষের জন্যই তাহাদের অর্থ ব্যয় করিতে হইল না। গৃহস্বামীরা পথে খাইবার জন্যও রুটি এবং পিঠা দিয়া তাহাদের থাল পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিল।

পাঁচশত মাইল তাহারা বিনা ব্যয়ে অতিক্রম করিল। কিন্তু ইহার পরই তাহারা ভীষণ দুর্ভিক্ষ পীড়িত এক জনপদে আসিয়া উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব বৎসর তথায় মোটেই ফসল হয় নাই। কাহারও ঘরে খাদ্য নাই। ধনীরা কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, মধ্যবিত্ত লোকদের অবস্থা শোচনীয়। দরিদ্রেরা যে পারিতেছে দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে, আর সব লতাপাতা খাইয়া কোন রকমে প্রাণ রক্ষা করিতেছে।

এফিম্ বেশ বলিষ্ঠ এবং কষ্ট সহিষ্ণু ছিল। পথ ভ্রমণে তাহার সহজে ক্লান্তি বোধ হইত না। এলিসা কিছুতেই তাহার সহিত হাটিয়া কুলাইতে পাইতেছিল না। সেদিন আট ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াই এলিসা অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িল। আর কিছুতেই সে চলিতে পারিল না। সে এফিমকে কহিল,—"ভাই, তৃষ্ণায় প্রাণ যায়, জল না খেয়ে আর এক পা চল্‌তে পারছি না। এফিম্ কহিল—"আচ্ছা তুমি জল খেয়ে নেও; আমার একটুও পিপাসা হয় নাই।"

এলিসা—তুমি চল্‌তে থাক। ঐ যে ঘরখানা দেখা যাচ্ছে সেখান হ'তে জল খেয়ে আমি তোমাকে এসে ধরব।

"আচ্ছা, তুমি জল খেয়ে এস—" এফিম এই বলিয়া একা পথ চলিতে লাগিল। এলিসা সেই কুটিরের দিকে অগ্রসর হইল।

(৩)

একখানি ক্ষুদ্র ঘর; চারিদিকে মাটির প্রাচীর, তার উপর চূণকাম করা। ঘরখানা জীর্ণ। মাটির প্রাচীর স্থানে স্থানে খসিয়া পড়িয়াছে। দীর্ঘকাল উহার সংস্কার করা হয় নাই। চালা হইতে খড়ও খুলিয়া পড়িতেছে। ঘরের সম্মুখে ক্ষুদ্র একটী আঙ্গিনা। আঙ্গিনাটীও মাটীর প্রাচীরে ঘেরা। এলিসা আঙ্গিনার প্রবেশ দ্বারে দেখিতে পাইল একটী পুরুষ মাটিতে শুইয়া আছে। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর কিরণ তাহার মুখের উপর পতিত হইয়াছে। লোকটী নিদ্রিত বলিয়া তাহার বোধ হইল না। এলিসা তাহাকে ডাকিয়া জল প্রার্থনা করিল। কিন্তু সে কোনই সাড়া দিলনা। এলিসা কোন উত্তর না পাইয়া মনে করিল, লোকটা হয় পীড়িত না হয় অতিশয় নিষ্ঠুর। এলিসা ফটকের নিকট গেল। তখন কুটিরের মধ্য হইতে একটী শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। এলিসা ফটকের দরজার কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়িল। কিন্তু কেহই শব্দ করিল না।

"ভিতরে কে আছেন?" কোন উত্তর নাই।

এলিসা চীৎকার করিয়া অনেক ডাকিল কিন্তু কেহ সাড়া দিল না। তখন সে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প করিল। এমন সময়ে হঠাৎ ঘরের ভিতর হইতে একটা গোঁ গোঁ শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল। সে মনে করিল—"হয়ত গৃহস্বামী কোন প্রকারে বিপদগ্রস্ত! আমার না দেখে যাওয়া উচিত নয়"।

কুটীরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল না; এলিসা ধাক্কা দিবামাত্র খুলিয়া গেল। কুটিরের দ্বার উন্মুক্তই ছিল। সে সভয়ে, অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করিল; ভিতরে গিয়া দেখিল উহার বামদিকে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত উনন, উহার নিকটে একটী যীশুর মূর্ত্তি। তাহার সম্মুখে একখানা টেবিল। টেবিলের পাশে একখানা বেঞ্চ। বেঞ্চের উপর একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া উপবিষ্টা। তাহার নিকটে একটী শীর্ণ বালক। বালকটী বৃদ্ধার জামা ধরিয়া টানিয়া কি কহিতেছিল আর আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল। ঘরের বদ্ধ বায়ু অতিশয় দুর্গন্ধময়। এলিসা ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। উননের নিকটে মাটিতে শায়িতা একটী স্ত্রীলোক তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্ত্রীলোকটীর নয়ন মুদ্রিত, মেঝেতে পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছে; হস্ত ও পদ কখন প্রসারিত, কখন বা সঙ্কুচিত করিতেছে। তাহার গলার ভিতর হইতে এক অস্পষ্ট গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইতেছে। স্ত্রীলোকটী সংজ্ঞাহীন!

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী অপরিচিত আগন্তুকের উপর করুণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কিজন্য এসেছেন? কি চান? আমাদের দিবার কিছুই নাই।

এলিসা কহিল "আমি একটু জল খেতে চাই।"

"এখানে জল নাই, জল আনবার পাত্রও নাই। আপনি যেতে পারেন।"

এলিসা তখন বিস্মিত হইয়া কহিল—"আচ্ছা এই স্ত্রীলোকটীর কি অসুখ হয়েছে? ও'কে শুশ্রূষা করবার কি কেহ এখানে নাই?"

"আমাদের কেহই নাই। দেখছেন ত আমার পুত্রটী বাহিরে আধমরা হয়ে আছে, পুত্রবধুটীও যায়। আমরা সকলই মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি।

ক্ষুদ্র ছেলেটী আগন্তুককে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য ক্রন্দন বন্ধ করিয়াছিল এখন আবার চীৎকার আরম্ভ করিল—"দিদি মা, রুটি দাও! রুটি দাও"! এলিসা বৃদ্ধাকে ইহাদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিতেছিল এমন সময় অলিন্দে শায়িত পুরুষটী অতি কষ্টে দেওয়ালে ভর দিয়া কুটিরে প্রবেশ করিল; সেখানে আসিয়াই মেঝের উপর পড়িয়া গেল। এলিসার দিকে কাতর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সে অস্পষ্টস্বরে কহিল,—"না খেয়ে বেরামে.........প্রাণ যায়।" ছেলেটীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সে এলিসার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

এলিসা তাড়াতাড়ি তাহার থলিটী বেঞ্চের উপর রাখিল। ক্ষিপ্রহস্তে তাহা হইতে একটী রুটি বাহির করিল এবং একটুকরা রুটী কাটিয়া সে মৃতপ্রায় গৃহস্বামীর মুখের নিকট ধরিল। গৃহস্বামী খাইল না। সঙ্কেত করিয়া বালক ও উননের পশ্চাতে শায়িতা একটী স্ত্রীলোক ও ক্ষুদ্র বালিকাকে দেখাইয়া দিল। এলিসা বালকের সম্মুখে একখানা রুটির টুক্‌রা ধরিল। বালক তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দু'খানি প্রসারিত করিয়া অতি আগ্রহের সহিত উহা গ্রহণ করিল এবং তৎক্ষণাৎ কামড়াইয়া খাইতে আরম্ভ করিল। মেঝের উপর শায়িতা ক্ষুদ্র বালিকাটী নির্নিমেষ নয়নে রুটির টুকরাটীর দিকে তাকাইয়া রহিল। এলিসা তাহাকেও এক টুকরা রুটি দিল। তারপর এলিসা থলি হইতে আরও রুটি বাহির করিয়া ক্ষুধায় মৃতপ্রায় ব্যক্তিদিগকে আহার করাইল এবং নিকটবর্ত্তী কূপ হইতে জল আনিয়া তাহাদের কণ্ঠ শীতল করিল।

এলিসার আর তখন যাওয়া হইল না। সে তাড়াতাড়ি বাজারে গিয়া আহার্য্য দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিল। কাষ্ঠ সংগ্রহ করিল এবং নিজেই রান্না করিয়া সকলকে আহার করাইল।

একটু সুস্থ হইয়া গৃহস্বামী ও তাহার মাতা সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী এলিসার নিকট তাহাদের ভীষণ দুঃখের কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। তাহাদের শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া এলিসার হৃদয় একবারে গলিয়া গেল। সে তখন তাহার সহযাত্রীকে সেদিন ধরিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিল। দুর্ভিক্ষ পীড়িত পরিবারের সেবা শুশ্রূষায় এলিসা সে রাত্র অতিবাহিত করিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া এলিসা সমস্ত গৃহকার্য্য সম্পাদন করিল; সে ঠিক যেন আপন বাড়ীতেই আছে। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীর সাহায্যে রুটী প্রস্তুত করিল। তারপর বাজারে গিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সকলই কিনিয়া আনিল। খাদ্যাভাবে ইহারা বাসনপত্র কাপড় চোপড় সব বিক্রয়

করিয়াছিল। এলিসা একটী একটী করিয়া সকল অভাব পূরণ করিতে লাগিল।

(৪)

প্রথমে একদিন, তারপর দুইদিন, ক্রমে তিন দিন গেল। অভাব আর পূরণ হয় না। বালক বালিকা দুইটী এখন বেশ সবল হইয়াছে, মাতা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীও কাজকর্ম্ম করিতে পারে, ও এখন উঠিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ কিন্তু তাহার স্ত্রী এখনও শয্যা হইতে উঠিতে পারিতেছে না।

এলিসা মনে ভাবিল, "অনেকগুলি দিন কাটাইয়াছি আর এখানে থাকা চলে না। কাল আমাকে যাইতেই হইবে।" পরদিন একটা পর্ব্ব ছিল, সেদিনও এলিসার যাওয়া হইল না। সে ভোরে উঠিয়া বাজারে গেল। বাজার হইতে নানাবিধ উপাদেয় প্রচুর খাদ্য সামগ্রী কিনিয়া আনিল। দুপুর বেলায় সকলে মিলিয়া মহানন্দে আহার করিল। উৎসবের কোলাহলে দীনের কুটির মুখরিত হইল।

এই কৃষক পরিবার যখন অর্থাভাবে অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহারা তাহাদের জমি জমা সব গ্রামের একধনী ব্যক্তির নিকট রেহেমাবদ্ধ রাখিয়া টাকা ধার করিয়াছিল। এই জমি ছাড়া তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য উপায় নাই। উৎসবের দিন এলিসা আহারান্তে সেই মহাজনের বাড়ীতে গিয়া একটা ফসলের জন্য সেই জমিগুলি ফিরিয়া চাহিল। নিষ্ঠুর মহাজন কোন প্রকার দয়া প্রদর্শন করিল না। সে সম্পূর্ণ টাকা না পাইয়া জমি ছাড়িতে রাজি হইল না। সন্ধ্যার সময় এলিসা ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ম্লান মুখে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এলিসার চিন্তা হইল,—এই অসহায় দীন পরিবারের উপায় কি হইবে? আমি যাইবা মাত্রই ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। সেই দিনও এলিসার যাওয়া হইল না। সে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া রাত্রি ঘুমাইতে গেল। সারা রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না।

সে শুইয়া ভাবিতে লাগিল,—"এ বিপদের কূল কিনারা কই? অনেক সময় নষ্ট করিয়েছি, অনেক অর্থব্যয় করিয়েছি তবু কোন ফল হল না।"

ভাবিতে ভাবিতে সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার স্থির করিল কাল সকালে চলিয়া যাইবে, আবার ভাবিল চলিয়া গেলে এদের কি উপায় হবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অনেক রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। ভোর হইবার পূর্ব্বে তাহার একটু তন্দ্রা হইল। তন্দ্রাবশে সে স্বপ্ন দেখিল যেন সে তীর্থে যাবার জন্য বাহির হইয়াছে। হঠাৎ তাহার থলেটী বেড়ায় আট্‌কে গেল, তাহা ছাড়াইতে না ছাড়াইতেই তাহার পা-বন্ধ যেন কিসে জড়াইয়া গেল। থলি ছাড়াইতে গিয়া সে দেখিল উহা বেড়ায় আটকায় নাই। গৃহস্থের ছোট বালিকাটী ধরিয়া রাখিয়াছে, আর সে কাঁদিয়া বলিতেছে "রুটি দাও, রুটি দাও; ক্ষুধায় প্রাণ যায়!" আবার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল ক্ষুদ্র বালকটী তাহার পা-বন্ধ ধরিয়া রাখিয়াছে। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল গৃহস্বামী ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী জানালা দিয়া তাহার প্রতি নির্ণিমেষ নয়নে কাতর ভাবে চাহিয়া রহিয়াছে।

সহসা এলিসার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। সে জাগিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল, ভাবিয়া স্থির করিল,—"কাল আমি নিশ্চয়ই এদের জমি উদ্ধার করে দিব, ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য একটা গাই, চাষের জন্য দুটা ঘোড়া ও শস্য আনবার জন্য একটা গাড়ী আর খেতের ফসল না হওয়া পর্য্যন্ত খাবার ময়দা কিনে রেখে যাব। যদি তা না করি তবে আমার তীর্থ যাত্রা বৃথা। আমি সমুদ্র পার হয়ে অন্তরে ভগবানের দর্শনলাভ করতে যাচ্ছি কিন্তু আমার অন্তরে যে ভগবান বাস করছেন আমি তাঁকে চিরদিনের জন্য হারাইতে চাচ্ছি।"

এলিসা পর দিন তাহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিল। কৃষি কার্য্যের সাজ সরঞ্জাম সব ক্রয় করিয়া আনিল, টাকা দিয়া জমি উদ্ধার করিয়া দিল।

সে দিন রাত্রে যখন সকল নিদ্রিত, তখন এলিসা উঠিয়া তাহার থলেটী স্কন্ধে লইল, পা-বন্ধ পরিধান করিল জুতা পায় দিল এবং কোটটী গায় দিয়া নীরবে সে এফিমের অনুসরণে বাহির হইয়া গেল।

এলিসা যখন তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গেল। তখন পূর্ব্বাকাশে প্রভাত রবির লোহিত রশ্মি ফুটিয়া উঠিল। সে একটী গাছের তলায় বসিয়া তাহার

থলেটী খুলিল। মুদ্রাগুলি গণিয়া দেখিল মাত্র সতের কখন কুড়ি কোপেক অবশিষ্ট আছে। সে ভাবিল "এই সামান্য সম্বল লইয়া সাগর পার হইয়া যাওয়া যায় না। আর ভিক্ষা করিয়া তীর্থে যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াই ভাল। বন্ধু এফিম একাই জেরুজালেম যেতে পারবে। সে নিশ্চয়ই গির্জার আমার নামে একটা প্রদীপ জ্বা ইয়া দিবে। আর এ জীবনে আমার তীর্থে যাওয়া হবে না।

এলিসা উঠিয়া থলেটী স্কন্ধে স্থাপন করিল; তারপর বাড়ীর দিকে চলিল। সে গৃহে পৌছিলে সকলই তাহাকে দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। কি হইয়াছে জানিবার জন্য সকলই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। সে সংক্ষেপে কহিল—'আমি তীর্থে যাই, ভগবানের ইচ্ছা নয়। পথে নানা দুর্ঘটনায় আমার অর্থ খোয়া গেছে। আর হাটিতে না পারায় এফিমের অনেক পাছে পড়িয়া গেছিলাম। তাই ফিরিয়া আসিয়াছি, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।

তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়া এলিসা পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে দেখিয়া পাড়ার অনেকই তাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া গালি দিল। সে কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় সাংসারিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

(৫)

এলিসা যখন জল পান করিবার জন্য কুটিরেরদিকে গমন করিল তখন এফিম কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাহার জন্য একটি বৃক্ষের ছায়ায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার একটু ঘুম পাইল, সে একটু শুইল। যখন সে ঘুম হইতে উঠিল তখন সূর্য্য পশ্চিমাকাশে অস্তাচলে গমন করিতেছে। তখনও এলিসার কোন খবরই নাই। সে অবাক্ হইল। মনে করিল এলিসা বোধ হয় তাহাকে না দেখিয়া অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

এফিম প্রবল বেগে ছুটিল। পথে যাহাকে পাইল তাহাকেই সে এলিসার কথা জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু কেহই কোন সংবাদ দিতে পারিল না। সে রাত্রি গেল, পরদিন গেল, তবু এলিসার দেখা পাইল না। "এফিম মনে করিল ওডেসা বন্দরে অথবা জাহাজে নিশ্চয়ই দেখা হইবে। কিন্তু বন্দরেও কিম্বা জাহাজেও এলিসার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, তখন নিরূপায় হইয়া এফিম্ একাই জাহাজে আরোহণ করিয়া জেরুজালেমে যাত্রা করিল।

যথাসময়ে বহুসংখ্যক যাত্রীসহ জেরুজেলমের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে জাহাজ আসিয়া অবতীর্ণ হইল। যাত্রীগণ পরমোৎসাহে, প্রফুল্ল-মুখে পবিত্র ভূমিতে অবতরণ করিল। তারপর দলে দলে নরনারীগণ যীশুর পুণ্য স্মৃতি, গৌরবপূত স্থানসমূহ দর্শন করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিতে লাগিল। মন্দিরে মন্দিরে লোকের ভিড়, পথে বিপুল জনতা, কাহার আগে কে প্রার্থনা শুনিতে দাঁড়াইবে সেইজন্য সকলই ব্যস্ত।

যে মন্দিরে যীশুর পবিত্র সমাধি অবস্থিত তাহারি ধারে গিয়া এফিম দাঁড়াইল। তাহার সম্মুখে অনেক লোক। মন্দিরের ভিতরে সমাধির উপর ছয়ত্রিশটী প্রদীপ জ্বলিতেছে; তথায় এফিম যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বড়ই বিস্ময় জন্মিল।

মন্দিরের উজ্জ্বল দীপালোকে সে দেখিল একটী বৃদ্ধ ভগবান্ যীশুর সমাধির নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার গায় সাদা জামা, মস্তক কেশহীন, দেখিতে ঠিক এলিসার মত। এফিম ভাবিল, "এই ব্যক্তি কি এলিসা? না;" এলিসা হ'তে পারে না। এলিসা আমার আগে আস্‌বে কিরূপে? আমরা যে জাহাজে আসিয়াছি তার ঠিক এক সপ্তাহ আগে আর একখানি জাহাজ ছেড়েছে, সে জাহাজ এলিসা ধরতেই পারে না। আর আমি যে জাহাজে এসেছি তাহাতেত এলিস ছিল না। আমি সব যাত্রীকেই ভাল করে দেখেছি।

এফিম যখন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন সেই বৃদ্ধ জোড়করে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল, এবং সমবেত যাত্রীবৃন্দকে অভিবাদন করিবার জন্য একবার সে ফিরিল তখন এফিম্ স্পষ্ট এলিসাকে চিনিতে পারিল। সেই কৃষ্ণকুঞ্চিত শ্মশ্রু, সেই কৃষ্ণ ভ্রুযুগল, সেই নাসিকা, সেই চক্ষু—এ ব্যক্তি এলিসা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। এলিসাকে পাইয়া এফেম বড়ই আহ্লাদিত হইল। কিন্তু কিরূপে এলিসা তাহার আগে আসিল সেই চিন্তা তার মন হইতে দূর হইল না।

এলিসা কিরূপে এই বিপুল জনতা অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাগ্রে সমাধির নিকট গেল। সে তাই চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিয়া স্থির করিল নিশ্চয়ই কেহ তাকে কোন গুপ্ত পথ দেখায়ে দিয়েছে। এলিস যখন বাহির হয়ে আসবে তখন তাকে ধরব। সে আমাকেও সকলের আগে যাবার পথ দেখায়ে দিবে।

এলিসাকে আবার হারাইয়া ফেলিবে ভয়ে এফিম তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিল; কিন্তু যখন প্রার্থনা শেষ হইল যীশুর সমাধি চুম্বন করিবার জন্য ভক্তি ব্যাকুল চিত্ত যাত্রীগণ মন্দিরাভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিল তখন এফিম সকলের পাছে পড়িয়া গেল। তাহার মুদ্রার থলে চুরি যাওয়ার ভয়ে সে লোকের ভিড়ে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। মুদ্রার থলে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সে উর্দ্ধশ্বাসে বাহির হইয়া আসিল। যখন জনতা কমিল তখন এফিম এলিসাকে অনেক খুঁজিল কিন্তু তাহার আর দেখা পাইল না।

পরদিনও এফিম সমাধি মন্দিরে গমন করিল। সেদিনও সে দেখিতে পাইল সমাধির সন্নিকটে ভক্তি বিহ্বল হৃদয়ে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সর্ব্বাগ্রে এলিসা উপবিষ্ট। এফিম মনে ভাবিল "আজ কিছুতেই এলিসাকে হারাব না।" সে সজোরে মন্দিরাভ্যন্তরে অগ্রসর হইতে লাগিল কিন্তু যখন সম্মুখবর্ত্তী হইল তখন আর সে এলিসাকে দেখিতে পাইল না। সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তৃতীয় দিবসও সে এলিসাকে মন্দিরে ঠিক সেই স্থানে দেখিতে পাইল কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না সে যে কোন পথ দিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়ে এফিম্ ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

এফিম ছয় সপ্তাহ কাল জেরুজেলামে অবস্থিতি করিয়া পবিত্র স্থান সকল দর্শন করিল। পাথেয় মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া সে সকল অর্থ তীর্থ ক্ষেত্রে গরিব দুঃখীকে দান করিল। তার পর একদিন যে পথ দিয়া সে জেরুজালেম গিয়াছিল সেই পথ দিয়াই দেশে যাত্রা করিল। জর্ডানের এক বোতল পবিত্র জল ও সমাধিমন্দিরের দগ্ধাবশিষ্ট চর্ব্বির বাতি সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইতে ভুলিল না।

যে স্থানে এলিসার সহিত এফিমের ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল একদিন সন্ধ্যার সময় সে ঠিক সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সে রাত্রির জন্য আশ্রয়ান্বেষণে গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। একটী ক্ষুদ্র বলিকা এফিমকে দেখিতে পাইয়া কুটির হইতে বাহির হইল এবং তাহাকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিয়া কহিল "আমাদের বাড়ীতে আসুন"। এফিম্ চলিয়া যাইবে মনে করিয়াছিল কিন্তু বালিকা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলনা। তাহার জামা ধরিয়া টানিয়া তাহাদের ঘরে লইয়া গেল।

এফিমের মনে হইল এই কুটিরেই এলিসা জল খাইতে আসিয়াছিল। এখানে তার খবর পাওয়া যাইতে পারে। গৃহে প্রবেশ করিতেই একটী স্ত্রীলোক তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। তাহার হাত মুখ ধোবার জল দিল। তার পর প্রচুর খাদ্য দ্রব্য আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল। এফিম্ স্ত্রীলোকটীকে অনেক ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটী তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—"মহাশয় আমরা তীর্থ যাত্রী পেলেই এখন বিশেষ যত্ন করি। একজন যাত্রী আমাদের নূতন জীবন দিয়েছেন। আমরা ভগবানকে ভুলেই গিয়েছিলাম, তাই আমরা অনাহারে ও রোগে মরতে পড়েছিলেম। আমাদের এক বিন্দু জল দেয় এমন কেউ ছিলনা। মৃত্যু নিশ্চিত! তখন ভগবান আপনার মত এক বুড়োকে পাঠালেন। তিনি জল খেতে এসে ছিলেন। আমাদের দর্শা দেখে তার দয়া হল। তিনি কয় দিন এখানে থেকে আমাদের আহার দিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে জীবন রক্ষা করলেন। শুধু কি তাই? তিনি নিজের টাকা দিয়ে আমাদের রেহানাবদ্ধ জমি ছাড়ায়ে দিয়েছেন, দুইটা ঘোড়া ও একটা গাড়ী কিনে রেখে গেছেন।"

ঐ স্ত্রীলোকটীর বৃদ্ধা শাশুড়ী কহিলেন বাবা "তিনি মানুষ কি দেবদূত তা আমরা এখনও বুঝতে পারি নাই। আমাদের প্রতি কত দয়া, কত ভালবাসা তিনি দেখায়েছেন কিন্তু যাবার সময় তার নামটী পর্য্যন্ত বলে যান নাই।" তারপর ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীলোক দুইটি মিলিয়া এলিসার গুণের অনেক প্রশংসা করিল।

সন্ধ্যার সময় গৃহস্বামী ফিরিয়া আসিল। সেও এলিসার বহু প্রশংসা করিল—"মহাশয় আমরা বিপদে পড়ে ভগবান্‌কে গালি দিতেছিলাম, তাঁর দয়ায়ই আমরা ভগবানকে চিনেছি। মানুষের মধ্যে যে ভগবান আছে তা এখন জেনেছি।"

রাত্রে আহারাদি শেষ করিয়া এফিম্ শুইতে গেল। কিন্তু তাহার নিদ্রা হইলনা। সে যে সমাধির নিকট উপর্য্যুপরি তিন দিন এলিসাকে দেখিয়াছে সেই কথাই বারংবার তাহার স্মরণ হইতে লাগিল। সে ভাবিল "এই বিপন্ন পরিবারের প্রতি এমন দয়া করেছে বলেই

এলিসা আমার আগে যেতে পেরেছে। আমার তীর্থ যাত্রা সফল হয়েছে কি না জানি না কিন্তু এলিসার উপর ভগবান যে সন্তুষ্ট হয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।”

পরদিন প্রভাতে এফিম সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দেশে যাত্রা করিল।

(৭)

এক বছর পর এফিম্ বাড়ীতে ফিরিল। বাড়ীতে আসিয়া সে দেখিল সকল বিষয়েই বিশৃঙ্খলা। তাহার দুশ্চরিত্র পুত্র বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াছে। সাংসারিক কার্য্যে সে একটুও মনোযোগ দেয় নাই। ক্রোধে সে পুত্রকে গালি দিল। পুত্র পিতার মুখের উপর কহিল তুমি বাড়ীতে থেকে কাজ কর্ম্ম দেখ্‌লেনা কেন? তোমার নগদ যা কিছু ছিল সবইত সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলে এখন আমার নিকট দাবী করছ কেন?”

ছেলের কথায় বুড়ার ক্রোধ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। সে তাহাকে এক ঘা বসাইয়া দিল।

অপরাহ্ণে এফিম গ্রাম্য মাতবরদের নিকট পুত্রের স্বভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করিতে গমন করিল। এলিসার বাড়ী অতিক্রম করিয়া যখন সে যায় তখন এলিসার স্ত্রী তাহাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ভাল আছেনত?

এফিম—“হাঁ! আপনার স্বামীকে কেন দেখতে পাই না। শুনেছি এলিসা নিরাপদেই বাড়ী এসেছে।”

“হাঁ তিনি অনেকদিন বাড়ী ফিরেছেন। তিনি বাড়ী আসাতে আমরা সুখী হয়েছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি বাড়ী না থাকলে কাহারো মনে স্ফূর্ত্তি থাকে না। তিনি বুড়ো হয়েছেন এখন কাজকর্ম্ম কর্ত্তে পারেন না, তবু তাকে দেখলেই সকলের আনন্দ।

“—এলিসা এখন কি বাড়ী আছে?”

“হাঁ, তিনি তার মৌমাছির দল নিয়ে ব্যস্ত। আসুন তিনি আপনাকে দেখ্‌লে ভারী সুখী হবেন।’

এফিম আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়া দেখিল—এলিসা একটা গাছের নীচে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার গায় একটা সাদা জামা, দুই হাত প্রসারিত, দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে। তাহার অনাবৃত কেশহীন মস্তক অস্তগামী সূর্য্যকিরণে সমুজ্জল হইয়াছে। এফিম তাহাকে ঠিক এই ভাবে জেরুজালেমের মন্দিরের দীপাবলীর আলোকে পবিত্র সমাধির সন্নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়াছিল।

এলিসার স্ত্রী তাহার স্বামীকে দেখাইয়া কহিল “এই যে, এখানে আপনার বন্ধু।”

এলিসা ফিরিয়া দেখিল এফিম্। সে দাঁড়ি হইতে মৌমাছিগুলি সরাইয়া সহাস্য বদনে নিকটে আসিল এবং তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “ভাই, নিরাপদে তীর্থে যেতে পেরেছিলে?”

এফিম ম্লানমুখে উত্তর করিল,—“হাঁ, আমার শরীরটা যে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই! এলিসা, তোমার জন্য জর্ডান নদীর জল এনেছি। আমার বাড়ী থেকে নিয়ে এসো।”

এলিসা—“ভাই ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে নিরাপদে ফিরতে পেরেছ। যীশু তোমার মঙ্গল করুন।”

এফিম কিছুকাল নীরবে থাকিয়া আবার বিমর্ষভাবে কহিল “আমার শরীরটা তীর্থে গিয়েছিল ভাই, মনটা বোধ হয় যায় নাই। তবে আমার বন্ধু যে যথার্থই তীর্থে গেছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই—

এলিসা তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—“তা’ ভগবানের কাজ তিনি দেখ্‌বেন।”

এফিম তখন গম্ভীরভাবে বলিল—“তুমি পথে যে কুটিরে জল খেতে গিয়েছিলে আমি ফিরার সময় সেখানে এক রাত্রি ছিলাম।”

এই কথা শুনিয়া এলিসা একটু বিচলিত হইল সে বলিল “ভগবানের কাজ তিনিই করেন। চল ঘরে যাই, তোমাকে খুব ভাল মধু দিব।”

এফিম্ নীরবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। সে আর সেই কুটিরের কথা তুলিল না। জেরুজালেমে যে এলিসাকে দেখিয়াছিল সে কথাও বলিল না। সে এখন বুঝিতে পারিল—সর্ব্বজীবে প্রেমই ভগবানের সাধনা—নর-সেবাই তাঁহার পূজা। মন নিষ্কাম ও পবিত্র না হইলে তীর্থ যাত্রার কোন ফল নাই। *

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

* টলষ্টয় হইতে অনূদিত।

বৌদিদি।

(ফাগুনে)

শীতের হিমে অবরুদ্ধ বনের সহর খানি,
মুক্ত আজি বসন্তের সে পুষ্প-রাজধানী।
মুছে গেছে পাতার চখে শিশির অশ্রুজল,
তরুতৃণে জাগ্‌ছে যেন সবুজ কুতূহল!
নাই সে এখন বক্ষ ভরা দুঃখ শোকভার,
অশোক ফুলে হাস্‌ছে যেন জয়ের অহঙ্কার!
শক্ররক্তে রাঙ্গা কেমন লাল পতাকা উড়ে,
শিমুল পলাশ নিবিড়-ঘন-শিবির-বনচূড়ে!
নানা রঙ্গীন মুকুল সঙ্গীন্ পল্লবে পল্লবে,
হাস্‌ছে যেন বসন্তের আজ বিজয় মহোৎসবে!
কোকিল করে হুলুধ্বনি জয়ধ্বনি তার,
অনীল মলয় জগতে বয়ে জয়ের সমাচার,
হরিণ লাফায় কানন কাঁপায় মহিষ ঝাঁপায় জলে,
বিলে ডোবায় পদ্ম শোভায় পল্বলে পল্বলে!
কানন রামা দয়েল শ্যামা মধুর স্বরে গায়,
অমর দেশের ভ্রমর আসে সুধার পিপাসায়!
পাতায় পাতায় তরুলতায় কেবল ফুলের সাজ,
জয়োল্লাসে কানন হাসে ফাগুন মাসে আজ!
তুমি কি গো প্রজাপতি চড়িয়ে মলয় হাওয়া
ফুল্ল মনে ফুলের বনে উড়িয়ে মধু খাওয়া?
অথবা কি দয়েল কোকিল মুকুল মুখে গাওয়া?
অমিয়চোর কিম্বা চকোর জোস্‌না জলে নাওয়া?
বুঝি না কি শশীর কোলের হরিণ চুরি যাওয়া
সরল চখে চিন্তে পেরে ফুল-বসন্তে পাওয়া?
উষার অরুণ তুষার মুছে তোমায় দেখে ভোলে;
আদরে তাই আন্‌লে দাদা প্রেমের পিঁজরা খোলে!
এস গো বসন্তলক্ষ্মী এস মোদের ঘরে,
ননন্দা আনন্দ দিয়ে তোমায় বরণ করে!
সন্ধ্যা যেন তোমার আগে অরুণ রাগে হাসে,
পুণ্য যেন পূর্ণশশী তোমার পাছে আসে!
তোমার স্নেহ ভালবাসায় আলয় যেন হয়,
বসন্তের সে পুষ্প হাস্তে সৌরভ সুধাময়।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

নেপালী দরবার।

(২)

নেপালে প্রায় সকল জিনিষই সস্তা। দুগ্ধ ঘৃতাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কলিকাতার ঘৃত ব্যবসায়ী নেপাল হইতে ঘৃত আনিয়া ব্যবসা করে। নির্ব্বাসিত নেপালী যাহারা ভারতের নানাস্থানে বাস করিতেছে তাহারা দধি, দুগ্ধ ও ঘৃতের ব্যবসায় অধিক করিয়া থাকে এবং উহারা পার্ব্বত্য প্রদেশেই বেশী থাকিতে ভালবাসে। এলাহাবাদ, মিরাট, দেরাদুন, আলমোড়া, কাশী প্রভৃতি প্রদেশে বহু নির্ব্বাসিত নেপালী দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজ পরিবারের লোকও রহিয়াছেন। ইহারা স্বদেশে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়া অবশেষে পরাজিত হইয়া কেহ বা স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করিয়াছে কেহ বা রাজাদেশে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

বহু দিন হইতেই নেপালে রাজবিপ্লব লাগিয়া আছে। উহারা স্বাধীন জাতি, যুদ্ধ প্রিয়তা তাহাদের স্বভাব, তাহারই নমুনা স্বরূপ আমরা নেপালী গুর্খাদিগকে দেখিতে পাই। রুষ জাপান যুদ্ধের সময় একখানি সাময়িক পত্রে কোন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর সকল জাতীয় সৈন্যই কখনও না কখন রণস্থলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে কিন্তু জাপানী সামুরাই এবং নেপালী গুর্খা সৈন্যেরা তাহা কখনো করে নাই। ইহা ভারতের বিশেষতঃ গুর্খাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। নেপালীদিগের মধ্যে ইহা প্রচার যে যুদ্ধে পলায়ন করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপী হইতে হয়। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে ইহাই প্রচার আছে যে, যুদ্ধে নিহত হইলে স্বর্গবাস হয়, আর পলায়ন করিলে অনন্ত নরক। যে দেশের লোকের এমনই বিশ্বাস সে দেশের লোকের উপর উপরি উক্ত মতের সত্যতা সম্বন্ধে আর সন্দিহান হওয়া যায় না।

ইংরাজী ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজদের সহিত নেপালীদের যে প্রবল যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে যে গুর্খাগণ অটল সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। সেই সাহস দেখিয়াই তদবধি ইংরেজ তাঁহাদের সেনাদের মধ্যে গুর্খাদিগকে যোগ্য স্থান দিয়া গুণগ্রাহীতার পরিচয় দিয়াছেন।

নেপাল বীর প্রসবিনী। নেপালীদের বীরত্ব নানা যুদ্ধ বিগ্রহেই দেখা গিয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের দুই একটী নেপালী আমি নেপাল গিয়া দেখিয়াছি, ইহারা যেমন বীর, ব্যবহারে তেমনই ভদ্র। হিন্দুর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা একমাত্র নেপালেই আছে। নেপালী দরবারের সহিত ইংরেজ রাজের বন্ধুতা আছে। গুর্খা সৈন্যদিগকে নেপাল দরবার ইংরেজের চাকরী করিতে আদেশ দিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু যখন নেপাল দরবারের ডাক পড়িবে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নেপাল দরবারের আদেশে চাকুরী ছাড়িয়া নেপালে চলিয়া যাইতে হইবে। আজকাল ইউরোপীয় যুদ্ধে গুর্খারা মিত্র শক্তির পক্ষে থাকিয়া যেরূপ বীরত্ব দেখাইতেছে তাহা ইতিহাসে অতুলনীয়। উহারা অনেক স্থলে দাড়াইয়া থাকিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু কখনও পলায়ন করে নাই। উহা ভারত বিশেষতঃ নেপালের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

ভারতবর্ষের লোককে বিদেশীয়েরা ভীরু, কাপুরুষ মনে করেন; কিন্তু ভারতকে এতদিন তাহারাই যে যুদ্ধ বিদ্যায় অপটু করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কেহ একবারও ভাবিয়া দেখেন না। এখনও দেখা যায় বিনা অস্ত্র সাহায্যে ভারতের লোক গভীর বন হইতে হিংস্র জন্তু ঠ্যাঙ্গাইয়া আনে, জল হইতে কুমির তাড়াইয়া বাহির করিয়া মারে। এই সকল লোককে যথারীতি অস্ত্র বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইলে তাহারাও ভারতের নাম রক্ষা করিতে পারে। যে জাতি সাহসী, যাহাদের আত্মোৎসর্গ অধিক, বিলাসিতা কম, যুদ্ধের কার্য্যে পারদর্শী তাহারাই যুদ্ধে নাম রক্ষা করিতে পারে। গুর্খাদের এ সকল গুণ সমধিক আছে। ইংরাজের অধীনে গুর্খাদিগকে আমরা দেখিতে পাই, ইংরেজ সৈন্যের ন্যায় তাহারা টানা পাখার বাতাস খায় না, গরমের দিনে সোডা লেমনেড্ বরফ খাইয়া গ্রীষ্মাতিশয় নিবারণ করে না। নেপালের জঙ্গবাহাদুর বিলাত হইতে আসিয়া দেশে বিলাতি ধরণের যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে শিখরাজ রণজিৎসিংহই ফরাসী সৈন্য রাখিয়া নিজের শিখ সৈন্য দিগকে ইউরোপীয় ধরণে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। অধুনা জঙ্গবাহাদুর তাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। গুর্খারা বড় আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন লোক; ইহারা ইংরেজের চাকরী করিয়া শেষ সময় দেশে চলিয়া যায়; কেহ কেহ বা জমি পাইয়া ইংরেজের এলাকায় বাস করিতে থাকে। গুর্খারা বীর পুরুষ: হইলেও তাহাদের স্বভাব মৃদু, উহারা স্বভাবতঃ সরল ও ধর্ম্ম ভীরু। উহারা হিন্দু, এক সময় ইহাদের জল অচল ছিল, নেপাল দরবার হইতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া জলচল হইয়াছে। অন্যান্য হিন্দুর ন্যায় ইহাদের ব্যবহার ও আচার একই মত।

সে দেশীয় প্রাচীন ইতিহাসের নাম বংশাবলী। ইহা পার্ব্বতীয় বা বাংলা হিন্দি ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থের ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ডাক্তার আজিয়েল-রাইট ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। অনুবাদ করিয়াছিলেন মুন্সী শিউশঙ্কর ও পণ্ডিত গুণানন্দ। গুর্খা রাইফেল নামক রেজিমেন্টের কাপ্তান ইডেন ভান্সি-টার্টের লিখিত "নোটস্ অব নেপাল" একখানি উৎকৃষ্ট নেপালি ইতিবৃত্ত উহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে একাধারে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই পুস্তক ছাপাইয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া আরো কতিপয় নেপাল সম্বন্ধীয় ইতিহাস বা ইতিবৃত্ত আছে। কার্ক প্যাট্রিক নামক জনৈক ইংরেজ ১৭৯৩ সালে, "নেপালে দৌত্য", ডাক্তার আমিনল্টন "নেপালের বিবরণ", ১৮১৯ অব্দে, হজসন তিব্বত ও নেপাল সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রবন্ধ, ১৮৭৬, "জঙ্গবাহাদুরের জীবন চরিত" ১৯০৯ সনে, ১৮৮০ অব্দে ডাঃ ওল্ড ফিল্ড "স্কেচেস্ অব নেপাল" ডাঃ ভগবানলাল ইন্দ্রাজী, গুজরাটী ভাষায় "নেপালী শিলালিপি", ভারতগবর্ণমেণ্ট নেপাল ও আফগান স্থানের গেজিটিয়ার প্রকাশ করেন। এতদ্ভিন্ন ৺ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় "নেপালের পুরাতত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া "নবাভারত" পত্রে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করেন। ত্রৈলোক্য বাবু উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে সময় পান নাই। আমি তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু অনুমতি পাই নাই। কাপ্তেন ভান্সিটার্টের পুস্তক হইতে জানাযায় যে ভারতগবর্ণমেণ্টের নেপাল সম্বন্ধে আর একখানি গুপ্ত রিপোর্ট আছে। রায় শরচ্চন্দ্রদাস বাহাদুর সি, আই, ই

ও ডাঃ বেণ্ডালের বৌদ্ধ গ্রন্থ তালিকায় নেপাল সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানাবার। বিশ্বকোষে নেপাল সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। কিন্তু যুদ্ধ সংবাদ তাতে প্রায় নাই।

ভারতের নানাস্থানে যেরূপ বিভিন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নেপালেও তদ্রূপ ২৪টী রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। উহাদিগকে "চৌবিশিয়া রাজ" কহিত। মধ্য ভারতেও তদ্রূপ "ছত্রিশগড়" (ছত্রিশটী রাজ্য লইয়া) ছিল। কাঠমাণ্ডু (কাষ্ঠমণ্ডপ শব্দের অপভ্রংশ) ভাটগাঁও ও কর্ত্তিপুর এই তিনটী প্রধান নগর নেপালে ছিল। উহার উত্তর পশ্চিম দিকে পর্ব্বতোপরি গুর্খানগর। ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের নাম গুর্খারাজ্য। কেহ কেহ বলেন গোরক্ষনাথের নামকরণ হইতেই এই গুর্খা নামের উৎপত্তি।

মুসলমানেরা চিত্তোর অধিকার করিলে অযুতরাম তথা হইতে পলায়ন করেন। তাঁহার দুই পুত্র খাঞ্চা ও মিঞ্চা হিমালয়ে আসিয়া ১৪৯৫ খৃঃ অব্দে ভীরকোট এলাকায় খিলমের জঙ্গল আবাদ করেন এবং নয়াকোট নামক স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই সময় দ্রব্যসাহ নামক একজন গুর্খা (১৫৫৯ খৃঃ অব্দে) গুর্খারাজ্য পত্তন করেন। ইহার বংশেই—অযুতরাম হইতে বহু পুরুষ পরে—পৃথ্বীনারায়ণের জন্ম হয়। মহারাজা পৃথ্বীনারায়ণের বীরত্বে নেপাল রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

গুর্খারাজ্যের অধিবাসী অনেকেই ক্ষত্রিয়। ঠাকুর, খসং, গরুঙ্গ, মগর প্রভৃতি নামধেয় অধিবাসীও আছে। পূর্ব্বে ইহারা বৌদ্ধ ছিল এক্ষণে প্রায় সকলেই হিন্দু হইয়াছে। একটা প্রবাদ শুনা যায়—পৃথ্বীনারায়ণ জয়প্রকাশ মল্লের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হইলে একজন নীচ জাতীয় গুর্খা তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে। তৎপর পৃথ্বীনারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে জায়গীর প্রদান ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর জল আচরণীয় করিয়া লন। পৃথ্বীনারায়ণ নেপাল অধিকার করিয়া কাঠমুণ্ডতেই গুর্খা রাজধানী স্থাপন করেন (১৭৬৮ খৃঃ অঃ।) ১৭৭১ খ্রীঃ অঃ গণ্ডকী তীরে মহাবীর পৃথ্বীনারায়ণ লীলা সম্বরণ করেন। নেপালী সম্বৎ ৮৯৫ সনে উক্ত ঘটিয়াছিল।

ইংরেজদের সঙ্গে গোলযোগ উপস্থিত হইলে নেপালরাজ সন্ধি করিয়া গড়োয়াল, শিকিম, দেরাডুন, শিমলা, আলমোড়া প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশ ইংরেজকে ছাড়িয়া দেন। চীনেরা নেপাল আক্রমণ করিলে লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় নেপালরাজ চীনের সহিত সন্ধি করেন (১৭৯২ খৃঃ অঃ)। পৃথ্বীনারায়ণ পরলোক গমন করিলে পর তদীয় পুত্র সিংহপ্রতাপ সা রাজা হন, তিনি ১৭৭৫ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার পর রণ বাহাদুর সাহ ১৭৭৮ হইতে ১৮০৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত নেপালে রাজত্ব করেন। এই সময় নেপালরাজ্য পশ্চিমে কাশ্মীর সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সময় চৌবিশিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ৪৬ ভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহারই অধীন হয়। রণ বাহাদুর সাহ ত্রিহুতের একজন বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। উহার গর্ভে নির্ব্বানযুধ বিক্রম জন্মগ্রহণ করেন, পরে তিনিই রাজা হইয়াছিলেন।

একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে রাজা রণবাহাদুর তাঁহার পিতৃব্য বাহাদুর সাকে বধ করেন। বাহাদুর সা নেপালে রাজ্য জরিপ করিতেছিলেন, তিনি নেপালের সমধিক উন্নতি করেন। এই জরিপ করা অপরাধে বাহাদুর সাহের প্রাণদণ্ড হয়। তখন নেপালীরা ভূমি মাপ করা মহাপাপ মনে করিত। রণবাহাদুরের পত্নী সেই বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার বসন্ত রোগ হইলে দেবালয়াদিতে বহু মানসিক করা হয়, কিন্তু ফল না হওয়ায় রণবাহাদুর উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং সমস্ত ব্রাহ্মণের অপমান করেন। দেবালয়াদিতে বিষ্ঠা ছড়াইয়া দেবতাদের অপমান করেন। যে সকল বৈদ্য তাঁহার পত্নীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে বধ করেন। ইনি পৃথ্বীনারায়ণের ভ্রাতা দল দল সার পুত্রের দুই চক্ষু নষ্ট করিয়া দেন ইহা ছাড়া তাহার আরও বহু অপকীর্ত্তি আছে। যদি তিনি এই সকল কুকার্য্য না করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিতেন, তবে বহু প্রকারে রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া সুবৃহৎ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। পরে তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃত হওয়ায় তাহাকে নেপাল বাসীরা রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেয়। তখন তাঁহার চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র নির্ব্বানযুধ বিক্রমকে সকলে সিংহাসন দান করেন। ইহার পূর্ব্বে আর একজন মন্ত্রী ছিলেন, এখন নাবালকের অভিভাবক স্বরূপ মন্ত্রী দামোদর পাড়ে রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। এখন হইতে মন্ত্রী শাসন প্রথা নেপালে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

রণবাহাদুরসাহ তাঁহার অন্যতম পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরীকে

লইয়া কাশীতে গিয়া বাস করেন। ইহার পর ২০ বৎসর পরে রণবাহাদুর সাহ হঠাৎ কাশী হইতে নেপালে আসিয়া মন্ত্রী দামোদর পাড়ে ও কতিপয় রাজ হিতৈষিগণকে বধ করেন। এই সময় তিনি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর ও অন্যান্যের তালুকাদি বাজেয়াপ্ত করিলেন। ১৮০৭ খৃঃ অঃ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সেরবাহাদুর সাকে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য ত্যাগ করিবার আদেশ দেন, তখন তিনি রণ-বাহাদুরকে অপমান সূচক কথা বলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া রণ-বাহাদুর সের বাহাদুরকে বধ করিবার আদেশ করিলে সের বাহাদুরই তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে রণ বাহাদুরকে নিহত করেন।

নির্ব্বানযুধ দশ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি ১৮০৭ খৃঃ অঃ ভীমসেন আপাকে প্রধান সেনাপতি ও শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

১৮০২ খৃঃ অঃ এপ্রিল মাসে কাপ্তেন নক্স বৃটিশ রেসিডেন্ট হইয়া কাটামাণ্ডুতে গিয়া উপস্থিত হন। ডাঃ বুকানন হ্যামিলটন এই সময় তাঁহার সংযাত্রী হইয়াছিলেন। মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী এই সময় কাশী হইতে নেপালে আসিয়াছিলেন। নেপাল বাসীরা বৃটিশ রেসিডেন্ট কাপ্তেন নক্সের বড় সমাদর করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যতায় রাজ্যের সকল লোকই ভীত ও সন্দিগ্ধ চিত্ত থাকায় তাহারা সন্ধি স্থাপন করিতে পারেন নাই। ১৮০৩ খৃঃ অঃ কাপ্তেন নক্স ফিরিয়া আসেন। ইহার পর লর্ড ওয়েলেস্লি প্রচার করেন যে ইংরেজের সহিত নেপাল রাজ্যের কোন সম্বন্ধ নাই। এই সময় নেপালে পুনরায় গৃহ বিবাদ বাধিয়া উঠে।

নেপালে তখন বরাবরই মারামারি, কাটাকাটি, নরহত্যা প্রভৃতি গৃহ বিবাদ লাগিয়া ছিল। রাজা, রাজমন্ত্রী ও প্রধান লোকদিগকে বধ করা কোন বিস্ময়ের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। এখনও মাঝে মাঝে নেপালী বিপ্লব ভীষণ আকার ধারণ করে। বর্ত্তমান কালে ইংরেজ রাজ নেপালের পৃষ্ঠপোষক। নেপালীরাও গুর্খাদিগকে ইংরাজের সেনাদলে প্রবেশ করিতে অবাধ অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ।

ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

ইতিহাসের প্রয়োজন এই যে ইহা অতীতকে আমাদের সম্মুখবর্ত্তী করে, আমাদিগকে মহাপুরুষদের সঙ্গে লাভে সমর্থ করে, অতীতের কঙ্কালসার স্মৃতিকে রক্ত মাংসে জীবন্ত, করিয়া আমাদের সম্মুখে স্থাপিত করে, অতীতের ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার আমাদের চক্ষুর সমক্ষে স্পষ্টীকৃত করে; প্রাচীন সময় ও সমাজে আলোক পাত করিয়া অতীতের উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করে। ইতিহাস মানব সমাজ নিয়ামক গূঢ় তত্ত্ব সকল উদ্ঘাটিত করে, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ প্রদর্শন করে, ঘটনাবলীর ব্যাবচ্ছেদ করিয়া সমাজ নীতি ও রাজ নীতির মূল তত্ত্ব বাহির করে।

ইতিহাস মানুষকে কর্ম্মক্ষেত্রে উৎসাহিত করে; তাহার প্রাণে বল সঞ্চার করে, এক সময় মানুষ যাহার সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়াছে, আবারও তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, মানুষ চিন্তার রাজ্য প্রসারিত করিয়া যে অনুপম সৃষ্টি করিয়াছে আবারও তাহা সৃষ্ট হইতে পারে। এই আশা—এই বিশ্বাস মানুষের প্রাণে বল সঞ্চার করে, মানুষকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে। এইজন্য পতিত ভারতে ইতিহাসের আলোচনা বড় প্রয়োজন। এক সময় ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর গৌরব স্থল ছিল। ভারতবর্ষের গৌরব রবি প্রাচ্য আকাশ আলোকিত করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সে গৌরব সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই ঘোর অন্ধকার যে আর অপসৃত হইবে, সে সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। ভারতবাসী মোহগ্রস্ত, শক্তিহীন, কর্ম্ম শূন্য। এই পতিত জাতিকে আবার কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে, আবার তাহাদিগকে জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তিতে মহৎ করিয়া তুলিতে হইলে তাঁহাদের সম্মুখে অতীতের গৌরব ছবি ধরিতে হইবে, তাহাদের আসন্ন প্রাণে আশার সঞ্চার করিতে হইবে। কালের ও স্থানের দূরতা আমাদের মানস চক্ষু হইতে অপসারিত করিয়া অতীতের ধর্ম্ম কর্ম্ম, জ্ঞান বিজ্ঞান, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি,

রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ, রাজ ব্যবস্থা দেদীপ্যমান করিয়া তুলিতে হইবে, প্রাচীন ভারতের ভাব প্রবাহে এই পতিত জাতির ঊষর চিত্তক্ষেত্র সরস ও উর্ব্বর করিয়া তুলিতে হইবে।

ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য এই যে, তাহা প্রাচীন ভাব-রসে আমাদিগকে সিক্ত করিয়া থাকে। আমরা গ্রীক জাতির ইতিহাস পাঠে আনন্দলাভ করিয়া থাকি, তাহার কারণ এই যে, প্রত্যেক পাঠক গ্রীশের সেই প্রাচীনযুগে উপনীত হন, তৎকালের গ্রীক জাতির শরীর ও মনের সামঞ্জস্য দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই, শরীর ও মনের পূর্ণ পরিণতি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। তৎকালের গ্রীক-বাসী হারকিউলিস, কোরাস এবং জোভের মূর্ত্তি নির্ম্মাতা শিল্পীর সমক্ষে সুগঠিত শরীরের আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিল। সেই সময়ের গ্রীকদের আচার ব্যবহার সরল ও তেজোগর্ভ ছিল, তাহাদের সাহস, আত্মসংযম, ন্যায় পরায়ণতা, দৃঢ়তা উচ্চকণ্ঠ এবং প্রশস্ত বক্ষ লোকের প্রশংসার বিষয় ছিল। বিলাসিতা সমাজকে দূষিত করে নাই। এই সমস্ত বিবরণ আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে প্রাচীন গ্রীক জাতির প্রকৃতিতে অভ্যস্ত করে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে ইতিহাসের শিক্ষা মনুষ্যের সম্মুখে জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে "মহত্ব ও মাধুরী এবং প্রীতি ও নীতির ভিন্ন ভিন্ন" অভ্যস্ত করে। ইতি-হাস দ্বিভাগে বিভক্ত করা হইতে পারে, প্রথম রাজকীয় ঘটনার বিবৃতি দ্বিতীয় সামাজিক বিবর্ত্তনের বিবৃতি। ইংলণ্ডের মনস্বী সার ওয়ালটার রেলী রাজকীয় ঘটনা মূলক ইতিহাস প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তাহার সমসাম-য়িক একটি ঘটনারই বিভিন্ন বিবরণ অবগত হইয়া এবং তাহার সমস্ত তত্ব এবং কারণ নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হইয়া আপন সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, অন্য জাতির প্রতি বিরাগ, স্বাভাবিক এক দেশ দর্শিতা ও স্বার্থ অনেক সময় রাজকীয় ঘটনার বিবৃতি পক্ষপাত দুষ্ট করিয়া থাকে। অনেক সময় রাজ-রোষের আশঙ্কা ইতিহাস রচনাকালে সত্যের গতি প্রতিহত করে। বস্তুতঃ স্বেচ্ছাচার মূলক রাজ্যে ইতিহাসের পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্ভবপর নহে।

সমপ্রাণতা এবং সহৃদয়তা ইতিহাস রচনার মূল। যে যুগের ইতিহাস রচিত হইবে, তাহার আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মকর্ম্ম, সমস্ত বিষয়ই সহানুভূতি সহকারে পর্য্যালোচনা করিতে হয়। সে সময়ের জনপুঞ্জ যে রসে কর্ম্মক্ষেত্রে ভাসিয়াছিল, আমাদিগকেও সেই রসে ভাসিতে হয়। সে সময়ের কার্য্যাবলী তৎকালীয় সমাজ নীতি এবং রাজনীতির সাহায্যেই পরীক্ষা করিতে হয়। সেই প্রাচীন সমাজকে নেত্র সমক্ষে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে হয়, তৎসময়ের ঘটনাবলিকে একেবারে আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিতে দিতে হয়। তবেই ইতিহাস রচনা সার্থকতা লাভ করে। একদিকে যেমন সমপ্রাণতা ও সহৃদয়তা সহকারে সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিতে হয়। অন্যদিকে আবার তেমনি সযত্নে পুরাকালের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ও পক্ষপাত বর্জ্জন করা আবশ্যক। জাতীয় অভিমান ও স্বদেশ বাৎসল্যকে ঐতিহাসিক সত্যের নিকট অবনত করা আবশ্যক। ইতিহাসের পবিত্র মন্দিরে সত্যে-রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন।

ইতিহাসের ঘটনা সকল পরস্পর এরূপ নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ যে একের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে চারিদিক হইতে এক ঘটনার পর আর এক ঘটনা উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধানকারীকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়, এজন্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কোন এক বিশেষ যুগের বিবরণে লেখনীকে আবদ্ধ রাখা হইতেছে। বহুকালের ঘটনা একত্র স্তরবদ্ধ করিয়া সজ্জিত করিতে হইলে উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দুরূহ হইয়া পড়ে। এক যুগের ঘটনাবলীর স্রোতে আর এক যুগের ঘটনাবলী ভাসিয়া যায়। কোন যুগের ঘটনাবলীই স্থির-নেত্রে দেখিবার সুযোগ ঘটেনা।

রাজকীয় ঘটনা এবং সামাজিক বিবর্ত্তনের বিবৃতি ব্যতীত আর একটি কার্য্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে ইতিহাসের কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। Social organism বা সমাজ শরীরের তত্ব নির্ণয় এবং প্রমাণ প্রদর্শন ইতিহাসের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। পূর্ব্বে "মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষলতা প্রভৃতি পদার্থকেই লোকে শরীরী বলিয়া ব্যাখ্যা করিত, কিন্তু এখন অবধারিত

হইয়াছে যে, মনুষ্য সমাজও শরীরী পদের বাচ্য। পণ্ডিত মণ্ডলী স্থির করিয়াছেন যে, ব্যক্তি সমষ্টিকে সমাজ বলা যাইতে পারে না, ব্যক্তির উন্নতিতে সমাজ উন্নত হয় না, ব্যক্তির বিনাশে সমাজ বিনষ্ট হয়না, যেমন বীজ নিহিত শক্তির প্রভাবেই বৃক্ষের উৎপত্তি এবং বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, অবধারিত হইয়াছে যে, সেইরূপে সমাজ নিহিত শক্তির দ্বারাই সমাজের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত হইতেছে। কিরূপে সমাজ ,শরীর উৎপন্ন হইয়াছে ও বর্দ্ধিত হইতেছে, ইতিহাস পাঠে তাহা হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক, সমাজ শরীর তত্ত্ব এখনও শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে নাই, এই তত্ত্ব কালক্রমে বলশালী হইয়া উঠিলে ইতিহাসকে আপনার অস্তিত্বের অনুকূল প্রমাণ সংগ্রহে নিযুক্ত করিবে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় তাদৃশ প্রমাণের প্রাচুর্য্য না থাকায় অসন্তোষ ধ্বনি উঠিয়াছে। মারসন নামক একজন অজ্ঞাতনামা লিখক ঐতিহাসিক কুলতিলক গিবনের ইতিহাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, গিবনের গ্রন্থের প্রধান অপূর্ণতা এই যে, সমাজও যে মনুষ্য পশু পক্ষীর ন্যায় শরীরী এবং আপন নিয়ম অনুসারেই স্থিতিলাভ করিয়াছে এবং বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে, সে তত্ত্ব উঁহাতে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই।

প্রথমে রাজকীয় ঘটনা এবং বীরকীর্ত্তির লালিত্যপূর্ণ বর্ণনাই ইতিহাসের লক্ষ্য ছিল। তাহপর অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে সামাজিক বিবর্ত্তনের বিবৃতি ইতিহাসের অঙ্গীভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাস মানবজাতির সকল যুগের সকল অবস্থার সকল চিন্তার পরিচায়ক বিজ্ঞান শাস্ত্ররূপে পরিণত হইতেছে। আবার অচিরে সমাজ শরীর তত্ত্বের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

প্রকৃত ইতিহাস কাহাকে বলে তাহা লইয়া এখনও ইয়োরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীতে বাগ্বিতণ্ডা চলিয়া আসিতেছে। যাহা এক সময়ে ইয়োরোপে ইতিহাস নামে সমাদর লাভ করিয়াছিল তাহা এখন পক্ষপাত দুষ্ট রাজবিবরণী বলিয়া নিগৃহীত হইতেছে। ইতিহাস লেখকের প্রতিভা ইতিহাসক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বর্ণবিন্যাসদ্বারা চিত্রফলককে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তুলিবে কিন্তু প্রতিভার গতি অবাধ রবে, তাহা প্রমাণের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিবে। বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতমণ্ডলী ইতিহাসকে বিজ্ঞানের উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা ইতিহাস রচনাকালে বিজ্ঞানোচিত সংযম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাসের প্রমাণমূলক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইতিহাসের প্রমাণ পরোক্ষ প্রমাণ। বিজ্ঞান শাস্ত্রের ন্যায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে। বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রাকৃতিক কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। কিন্তু অতীতকালের ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই। তাহা হইলেও ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ণয় করিবার জন্য বর্ত্তমান কালের কষ্টি পাথর সর্ব্বত্রই একরূপ বলিয়া ঐতিহাসিক প্রমাণও বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ন্যায়ই সমাদর লাভের যোগ্য। ঐতিহাসিকের দায়ীত্ব বৈজ্ঞানিকের দায়ীত্ব অপেক্ষাও গুরুতর, তাহাকে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের পরোক্ষ প্রমাণ এরূপ সতর্ক দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার সহিত পরীক্ষা করিতে হয় যে, তাহাতে তিলমাত্র শৈথিল্য এবং চিত্তবিক্ষেপ ও সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়।

আধুনিক বিজ্ঞানোচিত প্রমাণ পদ্ধতি রাজকীয় ঘটনার বিবৃতি এবং সামাজিক বিবর্ত্তনের বিবৃতি—ইতিহাসের এই দ্বিমূর্ত্তিকেই অভিনব অঙ্গরাগে শোভিত করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাস আর কল্পনার খেলা অথবা উষ্ণ মস্তিষ্কের খেয়াল নহে। ইতিহাস সাময়িক আচার ব্যবহারের প্রতিলিপি, সাময়িক চিন্তাপ্রণালী ও কার্য্যপদ্ধতির নিদর্শন। সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারই এই ইতিহাসের প্রকৃষ্ট উপকরণ। ইতিহাস লেখক সাহিত্যের পথ নির্দ্দেশক্রমে এক নির্দ্দিষ্ট যুগের মনুষ্যের অন্তরে প্রবিষ্ট হন, সেখানে তিনি সমস্ত ঘটনাবলী পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তৎসমুদয় বিবৃত করেন, সমস্ত পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করেন, মনুষ্যের অন্তরে যত বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহা তীক্ষ্ণ সমালোচনা সহকারে বিচার করেন ; তাঁহার এইরূপ সাধনার ফলে সামাজিক বিবর্ত্তনের বিবৃতি রচিত হয়। মানুষের বাহ্যপ্রকৃতির অভ্যন্তরে তাহার অন্তঃপ্রকৃতি নিহিত থাকে, তাহার বাস গৃহ, তাহার গৃহোপকরণ, তাহার সাজসজ্জা অন্তঃপ্রকৃতি প্রকাশ করে, তাহার রুচি কি প্রকার, তাহার মতিগতি কি প্রকার, তাহার স্বভাব বিলাসপ্রবণ অথবা সংযত, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ অথবা স্থূল, এই সমস্ত জানিতে দেয়। মানুষের কথা

বার্ত্তা, কণ্ঠস্বর, অঙ্গভঙ্গী তাহার অন্তঃপ্রকৃতি প্রকাশ করে। ফলতঃ বাহ্যদৃশ্যের অভ্যন্তরে আর একটি দৃশ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, সেই দৃশ্যকে লোক লোচনের গোচরীভূত করা ইতিহাসলেখকের কার্য্য।

বর্ত্তমান যুগে ইতিহাস প্রাণিতত্ত্বের ন্যায় ঘটনাবলী ব্যবচ্ছেদ করিয়া সত্য বাহির করে। ভাষাতত্ত্ব, পুরাণতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান প্রভৃতি ইতিহাসের সকল শাখাতেই এই ব্যবচ্ছেদ প্রণালী অবলম্বন না করিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিলে দেখা যায় যে, বৌদ্ধসঙ্ঘের বিরোধ এবং কলহের পশ্চাতে সুগভীর মনস্তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। মানব চরিত্রের যে নানাস্তর, নানাদৃশ্য এক প্রকার বিবরণের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা উজ্জ্বল হইয়া দিনের আলোকের ন্যায় লোকচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহার দৃশ্যের স্বতন্ত্রতা ও লক্ষ্যের বিভিন্নতা মানব চক্ষের গোচরীভূত হয়। ধর্ম্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনা ও বিচার এবং নীরস ধর্ম্মোপদেশের অভ্যন্তরে জীবন্ত মানুষের হৃদয়ের স্পন্দন অনুভূত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের জীবনের কোলাহল ও নৈরাশ্য তাহাদের মানবপ্রকৃতি সুলভ উচ্ছৃঙ্খলতা পারিপার্শ্বিক বৈষয়িকতার প্রতি লোলুপদৃষ্টি সমস্তই আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে।

মানবজীবনের দৃশ্যখানা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই আমাদের জ্ঞানলালসা পরিতৃপ্ত হয় না, এক দৃশ্যের পর আর এক দৃশ্য উত্থিত হইতেছে, এই সকল কিজন্য উত্থিত হইতেছে, আবার কিজন্যই বা বিলীন হইয়া যাইতেছে তাহার রহস্য নির্ণয় জন্য মানব মন স্বভাবতঃই কৌতূহলাক্রান্ত হয়। এজন্য ইতিহাসে তথ্য সংগ্রহের পরেই কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় আবশ্যক হয়। মনুষ্যের আকাঙ্ক্ষা, সাহস, সত্যানুরাগ সমস্তই নিগূঢ় কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ অতি জটিল, এক স্তর ভেদ করিলে আর এক স্তর, এইরূপ স্তরে স্তরে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আবদ্ধ রহিয়াছে।

ঐতিহাসিকক্ষেত্রে প্রাগুক্ত প্রণালীর অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে। মানবসমাজের প্রত্যেক বিবর্ত্তনের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বিচারিত হইতেছে। প্রত্যেক বিবর্ত্তনের অভ্যন্তরে যে সকল স্বতন্ত্র কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা নির্দ্দিষ্ট হই-তেছে, প্রত্যেক ঘটনা ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তর হইতে নিগূঢ় রহস্য বাহির করা হইতেছে, প্রত্যেক ঘটনা ইতিহাসে স্থান পাইবার উপযুক্ত কিনা তাহা প্রমাণের কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। এই সকল পরী-ক্ষায় যে সকল ঘটনা সত্য বলিয়া উত্তীর্ণ হইতেছে, তৎসমুদয় সরস রচনায় বিবৃত করিয়া লোক সমাজে উপস্থিত করা হইতেছে। সত্য অবিকৃত রাখিয়া শুষ্ক ঐতিহাসিক তথ্য সকল সরস ভাষার আবরণে লোক সমাজে স্থাপিত করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। ইহার ফলে আমাদের নিকট অতীত প্রত্যক্ষ বৎ প্রতিভাত হইতেছে।

সুদূর অতীত যুগে ভারতে ইতিহাস রচিত হয় নাই। যাহারা কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের রচনায় অলৌকিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহাদের কীর্ত্তি কলাপ অমর হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারা কি জন্য ইতিহাস রচনায় বিমুখ হইয়া ছিলেন, পুরাবৃত্ত রচনা কালে কল্পনা লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন, বর্ণোদ্ভাষিত চিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের পুরাণ শাস্ত্রে তৎকালের সমাজ ও সভ্যতা প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইলেও তৎ সমুদয় প্রকৃত ইতিহাসের লক্ষণাক্রান্ত নহে।

ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভকালে কতিপয় জ্ঞানোপাসক ইংরেজ এসিয়ার ইতিহাস, প্রত্ন তত্ত্ব, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অনুসন্ধান এবং আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং অদম্য উৎসাহ সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই ভাবে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনের সূত্র পাত হইল। প্রখ্যাত নামা সার উইলিয়ম জোন্স বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সার উইলিয়ম জোন্স অল্পকাল মধ্যেই পরলোক গত হন। মনস্বী কোলব্রুক অগ্রসর হইয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার ভার গ্রহণ করেন। কোলব্রুক ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে হোরেস হেমান উইলসন তাঁহার পদে বৃত হন। উইলসন সাহেবের পরবর্ত্তী কালে ডাক্তার মিলার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। সার উইলিয়ম জোন্স যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত করেন, তাহা মুষ্টিমেয় জ্ঞানোপাসক ইংরেজের অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রমে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতঃপর ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রয়াল সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর হইতে সমগ্র ইউরোপের পণ্ডিত মণ্ডলীর দৃষ্টি ভারতীয় পুরতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হয়। তদবধি সার উইলিয়ম জোন্স কর্ত্তৃক প্রবাহিত জ্ঞানধারা স্ফীত কলেবর হইয়া উঠিতেছে।

বহু সুধীব্যক্তি প্রাচীন ভারতের পুরাতত্ত্ব সংকলন করিবার জন্য কঠোর সাধনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের সাধনার বিবরণ প্রদান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আমাদের অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ সময় ও সঙ্কীর্ণ।

ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, নানা অংশে বিভক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব ,নৃতত্ত্ব, স্থপতি তত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব ইত্যাদি। এই সমস্ত বিভাগেই ইউরোপীয় প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য নিয়োজিত হইয়াছে এবং

তাহাতে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তাহা মনোজ্ঞ এবং প্রাচীন ভারতের গৌরব প্রকাশক। কিন্তু তৃপ্তি কর নহে। আমাদের রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—পরের রচিত ইতিহাস নির্ব্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগের ফল কোন পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে, সেই চেষ্টায়, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের প্রাণ।

আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের দেশে পুরাতত্ত্বের আলোচনায় প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। আমরা এই প্রাণ সঞ্চারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

আমাদের স্বদেশীয় যে সকল মহাত্মা প্রাচীন ভারতের রাজতত্ত্ব সংগ্রহ জন্য আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। এই মহাত্মা অসাধারণ মনস্বিতা সহকারে বিপুল শ্রমে প্রাচীন ভারতের নানা রাজতথ্য প্রচারিত করিয়াছেন। এই সমস্ত মধ্যে পাল ও সেন এবং কেশরী বংশ সম্বন্ধীয় আলোচনাই পাঠক সমাজে সমধিক পরিচিত।

মিত্র মহোদয়ের পর মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত ভাণ্ডারকরের নাম উল্লেখ যোগ্য। তিনি দক্ষিণাপথের প্রাচীন রাজ বিবরণ সঙ্কলন করিয়া ইতিহাসের একাংশ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

আমরা ভাণ্ডারকরের নামের সঙ্গে আর একজন মনস্বীর উল্লেখ করিতেছি। ইনি ডাঃ ভাউদাজি, ভাউদাজি পশ্চিম ভারতের রাজতত্ত্ব-বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়া অনেক নূতন তথ্যের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনস্বীর সঙ্গে অকাল পরলোক গত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা আবশ্যক। রাজকৃষ্ণ বাবু লক্ষণাব্দের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ণ বাবু অশোকের রাজধানী পাটলী-পুত্রের ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে গবেষণায় নিরত হইয়াছিলেন। আমরা ইহাদের নামের সঙ্গে পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর নাম সংযুক্ত করিতেছি। তিনি গৌড়ের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই সঙ্গে পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নাম স্মরণ করিতেছি।

আজমীর যাদুঘরের অধ্যক্ষ ওঝা চালুক্য বংশের ইতিবৃত্ত সংকলন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। মান্দ্রাজের পিলে মহাশয় তামিল দেশীয় রাজন্যগণের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া অনেক তথ্য পাঠক সমাজের গোচরীভূত করিয়াছেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে বিবরণ প্রদান করিলাম, তাহাতে পরিদৃষ্ট হয় যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস সংকলনের প্রথম চেষ্টার ন্যায় স্বদেশীয়দের স্বাধীন ভাবে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানও প্রথমতঃ আমাদের এই বঙ্গদেশেই আরব্ধ হইয়াছে। ইহা আমাদের বড় আশা, বড় গৌরবের কথা।

ইতিহাসের স্বাধীন চেষ্টার প্রথম যুগ অতিবাহিত হইয়াছে এখন দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এই নূতন যুগের স্বাধীন চেষ্টার ফলে "বাঙ্গালাদেশের মধ্যে একটি অভূত পূর্ব্ব আনন্দ এবং আশার সঞ্চার" হইয়াছে, "একটি সুদূর ব্যাপি চাঞ্চল্যে বাঙ্গালার পাঠক হৃদয় যেন কল্লোলিত হইয়া" উঠিয়াছে। যাহারা বঙ্গদেশের জীবন শূন্যতার মধ্যে প্রাণ ও আনন্দ সঞ্চার করিয়াছেন, আমরা এখানে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। ইহারা প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ, খননদ্বারা বিবিধ ঐতিহাসিক প্রমাণের আবিষ্কার তৎসমুদয়ের আলোচনা এবং আরও বিবিধ উপায় অবলম্বনে বঙ্গ ভূমির ইতিহাস সংকলনে কৃত সংকল্প হইয়াছেন।

বঙ্গদেশের এই নব উদ্যোগ, নব চেষ্টার ফলে স্বদেশের যে ইতিহাস লিখিত হইবে, সে ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "সর্ব্ব অলঙ্কার ভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী হইবেন"। পৃথিবীর যাবতীয় পণ্ডিত মণ্ডলী আমাদের সেই বালার্ক বর্ণ গৌরব মণ্ডিতা দেবী মূর্ত্তির সম্মুখে ভক্তি ও বিস্ময়ে অবনত মস্তক হইবেন। বন্দেমাতরম্!

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে,
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ষষ্ঠ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫। | ৮ম সংখ্যা।

যোসেফ জুবেয়ার।

জনৈক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের মতে লেখক সম্প্রদায়কে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণী,—মহাশক্তিমান, প্রতিভাশালী—যাদের লেখার ভিতর দিয়া, মানবের শোক সন্তোষ, জীবনের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও কদর্য্যতা সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে—ইহারাই কালিদাস ও শেক্সপিয়ার, গেটে এবং রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক-সমূহও প্রতিভাশালী—কিন্তু শক্তির তুলনায় আকাঙ্ক্ষা উচ্চ—মনের ভাবকে যারা যথোচিত ভাষার কলেবরে সাজাইয়া তুলিতে সক্ষম নন। ইহারা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ঘুড়িয়া বেড়ান। আদর্শের পশ্চাতে পড়িয়া যাওয়ার তুলনায়, জীবনে অসফলতাকে বরণ করিয়া নেওয়াও ইহারা শ্রেয় মনে করেন। জীবনকে উপভোগ করা এবং আলোচনা ও জ্ঞান-চর্চ্চায় অতিবাহিত করা—বরং ইহাদের কাম্য। ইহারা পূর্ণভাবে কিছু লিখিয়া যাইতে পারেন না। যাহা লিখেন পরের জন্য তত নয়, নিজ প্রীত্যর্থে ত, তাহাও খণ্ডাকারে এবং কখনও কখনও। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত যাহারা, তাহারাও শক্তিশালী কিন্তু প্রতিভা তেমন নাই। সাহিত্যাকাশের নিম্ন স্তরে বিচরণশীল—অল্পেতেই তাহারা সন্তুষ্ট। ইহাদের দ্বারাই সাহিত্যের ভাব-সমূহ সমাজে ছড়াইয়া পড়ে। প্রতিভার বিদ্যুৎ আলোকে বিকশিত নয় সত্য কিন্তু ইহাদের লেখার ভিতরও মাঝে মাঝে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আস্বাদ পাওয়া যায়।

যোসেফ জুবেয়ার—যার কথা এই প্রবন্ধে লিখিত হইতেছে—এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত-লেখক বলা যাইতে পারে। ফ্রান্সের অন্তর্গত মণ্টিগনাক নামক ক্ষুদ্র নগরে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সামান্য অবস্থাপন্ন ডাক্তার ছিলেন। বাল্যে টলোজের স্কুলে আট বৎসর পাঠ করেন। তৎপরে সেখানে কিয়ৎকাল শিক্ষকের কার্য্য করেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন তাহার বয়স দ্বাবিংশ বৎসর। তৎপর দুইবৎসর গৃহে কঠিন অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকেন। ১৭৭৮ সনে তিনি ভাগ্য পরীক্ষার জন্য রাজধানী প্যারিস নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। সেখানে তৎকালের প্রসিদ্ধ লেখক বিশ্ববিশ্রুত ডিডেরো, ডালেমবার্ট, মারমণ্টেল, লা-হার্পের সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময় তিনি প্যারিস-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্য গ্রেণ্ড মাষ্টার (Grand-master) ফোনটেইনের সহিত সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হন। এই অল্প বয়সেই, তাহার সম্বন্ধে কথিত হইত যে তিনি যশ-লাভ অপেক্ষা নিজকে সমুন্নত করিবার জন্যই অধিকতর ইচ্ছুক ও যত্নশীল ছিলেন। তাহার স্বাস্থ্য কখনও ভাল ছিল না, দেহ পূর্ব্বাপরই নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে এই চির রোগীগণই সাহিত্য-ক্ষেত্রে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার আদর্শ ছিল অন্যরূপ,—লোক দেখাইবার অপেক্ষা নিজের ভিতর নিজকে ফুটাইয়া তোলাকেই তিনি অধিকতর শ্রেয় মনে করিতেন। জ্ঞানার্জ্জন ও জ্ঞানচর্চ্চাতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন—লোক সমক্ষে বিস্তার

প্রসার দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। ইহাই তাহার জীবনের বিশেষত্ব। তাহার বন্ধু বিশ্ববিদিত ফরাসী লেখক শ্যেটো-ব্রায়েণ্ডের (Chanteubriand) কথায়, তিনি আজীবন নিজকে গোপন করিয়া চালাইয়াছেন।

ইদৃশ লোকের জীবন কাহিনী সম্বন্ধে বলিবার তেমন কিছুই নাই। তাহা সত্ত্বেও দুটী ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের Constituent Assembly, দেশের সর্ব্বত্র Justice of the Peace পদ সংস্কে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত করেন। মন্‌টিগনাক্ নগরের অধিবাসি-বৃন্দ চরিত্রবান, সরল, অধ্যয়নশীল জুবেয়ার সম্বন্ধে এমনই উচ্চ অভিমত পোষণ করিতেন যে তাহার অনুপস্থিতেও তাহাকে তাহাদের নগরের Justice of the Peace মনোনীত করেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জুবেয়ার এই পদ গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর কার্য্য করেন। তিনি এমন সততা ও দৃঢ়তার সহিত কাজ করিয়াছিলেন, যে অনেক দিন পর্য্যন্ত লোকে তাহা ভুলিতে পারে নাই। কার্য্য শেষে নাগরিকগণ আবার তাহাকে মনোনীত করে কিন্তু জুবেয়ার ভাবিলেন তাহার যাহা কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন—পূর্ব্বের নির্জ্জন জীবনকেই তিনি আবার বরণ করিয়া নিলেন।

তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় ঘটনা প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সভার (Executive Commeettee) সভ্যপদ প্রাপ্তি। ১৮০৯ অব্দে নেপোলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন করেন এবং ফোনটেইনকে গ্রেণ্ড মাষ্টার পদে নিযুক্ত করেন। নেপোলিয়ান তাহাকে কার্য্যকরী সভার সদস্য মনোনয়ন করিতে বলিলে, তিনি দুইজন প্রথিতযশা ব্যক্তির পরেই জুবেয়ারের নাম উল্লেখ করেন এবং তদুপলক্ষে লেখেন, যদিও অন্য দুইজনের ন্যায় ইনি তেমন লোক-সমাজে পরিচিত নন, তথাপি ইহার নিযুক্তি সম্বন্ধেই আমি বিশেষ মত দিতেছি। ইহার চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তা উচ্চ ধরণের। আপনি এবিষয়ে আমার মত গ্রহণ করিলে পরিতুষ্ট হইব। নেপোলিয়ন তাহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন—জুবেয়ার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

১৭৯৩ সনে,—যখন তাহার বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর—তিনি বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন। এখন হইতে তাহার স্ত্রীর পিত্রালয় ভিলেনেভি ও প্যারিস—এই দুই স্থানেই তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ অধিবাহিত হয়। যখন প্যারিসে থাকিতেন, তখন সেণ্ট হনোরি নামক ষ্ট্রীটের একটী উচ্চ কক্ষে তিনি বাস করিতেন। কক্ষটি আলোকোদ্ভাসিত ছিল—যেখান হইতে মৃত্তিকা অপেক্ষা তাহার স্নিগ্ধ আকাশ ও আলোই অধিক দৃষ্ট হইত। যত্ন, রুচি ও বিচক্ষণতার সহিত সংগৃহীত গ্রন্থরাজি সমূহে সুসজ্জিত এই কক্ষে তাহার আবেগ ও আড়ম্বর শূন্য জীবনের সুখাংশ অতিবাহিত হয়।

এই সময় ম্যাডাম বোমেণ্ট নামক বিদুষী রমণীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। তিনি ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী মণ্টমরিণের কন্যা। ফরাসী বিদ্রোহের সময় তাহার পিতা নির্দ্দয়ভাবে নিহিত হন, কয়েকমাস পরে তাহার মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিলিওটিনে Gulliotine প্রাণ হারাণ। অত্যল্পকাল পরে তাহার ভগ্নী কারাগারে জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া জীবনান্ত হন। ১৭৯৪ সনের গ্রীষ্মকালে জুবেয়ারের কর্ণে তাহার হৃদয়বিদারক কাহিনী পৌঁছে। তিনি তখন ভিলেনেভির সন্নিকটে জনৈক দরিদ্র দ্রাক্ষা-বিক্রেতার গৃহে লুক্কায়িত অবস্থায় বাস করিতেছিলেন। তখন তাঁহার বয়স এক বিংশ বৎসর। জুবেয়ারের সঙ্গে তাহার সেই গৃহে সাক্ষাৎ লাভ হয়। তাহার দর্শনে তিনি এই সর্ব্ব প্রথম বুঝিতে পারিলেন যে উচ্চবংশ ও বুদ্ধিমত্তার সমাবেশে রমণী চরিত্র কি অপূর্ব্ব শোভায় ভূষিত হইয়া উঠে। জুবেয়ার তাহাকে তাহার গৃহে আগমন করিবার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু ম্যাডাম বোমেণ্ট অস্বীকৃত হন।

অল্পকাল মধ্যেই দেখা সাক্ষাৎ, গ্রন্থ বিনিময় ও চিঠি পত্রাদির ব্যবহার বশতঃ দুই পরিবারের ভিতর ঘনিষ্টতা স্থাপিত হয়। ম্যাডাম বোমেণ্টের ভিতর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্যারিসের উচ্চ বংশের সুমার্জ্জিত আচার ব্যবহার ও বুদ্ধিমত্তা সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। কথিত আছে, পিত্রালয়ে বাসকালীন তিনি প্রতিবৎসর সাতহাজার ইউকাছ মুদ্রা পুস্তক ক্রয় ও বাঁধাইতে ব্যয় করিতেন। জুবেয়ার যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন তিনি কাণ্টের দর্শন পাঠে নিমগ্ন। যে অত্যাচার তিনি ভোগ করিয়াছিলেন তাহার ফলে চিরকালের জন্য স্বাস্থ্য হারাইয়াছিলেন। তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাস, এমন কি ভগবানে

বিশ্বাস পর্য্যন্ত অক্ষুহিত হইয়াছিল। এখন হইতে গ্রন্থপাঠ ও সৎচিন্তায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চ্চাতেই সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতেন, জুবেয়ারের সঙ্গে আলোচনা করিতেন। ছয়বৎসর পর্য্যন্ত পলাইন ডি বোমেণ্টের সঙ্গে আলাপ, গ্রন্থালোচনা ও জ্ঞানচর্চ্চা জুবেয়ারের জীবনের নির্দ্দোষ আনন্দের উৎস ছিল। তাহার প্রাণে পুনঃ জীবনের আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করাই, জুবেয়ারের চিন্তার বিষয় ছিল। তিনি বলিতেন, যতক্ষণ জীবন আছে,—তাকে ভালবাসাই উচিত—ইহাই কর্ত্তব্য। জুবেয়ারের জীবনের যা কিছু মধুরতা ও কমনীয়তা—ম্যাডাম বোমেণ্টের সঙ্গে আলাপের দরুণই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ছয়বৎসরের শেষে শ্যেটোব্রায়েণ্ডের সঙ্গে ম্যাডাম বোমেণ্টের পরিচয় হইলে, জুবেয়ারের সহিত তাহার ঘনিষ্টতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তখন হইতে জুবেয়ার পরিবার বৎসরের কিয়দংশ প্যারিসে বাস করিতেন—উদ্দেশ্য, ম্যাডাম বোমেণ্টের সান্নিধ্যে বাস। এই সময়কার রচিত তাহার পত্রাবলী হইতে এমন অনেক অংশ উদ্ধৃত করা যায়, যাহাতে ইংরাজ কবি কাউপারের চিঠির লঘুগতি সুরসিকতা, ও মিষ্টত্ব অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার অপেক্ষাও জুবেয়ারের পত্রাবলী স্থানবিশেষে মধুর। এক চিঠির একস্থানে তিনি ম্যাডাম বোমেণ্টকে লিখিতেছেন, যাদের জন্ম নির্জ্জন জীবনের প্রতি ভালবাসা-হারা হইয়াছ, অধঃপাতে যাউক তাহারা। ঘূর্ণায়মান বায়ুর ভিতর অহরহ তাহারা ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে। ঝড়ের স্কন্ধে চড়িয়া বেড়াইতে অভিলাষী কিন্তু জানেনা, শুধু ঝড়ের ক্রীড়নক তাহারা। যে হট্টগোলের ভিতর তাহারা বাস করিতেছে তাহাতে তোমার অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

অন্য পত্রে লিখিতেছেন, সুখ ও শান্তি ধ্বংসকারী এমন কিছুই নয়, যেমন মনের প্রবল প্রবৃত্তিসমূহ। নতজানু হইয়া বলিতেছি, শান্তভাবে জীবন যাপনকে ভালবাসিতে শিখ। শান্তিকে শ্রদ্ধা কর। ইহাই জীবনে ভুল না করার ও দুঃখ হ্রাসের উপায়।

১৮০০ সনে শ্যেটোব্রায়েণ্ডের সহিত ম্যাডাম বোমেণ্ট পরিচিত হন এবং তখন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার মহা উপাসক ও ভক্ত শিষ্য স্বরূপ ছিলেন। জুবেয়ার এই জন্য মনে যে কষ্ট না পাইয়াছিলেন তাহা নহে কিন্তু তথাপি তাহার প্রতি তাহার শ্রদ্ধাও ভালবাসার হ্রাস হয় নাই। শ্যাটোব্রায়েণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ম্যাডাম বোমেণ্ট রোমনগরে গমন করেন এবং সেখানেই ত্রিংশ বৎসর বয়সে তাহার জীবনান্ত হয়।

তাহার মৃত্যুর পর জুবেয়ার দ্বাবিংশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকাল প্রতিবৎসরের অক্টোবর মাসটী জুবেয়ারের পরিবারে ম্যাডাম বোমেণ্টের স্মৃতিচর্চ্চায় অতিবাহিত হইত। জুবেয়ার কোনও বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, আমার দুঃখের কথা তোমায় জানাইব না। নয় বছর পর্য্যন্ত এমন কোনও বিষয়ই আমি চিন্তা করি নাই, যার সহিত তার স্মৃতি কোন না কোন প্রকারে জড়িত ছিল না।

প্রকৃত প্রেম ইহাই, কোনও প্রকার কলুষতার চিহ্ন মাত্র নাই, যার আলোচনায় প্রাণ নির্ম্মল হয়। এমন নিঃস্বার্থ প্রেমিক কয়জন!

ম্যাডাম বোমেণ্টের মৃত্যুর পর ম্যাডাম ভিণ্টিমিলি নামক আর একটি বিদুষী রমণীর সহিত জুবেয়ার বিশেষ ভাবে পরিচিত হন। এই বিদুষী সাহিত্যামোদী রমণীগণ প্যারিসর সাহিত্যসমাজের একটা বিশেষত্ব। কিন্তু পলাইনের প্রতি জুবেয়ারের হৃদয়ে যে ভালবাসার উদ্রেক হইয়াছিল, ম্যাডাম ভিণ্টিমিলির প্রতি তেমন হওয়া অসম্ভব ছিল।

ক্রমে দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। বন্ধুবর্গ মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ লেখক বা রাজনৈতিক হইয়া সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিলেন কিন্তু জুবেয়ার ছায়াতেই পড়িয়া রহিলেন। তাহার শরীর এত দুর্ব্বল ও কৃশ ছিল যে তিনি এতদিন কি প্রকারে বাঁচিয়াছিলেন ইহাই আশ্চর্য্য। হৃদরোগ ও পেটের পীড়ায় অনেক সময়ই তাহাকে কষ্ট পাইতে হইত। হিন্দুদিগের ন্যায় নিতান্ত অল্পাহারী ছিলেন এবং আহারাদি বিষয়ে নিয়ম মানিয়া চলিতেন। কখন কখন অত্যধিক চিন্তা পাঠ অথবা বাক্যালাপের পর তিনি দিন কতক নিতান্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকিতেন—তখন কোনও কাজই করিতেন না বা কাহারো

সহিত আলাপ করিতেন না। ইদৃশ ভাবের যাহার শরীরের অবস্থা তাহার পক্ষে ধারাবাহিক কোনও গ্রন্থ রচনা অসম্ভব। কিন্তু তিনি পাঠ করিতেন যথেষ্ট এবং চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন। যাহা পাঠ করিতেন তাহারই নোট রাখিতেন। অতি সুন্দর চিঠি লিখিতেন। সর্ব্বোপরি অতি সুন্দর ভাবে কথাবার্ত্তা ও গল্প করিতেন। বয়সের সঙ্গে জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি হইলে বন্ধুবর্গ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য রিউ সেণ্ট হনরির কক্ষে মিলিত হইতে লাগিল। প্রায়ই শয্যাশায়ী অবস্থায় তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিতেন, কারণ বেলা তিন ঘটীকার পূর্ব্বে প্রায়ই তিনি শয্যা ত্যাগ করিতেন না। যে দিন শরীর অসুস্থ থাকিত, তাঁহার স্ত্রী দ্বারে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত শান্তি সুধা-বচন-বারি-পান পিপাসী অতিথিসমূহকে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতেন—অনেক সময়ই অকৃতকার্য্য হইতেন। ফোনটেইন তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোনও গুরুতর কার্য্যই করিতেন না। যখন তিনি ভিলেনেভিতে বাস করিতেন, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের যুবক পাদ্রীগণ তাঁহার লাইব্রেরীতে পাঠ করিবার জন্য ও তাঁহার সহিত আলাপে উপকৃত হইবার জন্য তাঁহার কক্ষে একত্র হইত। সর্ব্ববিষয়ে তিনি স্বাধীনমতাবলম্বী ছিলেন, রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। অনেকটা শান্তি প্রয়াসী রক্ষণশীল ধর্ম্মপ্রবণ দার্শনিকবিশেষ ছিলেন। বয়সের সঙ্গে জড়াজীর্ণতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল; বন্ধুগণ মধ্যে কতকজন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; অন্যান্য এমনভাবে রাজনীতির—যাহা জুবেয়ার ঘৃণা করিতেন—ভিতর ডুবিয়া গেলেন—যে তাহাদের সহিত তাঁহার আর বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু বার্দ্ধক্যসুলভ কর্কশতা তাঁহার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই। ১৮২৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। সেই বৎসর ৪ঠা মে তারিখে সত্তর বৎসর বয়সের সময় তাঁহার জীবনের অবসান হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পর শ্যাটোব্রায়েণ্ড লিখিয়াছিলেন, "কোথায় এখন সেই মণ্ডলী? অহো! যদি নিজের জন্য চিরস্থায়ী রচনা করিতে অভিলাষী হইয়া থাক, তাহা হইলে বন্ধুকর্ত্তৃক নিজকে পরিবেষ্টিত করিও। ম্যাডাম বোমেণ্টের মৃত্যু হইয়াছে, সেনেডালির মৃত্যু হইয়াছে, ম্যাডাম ভিণ্টিমিলির মৃত্যু হইয়াছে! পূর্ব্বে আমি দ্রাক্ষা উৎপাদন কালে জুবেয়ারের সঙ্গে ভিলেনেভিতে দেখা করিতাম। ইয়নি নদীর ধারে পাহাড়ের উপর আমি তাহার সাথে বেড়াইয়া বেড়াইতাম; সে দ্রাক্ষোৎস্থানের ভিতর ব্যাঙের ছাতি অন্বেষণ করিত এবং আমি মাঠ হইতে ক্রকাস ফুল আনয়ন করিতাম। সকল বিষয়ই আলাপ হইত, বিশেষতঃ ম্যাডাম বোমেণ্ট সম্বন্ধে—চিরকালের জন্য অপহৃত! আমরা যৌবনের স্মৃতি ও আশা আকাঙ্ক্ষার কথা মনে করিতাম। সন্ধ্যায় আমরা ভিলেনেভিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতাম। দূরে, পাহাড়ের উপর বনের ভিতর প্রসারিত একটী বালুকাময় পথ জুবেয়ার আমার নিকট নির্দ্দেশ করিত, যে পথ দিয়া ফরাসীবিপ্লবের কালীন যে গৃহে ম্যাডাম বোমেণ্ট লুক্কায়িত ছিল—সে গৃহে সে গমন করিত। বন্ধুবরের মৃত্যুর পর, আরও তিন চারিবার সেন্স দেশের ভিতর দিয়া গিয়াছি। রাজপথ হইতে পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইত। জুবেয়ার আর সেখানে ভ্রমণ করিতেছে না; যে মাঠে, যে দ্রাক্ষালতাবলীর সন্নিকটে, যে উপলখণ্ডের স্তূপের কাছে সে উপবেশন করিত, সবই নয়নে পতিত হইত। ভিলেনেভির ভিতর দিয়া যাবার সময় আমি জনহীন, রাজপথ দিয়া বন্ধুবরের পরিত্যক্ত রুদ্ধদ্বার গৃহের দিকে দৃষ্টি করিতাম। শেষবার আমি রাজদূত স্বরূপে রোমে যাইতে ছিলাম। অহো! সে যদি তখন জীবিত থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে ম্যাডাম বোমেণ্টের সমাধি ক্ষেত্রে লইয়া যাইতাম। কিন্তু ভগবান অনুগ্রহ করিয়া জুবেয়ারের নয়ন সমক্ষে আর এক রোমের স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিয়েছিলেন। তাহার সাথে আর এ মর্ত্তধামে দেখা হইবে না! আমিই তাহার কাছে যাইব, সে আর ফিরিয়া আসিবে না!"

সমসাময়িক মনস্বীগণের উপর যাঁহার এমন প্রভাব, তিনি যে কেমন মনস্বী ছিলেন—সহজেই অনুমেয়। জীবদ্দশায়, তাঁহার কোনও লেখাই সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। বস্তুতও তিনি বাহিরের লোকের জন্য নহে, নিজ চিত্ত বিনোদনের জন্যই লিখিতেন। ড্রয়ার ও বাক্সের ভিতরে তাঁহার কাগজ পত্র সঞ্চিত ছিল। তাহা কোনও দিন

লোক সমক্ষে প্রকাশিত হইবে মনেও স্থান দেন নাই। মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী স্বামার অনিচ্ছায় সে সকলকে লোক-লোচনের গোচরীভূত করা প্রথম‍ঃ সঙ্গত মনে করেন নাই কিন্তু নিজ শেষদিন যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, ততই এমন মহৎ হৃদয়ের স্মৃতি যাতে তাঁর বন্ধু বান্ধবের তিরোধানের পরও লোক সমাজে জীবিত থাকে, এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছিল। অবশেষে বন্ধুবর্গের বিশেষ অনুরোধে কিয়দংশ শুধু তিনি তাহাদের দেখিবার জন্য মুদ্রিত করেন। জুবেয়ারের মৃত্যুর চতুর্দ্দশ বৎসর পর তাহা প্রকাশিত হয়। অত্যল্পকাল মধ্যেই গুণী পাঠক-দিগের ইহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমালোচক-রাজ সেণ্টবভ (Sainte Beuve) তাহার প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৎপরে তাঁহার লেখার সহিত পরিচিত হইবার জন্য লোকের এমন আগ্রহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যে অত্যল্পকাল মধ্যে তাহার সমস্ত লেখা ও পত্রাবলী মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, তিনি জগতের সর্ব্বত্র বিদিত গ্রন্থকার।

তাঁহার লেখা Pensees of Joubert নামে ফরাসী সাহিত্যে সুবিখ্যাত। তিনি যে বিষয় পাঠ করিতেন বা চিন্তা করিতেন, তাহার সম্বন্ধে ছোট ছোট কথায়,—অনেকটা সূত্রাকারে—নিজ মনের ভাব লিখিতেন। ইহাদের সমষ্টিই—এই Pensees অথবা চিন্তা। ইহাদের ভিতর দিয়া, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, ধর্ম্ম, লোকচরিত্র—ইত্যাদি নানা বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশিত হইয়াছে। এমনই গভীর ভাবাত্মক, স্নিগ্ধ ও সুমধুর, এমনই কবিত্ব পূর্ণ ভাষায় রচিত—যে পড়িতে পড়িতে ধীরে ধীরে প্রাণ শান্তিরভাবে মহত্বের ভাবে পূর্ণ হইয়া ওঠে। তাঁহার লিখিত পত্রাবলীর ভিতরও ঈদৃশভাব সমূহের প্রাধান্য।

তাঁহার আদর্শ ছিল—যত ক্ষুদ্রাকারে, অল্প কথায় মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। তিনি বলিয়াছেন, যদি কোনও লোক সমগ্র গ্রন্থকে একটী পৃষ্ঠার ভিতর, সমগ্র পৃষ্ঠাকে একটী বাক্য ও বাক্যকে একটী মাত্র কথায় প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষায় উৎপীড়িত, তবে সেই ব্যক্তি আমি। আমি ভাবকে সংস্কৃত করিবার চেষ্টা করি, শব্দকে নহে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত যে আলোক কণার প্রয়োজন তাহা গঠিত হইয়া কলমের মুখে ফুটিয়া না ওঠে, ততক্ষণ আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। জ্ঞানকে আমি মুদ্রার ন্যায় প্রচলিত করিতে চাই—অর্থাৎ নীতিবাক্য ও প্রবাদ—যাহা লোকে অনায়াসে মনে রাখিতে পারে এবং ভবিষ্যবংশের হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতে পারে, তাহা রচনা করিতে আমি অভিলাষী। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে পূর্ণ হইয়াছে। প্রবাদের মত সূত্রাকারে রচিত, তাঁহার অনেক কথা ফরাসী সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে।

অনেক বিষয়েই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে কথাগুলি এমন সুন্দর এবং ভাব এমন নির্ম্মল—যে পাঠে মুগ্ধ হইতে হয়।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—দর্শনের ভগবান, একটী ভাববিশেষ কিন্তু ধর্ম্মজগতের ভগবান, স্বর্গ মর্ত্তের সৃষ্টিকর্ত্তা—মানবের কার্য্য ও চিন্তার বিচারপতি—শক্তি।...তাঁহার বাণী উপলব্ধি করিতে হইলে, অন্তরে নীরবতার প্রয়োজন; তাঁহার আলো দর্শন করিতে হইলে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে হইবে এবং অন্তরাভ্যন্তরে দৃষ্টি করিতে হইবে।

জগতের ভিতর তাঁহারাই একমাত্র সুখী—জ্ঞানী যাঁরা, সৎ যাঁরা, ধর্ম্মাত্মা যাঁরা। তিনজনের ভিতর আবার ধার্ম্মিকই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। ... নয়ন মুদ্রিত কর; তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে।

অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বলিতেছেন—আমাদের স্মৃতিশক্তি যাহা ধারণ করিয়া রাখিতে পারে, তাহা অপেক্ষা মনে অনেক চিন্তা স্থান পাইয়া থাকে। অনেক সত্যই মন উপলব্ধি করে কিন্তু কি-ভাবে, তাহা বুঝাইয়া উঠিতে সক্ষম নয়। আত্মার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎবেগে তাহাকে আলোকিত করিয়া এমন সব ভাব চলিয়া যায়, যাহা সে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। ...অন্তরের ভিতর আমরা যথোচিত অনুসন্ধান করি না। শিশুর ন্যায় পকেটে যাহা আছে তাহা অবহেলা করিয়া হাতে অথবা সম্মুখে যাহা আছে তাহার বিষয়ই ভাবি।

কল্পনার সম্মুখেই মহৎ সত্যসমূহ—প্রকৃতি, তাহার গতি এবং উদ্দেশ্য—প্রকটিত হয়। বিচারশক্তির উপলব্ধির বহির্ভূত ইহারা—শুধু কল্পনার দ্বারাই দ্রষ্টব্য।

অনেক মহৎ হৃদয় ও শ্রেষ্ঠ প্রতিভা লোকসমাজে অনাদৃত থাকিয়া যায়—কারণ এমন কোনও প্রচলিত মানদণ্ড নাই, যার দ্বারা তাঁহাদের পরিমাপ করা যাইতে পারে। ইহারা মূল্যবান রত্নসদৃশ, যাহাদের মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য কোনও কষ্টিপাথর আবিষ্কৃত হয় নাই।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদ যেমন মনকে ছোট করে এমত কিছুই নহে।

যে লোকের ভিতর কোনও দোষ নাই, সে হয় মূর্খ, নয় কপটাচারী। ইহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করাই কর্ত্তব্য।

যৌবনের কল্পনা ও বার্দ্ধক্যের চিন্তা—মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সারাটী জীবন পরচিন্তাতেই আমাদের অতিবাহিত হয়; অর্দ্ধেক ভালবাসিতে, অর্দ্ধেক নিন্দায়।

তাহাকেই লোকে স্ত্রীস্বরূপে গ্রহণ করিবে, পুরুষ হইলে যাহাকে সে বন্ধুস্বরূপ গ্রহণ করিত।

সাবধানতা ব্যবসায় পরিচালন পক্ষে প্রয়োজন—আরম্ভের পক্ষে অন্তরায়।

যে নির্ব্বাক্ হইয়া থাকিতে জানে না, পরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কার্য্যে নিজকে নিঃশেষ কর, কথায় বাঁচাইয়া চল। কার্য্যে শিথিলতাকে ঘৃণা কর; বাক্যে প্রাচুর্য্য, উক্তা ও বাচালতাকে ভয় করিয়া চল।

'ভগবানকে ভয় কর'—অনেককেই পুণ্যাত্মায় পরিণত করিয়াছে; ভগবানের অস্তিত্ব খুঁজিতে যাইয়া অনেকেই নাস্তিক হইয়াছে।

আমি, কোথা হতে, কোথায়, কেন, কি ভাবে—ইহাই দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমষ্টি—অস্তিত্ব, উদ্ভব, স্থান, উদ্দেশ্য এবং উপায়।

দর্শন মনকে বিশেষরূপে দৃঢ় করে। এই জন্যই দেখা যায় দার্শনিকের ন্যায় নির্দ্দয়-প্রকৃতির লোক অল্প।

রাজশক্তি (Government) নিজ হতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, জোড় করিয়া কেহ সৃষ্টি করে না।

স্বাধীনতা—স্বাধীনতা। সর্ব্ববিষয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হউক, আপনা হইতেই যথেষ্ট স্বাধীনতা দেখা দিবে।

বাক্য,—সুন্দর হওয়ার পক্ষে যাহা প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষাও বেশী ভাব ব্যক্ত করিবে অথচ যাহা বলিবার তাহাও যেন সম্যক প্রকাশিত হয়। প্রাচুর্য্যের সঙ্গে অল্পতা, ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের সমাবেশের প্রয়োজন; ধ্বনি ক্ষুদ্র হইবে কিন্তু অর্থ অনন্তের ভাবে পূর্ণ থাকিবে। প্রত্যেক তেজোময় পদার্থেরই ঈদৃশ স্বরূপ। প্রদীপের আলো যার উপর পতিত হয়, তাহাকে আলোকিত করে, সঙ্গে সঙ্গে আরও বিংশতি পদার্থকেও আলোকিত করিয়া তোলে।

যে সকল যুগে লেখকসমূহ প্রত্যেক বাক্য ওজন করিয়া ও গণিয়া ব্যবহার করিয়াছে, তাহাই সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

সুসজ্জিত স্বল্পাক্ষরতা—রচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রী।

যেমন চিত্রের পক্ষে বার্ণিস, সেই প্রকার পালিস ও ঘষামাজা রচনার পক্ষে। ইহারাই রচনাকে বাঁচাইয়া রাখে, স্থায়িত্ব এবং অমরত্ব দান করে।

প্রতিভা কার্য্যারম্ভ করে; কিন্তু একমাত্র শ্রমশীলতাই তাহাকে সমাপ্ত করিয়া তোলে।

মনের পক্ষে কার্য্যের ন্যায় অলসতারও প্রয়োজন। অত্যধিক লেখায় প্রতিভা নষ্ট হয় এবং একেবারে না লিখিলে তাহাতে মরিচা ধরে।

যা লিখিয়া নিজে খুব আনন্দ না পাও, তাহা লিখিও না। ভাবোচ্ছ্বাস লেখকের হৃদয় হইতে অল্পেতেই পাঠকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়।

বাক্য ও ভাবের অমিতব্যয়িতা নির্ব্বোধ হৃদয়ের পরিচায়ক। শ্রেষ্ঠত্বেই মহত্ব—প্রাচুর্য্যে নহে। সাহিত্যে মিতব্যয়িতা শ্রেষ্ঠ লেখকের পরিচায়ক।

কোনও লেখাই সুন্দর নয়, যাহার রচনায় দীর্ঘকাল পরিশ্রমে অথবা ভাবনায় ব্যয়িত হয় নাই।

কত উদ্ধৃত করিব?

ইংরাজ কবি ও সমালোচক ম্যাথিও আর্ণল্ড জুবেয়ারকে কবি কোলরিজের সহিত তুলনা করিয়াছেন কিন্তু তাহার অপেক্ষা তিনি ভাবসম্পদে শ্রেষ্ঠ। বলিবার ভঙ্গিমাও অতুলনীয়। জুবেয়ারের অনুকরণে ফরাসী ও জার্ম্মেণ সাহিত্যে এক্ষণে পেন্‌সি লেখকের অভাব নাই কিন্তু তাহার সমকক্ষ কেহই নহেন। তাহার বিষয় বলিতে

যাইয়া, অনেকটা তাঁহারই সম প্রকৃতি-বিশিষ্ট এমিয়েল (Amiel) তাঁহার সুবিখ্যাত জার্ণেলে বলিয়াছেন, জুবেয়ারের দর্শন, সাধারণ সাহিত্য ও লোকমতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার মৌলিকতা শুধু বিশেষ বিশেষ বাক্যে ও রচনার মাধুর্য্যে। কোনও বৃহৎ দৃশ্যের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই; ইতিহাসের নিগূঢ় ভাব কিম্বা আত্মদর্শন সম্বন্ধে তাহার নূতন বলিবার বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু তাহার নিজ ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিহত-দ্বন্দী। বন্ধুবান্ধবের ভালবাসা, সমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যাপার ইত্যাদি যে সকল ক্ষেত্রে কল্পনা ও ভাবের প্রয়োজন, তিনি বর্ণনায় ও সমালোচনায় অপূর্ব্ব।

বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহার মত লেখকের আবির্ভাব হয় নাই। শীঘ্র হইবে এমত সম্ভাবনাও নাই। Pensee লিখিয়া সফলতা লাভ তাহার পক্ষেই সম্ভবপর— যিনি চিন্তাশীল; যাহার জ্ঞান গভীর; ভাষা সুন্দর সুসংযত ও ভাবে পরিপূর্ণ; জীবন যাহার শান্ত আড়ম্বর-শূন্য; বাগ্দেবীর নীরব সাধনায় যার জীবন অতিবাহিত; এবং একাধারে যিনি গভীর দার্শনিক অথচ সংসারের কাজকর্ম্ম ও লোকজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জুবেয়ারের পাঠকেরও বঙ্গদেশে অভাব। একমাত্র কবিবর রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে তাঁহার ও এমিয়েলের সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের কথঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছে। সে পরিচয় আরও গভীর ও প্রসারতায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। জুবেয়ারের জীবন ও উপদেশ বাঙ্গালী লেখক সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষভাবে শিক্ষার বিষয়। হৃদয়ে যাহা প্রকৃত আনন্দ দান করে, শুধু তাহা লইয়াই সাধারণ্যে উপস্থিত হইব,—প্রত্যেক লেখকের ইহা আদর্শ হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য, যে রচনাগঠনে বিশেষ সময় বা চিন্তার প্রয়োজন হয় নাই— তাহার জীবন অনেক সময়ই ক্ষণকালস্থায়ী। আরও স্মরণ রাখা উচিত—বাক্য ও ভাবের সংযম এবং ভাষার মাধুর্য্য সাহিত্যের প্রাণ। বঙ্গসাহিত্য তবেই আমাদের হস্তে সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত ও সুষমাভূষিত হইয়া উঠিবে—যদি জুবেয়ারের ন্যায় সংসারের ধন মান প্রতিপত্তির দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া আমরা সাহিত্য চর্চ্চায় নিমগ্নচিত্ত হই—যাহা সৎ, উচ্চ, জীবনবর্দ্ধক, সাহসের সহিত সে সকল ভাবকে বরণ করিয়া লই এবং ধীর সমাহিত চিত্তে সুসংস্কৃত সুসংযত ভাবব্যঞ্জক ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে যত্নপর হই। ক্ষণকালস্থায়ী যশ নয়—যাহা অক্ষয়, তাহাই যেন আমাদের কাম্য হয়।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত।

নেপালী দরবার।

(৩)

——:০:——

আমার লিখিত "নেপালী দরবার" পাঠ করিয়া অনেকে আমাকে মৌখিক আক্রমণে লবেজান করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহারা বলেন "কোথায় আপনার দরবারি, কোথায় বা ভ্রমণ কাহিনী, এ যে ধান ভানিতে শিবের গীত।" আমি মনে করিয়াছিলাম প্রথমে সংক্ষেপে নেপাল আগমন বার্ত্তা শেষ করিয়া স্বাধীন নেপালের ইতিহাস ও বিবরণ প্রকাশ করিব তৎপরে আমার ভ্রমণ কাহিনী বিশদরূপে লিখিব। কিন্তু পাঠকগণ অধৈর্য্য হইয়া আমার ঝুলি হইতে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের মনোমত জিনিষ টানিয়া বাহির করিতে আয়োজন করিয়াছেন। প্রবন্ধ লেখক মাত্রেই পাঠকের সেবক; সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইবেনা।

নেপাল স্বাধীন দেশ। পাহাড় পর্ব্বতে ভরা চারিদিকে, মাথা খাড়া করিয়া পাহাড়গুলি দাঁড়াইয়া আছে, যেন উহারা অনন্তকাল কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। সে বুঝি আর আসিল না, তাই উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া চাহিয়া আছে।

হিমালয় অনেকেই দেখেন নাই কিন্তু তাহার নাম বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। হিমালয়ের ছোট খাট সন্তানগুলি সারা নেপাল জুড়িয়া পাহাড়া দিতেছে। পার্ব্বত্য লোকেরা যেমন হইয়া থাকে নেপালীরাও তেমনই। তাহারা সাহসে অর্জ্জুন, বলে ভীম, সত্যবাদীতায় যুধিষ্ঠির, ক্রোধে দুর্ব্বাসা, পরোপকার ও দয়ায় বশিষ্ঠ, মন্ত্রণায় শ্রীকৃষ্ণ। এই যে পর্ব্বতগুলি খাড়া হইয়া আছে তাহারা যেন দেশটাকে স্বাধীন করিয়াই রাখিয়াছে। পার্ব্বত্য পথে চলিতে চলিতে কত যে চড়াই, উৎরাই পাইয়াছি তাহা বলিতে নাই। চড়াই, উৎরাইটা কি তাহা বোধ হয় সকলে বুঝিতে নাও পারেন— উপরেরদিকে উঠিতে হইলেই উহাকে চড়াই ও নীচেরদিকে

নামিতে হইলেই উৎরাই কহে। চড়াইর বেলায় চলিতে বড় কষ্ট হয়; দুই পা, দুই হাটু যেন ভাঙ্গিয়া আসে; অনভ্যাসীর পক্ষে উঠিতে উঠিতে স্থানে অস্থানে বিশ্রাম করিতে হয়। সে দেশীয়েরা টক্ টক্ করিয় ধাপ ছাড়াইয়া উপরে উঠে, আর নীচে নামিবার বেলায় উৎরাইর সময় বেশ করিয়া নামিতে আমরা অভ্যস্ত। আমরা বাঙ্গলার লোক, আমাদের অধোগতির বেশ অভ্যাস আছে। নিম্ন দিকেই বেশ চলিতে পারি, তাই বাঙ্গালীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ।

নেপাল স্বাধীন দেশ, তাই এ অধীনের কাছে বড় খাপছাড়া গোছ লাগিয়াছিল। পোষা পাখী খাচাটাকেই ভালবাসে, যদি তাকে ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীন করিয়া দেওয়া যায়, তবুও সে ঐ খাচাটাকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া খাচার উপর ফিরিয়া আসে, যেন ইহাই তার সর্ব্বমোক্ষদাতা। তেমনই স্বাধীন দেশের হাওয়াটুকু যে আমাকে বদ হজম আনিয়া দিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? নেপালী ভদ্রলোকেরা আমার সহিত বড় সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহা আমার জাতীয় গৌরব বলিয়া মাথায় করিয়া লইয়াছি। বাঙ্গালীকে সব দেশের লোকেই খাতির করে, আমি তাদের নিকট সে খাতির পাইয়াছি আমাদের জাতির দোহাই দিয়া। নেপালী ব্রাহ্মণের গৃহে আমি আহার করিতাম। মধ্যাহ্নে অন্ন, রাত্রে লুচি বা রুটী প্রধান খাদ্য করিয়া লইয়াছিলাম।

যখন শিবরাত্রির ধুম লাগিয়া গিয়াছিল, তখন আমি পশুপতিনাথ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম। গুরুজী আমার তথায় যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এই যে কাণ্ডেট্যানের কথা পূর্ব্বে কহিয়াছি, আমি সেই পান্সী নৌকায় মানুষের ঘাড়ে চাপিয়া তথায় যাত্রা করিলাম। কাটমুণ্ড হইতে পশুপতিনাথ ৮ মাইল। এই অল্প পথটুকুর মধ্যেও চড়াই, উৎরাই রহিয়াছে। প্রাতে সেখানে গিয়া ঝরণায় স্নান করিলাম। লোকসমুদ্র ভেদ করিয়া মন্দিরে যাওয়া মস্ত এক ব্যাপার। ভারতের প্রায় সকল দেশের সাধু সন্ন্যাসী এখানে পাইলাম। ইহারা বড় আনন্দে পশুপতিনাথ দর্শনের জন্য বহুদূর দেশ হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া পুণ্যার্থে সমাগত হইয়াছিলেন। যে সকল বাঙ্গালী সাধু সন্ন্যাসী পাইয়াছিলাম তাহাদের সঙ্গে এক মুহূর্ত্তেই বেশ খাতির জন্মিয়া গিয়াছিল। স্বজাতি স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশে খুব শীঘ্র প্রেম জন্মিয়া থাকে। যাহারা বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, এই অভিজ্ঞতাটুক তাহাদের বেশ সহজেই জন্মে।

এই বিশাল জন সমুদ্রের মধ্যে আমিই একমাত্র বাবুবেশধারী বাঙ্গালী। তাই অনেকের চক্ষুই আমার উপর পড়িতেছিল। এই মহাতীর্থে খাইবার ব্যবস্থা ময়দার ভাজা জিনিষ আর ক্ষীরের লাড়ু। ছানা এদেশীয়েরা প্রস্তুত করে না, তাই আমাদের দেশের ন্যায় ছানার মিঠাই এখানে পাওয়া যায় না।

আমি এই জন সঙ্ঘের অভিনব তামাসা দেখিবার জন্য সেদিন সেখানে রহিয়া গেলাম। "হর হর বোম্ বোম্" শব্দে আকাশ, পাতাল, সমগ্র দিগন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। সকলের হৃদয়েই অভিনব ধর্ম্মোন্মত্ততার ভাব। এভাব যাহারা দেখিয়া প্রমত্ত হইয়াছেন তাহারাই বুঝিয়াছেন ইহা কিরূপ ব্যাপার। রজনীতে শিব পূজা। সকলেই পশুপতিনাথ মহাদেবের মস্তকে জল, বেলপাতা, ফুল দিবার জন্য একাগ্রচিত্তে দণ্ডায়মান। একে একে সকলেই ভক্তি ভরে তাহা করিতেছেন। গৃহীরা সাধু সন্ন্যাসীদিগকে অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিতেছেন। আমিও শিবের মাথায় ফুল, জল দেওয়ার জন্য দিনমান অনাহারে ছিলাম। বাঙ্গালী বাবু দেখিয়া আমাকেও সকলে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল। মন্দিরটী বৃহৎ,—অতি প্রাচীনকালের নির্ম্মিত। বাঙ্গালী বলিয়া সকল লোকই যে আমাকে অতিশয় খাতির করিত ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

রাত্রে দেখিতে পাইলাম যাত্রীর দল দিনমানের বহু পরিশ্রমে যেথানে সেখানে পড়িয়া গিয়াছে। গাছতলা, বাগান, মাঠ কোনখানেই বাদ নাই, যেন যুদ্ধে আহত সৈনিকের ন্যায় পড়িয়া গিয়াছে, কত তাদের হৃদয়ের ভক্তিভাব! এই ধর্ম্মোন্মত্ততা দেখিলেও যে একটু পুণ্য না হয় একথা বলিতে পারি না। আমার এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দভাব হইয়াছিল। রজনী যোগে আমার আশ্রয়স্থান হইয়াছিল মন্দিরাধ্যক্ষ বা সেবাইতের রমণীয় গৃহ। শীত তখন সে দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার আয়োজন করিতেছিল, তাই যাহারা গাছতলায় ও মাঠে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদের কোন কষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

রাত্রে আমি দেবালয়ের প্রসাদ পাইলাম। পশুপতিনাথ ব্যতীত এখানে আরো কয়েকটী দেবালয় আছে। তাহাদের সেবা পূজা নেপাল রাজসরকার হইতেই হইয়া থাকে। ইহাদের জন্য দেবোত্তর জমা জমি আছে। এই সকল দেবালয় অতি প্রাচীনকালের। যখন আমাদের দেশে লৌহবর্ত্মের প্রচলন হয় নাই, তখন শিবরাত্রি যোগে এত অধিক লোক দেব দর্শনে এখানে আসিত না। নেপালে রেল না গিয়া থাকিলেও আমাদের দেশের দূরবর্ত্তী স্থান হইতে নেপালের সীমান্তে পঁহুছিবার সুবিধা হইয়াছে বলিয়াই যাত্রীর ভিড় বেশী হইতেছে। আমি পরদিন শিবচতুর্দ্দশীর পারণ সেই সেবাইত ব্রাহ্মণের গৃহে করিয়া চড়াই, উৎরাইর পথ দিয়া নেপালের রাজধানীতে পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম।

নেপালের পাহাড়গুলি বড় সুন্দর, যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে বিধাতা সাজাইয়া রাখিয়াছেন। সমুদ্রে যেমন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের অভিনব বিশেষত্ব আছে এখানে কিন্তু তেমন কিছু নাই অনেক স্থানে প্রহরেকের পূর্ব্বে সূর্য্য দেখা যায় না, কোথাও বা প্রহরেক বেলা থাকিতেই সূর্য্য দৃষ্টি পথের অতীত হন। সূর্য্য দৃষ্টির অতীত হইলেও অন্ধকার আসিয়া সে রাজ্য দখল করে না। যখন অন্ধকার হয় তখন বুঝিতে হইবে সূর্য্য পৃথিবী হইতে গা ঢাকা দিয়াছেন।

পর্ব্বত যে রমণীয় স্থান ইহা আমাদের পুরাণাদিতেও পাওয়া যায়। পর্ব্বত হইতেই পার্ব্বতী নাম হইয়াছে, দেবী পার্ব্বতীকে হিমালয়ের কন্যা বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, হিমালয় প্রদেশের রাজকন্যা বলিয়াই তাহাকে হিমালয়ের কন্যা বলা হইয়াছে এবং তজ্জন্যই তাহার নাম পার্ব্বতী রাখা হইয়াছে। তাই আমরা পর্ব্বতকে দেবতা বলিয়া মানি, পর্ব্বতকে পূজা করি। দেবত্বের ভাবটুকু রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বতেই বুঝি আছে। পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে দেবতা জ্ঞান করা হইয়াছে। পর্ব্বতের ঝরণাগুলি আরো সুন্দর, কল্ কল্ তর্ তর্ করিয়া জলরাশি ঊর্দ্ধ হইতে নীচে বেগে নামিয়া আসিতেছে। স্বচ্ছ, স্ফটিক সদৃশ সলিলরাশি যেন নীচে কাহার উদ্দেশে চলিয়া যাইতেছে। কি যেন কোথায় হারাণ বস্তু পুনঃ প্রাপ্তির আশায় তাহার পিছে পিছে বেগে যাইতেছে। অহো কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! পার্ব্বত্য নরনারীরা এই জলে অবগাহন করিয়া কত না তৃপ্তি লাভ করে। এই স্বচ্ছ সলিল তারা পান করিয়া অসুরের বল দেহে ধারণ করিয়াছে।

পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া নেপাল অনুর্ব্বর নহে; বেশ ফশল হয়, ধান্যাদি প্রচুর হয়। এখানে এমন সকল ধান্য দেখিলাম, যাহা বাঙ্গালায় হয় না। এক প্রকার ধান্য দেখিলাম উহার ধান্যে ও খড়ে সুগন্ধ আছে, চাউল ও অন্নে ততোধিক সুগন্ধ, এক বাড়ী রান্না হইলে চতুর্দ্দিকে বাড়ীময় সুগন্ধ ছড়াইয়া পড়ে। ইহাই দেব ভোগের অন্ন। আমি এই অন্ন এখানে অনেক দিন খাইয়াছি। আমার মনে হয় ইহার নাম বাঁশমতী। আর এক রকম ধান্য আছে উহার নাম চাঁপা, চাপাফুলের সুগন্ধ তাহাতে স্পষ্ট পাওয়া যায়। কলাবতী ধান্যে কলার সুগন্ধ বর্ত্তমান। অন্যান্য ফল, ফুল নেপালে প্রচুর, আমাদের দেশে সেগুলি দুষ্প্রাপ্য। নেপালের বন জঙ্গলে অনেক দুর্লভ ফল ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ রাজের যুদ্ধ ফেরতা অনেক বীর পুরুষ নেপালে পাইয়াছিলাম। তাহারা অনেকে পেন্‌সন্ পাইয়া নেপালে বাস করিতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে নেপাল গবর্ণমেণ্টের মারফতে সেই পেনসনের টাকা তাদের হাতে আইসে; কেহ কেহ বা ইংরেজ রাজ হইতে গোরক্ষপুর, বেতিয়া প্রভৃতি স্থানে পেন্‌সনের পরিবর্ত্তে জমি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা কেহ বা সেই প্রদেশেই ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছে; কেহ বা নেপালে থাকিয়াই তাহার ফশলাদি ভোগ করিতেছে।

নেপালের লাইব্রেরী একটী প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। এই রাজ লাইব্রেরীতে "ভৃগু সংহিতা" নামক জ্যোতিশাস্ত্রের একটী বিশেষ গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থ ওজনে কয়েক মণ এবং অতি বৃহৎ ও হস্ত লিখিত। এই গ্রন্থ ভারতের কোথাও আর নাই বলিয়াই অনেকে জানেন। আমি এই গ্রন্থ রাজ লাইব্রেরীতে দেখিয়াছি। রাজগুরু শ্রীযুক্ত সূর্য্যপ্রসাদ মিশ্র মহাশয় এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আশ্চর্য্য ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং কোষ্ঠি, করকোষ্ঠি, কপালকোষ্ঠি প্রভৃতি দেখিয়া এবং অন্যান্য গণনা দ্বারায় পূর্ব্ব ও পর জীবনের বিবরণও বলিতে পারেন, আমি তাঁহার ঐরূপ গণনা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। তিনি কলিকাতায় থাকা সময়ে তাঁহার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকে মুগ্ধ হইয়াছেন।

কাশ্মীর বাসকালে ভৃগু সংহিতা নকল করিয়া আনিতে আদেশ পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমার তখন অর্থ ও সময়ের বড় অভাব ছিল। কাশ্মীরে ভৃগু সংহিতা সম্পূর্ণ না হউক কতকাংশ আছে। ভৃগু সংহিতা না পড়িলে জ্যোতিশাস্ত্র—পাঠ সম্পূর্ণ হয় না, ইহা সত্য কথা।

নেপালে গাড়ীর চলন একরূপ নাই বলিলেই চলে। নেপালীরা মাল আমদানী রপ্তানী করে মহিষ, গাধা ও অশ্ব সাহায্যে। এক একটা ছাগলের পৃষ্ঠে উহারা যে বোঝাই দেয়, তাহা এদেশের এক একটা ঘোড়ার বোঝার সমান। মহিষগুলি প্রচুর মাল বহিতে পারে। গরুর পীঠেও তাহারা বোঝা দেয়। আমাদের দেশী গরু অপেক্ষা এগুলি অনেক বলিষ্ঠ।

বাজারে বিলাতি মাল প্রচুর। আগে ভাবিয়া ছিলাম স্বাধীন দেশে বোধ হয় বিদেশী মাল নাই। কিন্তু সহরের ইন্দ্রচক্ বাজার দেখিয়া আমার সে ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে। এখানেও বিলাতি জিনিষের ছয়লাপ। বিলাতি দ্রব্যের মধ্যে সিগারেট, সুগন্ধি প্রভৃতির অভাব নাই। এই সকল বিলাতি জিনিষে নেপালীরাও আমাদের মত বাবু হইয়া কাবু হইয়াছে। বিলাসিতা তাহাদের রক্তমাংসে জড়িত হইয়াছে।

এখানকার বাজারে নিত্য প্রচুর দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত পাওয়া যায়। নেপালীরা তা প্রচুর আহার করে। এই গব্যে যতটা পোষকতা গুণ আছে, বিলাতি মালে তাহার একাংশ আছে কিনা সন্দেহ। দুগ্ধাদি বড় সস্তায় বিক্রী হয়। এক টাকায় চারি সের ঘি পাইতে আমি দেখিয়াছি। এখন শুনিয়াছি তাহার মূল্য চড়িয়াছে। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে যাইয়া মাড়োয়ারী ঘৃত ব্যবসায়ীরা দাম চড়াইয়া দিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দুধের দামও চড়িয়াছে।

এদেশে ইক্ষুর চিনি বেশ পাওয়া যায়; তবে এদেশীয়েরা বিলাতি চিনি বেশী ব্যবহার করে। বোধ হয় ইহা অত্যন্ত সাদা বলিয়া ইহার আদর এখানে বেশী। মিঠাই করিতে হইলেও এই চিনি ব্যবহার হয়; তজ্জন্য মিঠাইগুলি বড় সাদা হয়। নেপালীরা আপাতঃ মধুর চাক চিক্যে মুগ্ধ হইয়াই বিলাতি জিনিষের আদর করিতে শিখিয়াছে। চা এখানকার লোকে খুব ব্যবহার করে, দেশে প্রচুর দুধ থাকিতেও তাহারা বিলাতি দুধের আদর করিয়া থাকে। বিলাতি মদ এখানে অধিক ব্যবহৃত হয় না। এখানে অনেকেই রস বা সোমরস পান করিয়া থাকে। উহা ব্যবহারে শীত প্রধান দেশে শরীর বেশ গরম থাকে। অন্যান্য মদ্য অপেক্ষা ইহা খুব পুষ্টিকর ও নির্দ্দোষ। কলার মদও তাহারা ব্যবহার করে, এই মদ্যে কলার স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায়।

রাজাকে নেপালীরা দেবতা জ্ঞান করে এবং তাহারা রাজার আদেশ অবলীলা ক্রমে পালন করে। নেপালে রাজা অপেক্ষা মন্ত্রীর প্রভুত্ব অনেক বেশী। মন্ত্রী রাজ পরিবার হইতে নির্ব্বাচিত হয়। রাজার ভ্রাতারই মন্ত্রীত্বের দাবি অগ্রগন্য। নেপালে বিচার হয় ফরাসে বসিয়া; আসামীরা দাঁড়াইয়া থাকে, উকীলেরা হাটু গাড়িয়া বসিয়া হাকীমের কাছে মামলা বিষয়ক তর্ক বিতর্ক করেন। হাকিমেরা কাছারীতে আসেন কাণ্ডেট নামক পানসী নৌকার মত যানে, মানুষের কাধে চড়িয়া। এখানকার হাকিমদের বেশ প্রতিপত্তি আছে। আমাদের দেশে তক্ত ছাড়িলেই হাকিম সাধারণ মানুষের মত হইয়া যান; নেপালে কিন্তু হাকিম সর্ব্বদাই হাকিম থাকেন। রাজা জঙ্গবাহাদুর দেশ শাসনের জন্য যে আইন কানুন প্রণয়ন করিয়াছিলেন এখনও তাহাই চলিতেছে। জঙ্গবাহাদুর অতি বুদ্ধিমান, রাজনীতি সম্পন্ন ছিলেন। ইংরাজের আইন কানন ঘাটিয়া তাহা দিয়াই দেশোপযোগী আইন করিয়াছিলেন। এখানে গো-বধ হয় না। গো-বধকারীর গুরুতর দণ্ড হয়। আগে তজ্জন্য প্রাণদণ্ড হইত, রাজা জঙ্গবাহাদুর দণ্ড কমাইয়া দিয়াছেন। রাজা জঙ্গবাহাদুরের শাসন ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় ঘটনাবলী আমার পরবর্ত্তী কাহিনীতে পাওয়া যাইবে।

নেপালে সকলেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির নহেন। তথায় চোর বদমায়েসও বেশ আছে। প্রবাসীরাই অধিকতর চোর বদমায়েস। ইহারা শিক্ষিত কুকুর দিয়া পথিকের মাল চুরি করাইয়া আনে। চোর কুকুরগুলি আস্তে আস্তে ঘরে আসে ও চট করিয়া বেমালুম বুচকি পেটারা মুখে লইয়া পলায়ন করিয়া তাহার স্বামীর নিকট লইয়া যায়। কুকুর অনেক গৃহস্থ-গৃহ পাহাড়াও দেয়, বিনানুমতিতে কেহ গৃহে প্রবেশ করিতে পারেনা। তাহা করিলে কুকুর সেরূপ পথিককে কামড়াইয়া ধরে।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

আমার মনে হয় বিজ্ঞান শাখার প্রথম আলোচনার বিষয় বিজ্ঞানের বাঙ্গালা কি প্রকার হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষার আকৃতি কি প্রকারের হইবে এ বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন কথাবার্ত্তায় যে ভাষার প্রচলন সেই ভাষাই লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। আর একদল লিখিত ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন মনে করেন। সকলেই জানেন ইংরাজীতে এক সময়ে এই পার্থক্য বিশেষভাবে রক্ষিত হইত। তখন ইংরেজী ভাষায় লাটিন ও গ্রীক মূলক কথার অধিক প্রাধান্য ছিল। এখন, সরল সহজ স্যাক্সন ইংরাজীই সাধারণতঃ আদৃত ও প্রচলিত। সুতরাং যাহারা ইংরাজীর চর্চ্চা অনেক দিন হইতে করিয়া আসিয়াছেন তাহারা যে লিখিত ও কথিত বাঙ্গালার পার্থক্য রক্ষা করা অসঙ্গত মনে করিবেন ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু বিভিন্ন ভাষায় পরস্পরের তুলনা হইতে পারেনা, যাহা হউক এই বিষয়ের মীমাংসা বাক বিতণ্ডার দ্বারা সংসাধিত হইতে পারেনা। যে ক্রমোন্নতি ও ক্রম বিকাশের নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচলিত সেই নিয়মেই বাঙ্গালা ভাষার আকৃতি নিয়মিত হইবে। এ বিষয়ে অবশ্যই তর্ক যুক্তি চলিতে থাকিবে। ইহাও উন্নতির নিয়ম। তবে আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ কোন কালেই তর্ক ও দ্বন্দের মধ্যে পার্থক্য অনেক সময়েই বুঝিতে পারেন না, ইহাই দুঃখের বিষয়। এই স্থলে ভাষা সম্বন্ধে আর একটি কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আপনাদের সকলেরই স্মরণ আছে, গত বৎসর সম্মিলনের সভাপতি মাননীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিরূপ ওজস্বিনী ভাষায় বাঙ্গালী বিজ্ঞানবিদ্‌দিগকে বাঙ্গালাতেই তাঁহাদের গবেষণা লিপিবদ্ধ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। যে অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমে চালিত হইয়া তিনি এই প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার সম্মুখে তর্ক যুক্তি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ শোভা পায়না। আমিও তাহার চেষ্টা করিব না। তবে ইহা নিশ্চিত যে বাঙ্গালা ভাষার পূর্ণউৎকর্ষ ও শ্রীবৃদ্ধি ততদিন সংসাধিত হইবেনা যতদিন ইহা কেবল প্রধানতঃ পদ্য ও প্রহসনের ভাষা থাকিবে। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমাদের পক্ষে বাঙ্গালা ও ইংরাজী দুই ভাষাতেই সম্যক ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যাহারা এ বিষয়ে তর্ক যুক্তি করিতে যান তাহারা বাঙ্গালা বা ইংরাজী একটী ভাষার পক্ষপাতী। কেহ বলেন আমাদের পক্ষে ইংরাজীতে কাজ চালাইতে পারিলেই যথেষ্ট, তাহাতে অধিক সময় ক্ষেপন করার প্রয়োজন নাই। আবার কেহ বলেন বাঙ্গালা লইয়া অধিক সময় নষ্ট করা উচিত নহে। আমার মনে হয় ইংরাজী ও বাঙ্গালার মধ্যে বাস্তবিক এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। এবং সেই জন্যই আমাদের পক্ষে ইহা এক বিশেষ সমস্যার কথা। যে অলৌকিক ঘটনা সূত্রে বিধাতার বিধানে আমাদের এই সমস্যা পূরণ করিতে হইতেছে তাহার আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না, যে দুই সম্পূর্ণ পৃথক চলিত ভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে যে সময় ক্ষেপ ও কষ্ট কল্পনা প্রয়োজন তাহা আমাদিগকে করিতেই হইবে। কোন চলিত ভাষায় বলিতে ও লিখিতে হইলে সেই ভাষাতেই না ভাবিলে চলেনা। আমাদিগকে তাই ইংরাজী লিখিবার ও বলিবার সময় ইংরাজীতে ভাবিতে শিক্ষা করা প্রয়োজন। সেইরূপ বাঙ্গালায় লিখিতে ও বলিতে হইলে বাঙ্গালাতেই ভাবিতে হইবে। দুই ভাষাতেই প্রয়োজনমত ভাবিতে শিক্ষা করা সহজ নহে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের মত লোকে নিজ প্রতিভা বলে ইহা সহজে করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু সাধারণতঃ ইহার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রের বিশেষ সাধনা প্রয়োজন এবং ইংরাজী ভাষা শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। আমার একটী সাত বৎসরের কন্যা শিশুপাঠ্য রামায়ণ ধ্রুবচরিত্র প্রভৃতি অতি সহজে পড়িতে পারে, অথচ ইংরেজীতে ৭ বৎসরের ইংরেজ বালিকার মত কথাবার্ত্তা কহিতে পারে। আমার মনে হয় আমরা শিক্ষা প্রণালীর দোষ শিক্ষা নীতির উপর আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। তাই আমি বিশ্বাস করি আমরা ভাব

সমস্যা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তাহার পূরণের কোনও আয়োজনও করিনাই। ইংরেজী নবিশ যাহাদের বলা হয় তাহারা ইংরাজিতেই ব্যুৎপত্তি লাভের চেষ্টায় ব্যস্ত কিন্তু আমাদের বিদ্যালয় সকলে যে পন্থা অবলম্বিত হয় তাহাতে অনেক পরিশ্রম স্বত্বেও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ ফললাভ হয় না। বাঙ্গলার প্রতিও সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকেনা। তাই বাঙ্গলা ইংরাজী কোন ভাষাতেই আমাদের ব্যুৎপত্তি হয় না। সেই জন্য আমাদের রীতি পদ্ধতি এক বিশেষ প্রকারের হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় এই রীতি পদ্ধতি বাহিরের লোকের পক্ষে কত কৌতুকজনক হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজি বাঙ্গালায় মিশাইয়া বা ভুল ইংরাজীতে পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা, ভুল ইংরাজিতে আত্মীয় স্বজনের সহিত চিঠিপত্র লিখা ইত্যাদি সকলই আমাদের বিশেষ অস্বাভাবিকতা প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এবং সকল প্রকারের দৈনন্দিন অস্বাভাবিকতা যে উচ্চ জাতীয় জীবন গঠনের অন্তরায়, ইহা যদি বৈজ্ঞানিক সত্য হয় আশা করি আমার মত অব্যবসায়ীর পক্ষেও ভাষা বিষয়ে এতগুলি কথা বিজ্ঞান শাখার সম্মুখে উত্থাপন করা অযৌক্তিক বলিয়া আপনাদের মনে হইবেনা। ইংরাজী ভাষা বিষয়ে আমি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি তাহা বিজ্ঞান শাখায় বিশেষভাবে চিন্তার বিষয়। আমাদের মৌলিক গবেষণা সম্প্রতি প্রধানতঃ ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। সুতরাং এই বিষয় একটু চিন্তাকরিয়া দেখা যাউক। সকলেই জানেন নিউটনের সময়েও বিজ্ঞান তত্ত্ব লাটিনে লিপিবদ্ধ হইত। ক্রমশঃ বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির নিজ নিজ ভাষার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রথা লোপ পাইয়া গিয়াছে। তাহাতে কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্‌গণের কষ্টের লাঘব না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়াছে। এখন আর অনেক গুলি ইউরোপীয় ভাষা না জানিলে সুচারুরূপে বিজ্ঞান চর্চ্চা করা চলেনা। সুতরাং বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ভাষা প্রমাদ হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। এই জন্য বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কথায় সায় দিয়া বলিতে পারিনা "ইংরাজী ও বাঙ্গালার মিশ্রণে যে খেচুরী ভাষা প্রস্তুত হয় বিজ্ঞান অধ্যাপনা কার্য্যে ঐ ভাষা ব্যবহারে শিক্ষক বা ছাত্র কোন অসুবিধা বোধ করেন, তাহার কোন প্রমাণ পাই না"। তাঁহারা অসুবিধা বোধ না করিতে পারেন কিন্তু এইরূপ খেচুরী ভাষা ব্যবহার যে আমাদের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক এবং যথার্থ শিক্ষার অন্তরায়, তাহা বেশ বলা যাইতে পারে। আমার একজন প্রবীণ শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিতেন, ইংরেজী ও বাঙ্গালা মিশাইয়া না বলিতে হইলে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা কহিতে হয়। বাস্তবিক আমরা সম্পূর্ণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা কহিবার যে আয়াস তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক বলিয়াই এই খেচুরী ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই আয়াস যদি বিজ্ঞান শিক্ষক ও তাঁহার ছাত্রেরা লইতে অনিচ্ছুক হন তাহা হইলে বিজ্ঞান শিক্ষাই বৃথা হইয়া পড়ে। কারণ অনেকগুলি বিজ্ঞান তত্ত্ব জানিলেই বিজ্ঞান শিক্ষা হইল না। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনই যদি বিজ্ঞান শিক্ষার একটী বিশেষ লক্ষ্য হয় তাহা হইলে খেচুরী প্রথা পরিত্যাগ করা একান্তই প্রয়োজন। যে ব্যোম সম্পন্ন ক্ষেত্রে তড়িৎ ও চুম্বক শক্তির যুগপৎ আবির্ভাব নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিষয় সম্যক অনুধাবন করিতে যে বুদ্ধি শক্তি চালনার প্রয়োজন হয় তাহার সহিত তুলনায় বিজ্ঞানানুমোদিত প্রথানুসারে বিশুদ্ধ ইংরাজী শিক্ষাকরা সহজ সাধ্য! ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। বিশেষতঃ পারিপাট্য ও পূর্ণতাই যথার্থ শিক্ষার অঙ্গ। যাহাই করিনা কেন, যতটুকুই করিনা কেন, পরিপাটিরূপে করিতে হইবে। এই নীতি অবলম্বন করিলে আমাদের সকল শিক্ষাই পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়।

যদি ইংরাজী বলি ও লিখি বিশুদ্ধ ইংরাজী বলিব ও লিখিব, যখন বাঙ্গালা বলিব ও লিখিব তাহা ও খাটী বাঙ্গালা হইবে। এই নীতিই শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত নীতি। তাহা না হইল সকলি পণ্ডশ্রম হইবে। কিন্তু ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা ও তাহাতে এক্ষণে গবেষণা প্রকাশ করা প্রয়োজন বলিয়া বাঙ্গালাকে বিন্দুমাত্র অবহেলা করিলে চলিবেনা। বিশেষতঃ বিজ্ঞান শাখার সভ্যদিগের এই বিষয়ে দায়িত্ব অনেক। বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তকের অভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন ইহার মুখ্য কারণ শ্রদ্ধার অভাব, প্রীতির অভাব, অনুরাগের অভাব, প্রেমের অভাব। আমি আপনাদিগকে আজ তাহার এই কথা কয়টী

স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত মনে করিতেছি এবং সকলকে এই বিষয়ে চিন্তা করিতে আহ্বান করিতেছি। তবে ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে এতদিন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তক পাঠ করেন এরূপ লোকের সংখ্যা বড়ই অল্প ছিল। এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা যে স্থান অধিকার করিয়াছে তাহাতে মনে হয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিবার ও পড়িবার লোকের অভাব হইবে না। নূতন নিয়মানুসারে যাহারা বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হইতে যাইবেন তাহাদিগকেও বাঙ্গালার পরীক্ষা দিতে হইবে। সুতরাং এমন সময় আসিয়াছে যখন এই বিজ্ঞান শাখা বাস্তবিকই আপনার সার্থকতা সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারেন। আপনারা সকলেই এই কার্য্যে ব্রতী হউন এই আমার প্রার্থনা। কিন্তু এই কার্য্যে সফলকাম হইতে হইলে আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চ্চার আরও উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন। সে বিষয় আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা যে মেধা, যে জ্ঞানস্পৃহার উত্তরাধিকারী তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। ভারতের প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ যে অনেক আশ্চর্য্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেখাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় প্রাচীন হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণ যে প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার ফলে তাহাদের আবিষ্কৃত অনেক তত্ত্বই লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রমাণস্বরূপ একটী কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রে আলোক ও রশ্মি সম্বন্ধে কয়েকটী বিচার লিখিত আছে। তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় আলোকতত্ত্ব তখন ও তাহার পূর্ব্বে অনেক পণ্ডিতই আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের সেই সকল গবেষণা হয়ত লিপিবদ্ধই হয় নাই। শিষ্যানুশিষ্য পরম্পরা চলিয়া আসিয়া ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে হিন্দু গণিতের এই বিপদ ঘটে নাই। সুতরাং তাহার বিষয় কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা সম্ভব। জ্যামিতি ও বীজগণিতবে হিন্দুদিগের আবিষ্কার, ইহা আজকাল সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষের প্রাচীনত্ব খণ্ডন করিয়া অনেক ইউরোপীয় লেখক অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। যদিও গ্রীস দেশের লেখকেরা আপনারাই অনেকে স্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা হিন্দু জ্যোতিষের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী। তথাপি কোন কোন ইউরোপীয় লেখকের যুক্তি এই যে যখন হিন্দু জ্যোতিষ পুস্তকে অনেকগুলি গ্রীক কথা পাওয়া যায় তখন সমগ্র হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রই গ্রীক হইতে গৃহীত কিন্তু এই যুক্তি যে ভ্রমাত্মক ইহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রথম কথা আমার বিশ্বাস সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থ সমূহের কোনটীই একজন লেখকের রচিত নহে। কোন জ্যোতিষী প্রথমে কয়েকটী মাত্র শ্লোক রচনা করেন। তিনি অধ্যাপনাকালে তাহাদের অর্থ এবং কি প্রকারে তাহাদের অন্তর্ভূত নিয়মগুলি সংগৃহীত হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিতেন। ক্রমশঃ শ্লোকের সংখ্যা তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যানুশিষ্যদের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে চলে এবং অবশেষে এই সকল শ্লোক লিপিবদ্ধ হয়। যিনি লিপিবদ্ধ করেন তিনি হয়ত কেবল প্রথম কয়েকটী মুখবন্ধরূপে রচনা করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় যে সকল গ্রন্থে নানা প্রকারের শ্লোক থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সূর্য্য সিদ্ধান্তেও ফলিত জ্যোতিষের কয়েকটী শ্লোক আছে সেই জন্য যেমন ইহাকে ফলিত জ্যোতিষের গ্রন্থ বলিয়া বর্ণন করা যায় না, তেমনই কোন জ্যোতিষ গ্রন্থে গ্রীক জ্যোতিষের কথা প্রাপ্ত হইলেই সমগ্র জ্যোতিষ শাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে গ্রীকদের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া বলা যাইতে পারে না। ইহা সত্য যে হিন্দুজ্যোতিষগণ প্রয়োজন হইলে অন্য দেশীয় জ্যোতিষতত্ত্ব গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন কি কোন কোন সিদ্ধান্ত গ্রীক জ্যোতিষতত্ত্ব বর্ণনা কল্পেই লিখিত হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ বরাহমিহির কৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

বরাহমিহির বলেন পৌলিস, রোমক, বশিষ্ঠ, সৌর, পৈতামহ এই পাঁচটী সিদ্ধান্ত। এই পাঁচটীর মধ্যে প্রথম দুইটী লাটদেব রচিত। বাস্তবিক এই দুইটী গ্রীক জ্যোতিষ অবলম্বনে লিখিত। পৌলিস অনেকটা নির্ভুল, রোমক তদপেক্ষা এবং সৌর সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভুল। অন্য দুইটীতে অনেক ভ্রম বিদ্যমান। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় হিন্দুজ্যোতিষগণ প্রয়োজন মত বিজাতীয় জ্যোতিষ আলোচনা করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে বিজাতীয়

জ্যোতিষের তত্ত্ব সন্নিবেশিত দেখিলেই তাহাদের নিজস্ব কিছু নাই বলিয়া ধরিয়া লওয়া নিতান্তই একদেশদর্শিতার ফল।

আর একদল লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, সমগ্র হিন্দুজ্যোতিষ না হউক রাশির চক্র গ্রীক জ্যোতিষ হইতে গৃহীত। আমি কিছুদিন এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে ইহার কোন প্রমাণই নাই বরং ইহার বিরুদ্ধে অগণনীয় যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এই বিষয়ে আলোচনা করিবার অগ্রে বলা আবশ্যক যে জ্যোতিষিগণ সূর্য্যের গতি নির্ণয় করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে তাহার দৃশ্যমান বার্ষিক কক্ষ কতকগুলি তারকা রাজির মধ্যে সন্নিবিষ্ট। সেই তারকারাজী দ্বাদশ দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং ইহাদিগকেই দ্বাদশ রাশি বলা হয়। এক এক রাশির মধ্য দিয়া যাইতে সূর্য্যের প্রায় একমাস করিয়া সময় লাগে সুতরাং সূর্য্য অমুক রাশির অমুক স্থলে আছেন বলিলে সূর্য্যের স্থান মোটামুটি নির্ণয় করা সম্ভব হয়। আজকাল জ্যোতিষ বেত্তারা এরূপ যন্ত্রাদির দ্বারা সূর্য্যের গতি নিরীক্ষণ করেন যে তাহার স্থান সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দেশ করা সহজ। কিন্তু যখন এ সকল যন্ত্র ছিল না ও গণিতের এত উৎকর্ষ হয় নাই তখন এই দ্বাদশ রাশী তত্ত্ব যে সূর্য্যের স্থান নির্ণয়ের অতি বিশিষ্ট পন্থা ছিল ইহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। সুতরাং যে জাতি এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাদের কৃতিত্ব যে প্রাচীন জ্যোতিষের উন্নতির বিশেষ কারণ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই জন্য এই প্রশ্নের বিশ্লেষণ ও নিরাকরণ আমাদের বিজ্ঞান শাখার একটী কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

যাঁহারা এ বিষয়ে বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষত্ব বুঝিতে অক্ষম। সেইজন্য তাঁহাদের দ্বারা যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ জ্যোতিষীদিগের পক্ষে স্বাভাবিক, সেইগুলি প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়াছে। সেইজন্য প্রথমেই দেখিতে হইবে কি প্রকারে দ্বাদশ রাশির আবিষ্কার সংসাধিত হওয়া সম্ভব। সূর্য্য কোন কোন নক্ষত্র রাজির মধ্য দিয়া আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করেন তাহা সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া স্থির করা অসম্ভব কিন্তু চন্দ্র যে সকল নক্ষত্র রাজির মধ্য দিয়া বিচরণ করে তাহা স্থির করা সহজসাধ্য।

বাস্তবিক জ্যোতিষিগণের পক্ষে চন্দ্রকে পর্য্যবেক্ষণ করা স্বাভাবিক; ইহার গতি, ইহার কলার বৃদ্ধি হ্রাস, ইহার গ্রহণ; ইহার শোভা সকলই স্বভাবতঃ প্রাচীন জ্যোতিষিগণের চিন্তা, গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণের বিষয় হইয়াছিল। হিন্দু জ্যোতিষিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই চন্দ্রের গতি নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বৈদিক সময়ে চন্দ্রের গতি দ্বারা সময় নির্ণয় করা হইত। তখনই সূর্য্যরশ্মির আংশিক পাতেই যে চন্দ্রকলার উৎপত্তি তাহা তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন এবং হিন্দুরাই প্রথম চন্দ্র মার্গকে ২৭টী অংশে বিভক্ত করিয়া এক একটী অংশকে এক একটা নক্ষত্র নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই ব্যবস্থা যে অনেক প্রাচীন তাহা সকলেই স্বীকার করেন। যখন এই সকল নক্ষত্রের প্রথম নামকরণ হয় তখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ কাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সুতরাং ইহার সময় খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৩ শতাব্দীর পূর্ব্বে। ইহা নিশ্চিত যে এত পূর্ব্বে কোন দেশে জ্যোতিষের এইরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রের গতি নির্ণয় করিয়া তদনুসারে বর্ষ ও মাস গণনা করিয়া হিন্দু জ্যোতিষিগণ ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। চান্দ্র মাস ও বর্ষ গণনায় অনেক অসুবিধা। চন্দ্রের গতি ঠিক করিয়া নির্দ্ধারণ করাও শক্ত। সেইজন্য সহজেই তাঁহারা সূর্য্যের গতি নির্ণয় করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য একেবারেই অসম্ভব নয় যে তাঁহারা চন্দ্রের গতি নির্ণয় করিয়া সূর্য্যের গতি নির্ণয়ের জন্য গ্রীক জাতির স্মরণাপন্ন হন। যদি তাহাই করিয়া থাকেন, তবে তাহা সিকান্দরের ভারত বিজয়ের সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। কিন্তু ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্যাবিলনে খ্রীষ্টের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দ্বাদশ রাশীর দ্বারা সূর্য্যের গতি নির্ণয়ের প্রথা ছিল। সুতরাং যদি হিন্দু জ্যোতিষগণ বিদেশ হইতে ইহা গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে ব্যাবিলন হইতেই ইহা গ্রহণ করা সম্ভব। গ্রীস হইতে নহে। এখন ব্যাবিলন হইতে গ্রহণ সম্বন্ধে একটি সহজ

কথা স্মরণ করিলেই সকল মীমাংসা হইয়া যায়। চন্দ্র গতি নির্ণয় করিয়া অমাবস্যা পূর্ণিমাতে চন্দ্র সূর্য্যের আপেক্ষিক স্থান নির্ণয় করা ভিন্ন প্রাচীন কালে যে সূর্য্যের গতি নির্ণয় করিবার অন্য কোন উপায় ছিল ইহা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং যে জ্যোতিষ রাশি নক্ষত্র দুই প্রথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছে তাহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সে কথা যাহারাই জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদিগকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা, তাহার পরেও জ্যোতিষ শাস্ত্র অপরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। কাশীর মান মন্দিরে রক্ষিত প্রাচীন যন্ত্রের দ্বারা আর আধুনিক কোন কার্য্য সম্ভব নহে। মধ্যে কত শতাব্দী যে জ্যোতিষ জগতে ভারতের সাড়া পাওয়া যায় নাই বলিতে পারি না। তাহার পরেও আর্য্যভট্ট ৪৭৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ কোপারনিকসের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর আহ্নিক গতি নক্ষত্র মণ্ডলের দৈনিক গতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহ মিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা প্রকাশ করেন।

এখন জ্যোতিষ শুধু জ্যোতিষ নয়, অন্যান্য সকল বিজ্ঞান আলোচনা বিষয়েই আমরা কোথায় পড়িয়া আছি কে বলিয়া দিবে? আজ ৬৫ বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিজ্ঞান জগতে তাহার স্থান কোথায়? ৬৫ বৎসর অতি অল্পদিন কিন্তু জাপান ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটন করিয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হইবে যে আমরা এ যুগেও অনেক সময় নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি। কেহ কেহ বলেন আধুনিক ছাত্রবৃন্দের জ্ঞান স্পৃহার অভাবই ইহার কারণ কিন্তু আমি এইরূপ বিচারে সায় দিতে প্রস্তুত নই। কারণ ইহা বিজ্ঞান সম্মত বিচার নয় —ছাত্রদিগের নিন্দা ও উপহাস। বিশ্ব বিদ্যালয়ের গবেষণায় ও বিজ্ঞান চর্চ্চার অক্ষুণ্ণ যোগ রাখিতে হইলে যে পথ অবলম্বন করিতে হয় তাহার ব্যবস্থা না করিয়া শুধু ছাত্রদের উপর সকল দায়িত্ব চাপাইলে চলিবে কেন? সে পন্থা কি বুঝিতে হইলে যেখানে এই যোগ বর্ত্তমান সেইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যে কেহ কেম্ব্রিজ বিদ্যালয়ে পদার্পণ করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন যে ইহার জন্য কি কি উপকরণ প্রয়োজন।

যেখানে বিদ্যা চর্চ্চা, বিজ্ঞান চর্চ্চা গবেষণা প্রবলবেগে চলিতেছে সেখানকার আবহাওয়াই অন্য প্রকারের। তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে যথেষ্ট ফল হইবে না। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রেরা বাস্তবিকই ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত। প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ছাত্রের ধর্ম্ম ছিল। আমাদের দেশে সেই নীতি এখন আর অবলম্বিত হয় না কেন? এখনও কেম্ব্রিজে সেই নীতিই বর্ত্তমান, তাই সেখানে যাহারা বিদ্যা চর্চ্চা করিতে যান তাহারা তাহাতে আত্মবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন না। সেখানে অধ্যাপকেরা বিজ্ঞান চর্চ্চায় এবং গবেষণাতে আত্ম বিস্মৃত এবং ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতে—আপনাদের পথে লইয়া যাইতে ব্যস্ত। এই পথ ভিন্ন যথার্থ গবেষণার অন্য উপায় নাই। এদেশে যেমন আইন ব্যবসায় একমাত্র ধন উপার্জ্জনের পথ সেখানে সেইরূপ ধন উপার্জ্জনের অনেক প্রশস্ত পথ বিদ্যমান। কিন্তু যাহারা কেম্ব্রিজের জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহার ইন্দ্রজালে জড়িত হইয়া পড়েন তাহারা সে সকল পথ উপেক্ষা করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, কিন্তু আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে ইচ্ছুক ছাত্রদের মত তাহাদিগকে অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হয় না। পরিবার প্রতিপালনের গুরুভার মস্তকে লইয়া শিক্ষাগার হইতে বহির্গত হইতে হয় না। যদি আমাদের দেশে যথার্থ বিজ্ঞান চর্চ্চা প্রবর্ত্তন করিতে হয় তবে বিশ্ব বিদ্যালয়ের আবহাওয়া ফিরাইয়া যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে; নূতন করিয়া তুলিতে হইবে। তদ্ব্যতীত শিক্ষক ও ছাত্র দুই দলেরই মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে হইবে। তাহাদের সেই ব্রহ্মচর্য্য, সেই একাগ্রতা, সেই স্বার্থত্যাগ দেখাইতে হইবে। যাহা ভিন্ন কোন দেশেই কখনও কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় নাই। এই সাধনায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই যোগ না দিলে চলিবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে সকল প্রকার বাহিরের ভান এবং অভিমান আত্মম্ভরিতা পরিহার না করিলে সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ আর সকল বিষয়ে যেমন, বিজ্ঞান

শিক্ষা বিজ্ঞান চর্চ্চা ও গবেষণা বিষয়েও তেমনই নৈতিক বলই একমাত্র বল। একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া চলিতে হইবে। এবং তাহা হইলেই আমরা সফল কাম হইতে পারিব। সুখের বিষয় আমাদের দেশে অল্পে অল্পে যথার্থ বিজ্ঞান চর্চ্চার সূত্রপাত হইতেছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে কি কি কার্য্য হইয়াছে তাহার বিবরণ কতক কতক আপনারা পাঠ করিয়া থাকিবেন। কেম্ব্রিজেও ভারতবাসী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রামানুজম্ এফ, আর,এস, বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহা আশাপ্রদ, কিন্তু সমবেত চেষ্টা ভিন্ন এতদিন পরে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান জগতে স্থান পাইবার আমাদের কোনই সম্ভবনা নাই। কারণ আধুনিক বিজ্ঞান এক মহাসমুদ্র বিশেষ। ৬৫ বৎসরের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেই বিজ্ঞান চর্চ্চার কিরূপে উন্নতি বিস্তৃত হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা কোন মানুষেরই সাধ্যায়ত্ত নয়। এই সময়ের মধ্যে বিজ্ঞান এত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে এবং প্রত্যেক শাখা প্রশাখাই এত বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়াছে যে সমস্ত বিজ্ঞানে একত্ব প্রণিধান করাও একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণিবিজ্ঞানে হেকেল, ডারউইন, ভাইসম্যান ও ওয়ালেসের আবিষ্কৃত তত্ত্ব সকল আমাদিগকে নূতন আলোক দান করিয়াছে। লিনিয়স হুকার প্রভৃতি উদ্ভিদ বিদ্যায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। গণিত শাস্ত্রে রসায়ণ শাস্ত্রে আবিষ্কারের সীমা নাই। কিন্তু রাসায়নিক শক্তির কথা আর কেহ উল্লেখ করেন না। রাসায়নিক পরমাণু প্রায় দ্বিসহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া রসায়ণ শাস্ত্রকে বিভিন্ন আকারে পরিণত করিয়াছে; এদিকে আধুনিক বিজ্ঞান যেরূপ রাসায়ণিক পরমাণুর দ্বিসহস্র অংশের পরিমাণ করিতে ও তাহার বিশিষ্ট তড়িৎ গুণের অনুধাবন করিতে সমর্থ তেমনই আলোকের গতি সৌর জগতের পরিমাণ এমন কি কোন কোন নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করিতেও পারিতেছে। যখন নিউটনের নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া গণিতজ্ঞ য়্যাডামস ও লেভেরিয়ে অজানিত গ্রহের কক্ষ নির্দ্ধারণ করিলেন ও পরে তাহা দূরবীক্ষণের অধীন হইল তখন নিউটনের প্রণোদিত আকর্ষণী শক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইল বটে কিন্তু বিজ্ঞান তাহার এই তত্ত্ব নিরাকরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছে না। রাসায়ণিক পরমাণু সকল পরস্পর আকর্ষণ করে বটে কিন্তু তড়িতাণু তাহার বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী সুতরাং এই বরাহমিহির, নিউটন প্রণোদিত আকর্ষণেরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। আবার সকল প্রকার অণুই গতিবিশিষ্ট সুতরাং তাহাদের আপেক্ষিক গতিই বা কি প্রকারে আকর্ষণ নিয়মিত করণে কার্য্যকরী হয় এবং অবশেষে পরমাণুর আকর্ষণের দূরত্ব অনুসারে হ্রাস বৃদ্ধি যে কারণে হইয়া থাকে ইহারই বা গূঢ় তত্ত্ব কি? এই সকল বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে।

সূর্য্যরশ্মি ও নক্ষত্র রশ্মির দ্বারা আমরা সূর্য্য ও নক্ষত্র সমূহ দেখিতে পাই। ইহা অতি সহজ ব্যাপার। কিন্তু ইহা কি প্রক্রিয়া দ্বারা সংসাধিত হইতেছে সেই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ যে আলোকের সাহায্যে আমরা অধিকাংশ অস্বচ্ছ বস্তুর ভিতর দিয়া দেখিতে পাই তাহার বিচিত্রতা উপলব্ধি করিতে গিয়া আমরা এক নূতন আলোক রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ পদার্থ বিদ্যাবিদেরা এই কয়েকটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যথা, (১) বিশ্ব সংসারের তেজসমষ্টির হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। (২) আলোক তাপ ইত্যাদি তেজ সকল ব্যোমাণুকম্পন মাত্র, কোন অণুর কার্য্যকারিতা এসকলের মধ্যে কিছু নাই। (৩) পৃথিবী ও সূর্য্যের বয়স নির্দ্ধারণ করা সম্ভব কিন্তু রেডিয়ম এবং তড়িতাণুর আবিষ্কারের পর এ সকল তত্ত্বই নূতন আকার ধারণ করিতে চলিয়াছে। সেই আকার কি হইবে এ বিষয়ে অনেক গবেষণা চলিতেছে। পদার্থবিদেরা সাধারণতঃ দুই প্রকারে তেজ নির্দ্দেশ করেন স্থিতিমূলক ও গতিমূলক। স্থিতিমূলক তেজ বাস্তবিক মূলতঃ কি এই প্রশ্নের সমাধান প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

আমার মনে হয় আমরা যদি অগ্রসর হই, এই সকল মীমাংসায় বিশেষ সহায়তা করিতে সমর্থ হইব। তাহার কারণ উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি। প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে পণ্ডিতগণ সাধারণ বুদ্ধি চালনায় প্রাকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেন। তাহা সেই জন্য ভ্রমাত্মক হইত। তাহার পর শুদ্ধ তাহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা হাতে কলমে পরীক্ষা

প্রথম ও দ্বিতীয় ফর্ম্মা ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
অপর ফর্ম্মা ঢাকা জগত আর্ট প্রেসে মুদ্রিত।

দ্বারা প্রকৃতির তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইবে ইহাই স্থির হয়। আমার মনে হয় ভারতবর্ষেই এই নীতি প্রথম অবলম্বিত হয়। পরলোকগত বিখ্যাত রাসায়নিক স্যার উইলিয়ম র্যামসে আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে হিন্দুরাই যথার্থ প্রকৃতিতত্ত্ব শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন করেন। গ্রীকেরা কুটতর্কেই সময় ক্ষেপন করিতেন। কিন্তু হিন্দুরা তাহাতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ তিনি দিল্লীর লৌহস্তম্ভের কথা উল্লেখ করেন। হিন্দুদের বুদ্ধি দৃষ্টিও অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। এক্ষণে বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন শুধু পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলন করিলেই চলিবে না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দৃষ্টির পরিচালনাও করিতে হইবে, তবেই প্রাকৃতিক তত্ত্বের আবিষ্কার সম্ভব। ধর্ম্মরাজ্যে যেমন শুধু তর্ক যুক্তিগবেষণায় কার্য্য চলেনা তার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করিলে আকাঙ্খিত ফল লাভ হয়, ঋষিরা ভগবানের আদেশবাণী শুনিয়া শিক্ষালাভ করেন, সেই শিক্ষাই প্রকৃষ্ট শিক্ষা, বিজ্ঞান রাজ্যেও তেমনি যুক্তি গবেষণা চাই। প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিতে হয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু এই প্রকার অলৌকিক ভাবেই সত্য লাভ করিয়া আলোক প্রাপ্ত হন। একটা আপেল গাছ হইতে পড়িল আর নিউটন মধ্যাকর্ষণশক্তির উদ্ভাবন করিলেন বলিয়া যে গল্প আছে তাহা সত্য নয় বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি বিজ্ঞানের উচ্চতম সত্য আবিষ্কারের যথার্থ নিয়ম কি?

যদি পর্য্যবেক্ষণ অনুশীলন ও বুদ্ধি দৃষ্টি পরিচালনার সমাবেশই বিজ্ঞানতত্ত্বের প্রধান সহায় হয়, ভারতবাসীর নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের ভগবান প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা আছে এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার দিন আসিয়াছে। অনেক দিন নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আমাদের পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ক্ষমতা লুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দৃষ্টি অনেক সময়ে বৃথা ব্যাপারে নিয়োজিত হইতেছে। দূরে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ মেষশাবক আসিতেছে, বুদ্ধি খাটাইয়া সেগুলি কৃষ্ণবর্ণ মেষ বলিয়া তর্ক করিতে আরম্ভ করা প্রায় স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে; এই বুদ্ধি চালন নিয়মিত করিয়া বৈজ্ঞানিক নিয়মে আগুয়ান হইতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চই আমরা বিজ্ঞান জগতে আমাদের স্থান অধিকার করিতে পারিব। জন্মভূমির মুখ উজ্জল করিতে পারিব।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া শিল্প বাণিজ্যক্ষেত্রে সভ্য জগতে বিজ্ঞান যে নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে তাহার কথা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। সে পক্ষে আমাদের দারিদ্রের কথা আর কাহাকেও জানাইতে হইবে না। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তাহার জন্য ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে আমরা সকলেই এখন ভুক্তভোগী। এই বিষয়ে আলোচনা করা বিজ্ঞান শাখার কার্য্য নহে। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইহার সঙ্গে বিজ্ঞানের অপব্যবহারের কথাও স্বভাবতঃই মনে আসে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার মনুষ্যকে নবজীবন দিবার জন্য, মনুষ্য ধ্বংসের জন্য নহে। এই সহজ কথা ভুলিয়া যাওয়াতে কি কুফল ঘটিতেছে মনে করিলে, মনুষ্যের অধঃপতনের কথা স্মরণ করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার মধ্যেও ভগবানের মঙ্গল বিধান নিহিত আছে, আমি বিশ্বাস করি কিন্তু সে আলোচনা অপ্রয়োজন।

প্রাচীন কালে লোক ধর্ম্মের নামে সংগ্রাম করিত। ধর্ম্ম বিজ্ঞানচ্যুত হওয়াতে মনুষ্যের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এ কালে বিজ্ঞান ধর্ম্মচ্যুত হইয়া সংসারকে তাহা অপেক্ষাও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ব্যতীত এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আর উপায় নাই। বিজ্ঞানের তত্ত্ব, ধর্ম্মের তত্ত্ব একই সত্যের বিভিন্ন আকৃতি, তাহাদের মধ্যে বিভেদ থাকিতে পারে না। যেখানে বিভিন্নতা সেই খানেই অসত্য বা আংশিক সত্য বিদ্যমান। পূর্ণসত্য ভগবানের আদেশে, তাঁহারই ইঙ্গিতে, বিজ্ঞানের ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলেই মনুষ্য জাতির মঙ্গল সাধিত হইবে। ধর্ম্ম প্রাণ ভারত বঙ্গদেশের অগ্রনীত্বে এই সামঞ্জস্য সাধনে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়া নিজ বিশেষত্বের পরিচয় প্রদান করিবে ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।

ঠাকুরমার চিতা।

জল ভরা ওই পুকুর ধারে ফল ভরা আম তলে,
আজো আছে তোমার চিতা ঘেরা দূর্ব্বাদলে।
সাঝেঁর তারা বাতি রাখে, চাঁদ যতনে সুধা মাখে,
আরতি হয় পাখীর ডাকে, পূজা পুষ্প দলে।
জল ভরা ওই পুকুর ধারে ফল ভরা আম তলে।

(২)

কবে তুমি মরে গেছ—কত দিন হয় "নাই"?
তোমার স্নেহ ভালবাসা আজো আমি পাই।
উষা যখন দাঁড়ায় আসি, ফোটে তোমার মধুর হাসি,
পাইগো তোমার স্নেহ রাশি, তোমার কোলে যাই!
কবে তুমি মরে গেছ—কত দিন হয় "নাই"।

(৩)

সন্ধ্যাকাশের বুকে যখন হাসে তারা সুখে,
আমি তোমার গলা ধরি, জড়িয়ে রাখ বুকে!
যখন রেতে নাইকো সারা, হয়ে আমি আপন হারা,
শুনি তোমার মধুর কথা সেই মধুময় মুখে,
গভীর রেতের নীরবতা যখন ধরার বুকে!

(৪)

তোমার স্নেহ, ভালবাসা তোমার মধুর স্মৃতি।
সংসারের এ শত দুঃখ দূর করে দেয় নিতি!
যখন ডাকি আপন ভুলে "ও দিদিমা লও না তুলে"
(তখন) তুমি যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাক আসি।
সদাই জাগে তোমার স্নেহ তোমার মধুর হাসি।

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত।

হাতের পাঁচ।

(১)

নিতাই সরকার যখন অফুরন্ত টাকার কাঁড়ি এবং আঠার বছরের ছেলে বলাইচাঁদকে রাখিয়া দেহত্যাগ করিল, তখন পাড়ার সকলেই আশা করিয়াছিল, এবার হয়ত নিতাইর টাকায় ভাঁটি ধরিবে। কিন্তু বলাই শীঘ্রই সকলের সন্দেহ দূর করিয়া দিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রী আরো বেশী উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। নিতাই সামান্য কড়াকিয়া গণ্ডা কিয়ার বিদ্যা লইয়া লাখ টাকা কারবারে খাটাইয়া গিয়াছে। আর বলাই ও পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া বাপের নিকট তেজারতি কারবারের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, মাসে মাসে বছরে বছরে পরীক্ষা দিয়া প্রমোশন পাইয়াছে।

নিতাই বলিত আমার ছেলের পরীক্ষা তোমাদের কলিকাতার বড় বড় ইস্কুলের পরীক্ষার চাইতে শক্ত। আর বলাইর দামও তাদের চেয়ে বেশী। দ্বিতীয় কথা এই —ঐ সব ইস্কুলের ছেলেরা আচারহীন হয়, বাবু হয়, বলাইর বাবুয়ানার অবকাশ নাই, আচার ষোল আনা আছে।

(২)

বলাই দেখিল বাবার সিন্দুক গুলি টাকায় ভরা। সে ঐ টাকা দিয়া দেশের বড় বড় বাজার বন্দরে কারবার খুলিল। সে সারা বছর দোকানের হিসাব নিকাশ দেখিয়া ঘুরিত, আর টাকার কাঁড়ি আমদানী করিত। দেশে তাহার বড় নাম ডাক পড়িয়া গেল। হিসাবি পরিশ্রমী প্রভৃতি বিশেষণে বলাইর প্রতিষ্ঠা চারিদিকে ছড়াইল। তাহার পত্নী মিলনী দাসী সেবার রূপার পৈচা পুরস্কার পাইল। পাড়ায় হৈ হৈ পড়িয়া গেল।

এই রাজোচিত সম্পদের মাঝখানে যখন বলাইর দিন গুলি পাল তুলিয়া যাইতেছিল, তখন একদিন সকাল বেলায় এক সাহেব আসিয়া তাহাকে সেলাম ঠুকিয়া দাঁড়াইল। বলাইর গদিতে চেয়ার ছিল না, সাহেব একখানি ছোট টুলের উপর বসিয়া কহিল—"আপনিই কি বলাই চাঁদ বাবু!"

একে সাহেব তহাতে তাহার মুখে 'বলাই চাঁদ বাবু' সম্বোধন, সুতরাং বেচারী বলাই একেবারে থ হইয়া গেল। বলাই বড়ই— কিন্তু হইয়া কহিল—"আজ্ঞে হুজুর।"

সাহেব তখন পকেট হইতে এক খানা চিঠি বাহির করিয়া বলাইর হাতে দিল। চিঠি হাতে লইয়া চসমা খুঁজিবার ভান করিতে করিতে বলাই ডাকিল—"কেরাণী বাবু"। কেরাণী আসিলে বলাই তাহাকে চিঠি খানা দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কেরাণী চিঠি পড়িয়া বলিলেন "মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনাকে পত্র দিয়াছেন। ইহার নাম মিঃ জনষ্টন্। ইহাকে আপনার ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে মাজিষ্ট্রেট আপনাকে অনুরোধ করিয়াছেন।"

বলাই—"অলরাইট"। বলিয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন।

(৩)

জনষ্টন্ সাহেবের কুঠীতে বলাইচাঁদ দু' বেলা চা খায়, ইজি চেয়ারে বসিয়া আয়েস করে, সিগার টানে। অনিন্দ্য সুন্দরী মেম সাহেব পার্শ্বে বসিয়া ভাঙ্গা বাঙ্গালায় বলাইর সহিত গল্প করে। বলাইও মাঝে মাঝে yes, no, very good প্রভৃতি বুলি আওরায়। প্রথম প্রথম বলাই অতি সঙ্কোচে মেম সাহেবকে পার্শ্বে বসিতে দিত। ক্রমে সে মেমের ধারে চেয়ার টানিয়া লইত। মিসেস জনষ্টন্ স্বহস্তে বলাই বাবুকে চা পরিবেশন করে। বলাই কৃতার্থ হয়। ক্রমে চা এর সঙ্গে বিস্কুট চলিল। বলাই মেমের হাতে দেওয়া বিস্কুট প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না।

সে দিন সাহেব মফস্বলে এক কারখানা দেখিতে গিয়াছিল। বিবি বলাইকে কহিল—"তোমার কপালে ঐ চিহ্নটা কিসের?"

"ওটা তিলক। আমরা বৈষ্ণব—তিলক, মালা আমাদের ধারণ করিতে হয়।" এই বলিয়া বলাই তাহার হাই কলার শার্টের বোতাম খুলিয়া গলদেশে তিনছড়া তুলসীর মালা দেখাইল।

বিবি একটু মিছরীর টুক্‌রা মিশান সুরে কহিল—ড্যাম মালা, তিলক—তোমাকে দস্তুর মত অসভ্যের চেহারা করিয়াছে ঐ মালা তিলক। এই বলিয়া বিবি স্বহস্তে এসেন্স সুবাসিত রুমালে বলাইর তিলক মুছিয়া দিল। সেই কোমল করস্পর্শে বলাই মূর্চ্ছা যাইতে যাইতে যেন সামলাইয়া গেল। সে ভাবিতেছিল—বাবা সিন্দুক ভরা টাকা রাখিয়া গেছে, সকল টাকার বিনিময়ে মেম সাহেব আমার হাতের পাঁচ।

এদিকে বিবি হেঁচকাটানে বলাইর আশৈশব ধৃত মালা ছিঁড়িয়া ফেলিল। বেচারী হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিল মেঝের উপর সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মালাগুলি গড়াইয়া যাইতেছে। বড় দুঃখে কহিল—একি করিলে মেম সাহেব?

(৪)

সাহেবী পোষাক পরা বলাই যখন তাহার নবনির্ম্মিত বাস ভবনের দ্বিতলের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল তখন মিলনী তাহার মুখে একটা কি উগ্র গন্ধ পাইল। বেচারী স্বামীর অস্থির গতিতে চলন ভঙ্গি দেখিয়া মনে করিল—বোধ হয় কোনো অসুখ করিয়াছে। তাই সে বড় মিনতির সুরে জিজ্ঞাসা করিল—ওগো—অমন করে টল্‌ছ কেন? বলাই বিজড়িতকণ্ঠে যাহা কহিল সেগুলি মিলনী আর কোনও দিনই শুনে নাই। অতি কদর্য্য ভাষা এবং তাহার সঙ্গে বিবির নাম জড়িত।

মিলনীর ভাই তাহাদেরই গোমস্তা ছিল। তাড়াতাড়ি সে তাহার নিকট সকল কথা জানাইল। ভ্রাতা গোবর্দ্ধন বহুকালের লোক। সে বলাইর সকল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিত। ভগ্নীর কাণে সে অত কথা বলা নিরাপদ মনে করিল না। পাঁচ সাত কথায় ভগ্নীকে প্রবোধ দিল।

গোবর্দ্ধন ধার্ম্মিক, বিষয়ী এবং অতি পাকা লোক। সে ভাবিল আমি থাকিতে আমার ভগ্নীকে পথে বসাইতে দিব না। আমি তাহার হাতের পাঁচ।

(৫)

বলাই এখন আর সাহেবকে সদরে আসিতেই দেয় না। মফস্বলের কারবারের পরিদর্শন জন্য তাহাকে এক স্থান হইতে অন্যত্র যাওয়ার হুকুম পাঠায়। সাহেবও অতি বশংবদের মত আজ্ঞাপালন করে। ছয় মাসের মধ্যে সাহেব সদরে আসিতেই পারিল না।

এদিকে তাহার যুবতী স্ত্রী আর বলাই সারাদিন

রাত্রি কুঠিতে আমোদে মগ্ন। বিবি যে দিন বলাইকে 'বল নৃত্য' শিক্ষা দিয়াছিল, সে দিন বলাই মনে মনে মিলনীকে ত্যাগ করিল।

এখন আর পৈত্রিক বন্দোবস্তে বলাইর খাওয়া হয় না। বিবি তাহার খাওয়ার ভার লইয়াছে। এক টেবিলে উভয়ে খানা খায়। বিবি যখন জোর করিয়া বলাইর মাথাটী আপন কোমল প্রকোষ্ঠে সাপটিয়া ধরিয়া নিজ মুখের খাদ্য বলাইর মুখে গুজিয়া দিল. তখন বলাই একাধারে স্বর্গ ও নরকের দৃশ্য যেন প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিল। তবে স্বর্গের চেয়ে নরকের দৃশ্যটা অনেকখানি ম্লান হইয়া গিয়াছিল।

(৬)

গোবর্দ্ধন আসিয়া জানাইল ম্যানেজার সাহেবের চিঠিতে বিশ হাজার টাকার হুকুম আসিয়াছে। টাকা কোথায় ?

ইজি চেয়ারে অর্দ্ধ শায়িত বলাই কহিল—সিন্দুকে।

"সিন্দুকে যে টাকা আছে, তাহা বড় জোর পাঁচ হাজার হইবে।"

"আর টাকা কোথায় গেল ? টাকা চাই টাকা দে আও।"

"আমি টাকা পাইব কোথায় ? তোমার টাকা, তোমার হুকুমে, তোমার ম্যানেজারের কাছে যায়, আমি টাকা আনিব কোথা হইতে ?"

"চেক ?"

"টাকা জমা কোথায় ? গত ছয় মাসে—গিয়াছে ব্যতীত এক পয়সাও আসে নাই।

ঠিক সেই সময় পর্দার আড়াল হইতে একখানি রাঙ্গা মুখের ঈষৎ হাসির আভাস পাইয়া বলাই উঠিয়া ভিতরে গেল।

(৭)

"আমি এখানে বসে আছি। আর আমার কারবার গুলি নাকি ফেল পড়্‌বার পথে লিলি !" বলাই মেমকে লিলি ডাকিত।

বিবি আকুলভাবে বলাইকে বক্ষে জড়াইয়া তাহার মুখে অজস্র চুম্বন কাটিয়া এক গেলাস শরাব পিয়াইয়া দিল। তার পর কহিল মিঃ বুল্ (বিবি বলাইকে বুল ডাকিত)আমারত ঐই কুঠিতে আর ভালো লাগছে না—একা একা বড় ভয় হয়। আমি কদিন থেকেই ভাব্‌ছি তোমার নূতন বৈঠকখানায় থাক্‌ব। কেমন ?—

বলাই অমনি লাফাইয়া উঠিয়া কহিল ;—এখনই চল, আজ হতে তুমি খাঁটি রকমে আমার হইলে ; কেমন ?

আমিত অনেক দিনই তোমার আছি। আজ তোমার আরও আপন হইলাম।

নূতন ক্রীত ল্যাণ্ডোতে লিলির পাশে বসিয়া বলাই ভাবিল— সাহেব, তুমি আমার টাকার দোকান লুঠ কর্‌ছ —আমি তোমার প্রেমের দোকান লুঠ করিলাম। আমি নিমাই দাসের ছেলে। পাকা খেলোয়ার। হাতের পাঁচ না রাখিয়া আমরা খেলি না। বাবার মরণের কালের এই উপদেশ।

(৯)

মেম চুরির মামলার বিরুদ্ধে বলাই সাহেবের নামে—টাকা চুরির মামলা রুজু করিয়াছিল। শেষটা উভয় পক্ষের উকীল ব্যারিষ্টারের মধ্যস্থতায় মীমাংসার কথা চলিল। সাহেব নগদ দশ হাজার টাকা লইয়া মেমকে ছাড়িয়া দিবে। বলাইও তাহার মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবে। সমাজে উঠিবার তাহার পথ ছিল না। মেমকে পাইলে সমাজ পাওয়ার প্রবৃত্তিও তাহার ছিল না।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে গোঁড়া বৈষ্ণব, পাকা লোক গোবর্দ্ধনও ইহাতে সায় দিল।

দশটী হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়া আনিয়া বলাই সাহেবের হাতে দিয়া ঘরে গেল— মিসেস লিলি আকুল প্রেমে বলাইকে বুকে টানিয়া চুম্বন করিয়া কহিল—'তোমার ভালবাসা জগতে অতুলনীয়।'

(১০)

বলাই বুঝিলেন তাহার অর্থ কিছুই থাকিবে না। থাকিবার মধ্যে লিলি। মিলনী গোবর্দ্ধনের বাড়ীতে আছে। বলাইর সমুদয় সম্পত্তি দেনায় আবদ্ধ।

লিলি আর বলাই চা খাইতেছিল,— এমন সময় চাপরাসী আসিয়া একখানা কার্ড দিল। তাহাতে লেখা

মিঃ জন আজ চলিয়া যাইতেছেন। মনোমালিন্য যখন, ঘুচিয়া গিয়াছে, তখন আজ তিনি বিদায়ের দিনে তাহার প্রিয় মনিব বলাই চাঁদের সহিত ষ্টেসনে একবার শেষ সাক্ষাৎ করিতে চান। সন্ধ্যা ৭ টায় মেল ছাড়িবে।

লিলি কহিল মিঃ বুল্, চল। যে লোকটা জীবনের এত দিনের সঙ্গী ছিল তাহাকে 'এটিকেট' মাফিক একটা বিদায় দিয়া আসি। তারপর যাক্ হতভাগা।

স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা, মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিশোভিতা লিলির গলায় আরও একটা নেকলেচ দিয়া বলাই চাঁদ তাহার দিকে এক বার চাহিল। তারপর তাহাকে হাতে ধরিয়া লইয়া উভয়েই ল্যাণ্ডোতে চড়িল।

গাড়ী ছাড়িতে পাঁচ মিনিট বাকি। মিঃ জন প্রথম শ্রেণীর কামরার দ্বার দেশে উপস্থিত হইলেন এবং বিনয়ের সহিত বলাইর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়া ট্রেনে উঠিলেন। তাঁহার জিনিষ পত্র পূর্ব্বেই বুক্ করা হইয়াছিল।

লিলি রুমালে চক্ষু মুছিলেন। বলাই নিকটে দাঁড়াইয়া ছড়িদিয়া মাটিতে টুক্‌টাক করিতেছিল। জন গাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া লিলিকে কহিল— 'আমি চলিলাম, এসো এই শেষ বার তোমার কর স্পর্শ করি।'

তখন ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। লিলি হাত বাড়াইয়া দিতেই জন তাহাকে টানিয়া তুলিল। লিলি রুমাল উড়াইয়া কহিল—Good bye Mr. Bull.

ট্রেন চলিয়া গেল। বলাই চাঁদ—"ষ্টেসন মাষ্টার! ষ্টেসন মাষ্টার! গার্ড—গার্ড—থামাও—গাড়ী থামাও - " বলিয়া চিৎকার করিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে গাড়ী ধরিতে যাইয়া হোচট্ খাইয়া পড়িয়া গেল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পোয়েটস্ লরিয়েট।

ভাবের অম্বুধি মন্থন করিয়া যেদিন লীলাময়ী কবিতা দেবীর উদ্ভব হইয়াছিল, তদীয় মানস পুত্রগণ তদবধি নানারূপ সম্মানসূচক শিরোভূষণ, মাল্যাগুরু—চন্দনলাজাক্ষতাদি বা অন্ততঃপক্ষে 'পান গুয়া' লাভ করিয়া আসিতেছেন। সম্মান সম্ভারের বৈচিত্র্য দেশকালানুসারে হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন কবিগণকে লরেলকীরিটে বিভূষিত করিবার রীতি থিয়োডোসিয়াসের রাজত্ব কালাবধি প্রতীচ্য জগতে প্রচলিত ছিল। তৎপর পৌত্তলিকতার ধূয়া ধরিয়া সংস্কার প্রয়াসী নবীন সম্প্রদায় উহার বিলোপ সাধন করে।

ইউরোপ যখন পূর্ব্বাগত বর্ব্বর জাতি দ্বারা অভিক্রান্ত হইয়াছিল, তখন উক্ত সম্মান লাভ করিবার উপযুক্ত কেহ ছিল বলিয়া জানা যায় না, কবিত্বের মাধুর্য্য ভোগ করিতে পারে এরূপ লোকই তৎকালে দুর্ল্লভ ছিল। পেট্রার্কের সম সাময়িকযুগে কবিতাদেবীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছটায় ইউরোপ আবার উদ্ভাসিত হয়। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইটালীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে বেচুলার এবং ডাক্তার উপাধি দান করিবার বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। উক্ত উপাধিদ্বয় যাহারা লাভ করিবার যোগ্য বিবেচিত হইতেন,তাঁহাদিগের ভাগ্যে কেবল যে শব্দসার লোভ্যটাই ঘটিত তাহা নহে, তাহাদের মস্তকে লরেল পত্রের হরিৎকিরীট পরাইয়া দেওয়া হইত।

কিসে বিলুপ্ত আচারটীর পুনরায় প্রচলন হইয়াছিল তাহা প্রদর্শন করিতে যাইয়া জনৈক প্রাচীন লেখক লিখিয়াছেন কবিগণ তাঁহাদের চিরন্তন স্বত্বটী কেন প্রাপ্ত হইবেন না তাহার জন্য বিষম আন্দোলন করিতে বিরত ছিলেন না, তাহাদের পৃষ্টপোষকগণও দেখিলেন যদি একটা মার্কা মারিয়া দিলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন তাহাতে আর আপত্তি কি?

কাউন্ট আঙ্গুইলারা মহাকবি পেট্রার্ককে যে উপাধি-পত্র দান করিয়াছিলেন তাহাতে লিখিতছিল—আমরা কাউন্ট ও সিনেটর—আমাদের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ফ্রান্সিস্ পেট্রার্ককে মহাকবি এবং প্রবীণ ঐতি-

হাসিক বলিয়া এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি ; তদীয় কবিত্বের বিশেষ চিহ্নস্বরূপে আমরা তাঁহার মস্তকে লরেলকিরীট স্থাপিত করিলাম। এই সম্মান লাভ করাতে তিনি রাজা রবার্ট, সিনেট এবং রোমীয় জনসাধারণের অনুমোদন ক্রমে কাব্য, ইতিহাস ও তৎসম্পর্কীয় যে কোন সাহিত্যের চর্চাকল্পে এই পবিত্র নগরীমধ্যে বা অন্যত্র অধ্যয়ন, আলোচনা, প্রাচীনগ্রন্থরাজীর ভাষ্যকরণ, নবীন গ্রন্থের প্রণয়ন এবং কবিতা রচনা করিবার অনাপত্য অধিকার এবং স্বাধীনতা লাভ করিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার সাধনা কল্লান্ত স্থায়ী হইবে।

ইটালীতে সমারোহ সহকারে বাণী বরতনয়গণের অর্চ্চনা বহুদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না ; পরবর্ত্তী যুগে আমরা অতি অল্প সংখ্যক উপযুক্ত ব্যক্তিকেই সম্মানিত দেখিতে পাই। ট্যাসো-লরেলের বর-ভূষণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিরে শোভিত হইবার ভাগ্য প্রাপ্তিতে লরেলকীরিট উদ্দীপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অনুপযুক্ত অনেক লোকের অদৃষ্টও পোয়েটলরিয়েট উপাধি ব্যাধিরূপে জুটিয়াছিল। কোয়ার্ণো নামক এক ব্যক্তি ঐ উপাধি লাভ করেন। মদের ঝোঁকে তাহার কবিতার রোক হইত, ভোজের গন্ধে ভাবের তুফাণ সোঁ সোঁ করিয়া গর্জ্জন করিত। ফলার খাইতে আসিয়া সে নাকি কুড়ি হাজার ছড়া আবৃত্তি করিয়া তবে নিরস্ত হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে লোকটা পোপ দশম লিও মহাশয়ের অনুগৃহীত ; কবি ছিল না, সে ছিল বিদূষক বা ভাঁড়। তাহার দক্ষিণ হস্ত লেখনী সঞ্চালনে দক্ষ না থাকিলেও পাতড়া মারিবার বেলায় অসাধারণ ক্ষিপ্র ছিল। তাই কোন রসিক ব্যক্তি নাকি লরেল পত্রের সহিত চাতুরী সহকারে অঙ্গুর ও কপির পাতা গাঁথিয়া দিয়াছিল।

অষ্টম অরবানের কল্পনার রাজ্যে অধিকতর এবং উচ্চতর ধারণা ছিল। কথিত আছে তিনি উচ্চাঙ্গের কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। কবিত্বের পথে খ্যাতিপন্ন হইতে একটু সুবিধা পাইবার আশায় তিনি নাকি চিয়াব্রেরার নিকট একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন। তৎকালে নৃপতিবৃন্দের মণিময়কিরীটই পোপ কল্পদ্রুমের অনুগ্রহ স্নিগ্ধপত্র বর্দ্ধিত হইবার একমাত্র যোগ্যস্থল ছিল। কোন পোপ উপায়ান্তরে স্বীয় কাব্যরস রসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ব্রাসি ও লিনির একটী কবিতায় মুগ্ধ হইয়া লেখককে কাব্যামোদমোদী মারুতি ও কবিকুলভৃঙ্গ উপাধি—নামের সঙ্গে ব্যবহার করিবার অধিকার দান করিয়া চরিতার্থ করিয়াছিলেন। এমন সহজ অস্ত্র হাতে থাকিতে তিনি কোন অনুগ্রহাপেক্ষী কবিকেই লরেলের মুকুট পরাইবার দায় ঘাড়ে লয়েন নাই, তাঁহারা কেহই উক্ত সম্মান লাভের উপযুক্ত ছিল না, সম্ভবতঃ তাঁহার এরূপ ধারণা ছিল।

প্রথমে ম্যাক্সিমিলিয়ানের রাজত্বকালে জার্ম্মাণীতে লরিয়েট সম্মান প্রচলিত হয়। তিনি ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা সহরে রাজকীয় কাব্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্মান প্রদানে পাছে অব্যবস্থা হয় এজন্য তিনি দান করিবার অধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈদৃশ সুব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হইলেও বিদ্যাপীঠটী পরিশেষে কুখ্যাতির হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইয়াছিল না। কবিযশঃপ্রার্থী বিবদমান বচনবাগীশ বৃন্দের কোপাকুলা বাচালতার ধারা যখন কবিতার ফেণোচ্ছ্বাসময়ী ঊর্ম্মিমালা ছুটাইয়া বাণীর বরমন্দির বিকম্পিত করিয়া তুলিল, তখন তদুপরি উপাধির স্নিগ্ধ তৈল প্রক্ষেপে আর পাত্রাপাত্র ভেদ করিবার অবসর রহিল না। ব্যভিচারে বাণীর পূজার বিরতি হইল। উপাধি-ব্যাধি-বাতুল বৃন্দের হঠতার বিরুদ্ধে দিগ্‌দেশহইতে তীব্র বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। তথাপি জার্ম্মাণগণের লোলুপদৃষ্টি ম্যাক্সিমিলিয়ানের প্রদত্ত উপাধির প্রতি বহুদিন আবদ্ধ ছিল ; সম্ভবতঃ তাহারা চিন্তা করিয়া দেখে নাই যে শ্বেতভুজার কোমল নির্ম্মাল্য কিরীট যখন এত মাথায় ঘুরিয়াছে তখন আর তাহা সরস এবং শুভ্র থাকিতে পারেনা—মায়ের মাল্য যে অশুচির কঠোর অঙ্গুলীর স্পর্শমাত্রে মুসড়িয়া যায়। যাহা হউক, বীণা বাদিনীর সানুগ্রহ দৃষ্টি আবার জার্ম্মাণীর উপর পতিত হইল। জার্ম্মাণ সম্রাট ষোড়শোপচারে আবার তাঁহার পূজার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। এপোষ্টোলো জেনো রাজকীয় সম্মান—পোয়েটা সেসারিও লাভ করেন। তিনি একা-

ধারে প্রবীণসাহিত্যিক ও কবি বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার পরেই সম্মানিত হন সুপ্রসিদ্ধ কবি মেটাষ্টাসিও, ইহার কাব্যরস প্রাণোন্মাদকর।

ফরাসী দেশে মুকুট পরাইয়া কবিকে সম্মানিত করা হয় নাই, তাঁহাদের রাজকীয় কবি (Regal Poets) ছিল। স্পেনীয়গণ শব্দাত্মক সম্মানের যেরূপ ভক্ত তাহাতে তদ্দেশে লরিয়েট ব্যবস্থা থাকিবার কথা, কিন্তু তত্রত্য প্রাচীন গ্রন্থকারগণের সে সম্বন্ধে কোন উচ্চ বাচ্য দৃষ্ট হয় না।

প্রাচীন ইংলণ্ডে পোয়েট লরিয়েট রীতি কিরূপ প্রচলিত ছিল কেবলমাত্র সেলডেনের লেখাতেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। জন প্রথম এড্ওয়ার্ডকে তাঁহার রোড্সের ইতিহাস উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজকে বিনীত পোয়েট লরিয়েট বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। গাউয়ার এবং চশার পোয়েট লরিয়েট ছিলেন; স্কেলটনও অষ্টম হেনরীর পোয়েট লরিয়েট ছিলেন।

অন্যান্য দেশের ন্যায় ইংরেজ কবিদিগকে যে পত্র কিরীটে বিভূষিত করিয়া সম্মানিত করা হইত, ইহার পর্য্যাপ্ত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেলডেন অশেষ অনুসন্ধানের পর এই বলিয়া নিজকে প্রবোধ দিয়াছেন যে—অতীতযুগে ইংরেজ জাতির মধ্যে উক্তরীতি কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত ছিল এরূপ চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে ইহা সত্য যে অতীত যুগ হইতে ইংরেজ নৃপতিগণ 'রাজার কবি' বলিয়া এক ব্যক্তিকে তাঁহাদের ভাগ্যোপজীবী দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।

বাহুল্যরূপে বলিতে যাইলে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়—লরেল মুকুট পরাইবার রীতি ইংলণ্ডে প্রচলিত থাকিলেও তাহার মূল্য অনধিক এবং সার্ব্বভৌম সম্মানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্তছিল। প্রকৃত প্রতিভাবানের শিরোভূষণ হইবার ভাগ্যপ্রাপ্ত না হইয়া লরেল অধিক স্থলেই মস্তিষ্কহীন নৃমুণ্ডের ভার মাত্রে পর্য্যবেসিত হইত।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

খ-যান।

আমাদের পুরাণাদিতে পুষ্পকরথ প্রভৃতি নানাবিধ বিমানচারি যানের কথা দেখিতে পাই। এক সময়ে আমরা উহা কবির কল্পনা মনে করিতাম। ক্রমে যখন বেলুন, এরপ্লেন, জেপ্লেন দেখা দিল, তখন আমাদের বিমানচারি রথের কথা সত্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বর্ত্তমান যুদ্ধে বিমান যাত্রা বহুল পরিমানে প্রচলিত হওয়ায় আমাদের ভবিষ্যত আশা অনেক প্রসারিত হইতেছে।

টমাস হণ্ট বলেন যুদ্ধাবসানের পরে অদূর ভবিষ্যতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে লোকে রেল, মটর গাড়ীর পরিবর্ত্তে বিমানযান ব্যবহার করিবে। কারণ ইহা দ্বারা অত্যন্ত দ্রুত যাওয়া যায়; ইহা অনেক নিরাপদ এবং ইহাতে খরচ কম।

ইহার দ্রুতগতি সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য, কারণ বর্ত্তমানেও ইহা অনায়াসে ঘণ্টায় ১০০ মাইল চলিয়া থাকে। এই গতি রেল কিম্বা মটরের রাস্তার মত বক্র নহে, ইহার এই গতি পাখীর মত সরল পথে; কাজেই স্থানের দূরত্বও অনেক কমিয়া যায়। যদি ধরিয়া লই ইহা ঘণ্টায় ৮০ মাইলও চলে, তাহা হইলে সরল রেখায় লণ্ডন হইতে পেরিসে যাইতে ইহার ৩ ঘণ্টা মাত্র সময় লাগে। অথচ রেলে যাইতে বর্ত্তমানে ৭।৮ ঘণ্টার প্রয়োজন। শূন্য পথে লণ্ডন হইতে রোম নগরীতে যাইতে ১২ ঘণ্টা সময়ের দরকার কিন্তু রেল যোগে ৪২ ঘণ্টা লাগিয়া থাকে। কেবল মাত্র ২½ দিনেই আকাশ মার্গে লণ্ডন হইতে ভারতে আসা সম্ভব হইবে।

ইহার দ্রুতগতির ফল এরূপ হইবে যে রাজা এবং বড়লোক গণ ইচ্ছা করিলে ইউরোপ হইতে টাটকা ফল আনিয়া ভারতে বসিয়া আহার করিতে পারিবেন।

বিপদের কথা দেখিতে গেলে সকল যান বাহনেই বিপদ আছে, চালক ভাল হইলে ইহাতে রেল মটর গাড়ী হইতে অল্প বৈ কোন অংশে অধিক বিপদের সম্ভাবনা নাই। প্রবল ঝড় কিম্বা কুয়াসাই ইহার প্রধান বিপদ। মিঃ টমাস্ বলেন, ইহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে প্রতি ১০ মাইল অন্তর এমত এক একটী ষ্টেসন রাখিতে হইবে যেন প্রয়োজন হইলে ইহা তথায় অবতরণ

করিতে পারে। ১০ মাইল অন্তর সার্চ লাইট থাকিলে ইহার রাত্রিতে চলিতেও কোন বাধা হইবে না। যে স্থানে কেবল সমুদ্রের উপর দিয়া চলিতে হইবে তথায় প্রতি ৫০ মাইল দূরে ২ জাহাজ রাখিলেই চলিতে পারিবে। এই জাহাজ নঙ্গর করিয়া রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। জাহাজ ৫০ মাইল অন্তর ২ চলা ফেরা করিতে থাকিলেই চলিতে পারে।

বিপদ সম্বন্ধে মিঃ লেঙ্কেষ্টারের (Mr. F. W. Lanchester) অভিমত যে পূর্ব্বে লোকে ২ হাজার মাইল চলিতে হয়ত এক জনের মৃত্যু হওয়া সম্ভব মনে করিত কিন্তু তিনি বলেন ৪০ হাজার মাইল চলিতে মাত্র এক জনের মৃত্যু হইলেও হইতে পারে।

রেলগাড়ী এবং আকাশ যানের খরচের তারতম্য দেখিলে বস্তুতই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এক শত মাইল রেলের জন্য ৩,৬০,০০০০০ তিন কোটি ষাটি লক্ষ টাকার প্রয়োজন, কিন্তু সে স্থানে আকাশ যানের মাত্র ৯০০০০০ নয় লক্ষ টাকা লাগিয়া থাকে।

ইহার পরে আর একটী দেখিবার বিষয় আছে। সমুদ্রে যেরূপ নূতন যাত্রিদের সামুদ্রিক পীড়া হয়, ইহাতে সেরূপ কিছু হয় কি না। অত্যন্ত উপরে উঠিলে এবং উপর হইতে নীচে নামিবার সময়ে কাহার কাহার গা বমি বমি করে বটে কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকিলে আকাশ যানের অত উর্দ্ধে উঠার কোন প্রয়োজন হয় না। মিঃ টমাস্ বলেন ৫০০০ হাজার ফিট উপরে উঠিলে কাহার ঐরূপ অসুস্থ হইবার কারণ নাই।

লর্ড মণ্টেগ ও মিঃ হণ্ট টমাসের উল্লিখিত অভিমত সমর্থন করেন। তিনি বলেন আকাশ যানই বর্ত্তমান যুদ্ধের একটী শুভ ফল বলিয়া পরিগণিত হইবে। জল অপেক্ষা স্থলের উপর দিয়া ইহার চলাচল সুবিধা জনক হইবে।

বর্ত্তমানে বাতাস যদিও আকাশ পথে চলা ফেরার একটী অন্তরায় বটে কিন্তু এমন দিন আসিবে যখন বাতাসই ইহার অনুকূল হইবে। কিন্তু সে সময়ে চালকদের বাতাসের গতি বিধি বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন হইবে।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

প্রেমের ক্ষুধা।

আজ একি বিশ্ব-গ্রাসী ক্ষুধা
জাগে সারা প্রাণের ভিতর,
বাহু-পাশে বাঁধিবারে সাধ
বিশাল বিপুল চরাচর!
হৃদয়ের সুধা বিলাইয়ে
মোর শূন্য হৃদিমাঝে ভাই,
সবাকার হৃদয়ের সুধা
আজ আমি লুটে নিতে চাই!
কি অতৃপ্ত! কি গভীর তৃষা!
কি বেদনা! কি মহা চেতনা!
আজ আমি অধীর পাগল!
কোথা শান্তি জানে কোন্ জনা!
কে আমারে নিবে উপহার?
কে আমারে দিবে আপনায়?
সব জ্বালা হবে অবসান
সুনিবিড় মিলন-ছায়ায়।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

গ্রন্থ সমালোচনা।

সতীর-গৃহধর্ম্ম—শ্রীসুধেন্দুরঞ্জন ঘোষ মূল্য ১৲

এই গ্রন্থে মহিলাদের পাঠোপযোগী ধর্ম্মনীতি ও সদৃষ্টান্ত মূলক কতিপয় বিষয় গদ্যে ও পদ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "শিশুশিক্ষা" ও "বোধোদয়" পাঠের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস পাঠের পরিতৃপ্তি ব্যতীত যে সকল পাঠিকার আর গতি নাই, তাহাদের পক্ষে এই সান্ধ্যকালে এ প্রকার দুই একখানা বই পড়িয়া লওয়া মন্দ নয়। ইহাতে প্রাচীন সৎ সাহিত্যের রসমাধুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে বিমল আনন্দও লাভ হইবে এবং সদ্দৃষ্টান্তের দিব্য চিত্র মানসপটে অঙ্কিত থাকিয়া জীবনে এক নব ভাবের প্রেরণা আনিবে। উপন্যাস পূর্ণ বঙ্গে সংস্করণ গ্রন্থমালার যে প্রচণ্ড বন্যা আসিয়াছে তাহাতে কেহ স্বল্লায়াসে চটকি গল্পের রস আস্বাদন করিতে ছাড়িবেন কি? তথাপি এ প্রকার গ্রন্থ যে গৃহলক্ষ্মীদের করপদ্মে বেশ মানাইবে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে। গ্রন্থকার সাহিত্য ক্ষেত্রে নূতন-ব্রতী হইলেও এ ক্ষেত্রে অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন। গ্রন্থের বাঁধাই উৎকৃষ্ট।
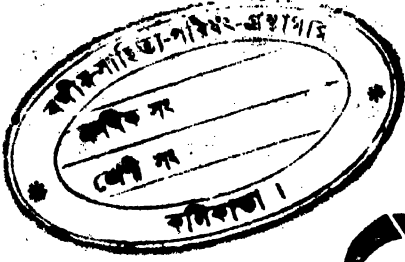
সৌরভ

ষষ্ঠ বর্ষ। ময়মনসিংহ, আষাঢ় ১৩২৫। ৯ম সংখ্যা।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(নীল নদের উপর।)

একদিন সংবাদ পাইলাম যে আমাকে কাপ্তেন সাহেবের সহিত মিশর দেশে (Egypt) যাইতে হইবে। খবরটা আমি কয়েক দিন আগেই জানিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া অনেকটা প্রস্তুত ছিলাম। চিরজীবনটা এদেশ ওদেশ করিয়া কাটাইয়াছি। অনেকে বলিত আমার মাথার মধ্যে ঘূরণি পোকা আছে। কথাটা যে অনেকটা সত্য তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। একস্থানে আমি কখনও অধিক দিন থাকিতে পারিতাম না। ইউগণ্ডায় প্রায় এক বৎসর কাল একাদিক্রমে থাকায় কয়েক সপ্তাহ হইতে মনটা উড়ু উড়ু করিতেছিল। এখন এই হুকুম আসাতে যে আমি বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম তাহা না বলিলেও চলে।

যেদিন হুকুম আসিল তাহার পরদিনই আমি রওনা হইলাম ও যথাসময়ে মেন্‌গো উপস্থিত হইলাম। কাপ্তেন সাহেবের নিকট শুনিলাম নৌকাযোগে আমাদিগকে যাইতে হইবে। যাহারা এই দেশের সংবাদ রাখেন না তাঁহাদের জানিয়া রাখা ভাল যে প্রসিদ্ধ নীল নদ ইউগণ্ডার দক্ষিণে উৎপন্ন হইয়া ৩৬৭০ মাইল গমনের পর ভূমধ্য সাগরে (Mediterranean Sea) পতিত হইতেছে। ইউগণ্ডা, নিউবিয়া, সুদান ও সমগ্র মিশর দেশের ভিতর দিয়া ইহা প্রবাহিত হইতেছে। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ইহা দ্বিতীয় নদী বলিয়া গণ্য। মিশর যাইতে হইলে ইউগণ্ডা হইতে আমাদিগকে নীল নদীর প্রায় সমস্ত অংশ অতিক্রম করিতে হইবে।

এই নদী ভূগোলে 'মিশর-জননী' বলিয়া অভিহিত হয়। ইহ না থাকিলে মিশর সাহারার মত জনহীন মরুভূমি হইয়া পড়িত। মিশর, সুদন প্রভৃতি দেশে কোনও পর্ব্বত না থাকাতে বৃষ্টি হয় না। কিন্তু প্রত্যেক বৎসর নীল নদীতে এমন বন্যা উপস্থিত হয় যে, বহুদূর পর্য্যন্ত নদীর উভয় কূল একেবারে ডুবিয়া যায়। জল সরিয়া গেলে ঐ সকল স্থানে খুব ঘন পলি পড়িয়া যায়, এই পলির উপর গম, ধান তুলা প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশের সিন্ধু প্রদেশের অবস্থাও অনেকটা এই রকম—সেস্থানেও বৃষ্টির নাম গন্ধ নাই। বর্ষাকালে সিন্ধু নদ উভয়কূলকে ডুবাইয়া দেয়, তারপর জল সরিয়া গেলে পলির উপর গম প্রভৃতি রোপণ করা হয়।

আমাদের সঙ্গে দুইখানি বজরা ও তের জন লোক থাকিবে। ইহাদের মধ্যে দুই জন সাহেব, চারি জন ভারতবাসী ও অবশিষ্ট সাতজন সোমালী আরব। নৌকার মাঝি-মাল্লার সংখ্যা অবশ্য ধরা হয় নাই। রবিকে সঙ্গে লইবার বিশেষ ইচ্ছা কাপ্তেন সাহেবের ছিল না। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধে অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন। স্থির হইল যে মিশরে উপস্থিত হইবার পর আমরা দুইজনে (রবি ও আমি) তিন মাসের ছুটি লইয়া ভারতবর্ষে যাইব; কাপ্তেন সাহেবও সুবিধা পাইলে ছয় মাসের অবকাশ লইয়া

বাড়ী যাইবেন। ১৭ ই মে সোমবার আমরা মেনুগো হইতে রওনা হইলাম।

পাঠকের মনে থাকিতে পারে যে, মেনুগো ভিক্টোরিয়া নিয়ানজার উপর অবস্থিত। নীল নদ এই বিশাল হ্রদ হইতে বাহির হইয়া সমরসেটনীল (Somerset Nile) নামে উত্তর পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। কিয়দ্দূর পরেই রিপন জল প্রপাত (Ripon Falls) এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, নীল নদ প্রপাতের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। এ দেশের মাঝিরা এমন নিপুণ যে অধিকাংশ স্থানে বড় ২ নৌকা লইয়া ইহারা অনায়াসে চলিয়া যায়। বড় ২ প্রপাত গুলি অতিক্রম করিবার সময় আরোহীদিগকে নৌকা হইতে নামিয়া যাইতে হয়। রিপন প্রপাতে আমাদিগকে নামিয়া খানিকদূর হাঁটিয়া যাইতে হইল।

মেনুগো হইতে মিশরের রাজধানী কায়রো পহুছিতে আমাদিগের প্রায় তিন মাস লাগিয়াছিল। এই দীর্ঘ সময়ের সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বিবৃত করিলে এক প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। আমাদের তত সময় নাই; এবং পাঠকেরও তাহা ভাল লাগিবে না। এই জন্য আমরা এই ভ্রমণ কালের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি মাত্র পাঠকের নিকট উপস্থিত করিব।

আমাদের কাহিনী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা এই নদীর বিষয়ে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

নীলনদ ভিক্টোরিয়া নিয়ানজা হ্রদ (Victoria Nyanza) হইতে বাহির হইয়া উত্তর পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। এইস্থানে নদী সমরসেটনাইল নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পর ইহা ইউগণ্ডাকে কনুগো হইতে পৃথক করিয়া উত্তরদিকে চলিয়া গিয়াছে। এইখানে ইহা "নীল" নামে প্রসিদ্ধ। কিয়দ্দূর যাইয়া নদী দক্ষিণ সুদনে প্রবেশ করিয়াছে। এখানে ইহার নাম "বহারএল জেবেল"। প্রায় ২৩০ মাইল গমনের পর ইহা সহসা পূর্ব্বদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে এবং "শ্বেত নাইল" নাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। উত্তর সুদনের রাজধানী খর্ত্তুম সহরের নিকট 'ব্লু নাইল" নাম্নি একটি শাখা নদী এবিসিনিয়ার পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রায় ১৫০ মাইল উত্তরে 'আটবারা" নাম্নি অপর একটী শাখা নদী আবিশিনিয়ার পর্ব্বত হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার দক্ষিণ দিকে আসিয়া পতিত হইতেছে। নিউবিয়ার আবুহাম্মাদ নামক সহরের নিকট হইতে ইহা কিয়দ্দূর দক্ষিণ পশ্চিম মুখে গমন করিয়া পুনরায় উত্তরদিকে প্রবাহিত হইয়া মিশরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মিশরের রাজধানী কয়রো হইতে ইহা এক বিশাল "ব"দ্বীপের সৃষ্টি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বিভক্ত হইয়া সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই ধারা গুলির মধ্যে তিনটী সমধিক প্রসিদ্ধ। এই তিন ধারার ঠিক মোহনার উপর আলেকজান্দ্রা, রোশেটা, এবং ডামায়টা অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি মিশরের সর্ব্ব প্রধান বন্দর।

সকলেই জানেন বঙ্গদেশ গঙ্গানদীর "বদ্বীপ"। সহস্র সহস্র বৎসরের পলিমাটী জমিয়া বঙ্গদেশ প্রস্তুত হইয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীনতম পুস্তক ঋগ্বেদে আমরা ইহার নাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাই না। মহাভারতে ইহার নাম আছে বটে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তখন এদেশের অধিকাংশ স্থল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ভীমসেন রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে পূর্ব্বদিক দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়া এই দেশে আসিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু রাক্ষস সঙ্কুল গভীর জঙ্গল ভিন্ন তিনি আর কিছু দেখিতে পান নাই। শল্য পর্ব্বে শল্যের মুখে জানিতে পারা যায় যে সেকালে বঙ্গদেশে আসিলে আর্য্য জাতিকে পতিত হইতে হইত অর্থাৎ তখনও পর্য্যন্ত এ দেশে আমাদের প্রাচীন পিতামহেরা বসবাস করিতে আরম্ভ করেন নাই।

প্রাচীনকালে মিশরের ও ঠিক এই অবস্থা ছিল। এ দেশও ক্রমে ক্রমে নীল নদী কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে এদেশ সভ্যতার হিসাবে অত্যন্ত প্রাচীন। পুরাতত্ত্ববিদেরা বলেন যে ভারত অপেক্ষাও মিশরের সভ্যতা প্রাচীন। ইহার নিকট ভারত, চীন, বাবিলন, মিডিয়া, গ্রীস প্রভৃতি সেদিনকার দেশ। এই মিশরের প্রাচীন ইতিহাসের অন্ধকার ময় পৃষ্ঠা উদ্ঘাটনের জন্য ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিত তাঁহাদের জীবনপণ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সে যাহা হউক ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে মিশরের প্রাচীন কথা জানিতে

পারিলে আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের অনেক অজ্ঞাত কাহিনী বাহির হইয়া পড়িবে। প্রাচীন সময়ে মিশরের সহিত আমাদের যে অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল, তাহার বহুতর প্রমাণ বাহির হইয়াছে।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

চীনের জ্যোতিস্তত্ত্ব।

চীন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা বহু প্রাচীনকাল হইতেই জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন। ঐদেশে, জ্যোতির্ব্বিদ্যা রাজ্য শাসন কার্য্যের একটী অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহারা সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণের একটী সুদীর্ঘ তালিকা রাখিয়াছেন। ঐ তালিকাতে গত ৩৮৫৮ বৎসরের মধ্যে যে যে গ্রহণ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাদের সকল গুলিরই সন তারিখ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। চীনারা ঐরূপ একটী তালিকার জন্মদাতা বলিয়া নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। ঐ গৌরব ইহারা পাওয়ার অযোগ্য নহেন; কেননা পৃথিবীতে একমাত্র বেবিলোনিয়ানগণই এই প্রকারের তালিকার ব্যবহার জানিতেন। কিন্তু চীন দেশীয় তালিকার ন্যায় ইহাদের গ্রহণ-পর্য্যায়-তালিকা এত দীর্ঘ ছিল না। পৃথিবীর অন্য কোন জাতি গ্রহণের এই প্রকার বিশুদ্ধ তালিকা রাখিয়া যান নাই। অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে অন্যান্য জাতিও—পৃথিবীর যে যে স্থান হইতে যে যে গ্রহণ দৃষ্টিগোচর হইবে—তাহা পূর্ব্বেই গণনা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। তাই আজ কাল নাবিক পঞ্জিকার কল্যানে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের গ্রহণগুলিও বাঙ্গলা দেশের পঞ্জিকায় গৃহীত হইয়া থাকে। যাহা হউক চীনবাসিগণ বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্বোক্ত তালিকাতে যে যে গ্রহণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাদের সকলগুলিই গ্রহণ সঙ্ঘটিত হওয়ার বহু পূর্ব্বে গণিত হইয়াছিল।

কেল্‌ডিয়ান ও ইজিপ্সিয়ানগণ যে কারণে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ বিদ্যার চর্চ্চায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন চীন-বাসিগণও সেই কারণে সঞ্জীবিত হইয়াই জ্যোতিঃশাস্ত্রের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীন দেশীয় রাজগণ এই বিদ্যার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া তাহাদের পঞ্জিকা সংশোধন করাইয়া আসিতেছেন। কথিত আছে যে ফোহি (Fouhi) নামক রাজা খৃষ্টের জন্মের ২৮৫৭ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। তিনি বিশেষরূপ অধ্যবসায় সহকারে জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহার প্রজাদিগকে ঐ বিদ্যা শিক্ষা দিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রজাগণ তত উন্নত না থাকায় তাহারা তাঁহার প্রণালী বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি ১০ ও ১২ বৎসরের দুইটী নূতন চক্র ইহাদিগকে শিক্ষা দেন। এই ১০ ও ১২ বৎসরের সমন্বয়ে যে ৬০ ষষ্ঠী বৎসরের আর একটী চক্র উৎপন্ন হইয়াছে, চীন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা এপর্য্যন্ত তাহাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তথায় সন, মাস, তারিখ, দিন ও দণ্ডাদি এই চক্রানুসারে গণিত হইয়া থাকে। কিন্তু ফোহি কোথা হইতে এই গণনা শিক্ষা করিলেন তাহার সম্বন্ধে কেহই কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যান নাই।

ফোহির রাজত্বের কিছুকাল পরে তাহাদের পঞ্জিকাতে বড়ই গোল বাধিয়া যায়। খৃষ্টের জন্মের ২৬০৮ বৎসর পূর্ব্বে হোয়াংসি (Hoang Ti) নামক নরপতি পঞ্জিকা সংশোধনের উদ্দেশে একটী মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এক এক দল জ্যোতির্ব্বিদের উপর যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণের ভার ন্যস্ত করেন। তখন দেখিতে পাওয়া গেল যে ১২শটী চান্দ্র মাস সম্পূর্ণরূপে একটী সৌর বৎসরের সমান হইতেছে না। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য ১৯ বৎসরে আরও সাতটী চান্দ্রমাস বেশী যোগ করিবার দরকার হইয়াছিল। অর্থাৎ গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে ইহারা দেখিলেন যে ১৯টী সৌর বৎসর=১৯টী চান্দ্র বৎসর+৭টী চন্দ্র মাস। ইহা সত্য হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে এথেন্সবাসী জ্যোতির্ব্বিদ মিটন তাঁহার পৌনঃপুনিক চক্র বা পৌনঃপুনিক বৃত্ত আবিষ্কার করিবার প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে চীনবাসিগণ ঐ চক্রের আভাস পাইয়াছিলেন। হোয়াংসির রাজত্ব কালেই চীনদেশে গ্রহণ গণনা করিবার জন্য সর্ব্ব প্রথম গণিতের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। এবং পৃথক বিচারালয়ের

অনুষ্ঠান করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্যার আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। এই আইন অনুসারে, কোন রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ গ্রহণ ঠিক মতে গণনা করিতে না পারিলে বা গণনায় অক্ষম হইলে অথবা কোনও গ্রহণ তাহার গণনায় ধৃত না হইয়া দৃষ্টি অগোচর থাকিলে, উক্ত জ্যোতির্ব্বিদ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন চংকং (Tchong Kong) এর রাজত্ব কালে, একটী গ্রহণ গণনায় ধৃত না হওয়ায়, হি ও হো নামক দুইজন জ্যোতির্ব্বিদ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি।

খৃঃ পূর্ব্ব ২৩১৭ অব্দে এও (Yao) রাজা হন। তখন চীনদেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যার খুব অবনতি ঘটে। ঐ বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রগণের গতি অতি সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চারিটি ঋতুর দৈর্ঘ্য অতি সূক্ষ্ম পরিমাপ করিবার জন্য, তাহার জ্যোতির্ব্বিদগণকে আদেশ করেন। রাশি চক্রকে তিনিই সর্ব্ব প্রথম ২৮ অংশে বিভক্ত করেন। ভারতীয় মতেও রাশি চক্র (অভিজিৎ সহ) ২৮ অংশে বিভক্ত। তবে ইহাদের বিভাগগুলি অন্যরূপে সম্পন্ন করা হইয়াছে। এওর সময় হইতেই চীনদেশে বৎসরের দৈর্ঘ্য ৩৬৫¼ দিন ধরা হইত। এবং তিনিই রাশি চক্রকে ৩৬৫¼ অংশে বিভক্ত করেন। এই চক্রানুসারে সূর্য্যের দৈনিক গতি নির্ণয় করিতে বিশেষ সুবিধা। ৩৫৪ ৩৪৮/৯৪০ দিনে চীন বাসিগণের এক চান্দ্র বৎসর হয়, এই দুইটী গণনার সংযোগে তাহাদের ৪৬১৭ বৎসরের চক্র ধরা হইয়াছে। এই চক্র মতে ৪৬১৭ বৎসর পর পর চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পর ঠিক পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়।

খৃষ্টের জন্মের ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে চিয়াও কং এর (Tchoou Kong) রাজত্ব আরম্ভ হয়। তাহার সময়েই জ্যোতিষের উপযোগী অত্যাবশ্যক গগন পর্য্যবেক্ষণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। এই সকল পর্য্যবেক্ষণ ক্রিয়ার মধ্যে একটী হইতেছে—কর্কট ও মকর সংক্রান্তির (Summer solstice and winter solstice) সময়ে মধ্যন্দিন রেখা অতিক্রম করিবার কালে, সূর্য্যের উচ্চতা নির্ণয়। লয়াং (Loyang) নামক গ্রামে এই পর্য্যবেক্ষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। তখন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল যে বিষুবদবৃত্ত ক্রান্তিবৃত্ত পরস্পর পরস্পরকে ২৩°—৫৪′—৩০″·১৫ ডিগ্রীতে অবচ্ছেদ করিত। মহাকর্ষণ বাদের সিদ্ধান্তের (Theory of universal gravitation) সঙ্গে এই গননা ও পর্য্যবেক্ষণের সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। মকর সংক্রান্তির সঙ্গে আর একটী গণনার সম্বন্ধ ছিল। লেপ্লেসের গণনার সঙ্গে এই পরবর্ত্তী গণনার পার্থক্য অতি সামান্য। ইহাতে লেপ্লেস মনে করেন যে প্রাচীন চীন বাসিগণ যথা যথ রূপেই তাহাদের গণনাকার্য্য সমাধা করিতেন। ফৌহির সময় হইতে খৃঃ পূঃ ৪৮০ পর্য্যন্ত (২৫০০ বৎসর) চীন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদ্যার চরম উৎকর্ষসাধিত হইয়াছিল। কিন্তু খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতেই মাত্র চীনবাসিগণের ইতিহাস সভাসমাজ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। খৃঃ পূঃ ৭২২ হইতেই চীনদেশে ব্যবহারিক জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনা প্রকৃতরূপে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে খৃঃ পূঃ ৪০০ পর্য্যন্ত যে ৩৬টী গ্রহণ চীন দেশ হইতে দেখিতে পওয়া গিয়াছিল, তাহা কনফিউসিয়াস নামক তদ্দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত তালিকা ভুক্ত করেন। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ গণের গণনায় এই ৩৬টী গ্রহণের ৩১ টীই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কনফিউসিয়াসের পর চীনবাসিগণের সমবেত একাগ্রতা সত্ত্বেও তথায় জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিশেষ অবনতি ঘটে।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে সিনচিংসির (Tein chi Hong Ti) বর্ব্বরতাই এই অধঃপতনের কারণ। এই সম্রাট খৃঃ পূঃ ২২১ অব্দে কৃষিভৈষজ্য, চিকিৎসা ও ফলিত জ্যোতিষ ভিন্ন অন্যান্য সর্ব্বশাস্ত্রের পুস্তকাবলী ধ্বংস করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাহার বিবেচনায় উপরিউক্ত শাস্ত্র-চতুষ্টয় ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্র মনুষ্যের শিক্ষা করিবার দরকার ছিলনা। এইরূপে রাশি রাশি জ্যোতিষ গ্রন্থ ও স্তূপাকার জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র অগ্নিসাৎ করিয়া নষ্ট করা হইয়াছিল।

সমস্ত পুড়িয়া যাওয়ায় এখন চীনদিগের পাণ্ডিত্যের তেমন কোন পরিচয় বর্ত্তমান নাই; তাই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমাণ করেন যে প্রাচীন চীন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা কেবল গ্রহণ গণনার জন্যই গগন পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ইহারা জ্যোতিষ্কগণের গতির কোন প্রকার প্রণালীর বা সিদ্ধান্ত বাদের আবিষ্কর্ত্তা, উদ্ভাবণ কর্ত্তা

নহেন। তাঁহারা অনুমাণ করেন খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে যেশুইট (Jesuit) সম্প্রদায় কয়েকজন পাদ্রিকে চীন দেশে প্রেরণ করেন। ইহারা চীনদেশের জাতীয় ইতিহাস ও জ্যোতির্ব্বিগ্যারইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন ও তাহা ইউরোপে প্রচার করেন। তাহারা আরও অনুমান করেন যে আরবের খলিফাগণের রাজত্বকালে অনেক মুসলমান চীনদেশে গমন করেন, তখন আরবগণের নিকট হইতে চীনবাসিগণ আরবীয় জ্যোতিষ শিক্ষা করেন ও তাহাদের প্রণালী অবলম্বন করেন। আর মিশনারীগণও ইউরোপ হইতে অনেক বিষয় লইয়া গিয়া চীন দেশে শিক্ষা দেন। এই প্রকারে চীন দেশীয় জ্যোতির্ব্বিগ্যার উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইউরোপীয় অনেক পণ্ডিত ইহাও মনে করেন যে অনেক খ্রীষ্টীয়ান পাদ্রি চীনবাসিগণকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য চাটুকারিতা করিয়া ইহাদের গুণ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ মিশনারিগণের লিখিত বিবরণ ইঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এই ধারণা ভ্রমাত্মক। কেননা বেবিলোনের জ্যোতিস্তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে চীন দেশীয় জ্যোতিস্তত্ত্বই প্রাচীনতর। বেবিলোনের ইতিহাস খৃ: জন্মের ১৫০০ বৎসরের পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই কিন্তু চীন দেশীয় রাজগণ খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০০তিন হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছিলেন।

মিশর দেশে কয়েকটী প্রাচীন সমাধি মন্দিরের ভিতর কতকগুলি চীনা বাসন পাওয়া গিয়াছে। ঐ পাত্র গুলি দেখিতে অনেকটা বর্ত্তমান কালের নিম্মিত চীনা বাসনের মত এবং ইহাদের উপরে চীনা ভাষায় লিখিত দুই একটী কথা (Motto) ও আছে; ইহা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমাণ করেন পিরামিড নির্ম্মাণকারী ইজিপ্টের রাজারা চীন দেশের আদি রাজার পরে জীবিত ছিলেন। চীন বাসিগণের মতে (Fo He) ফোহিই চীন দেশের আদি রাজা (খৃ:পূ: ২৮৫২ ?)।

চীন বাসিগণের কাগজ পত্রাদি সমুদয় নিদর্শন পুড়িয়া যাওয়ায় গ্রহণ গণনার তালিকা ব্যতীত ইহাদের পাণ্ডিত্যের অন্য কোন প্রমাণ পওয়া যায়না। পৃথিবীর সকল প্রাচীন জাতির ন্যায় ইহারাও ধুমকেতু উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কের কোন প্রকার হিসাব পত্র রাখিতেন বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ডুবুরী জাহাজ।

পুরাকাল হইতে লোকে জলযানের ব্যবহার করিতেছে। পূর্ব্বে যখন কম্পাস প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কার হয় নাই লোকে তখনও সমুদ্রে গমন করিত। এই আবিষ্কার আরকিমেডিসের (Archimedes) আপেক্ষিক গুরুত্ব আবিষ্কারের বহুপূর্ব্বে হইয়াছিল তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু আরকিমেডিসের পূর্ব্বে জলের নীচে ভাসিয়া থাকা যে সম্ভব তাহাও প্রাচীনেরা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এরিষ্টোটেল (Aristotle) লিখিয়াছেন যে টায়ার (Tyre) আক্রমণকালে একরূপ ডুবুরী জাহাজ ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই জাহাজে হস্তী শুণ্ডের মত একটী চোঙ্গ থাকিত তাহাদ্বারা ডুবুরীগণ বাতাস গ্রহণ করিত। কথিত আছে আলেকজাণ্ডার (Alexander the Great) যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে কখন কখন একরূপ ডুবুরীর সাহায্য গ্রহণ করিতেন, যাহারা যন্ত্র সহযোগে সমুদ্রের তলে বিচরণ করিতে পারিত। খ্রীষ্ট জন্মিবার ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে লোকে যেরূপ সমুদ্রের উপরে বিচরণ করিতে পারিত সেরূপ সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করিবারও চেষ্টা করিতেছিল। বর্ত্তমান নৌ-বিভাগের মত তখন কেহই অপরিসীম সাহসের সহিত কার্য্য করে নাই।

বিশপ ক্লোয়াস মেগনাস (Bishop Claus Magnus) বলিয়াছিলেন যে সে সময়ে একরূপ দস্যু ছিল যাহারা চর্ম্ম নির্ম্মিত যানে আরোহন করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিত; উহার সাহায্যে তাহারা জলের উপরে ও নীচে যাইত। তিনি বলিয়াছেন যে ১৫০৫ খৃ: অব্দে এসলোর (Aslor) গির্জ্জায় ঐরূপ যানের দুইটি নমুনা দেখিয়াছেন। খুব সম্ভবত: ১৫৩৮ অব্দে সম্রাট ৫ম চার্লসকে টোলেডোতে একটি ডুবুরী জাহাজ দেখান হইয়াছিল। ইহার ২০ বৎসর পরে ভেনিসিয়ানগণ একখানা নিমজ্জিত জাহাজ

উত্তোলন করার জন্য একরূপ ডুবুরী নৌকা ব্যবহার করিয়াছিল। ইহার ২০ বৎসর পরে রাণী এলিজাবেতের সময়ে একজন নৌ গোলন্দাজ এক তরী আবিষ্কার করিয়াছিল যাহা সমুদ্রের তলে গিয়া আবার উপরে উঠিতে পারিত। এই তরণীতে তিনটী প্রকোষ্ঠ ছিল; উপর এবং নিম্ন প্রকোষ্ঠে বাতাস প্রবেশ করিতে পারিত না। মধ্য প্রকোষ্ঠে কতকগুলি ছিদ্র ছিল উহাদ্বারা জল প্রবেশ করাইয়া তরণী নিমজ্জিত করা যাইত এবং প্রয়োজন মত জল বাহির করিয়া দিয়া নৌকাখানা জলের উপরে ভাসাইয়া তোলা যাইত।

দ্বিতীয় জেমস্, কর্ণিলিয়া ড্রেবেল নামক একজন উপন্যাসকে ডুবুরি জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তাহার নির্ম্মিত তরীখানা ১২ জন নাবিক ও যাত্রী সহ টেমস নদীতে ডুবিয়া যায়।

শতাব্দীর পরে শতাব্দী লোকের চেষ্টা চলিতে লাগিল। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে আমেরিকার ডেভিড বুসনেল একটি ডুবুরী নৌকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহাদ্বারা একখানা বৃটিশ রণতরীকে টরপেডো করিবার উপক্রম করিয়াছিল। উহা একজন লোক দাঁড় বাহিয়া চালাইত। সেই চালক যুদ্ধ জাহাজের নিম্নে গিয়া টরপেডো ছাড়িতে একটু গোল করাতে সফল কাম হইতে পারে নাই।

ইহার পরে নেপোলিয়ানের সময়ে রবার্ট ফুলটন নামক এক ব্যক্তি এসম্বন্ধে চেষ্টা করেন। ফুলটন কৃতকার্য্য হইতে পারিলে নেপোলিয়ান নাইল অথবা ট্রেফেলগারের যুদ্ধে পরাজিত হইতেন না। এবং যদি ওয়াটারলুর যুদ্ধ হওয়া সম্ভব হইত তবে হয়ত তাহার ফল অন্যরূপ হইত।

সম্রাট নেপোলিয়ান যখন পরাভূত হইয়া সেণ্টহেলেনায় আবদ্ধ ছিলেন তখন তাহাকে গোপনে আমেরিকায় নেওয়ার জন্য যুক্ত প্রদেশে একখানা ডুবুরী জাহাজ তৈয়ার হইয়াছিল কিন্তু উহা আর কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল না। ফুলটনের বোট খানা একটী চুরটের আকৃতির ছিল। উহা দাড় টানিয়া চালাইতে হইত এবং উহাতে একটী মাস্তুল ছিল। প্রয়োজন মত উহা জলের উপরে পালের দ্বারা চলিত।

ইহার ৫০ বৎসর পরে বোয়ের নামক একজন জর্ম্মাণ ইংলণ্ডের রাজদরবারের সাহায্যে ডুবুরী জাহাজ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

১৮৬৪ সনে চার্লসটনের নিকটে যখন হাউসাটনিক (Housatonic) নামক একখানা জাহাজকে ডুবুরী জাহাজ হইতে টরপেডো করিয়া ডুবাইয়া দেওয়া হয়, তখনই সকলের যুদ্ধ বিগ্রহে ডুবুরী জাহাজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এই সঙ্গে টরপেডো বোট, টরপেডো বোট ধ্বংসকারী যান এবং ডুবুরী জাহাজের দিকেও লোকে মনোযোগ দিতে থাকে।

পূর্ব্বকালে একখানা তরণীর পার্শ্বে কয়েকটী দণ্ডের উপরে টরপেডো স্থাপন করা হইত এবং প্রয়োজন মত উহা তাড়িৎ যন্ত্র যোগে ছাড়া হইত কিন্তু ইহাতে আক্রান্ত ও আক্রমনকারী উভয় তরণীরই বিপদের সম্ভাবনা ছিল।

অতঃপর রবার্ট হোয়াইট হেড (Robert Whit-head) নামক একজন ইংরাজ টরপেডোর অনেক উন্নতি সাধন করেন। এই টরপেডো চুরটাকৃতি একটী ধাতব চোঙ্গা বিশেষ। ইহার ভিতরে কয়েকটী কুঠরী আছে। সম্মুখের কুঠরীতে কিছু গানকটন এবং উহা প্রজ্জ্বলিত করার জন্য একটী কল স্থাপিত—তাহার নাম পিস্তল। এই পিস্তলটী একটী লৌহদণ্ড; তন্নিম্নে একটী কেপ অবস্থিত। কোন কঠিন বস্তুর আঘাতে এই দণ্ডটী ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিম্নস্থ কেপটীকে আঘাত করে, তাহার ফলে গানকটন প্রভৃতি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভীষণ বিদারণকার্য্য সম্পাদন করে।

ইহার পিছনের কুঠরীতে সঙ্কুচিত বায়ু আবদ্ধ। এই বায়ু প্রতি ইঞ্চিতে ২০০০ হাজার পাউণ্ডের চাপে সঙ্কুচিত। এই সঙ্কুচিত বায়ু প্রকৃত পক্ষে টরপেডোটীর বয়লারের কার্য্য করে। এই বায়ু যখন ভিতরের কল ঘরে প্রবেশ করে তখন উহা উত্তপ্ত হইয়া টর্পেডোর গতি বৃদ্ধি করে। ইহার পিছনের কুঠরীতে টরপেডোটী স্থির রাখিবার যন্ত্র। এয়ার মটর (air motor) এর উপরে আধিপত্য করার জন্য এস্থলে একটী গাইরস্কোপ (Gyroscope) অবস্থিত। টরপেডোটী ছাড়িবার পুর্ব্বে নিশানা করিয়া উহার গতি নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। যদি চলিতে চলিতে উহা গভীর জলে প্রবেশ করে কিম্বা উপরেরদিকে ভাসিয়া উঠে, তাহা হইলে এই যন্ত্র তাহা সংশোধন করিয়া দেয়। এই গতি নির্দ্দেশক যন্ত্রটীর বর্ণনা শুনিয়া ইহা বড়

সহজ মনে হয় বস্তুতঃ ইহা তত নহে। ইহার পিছনে একটী ভাসাইয়া রাখিবার কুঠরী এবং মটরের কুঠরী। ইহার মটর যন্ত্রটী কেবল মাত্র কয়েক ইঞ্চ লম্বা কিন্তু ইহা প্রবল শক্তি সম্পন্ন। টরপেডোর লেজের দিকে ২টী প্রোপেলার আছে, উহারা পরস্পর বিপরীতদিকে ঘুরিতে থাকে। উহারা একদিকে ঘুরিলে টরপেডোটীকেও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে হইত। ইহাতে এরূপ বন্দোবস্ত আছে যে কিয়ৎদূর না গেলে টরপেডোটী বিদীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কারণ তাহা না হইলে যে তরী হইতে উহা নিক্ষেপ করা হয় তাহারও ধ্বংশ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহা জাহাজের উপর হইতেও সমুদ্রে ফেলা যায় পতনের আঘাতে উহার অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র বিকল হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই উহা জলের নীচে নামাইয়া ছাড়াই নিরাপদ। বর্ত্তমান ঘণ্টায় ৩০ নট বেগে ইহা ২০০০ গজ পর্য্যন্ত এক চোটে জলের নীচে দিয়া যাইতে পারে।

ব্রেন্নান সাহেবের (Brennan) টরপেডো অনেকটা হোয়াইট সাহেবের টরপেডোর মত কিন্তু ইহা তীর হইতে চালিত করিতে হয়। ইহা কেবল তীরদেশ কিম্বা বন্দর ইত্যাদি রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই টরপেডোর ভিতরে দুই ড্রাম আন্দাজ সূক্ষ্ম পিয়ানোর তার জড়ান থাকে এবং তীরদেশে ইঞ্জিনের সহিতও ঐরূপ তার থাকে। ইঞ্জিন চালাইলে তীরের কলের সহিত জড়ান তার খুলিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে টরপেডোর ভিতরের তার ও খুলিতে থাকে এবং ঐ তারের দ্বারাই টরপেডো যথা স্থানে চালিত হয়। কিন্তু ইহার একটী বিপদ আছে। চলিত জাহাজের দ্বারা তীরের তার ছিন্ন হইলেই টরপেডো বন্ধ হইল। সেই জন্য হোয়াইটহেড,.. টরপেডোই যুদ্ধ জাহাজ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

এই টরপেডো সুবিধা মত ছাড়িবার জন্যই যেন বর্ত্তমান ডুবুরী জাহাজের এত উন্নতি হইয়াছে। এখন দেখা যাক ডুবুরী জাহাজের কি কি প্রয়োজন ইহা জলের উপরে চলিতে পারা দরকার। প্রয়োজন হইলে জলের নীচে ইহার এরূপ ডুবিতে পারা দরকার যেন ভাসমান জাহাজের তলাতে ধাক্কা না লাগে। জলের সমান্তরাল ভাবে ইহার চলা দরকার। ইহাতে যেন জল ও বাতাস প্রবেশ না করিতে পারে অথচ ইহাতে এরূপ বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন যেন নাবিকগণ ইহার মধ্যে নিমজ্জিত অবস্থাতেও অনেকটা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। ইহার যেরূপ তাড়াতাড়ি ডুবিবার দরকার আবার প্রয়োজন হইলে ইহার সেইরূপ তাড়াতাড়ি ভাসিয়া উঠারও দরকার।

আদিম অবস্থায় ইহা হস্ত দ্বারা চালিত হইত। কিন্তু আমেরিকার যুদ্ধের সময়ে ইহা সঙ্কুচিত বায়ু ও বাষ্প দ্বারা চলিতে আরম্ভ হয়।

আমেরিকাবাসী হলেণ্ড (J. P. Holland) ও সুইজারলেণ্ডবাসী নরডেনফেল্‌ট (Mr. Nordenfelt) ইহার নানারূপ পরীক্ষা করেন। ১৮৮৮ সনে ফরাসী দেশে ইহার চল হয় এবং ১৯০০ সনে ইংলণ্ড ইহা গ্রহণ করেন।

মিঃ নরডেনফেল্টের ডুবুরী জাহাজ বাষ্প দ্বারা চালিত হইত। ইহা ডুবাইবার পূর্ব্বে ইহার চোঙ্গ নামাইয়া আগুন নিবাইয়া দিতে হইত। ইহাতে নানারূপ অসুবিধা হইত। ইহা জলে ডুবিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির থাকিতে পারিত না কেবলই আন্দোলিত হইত।

ইহার পরে মিঃ হলেণ্ড একটী জাহাজ আবিষ্কার করিলেন। উহা পেট্রল দ্বারা চালিত হইত এবং নিমজ্জিত অবস্থায় তাড়িত বেটারি ইহার গতিশক্তি প্রদান করিত। নাবিকদের জীবন ধারণের জন্য ইহাতে প্রচুর সঙ্কুচিত বাতাস সঞ্চিত থাকিত।

অতঃপর ইংরাজগণ ছোট জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া নানারূপ পরীক্ষা করিতে থাকেন। প্রথমতঃ গেসলিন (Gasaline) ইঞ্জিন তৈয়ার করিয়া উহা চালাইবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু আবদ্ধ অবস্থাতে গেসলিন হইতে এরূপ ধূম নির্গত হয় যে তাহা দ্বারা তরণীটি বিদীর্ণ হইয়া যায়। পেট্রলেও ঐরূপ অবস্থা হয়। ইহার পরে তৈলের ইঞ্জিন দ্বারা ইহা চালাইবার চেষ্টা হয়। এইরূপে নানাবিধ পরীক্ষা চলিতে থাকে। নানারূপ পরীক্ষার পর স্থির হয় যে সঞ্চয়কৃত ইলেট্রিক বেটারি দ্বারা (Electric starage battery) ইহা চালান সুবিধাজনক।

বর্ত্তমানে ইংরাজ ডুবুরী জাহাজ ভাসমান অবস্থায় ৪০০০ মাইল চলিতে পারে এরূপ তৈলের সঞ্চয় রাখে। সঞ্চিত বেটারির দ্বারা জলের তলে ঘণ্টায় ১১ নট বেগে

৪৮ ঘণ্টা চলিতে সমর্থ হয় ইহার যোগাড় থাকে এবং ঐ সময় চলিবার উপযোগী যথেষ্ট সঙ্কুচিত বাতাস মজুত থাকে।

জলের নীচে চলিবার ইহার আর একটী অন্তরায় আছে। এ বাবৎ ইহাকে অন্ধ মাছের মত চলিতে হইত। মৎসের স্পর্শ শক্তি আছে কিন্তু ইহার তাহাও ছিল না। কেবলমাত্র কম্পাসের সাহায্যে ইহাকে চলিতে হইত। অতঃপর পেরিস্কোপ (Periscope) ইহার চক্ষু দান করে।

বর্ত্তমান ডুবুরী জাহাজের কল কৌশল অত্যন্ত গোপন রাখা হয়। ইহা একটী বৃহৎ মৎসের আকারে নির্ম্মিত হয়। ইহার পৃষ্ঠদেশে একটী গুম্বুজের মত থাকে উহাকে কনিং টাওয়ার বলে (Conning tower) বলে। জাহাজ অর্দ্ধ নিমজ্জিত হইয়া চলিবার সময়ে টাওয়ারের আলোদ্বারা চালক সমস্ত দেখিতে পায়। পূর্ব্বে এই টাওয়ারের ভিতর দিয়া কখন কখন উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গ প্রবেশ করিতে পারিত কিন্তু এখন এরূপ বন্দোবস্ত আছে যে উহাদ্বারা জল ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। আমরা বলিতে ভুলিয়াছি যে এই টাওয়ার পথে নাবিকগণ উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া থাকে। জাহাজটী ডুবিবার সময়ে এই টাওয়ারের মুখটী বন্ধ হইয়া যায় এবং জাহাজের কুঠরী বিশেষে জল প্রবেশ করাইয়া জাহাজটী ডুবান হয়। বর্ত্তমান ডুবুরী জাহাজের তাড়িৎবল ৬০০ শত অশ্ব শক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা ডুবিয়া ১০০ ফিট নিম্ন পর্য্যন্ত যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা ২০।৩০ ফিট নিম্ন দিয়া চলিয়া থাকে। ইহার আন্দোলন নিবারণের জন্য নানারূপ কল কব্জা আবিষ্কৃত হইয়াছে। উপরের অবস্থা দেখিবার জন্য পেরিস্কোপ এবং চতুষ্পার্শ্বের অবস্থা জানিবার জন্য বহুবিধ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ডুবুরী জাহাজে দুইটী পেরিস্কোপ থাকে। একটি দ্বারা দূরের জিনিষ এবং অপরটি দ্বারা নিকটের জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। এখন উহাতে ৪টী করিয়া টরপেডো টিউব নেওয়া হয়। এবং উহা ছাড়িবার সময়ে জাহাজের ভার কেন্দ্রের কোন ব্যতিক্রম হয় না। পূর্ব্বে একটী লোক চলা ফেরা করিতেই কখন কখন জাহাজ খানা একবারে জলে ডুবিয়া যাইত।

বর্ত্তমান ডুবুরী জাহাজে কর্ম্মচারী ইত্যাদি সহ প্রায় ১৪ জন লোক থাকে। তাহারা বৈদ্যুতিক উনুনে তাহাদের খাদ্য ইত্যাদি পাক করে। সকলে একরূপ খাদ্য আহার করে এবং একই স্থানে বাস করে। ডুবুরী জাহাজের অভ্যন্তরীক অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। বিষাক্ত কার্ব্বন এসিড গ্যাস উৎপন্ন হইয়াছে কিনা তাহা অবধারণ করিবার জন্য এখন আর শ্বেত ইঁদুর সঙ্গে নিতে হয় না।

যুদ্ধাদির অবসানে এই ডুবুরি জাহাজের দ্বারা কি কাজ হইবে তাহা ঠিক বলা যায় না। ঝঞ্ঝাবাতের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কেবল সমুদ্রের খারি ইত্যাদি পারাপার হইতে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। কথিত আছে এক সময়ে একজন আমেরিকার এডমিরেল ১৫ পনর ঘণ্টা জলের তলে থাকিয়া যখন উপরে উঠিলেন তখন সেখানে প্রবল ঝড় বইতেছিল কিন্তু তাহারা তাহার কিছুই অবগত ছিলেন না।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ডুবুরী জাহাজ এই শিক্ষা দিয়াছে যে কোটী কোটী টাকা ব্যয় করিয়া যুদ্ধ জাহাজ তৈয়ার করিয়া কোন লাভ নাই।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

স্মৃতি।

পক্ককেশ লোল চর্ম্ম বৃদ্ধ এক যায়,
এক হাতে লাঠীভর, তবু কাঁপে কায়।
নতশির, ম্লান দৃষ্টি ভূমির উপর,
ভূমি পানে হাত দু'টি কাঁপে থর থর।
গৌতম কহেন কিবা চাহ মহাজন,
বৃদ্ধ কহে খুজিতেছি সাধের যৌবন।

শ্রীযামিনীকুমার রায় বিদ্যাবিনোদ।

মনের টান।

রাত্রি দ্বিপ্রহর, সেদিন অমাবস্যার রাত্রি দিগ্‌দিগন্ত নিবিড় কালিমায় আবৃত। মহাসমুদ্রের কাল জল সেই গাঢ় অন্ধকারের ছায়া বক্ষে ধারণ করিয়া আরও গভীরতর কালিমাময় দেখাইতেছিল। ঊর্দ্ধে অসংখ্য তারকা-খচিত নীলাকাশ, নিম্নে সীমাশূন্য জলধিবক্ষে তাহার প্রতিবিম্ব। মহাসাগরের স্থির বক্ষ তরঙ্গায়িত করিয়া, প্রতিবিম্বিত তারকাগুলিকে নাচাইয়া নাচাইয়া অর্ণবপোত চলিতেছিল। জাহাজের যাত্রিগণ সকলেই নিজ নিজ ক্যাবিনে সুষুপ্ত। দুইটী যাত্রী মাত্র ডেকের উপর দুইখানা আরাম কেদারায় অর্দ্ধ শায়িত হইয়া গল্প করিতেছিল। তাঁহাদের একজন বাঙ্গালী, অপরটী ইংরেজ। ইংরেজটীর নাম জেম্‌স্‌স্মিথ্, বাঙ্গালীটী পরিব্রাজক জ্ঞানানন্দ স্বামী নামে লোক সমাজে পরিচিত।

জেম্‌স্‌স্মিথ্ ভারত প্রবাসী একজন ইংরেজের সন্তান। জ্ঞানানন্দ স্বামী এবং তিনি বাল্যকালে একই স্কুলে, তারপর একই কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে জেম্‌স্‌স্মিথ্ কলিকাতা একটী প্রধান কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক। জ্ঞানানন্দ স্বামী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ উপাধি গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম চেষ্টায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, ক্রমে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি সন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন এবং ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হন। তাঁহার বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ। তিনি চির-কুমার ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, কাজেই আজও অবিবাহিত। উভয়ে উভয়ের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে কি হইবে? দুই বন্ধু কোন স্থানে একত্র হইলেই, সেই স্থান উভয়ের তর্ক কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিত। কারণ উভয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানানন্দ থিওসফিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত, মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যস্ত; স্মিথ্ মনোবিজ্ঞানের ধার ধারেন না, জড় বিজ্ঞান লইয়াই তাঁহার কার্য্য। স্মিথ্ দীর্ঘকালের বিদায় লইয়া স্বদেশে যাইতেছিলেন, জ্ঞানানন্দও থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের একটী বিশেষ অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া ভারত হইতে ইংলণ্ডে যাইতেছিলেন। উভয় বন্ধুতে জাহাজে সাক্ষাৎ হইয়াছে। উভয়েই একই ক্যাবিনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নানা প্রকার সাধারণ বিষয় লইয়া দুই বন্ধুতে কথোপকথন হইতেছিল। এমন সময় জাহাজের ঘড়িতে একটা বাজিল। জাহাজের পাহাড়া বদল হইল। স্মিথ্ বলিলেন "চল ঘুমান যাক।" জ্ঞানানন্দ উত্তর করিলেন "তোমার ঘুম পেয়ে থাকে ঘুমাওগে, আমি আরও কিছুক্ষণ ডেকের উপর থাকব।"

স্মিথ্—"কেন?"

জ্ঞানানন্দ—"আমার মন যেন আমাকে টেনে এখানে রাখ্‌ছে; আমার মনে হচ্ছে যেন কোন একটা গুরুতর ঘটনা এখনই ঘট্‌বে।" স্মিথ্ শুনিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন "আজ ডিনারে কি খেয়েছিলে বল দেখি?"

জ্ঞানানন্দ—"কেন?"

স্মিথ্—"এমন কিছু খেয়েছ, যা হজম হয়নি, তাই অম্বল হয়েছে। পেটে অম্বল হলেই মস্তিষ্কের উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়। এস একটা সোডা খেয়ে শুয়ে পড় এসে।"

জ্ঞানা—"না-গো-না, আমার অম্বলও হয়নি, মাথাও গরম হয়নি। তুমি নিশ্চয় জেনো ক্রিয়া বিশেষদ্বারা মনকে এমন তৈরী করা যেতে পারে, যার ফলে মন যা ডেকে বলে, তা প্রায়ই মিছে হয় না। আমি নানা ঘটনায় তা প্রত্যক্ষ করেছি।" এই বলিয়াই জ্ঞানানন্দ তাঁহার জীবনের কতকগুলি ঘটনার কথা উল্লেখ করিলেন। এবং এই প্রকার ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়া পূর্ব্বেই মনে প্রতিফলিত হওয়া যে কেবলমাত্র সম্ভবপর নয়, যুক্তি মূলক তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করিলেন। স্মিথ্ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন—"একটা শিক্ষিত লোককে একটা আস্ত গাধাতে পরিণত করতে যদি কেউ পারে—সে কেবল তোমার থিওসফি।" দুই বন্ধুতে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া উঠিল।

জ্ঞানানন্দ বলিলেন—"তুমি এসব কি করে বুঝবে? আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত কেন হয়, ভূমিকম্প কেন হয়, রেশমী কাপড়ে কাচ ঘসে কাগজের টুকরোর সামনে ধর্‌লে সেগুলো সেই কাচের দণ্ডে এসে লাগে কেন, তুমি এই সব খোঁজগে যাও, জড়বিজ্ঞানের শক্তি নেই এসকল অলৌকিক ঘটনার কারণ নির্ণয় কত্তে।" দুই বন্ধুর এই তর্কের পরিণাম কি হইত, কতক্ষণ স্থায়ী হইত, বলা

অসম্ভব। সহসা উভয়ে চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহাদের সম্মুখে একটী ইউরোপীয় ভদ্রমহিলা আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহিলাটীর অসম্বদ্ধ কেশরাশি নৈশবায়ুতে উড়িতেছিল, শয়নকালীন পরিচ্ছদের উপর লজ্জানিবারণের জন্য একখানা আলোয়ান মাত্র বেষ্টিত রহিয়াছে। মহিলাটী প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন "মহাশয় বলতে পারেন তারহীন টেলীগ্রাফের ঘর কোন দিকে ?

স্মিথ্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন কি হয়েছে ?"

মহিলা—"কি হয়েছে বল্‌তে পারব না, আমার স্বামী"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মহিলাটী কাঁদিয়া ফেলিলেন, তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বলুন না টেলিগ্রাফের ঘর কোথায় ?" স্মিথ্—"আপনার স্বামীর কি হয়েছে ? ডাক্তার ডাক্‌বো?" মহিলা—"না গো না, আমার স্বামী এ জাহাজে নেই ! তিনি সিসিলিয়া জাহাজে।

স্মিথ্—সিসিলিয়া জাহাজে ?"

মহিলা—হাঁ। তিনি বোম্বে থেকে কাল জাহাজে চেপেছেন, আমি দার্জ্জিলিং থেকে এসে বোম্বেতে তাঁর সঙ্গে একত্র হয়ে দেশে যাব, এই কথা ছিল। কিন্তু একদিন ট্রেন ফেল করে আমি তাঁর সঙ্গে একত্র যেতে পারিনি। তিনি কালই গ্যাছেন, আমি আজ যাচ্ছি।"

স্মিথ্—সিসিলিয়া আমাদের প্রায় আঠারো ঘণ্টা পূর্ব্বে বোম্বে থেকে ছেড়েছে। এখন সে জাহাজ আমাদের প্রায় তিন্‌শো মাইল সাম্‌নে। তারহীন টেলিগ্রাফের ঘর রাত্রির জন্য বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বে, আমাদের টেলিগ্রাফ মাষ্টার সিসিলিয়ার টেলিগ্রাফ মাষ্টারকে ডেকে আলাপ কচ্ছিল। সে হয়তো ঘণ্টা দুই হলো। আপনি ব্যস্ত হবেন না, সে জাহাজে কোন বিপদ ঘটেনি।"

মহিলা—আমি জানি আপনারা আমাকে একেবারে ছেলে মানুষ মনে করবেন। কিন্তু আমার মন মানতে চাচ্ছেনা। আমার মনে হচ্চে, আমার স্বামীর কোন বিপদ হয়েছে। আমি ঘুমুচ্ছিলেম হঠাৎ জেগে উঠে দেখলুম আমার স্বামী যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁর মুখে কেমন একটা ভীতি এবং হতাশার চিহ্ন। আপনারা দয়া করে আমাকে বলুন টেলিগ্রাফ আফিস কোন জায়গায়, আমি একটা সংবাদ লইব।

স্মিথ—টেলিগ্রাফ অফিস এখন বন্ধ। আমাদের মাত্র একজন কর্ম্মচারী। সমুদ্রের অবস্থা আশঙ্কাপ্রদ না হলে তাকে রাত্রে কাজ কত্তে হয় না। সে এখন ঘুমুচ্ছে। আপনিও ঘুমানগে যান, একটা স্বপ্ন দেখে অত অস্থির হ'তে নেই।

জ্ঞানানন্দ এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন আপনি—ওর কথা শুনবেন না, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাকে টেলিগ্রাফ আফিসে নিয়ে যাচ্ছি। স্মিথের অধর প্রান্তে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন "কিহে এ ঘটনাটাকেও একটা আত্মিক আকর্ষণ গোছের কিছু বল্‌তে চাও বুঝি ?" জ্ঞানানন্দ বলিলেন,—"হতে পারে, অসম্ভব কি ?" এই বলিয়া মহিলাটীরদিকে ফিরিয়া বলিলেন—চলুন'। রমণী কৃতজ্ঞ নয়নে জ্ঞানানন্দেরদিকে চাহিয়া গেলেন।

স্মিথ্ আরামকেদারায় শুইয়া পড়িয়া হাই তুলিলেন। কিন্তু বেশীক্ষণ নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনেও তীব্র কুতূহলের সঞ্চার হইয়াছিল, তিনিও ধীরে ধীরে তারহীন টেলিগ্রাফের ঘরেরদিকে অগ্রসর হইলেন। একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন যে টেলীগ্রাফ মাষ্টারকে লইয়া সেই মহিলাটী ও জ্ঞানানন্দ টেলীগ্রাফ আফিসেরদিকে যাইতেছেন, টেলীগ্রাফ মাষ্টারের মুখ দেখিলেই বোধ হয় তিনি সদ্য নিদ্রোত্থিত এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় কেবলমাত্র একটী ভদ্রমহিলার অনুরোধ রক্ষার জন্য দায়ে পড়িয়া যাইতেছেন। টেলীগ্রাফ আফিসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি দ্বার উন্মোচন করিলেন, এবং দ্বার সংলগ্ন একটী বোতাম টিপিয়া ধরিলেন; তৎক্ষণাৎ কক্ষটী বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দ্বার উন্মোচনের শব্দে পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে জাহাজের কাপ্তেন সাহেব বাহির হইয়া আসিলেন। আসিয়া প্রশ্ন সূচক দৃষ্টিতে টেলীগ্রাফ মাষ্টারের দিকে তাকাইলেন।

টেলীগ্রাফ মাষ্টার সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন—"এই মহিলাটীর স্বামী সিসিলিয়া জাহাজে আছেন। ইনি মনে কচ্ছেন, তাঁর কোন বিপদ হয়েছে, একটা খবর নেবার জন্য আমাকে ঘুম থেকে তুলে এনেছেন।" এই কথা বলিয়া তিনি কলের নিকট যাইয়া কলটা ঠিক করিয়া লইতে

আরম্ভ করিলেন। কাপ্তানের ওষ্ঠাধর মৃদুহাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। টেলীগ্রাফ মাষ্টারও হাসিতে ছিলেন। বালক বালিকার কোন আব্দার প্রতিপালন করিতে যাইয়া বয়স্ক ব্যক্তিরা যে এক প্রকার মৃদু হাস্য করেন একমাত্র জ্ঞানানন্দ স্বামী ব্যতীত উপস্থিত তিন জনের মুখেই সেই-প্রকার হাসি প্রতিভাত হইতেছিল। একমাত্র জ্ঞানানন্দ গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। হাসিতে হাসিতে টেলীগ্রাফ মাষ্টার রিসিভারটী কানের সঙ্গে আঁটীয়া লইলেন, রিসিভারটী কানে আটার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, মুখমণ্ডলে এক ভীতি ও বিস্ময়ব্যঞ্জক ভাব প্রকাশিত হইল। সকলেই সে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন, কাপ্তেন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? টেলীগ্রাফ মাষ্টার বলিলেন, —"বিপদ সূচক সাঙ্কেতিক শব্দ শুনতে পাচ্ছি" কাপ্তেন অগ্রসর হইয়া কলের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন জাহাজ থেকে?" টেলীগ্রাফ মাষ্টার মৃদুস্বরে বলিলেন, "এই মহিলা-টিকে আপনারা কেউ বাহিরে নিয়ে যান, সিসিলিয়া জাহাজ থেকেই বটে! মৃদুস্বরে বলিলেও কথা কয়টী মহিলার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি উন্মাদিনীর মত কলের নিকট ছুটিয়া আসিতেই জ্ঞানানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন।

কাপ্তেন বলিলেন "কি ব্যপার জিজ্ঞাসা কর।" টেলীগ্রাফ মাষ্টার তাড়াতাড়ি সংবাদ প্রেরক যন্ত্র চালনা করিলেন। তাঁহার প্রতিস্পর্শে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীরণ করিতে করিতে বিশাল বৈদ্যুতিক শক্তি মহাশূন্য পথে সংবাদ বহন করিয়া চলিল। কাপ্তেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি?"

কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন—"সিসিলিয়ায় প্রায় একঘণ্টা হ'ল আগুন লেগেছে। আগুন নেবাবার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু কোন ফল হচ্ছেনা। জাহাজের গুদামে পাট বোঝাই ছিল, সেইসব পাটে আগুন লেগেছে। জাহাজ রক্ষা করা অসম্ভব, বিশেষ চেষ্টা করলে বড় জোড় চার ঘণ্টাকাল টীকতে পারে।"

কাপ্তেন —"চারঘণ্টা মাত্র! জাহাজ এখন কোথায়?" পুনরায় যন্ত্রে কর্ণ সংযোগ করিয়া কর্ম্মচারী জাহাজের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া, কাপ্তেনকে বলিলেন। কাপ্তেন বিশুষ্ক মুখে বলিয়া উঠিলেন—"তা হ'লে আর উপায় নেই। সিসিলিয়া এখান থেকে প্রায় দুশো মাইল দূরে রয়েছে, আমরা যদি সম্পূর্ণ বেগেও জাহাজ চালিয়ে দি, তা হ'লেও সাত আট ঘণ্টার কমে পৌছিতে পারব না।" স্মিথ বলিলেন,—"তা'হলে এখন উপায়?"

কাপ্তেন কিছুক্ষন নীরব থাকিয়া, ছুটিয়া তাঁহার নিজের ক্যাবিনের দিকে গমন করিলেন, এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া টেলীগ্রাফ মাষ্টারকে বলিলেন, সিসিলিয়াকে জানাও যে "টীনকরটীন" জাহাজ মাদ্রাজ বন্দর থেকে তাদের ছাড়বার ছয় ঘণ্টা আগে ছেড়েছে। সে জাহাজ সম্ভবতঃ তাদের পঞ্চাশ মাইলের ভেতর কোন খানে আছে। টীনকরটীনেও তারহীন টেলীগ্রাফ আছে, টীনকরটীনকে ডাকতে বল।"

টেলিগ্রাফ মাষ্টার আজ্ঞা পালন করিলেন। তিনি কয়েক মিনিট পরে বলিলেন—"সিসিলিয়ার টেলীগ্রাফ ঘরে আগুন লেগেছে, আর তাদের পক্ষে সংবাদ পাঠান সম্ভব পর নয়। তাদের শেষ সংবাদ—সিসিলিয়ার টেলিগ্রাফ মাষ্টার এখন ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন।' কাপ্তেন বলিলেন,—"তুমিই তা'হলে ডাক, টীনকরটীনকে ডাকতে থাক; তুমিই সংবাদ দাও,—সিসিলিয়ার অবস্থা ও অবস্থান জানিয়ে দাও।"

আবার যন্ত্র চালিত হইল, আবার সেই বিশাল বৈদ্যুতিক শক্তি মহাশূন্যে সেই আহ্বান বহন করিয়া লইয়া চলিল— 'টীনকরটীন' 'টীনকরটীন' এই আহ্বান এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপদ জ্ঞাপক সাঙ্কেতিক ধ্বনি ঘন ঘন যন্ত্রমুখে প্রেরিত হইতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইভাবে অতিবাহিত হইল। টেলিগ্রাফ মাষ্টার শুষ্কমুখে বলিলেন "কোনই উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।"

কাপ্তেন—সে কি? তোমার যন্ত্রের কি কোন দোষ হয়েছে? মাষ্টার—"আমার যন্ত্র ঠিক আছে। টীনকরটীনের টেলীগ্রাফ কক্ষে বোধ হয় লোক নাই, সম্ভবতঃ সে তার নিজের ঘরে ঘুমুচ্ছে।"

কাপ্তেন—"ডাক, ডাকতে থাক"—এই বলিয়া তিনি ও স্মিথ ডেকের উপর উঠিয়া আসিলেন। ডেকের উপর

তখন জাহাজের সমস্ত যাত্রীই উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ মহিলাটীর সকরুণ বিলাপে কয়েকজনের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তার পর কাপ্তেনের আদেশে জাহাজ পূর্ণ শক্তিতে চালাইয়া দেওয়ায় এবং বিপদ সূচক ঘণ্টাধ্বনি হওয়ায় সকলেই শশব্যস্তে ডেকের উপর আসিয়া একত্র হইয়াছিলেন।

কাপ্তেন সকলকে অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন এবং জাহাজ পূর্ণশক্তিতে চালাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে সিসিলিয়া ধ্বংস হওয়ার পূর্ব্বে সেখানে উপস্থিত হইতে পারিবেন এমন আশা তিনি করিতে পারেন না। তবে "লাইফবোটে" করিয়া যে সমস্ত যাত্রী জাহাজ পরিত্যাগ করিবেন, হয়তো ২।৩ ঘণ্টা পরে পৌঁছিলেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন—এই আশাতে পূর্ণবেগে জাহাজ চালাইতেছেন।

মহিলাটী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, তাঁহার একটু জ্ঞান সঞ্চার হইলে তাঁহাকে সকল কথা বলা হইল। এইসকল গোলযোগে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। কাপ্তেন পুনরায় টেলিগ্রাফের ঘরের দিকে ছুটিয়া গেলেন। টেলিগ্রাফ কর্ম্মচারিটীর চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কোনই উত্তর পাওয়া যায় নাই।

কাপ্তেন ডেকের উপর পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। তাহার মুখ বিশুষ্ক, তিনি বলিলেন,—"টীনকরটীনের টেলিগ্রাফ ঘরে লোক থাক্‌লে, সিসিলিয়ার লোকগুলি রক্ষা পেত, তাতে আর সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেখানে লোক নেই। থাক্‌লে আমরা নিশ্চয়ই উত্তর পেতাম।"

মহিলাটী কাঁদিয়া উঠিলেন,—অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"কোন উপায়ই কি নেই?" কাপ্তেন কহিলেন,—"আমাদের লোক এখনও যন্ত্রচালনা কচ্ছে। মানুষের যা সাধ্য, তা আমরা করেছি। কিন্তু টীনকরটীনের টেলিগ্রাফ ঘরে লোক না এলে আমাদের চেষ্টায় কোনই ফল হইবে না। সেটা তো আর আমাদের করবার সাধ্য নেই।"

"কেন নাই, অবশ্য আছে" জলদ গম্ভীরস্বরে এইকথা ডেকের একপার্শ্ব হইতে শ্রুত হইল। সকলে সবিস্ময়ে সেইদিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে জ্ঞানানন্দ স্বামী এই কথা বলিতেছেন। সকলেই বিস্মিত হইলেন, স্মিথ একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিলেন।

স্বামীর উন্নত মস্তক, গৈরিক বসন, সবল সুদেহ, উজ্জ্বল মুখশ্রী এবং তেজোদীপ্ত চক্ষু দর্শনে কাপ্তেনের প্রাণে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ভক্তি উদিত হইয়াছিল তিনি সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি উপায় আছে বলুন"।

স্বামীর উজ্জ্বল চক্ষু আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; তিনি বলিতে লাগিলেন—"আপনারা হয়তো আমার কথায় সকলেই বিস্মিত হবেন, কিন্তু একটা কথা আপনারা ভেবে দেখুন, কেমন করে দু'শো মাইল দূরের এই বিপদের সংবাদ আমরা প্রথম জান্‌তে পেলেম? তারহীন টেলিগ্রাফ করে জানবার অনেক পূর্ব্বেই এই মহিলাটী সে সংবাদ জান্‌তে পেরেছিলেন। কি সেই শক্তি, যাহা কোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত দু'শো মাইল দূরে এমন করে সংবাদ বহন করে নিয়ে আসে? জড়বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। মনোবিজ্ঞান পারবে। সেটা মানবের প্রবল ইচ্ছাশক্তি। যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি এই মহিলার স্বামীর বিপদের বার্ত্তা এঁর প্রাণে জাগিয়ে তুলেছে, সেই প্রবল ইচ্ছাশক্তির চালনায় টীনকরটীনের টেলিগ্রাফ মাষ্টারকে টেলিগ্রাফ কক্ষে আন্‌তে বাধ্য করা কি সম্ভবপর নয়?"

সকলেই বিস্মিত হইয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিলেন—জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন তৃণগাছি পাইলেও তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, মহিলাটীও তেমনি ব্যগ্র হইয়া স্বামীর করধারণ করিয়া বলিলেন—"বলুন, বলুন, কেমন করে তা সম্ভব হবে?"

স্বামী বলিলেন—"আমরা এখানে প্রায় দুইশত লোক উপস্থিত আছি। আসুন সকলে মিলে একাগ্রচিত্ত হয়ে মনে মনে ইচ্ছা কত্তে থাকি—"টীনকরটীনের টেলিগ্রাফ মাষ্টার জাগরিত হ'য়ে টেলিগ্রাফ কক্ষে এসে উপস্থিত হোক।"

আমার বিশ্বাস পনর মিনিট কি আধঘণ্টা কাল একাগ্রচিত্তে এই ইচ্ছাশক্তির প্রেরণাকল্পে আমরা তাঁকে জাগরিত করে টেলিগ্রাফ কক্ষে আন্‌তে পারব।"

স্বামীর প্রত্যেকটী কথা এমন দৃঢ়স্বরে উচ্চারিত হইয়াছিল এবং সেই কথাগুলির মধ্যে এমন একটী বিশ্বাস ও আকর্ষণী শক্তি নিহিত ছিল যে সকলেই উৎসাহের সহিত সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কেবল স্মিথ্ স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

ডেকের উপর পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। যথাসম্ভব একাগ্রচিত্ত হইয়া সকলে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই প্রকার ভাবে পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পোনর মিনিট, প্রায় কুড়ি মিনিট অতিবাহিত হইল।

সহসা কাপ্তেনের টেবিলের উপরিস্থিত বৈদ্যুতিক ঘণ্টা সজোরে বাজিয়া উঠিল। সকলের চিন্তার স্রোত ভঙ্গ হইল। কাপ্তেন শশব্যস্তে টেলিগ্রাফ ঘরের দিকে ছুটিলেন। যাইয়া দেখিলেন টেলিগ্রাফ মাষ্টারের মুখমণ্ডল উল্লাস-দীপ্ত।

"উত্তর পাইয়াছি" বলিয়া কর্ম্মচারী সোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কাপ্তেন বলিলেন—"সিসিলিয়ার অবস্থা ও অবস্থান জানাইয়াছ?"

"জানাইয়াছি। টীনকরটীনের গতি পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। পূর্ণবেগে 'টীনকরটীন' ছুটিয়াছে।"

প্রকোষ্ঠের সম্মুখে যাত্রীরা সকলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। অত্যন্ত ভিড় হয় দেখিয়া তাহাদিগকে ডেকের উপর যাইতে কাপ্তেন আদেশ করিলেন। কেবলমাত্র মহিলাটী, জ্ঞানানন্দ স্বামী, স্মিথ্ ও কাপ্তেন কক্ষদ্বারে এবং সহকারী কাপ্তেন কিছুদূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। টেলিগ্রাফ মাষ্টার কাপ্তেনের নিকট, কাপ্তেন সহকারী কাপ্তেনের নিকট, এবং সহকারী কাপ্তেন যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তথা হইতে উচ্চৈস্বরে ডেকের উপরস্থিত যাত্রিগণের নিকট, সংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। দশ মিনিট পরে সংবাদ আসিল "সিসিলিয়া টীন্‌করটীন্ হইতে প্রায় পঁচিশ মাইল উত্তরে ছিল, জাহাজের গতি সেই দিকে পরিবর্ত্তন করিয়া পোনর মিনিট জাহাজ চালানের পর চক্রবাল সীমান্তে অগ্নিপ্রভা দেখিতে পাইয়াছি।" আরও কিছুক্ষণ অতীত হইল; আবার সংবাদ আসিল "টেলিস্কোপ দ্বারা সম্পূর্ণ জাহাজ আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমরা সাহায্যার্থ আসিতেছি, এ সংবাদ তাহাদিগকে হাউই ছুড়িয়া জানাইতেছি।"

পাঁচ মিনিট পরে আবার সংবাদ আসিল—"সিসিলিয়া আমাদের হাউই দেখিতে পাইয়াছে। সাঙ্কেতিক আলো দ্বারা খুব তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য সঙ্কেত করিতেছে।"

শুদ্ধ প্রত্যাশায় আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। আবার সংবাদ আসিল, "আমরা সিসিলিয়া হইতে এখন প্রায় পাঁচ মাইল দূরে আছি।"

"আবার সংবাদ আসিল টেলিস্কোপ দ্বারা লোক জন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ডেকের উপর সকল যাত্রী একত্র। সে স্থান এখনো অগ্নি হইতে নিরাপদ। আমাদের সঙ্কেত তাহারা দেখিতে পাইয়াছে এবং সঙ্কেতে উত্তর দিয়াছে।"

আরও কিছুক্ষণ পরে সংবাদ আসিল "আমরা অর্দ্ধ মাইল দূরে; উভয় জাহাজ হইতে জীবনরক্ষক নৌকা নামান হইতেছে।" আরও কিছুক্ষণ পরে সংবাদ আসিল "প্রথম দলসহ দুইখানি নৌকা নিরাপদে আসিয়া পঁহুছিয়াছে প্রায় ত্রিশটী লোক আসিল।" এইরূপে ক্রমে ক্রমে সংবাদ আসিতে লাগিল। শেষে সংবাদ আসিল যে সিসিলিয়ার প্রায় সমুদায় যাত্রী নিরাপদে টীন্‌করটীন্ জাহাজে নীত হইয়াছে। তখন সেই মহিলাটীর স্বামীর নাম ধরিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করা হইল—উত্তর আসিল "তিনি নিরাপদে পঁহুছিয়াছেন।"

মহিলাটী প্রবল আনন্দাতিশয্যে আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলেন—শুশ্রূষাদ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করা হইল।

জ্ঞানানন্দ টেলিগ্রাফ মাষ্টারকে বলিলেন "আপনি জিজ্ঞাসা করুন টীনকরটীনের টেলিগ্রাফ মাষ্টার কি করিতে-ছিলেন এবং কেনই বা এত রাত্রিতে টেলিগ্রাফ কক্ষে আসিলেন।" প্রশ্ন প্রেরিত হইল। উত্তর আসিল—"আমি নিজ কক্ষে ঘুমাইতেছিলাম ঘুমের ঘোরে একটা চীৎকার শুনিলাম—"ওঠ-জাগ—টেলিগ্রাফ ঘরে যাও।"

চমকিয়া উঠিয়া লোকজন কাহাকেও দেখিলাম না। কিন্তু কুতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া টেলিগ্রাফ কক্ষে যাইয়া যন্ত্রটীতে কর্ণ সংযোগ করিবা মাত্র আহ্বান ও বিপদ সূচক সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিতে পাইলাম।"

জ্ঞানানন্দ ঈষৎ হাসিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"There are more things in heaven and earth Horatio, than ever dreamt of in thy philosophy."

স্মিথ মস্তক অবনত করিলেন।

শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল।

* একটী ইংরেজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

কুঁড়েমির ঔষধ।

দরিদ্রতার মূলে অন্য কোন কারণ থাকুক আর নাই থাকুক আলস্য যে আছে তাহাতে আর ভুল নাই। সেজন্য নীতিবিদেরা আলস্যের মরিচা সমাজ দেহ হইতে পিটাইয়া উঠাইবার জন্য নানা উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিশরদেশে কোন ভবঘুরে মোটাসোটা ভিখারীর ভুখ্ মিটানো ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ছিল। ঐরূপ ভিখারীগুলিকে পাপী বলিয়া সাজা দেওয়া হইত। কুঁড়েমির দায়ে অভিযুক্ত হইয়া যদি কাজ দিলেও তাহা করিতে রাজী না হইত তবে তাহাদিগকে ফাঁসীকাঠে ঝুলান হইত। মিশরদেশের ওভারসিয়ারেরা কুঁড়ে ইস্রায়েলদিগকে ঘাড় ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগকে দিয়া পিরামিড গাঁথিবার জন্য পাথর ভাঙ্গাইয়া লইত। পিরামিডগুলি দেখিলে মনে হয় যাহাদের জগতে অন্য বিশেষ কোন কাজের গরজ ছিল না, তাহাদেরই ওরূপ জিনিষ গড়িবার মর্জ্জি হওয়া সম্ভব।

লাইকারগাস তাঁহার সমাজে ধনী দরিদ্রের ভেদ উঠাইয়া দিতে একান্তইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার কাছে কাহারো কাজ না করিয়া শুইয়া কাল কাটাইবার উপায় ছিল না। সকলেই নিজের নিজের মত খাটিবে এবং মেহানতি ধন দৌলত দানা-পাণিতে সমাজের সকলেরই সমান অধিকার থাকিবে, এই ছিল তাঁহার নিয়ম। লাইকারগাস পারিবারিক বিভিন্ন ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া সাধারণের জন্য এক ভাণ্ডার করিয়াছিলেন। সেই ভাণ্ডার হইতে মানুষের খোরাকী তাহার বয়স এবং শারীরিক গঠন দেখিয়া বরাদ্দ করিয়া দেওয়া হইত। আথেন্স, করিন্থ এবং গ্রীসের অপরাপর অংশের লোকেরা যদিও লাইকারগাসের উপর্য্যুক্ত বিধি বিশেষরূপে মানিয়া চলিত না, তবু তাহাদের কুঁড়েদিগকে সাজা দিবার কড়াকড়ি তাঁহার চেয়ে এক কড়াও কম ছিল না।

ড্রাকো, সোলন প্রভৃতি নীতিবিদগণের মতে স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যের সাজা ছিল— প্রাণদণ্ড। প্লেটোর হৃদয়টা একটু নরম ছিল, তিনি তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াই সন্তুষ্ট হইতেন। প্লেটো বলেন, ঐরূপ দারিদ্রেরা রাজ্যের কণ্টক। তাঁহার মতে যেখানে উহাদের বৃদ্ধি, তথায় অশান্তি অনিবার্য্য; না-ঘর-না-দুয়ার: ঐ ভবঘুরে লোক-গুলা আর কিসের মায়ায় পড়িয়া সমাজবিধি মানিয়া চলিবে? সাধারণের সমৃদ্ধি লাভই প্রাচীন রোমীয়গণের শ্রেষ্ঠ অভীষ্ট ছিল: তাঁহাদের পরিদর্শকগণের একটী প্রধান কর্ত্তব্য ছিল কুঁড়ে দিগের উপর কড়া নজর রাখা আর তাহাদিগকে কোন-না-কোন কাজে লাগাইয়া দেওয়া। যাহাদের আলস্য ব্যাধি কিছুতেই শোধরাইত না তাহাদিগকে খনিতে মজুরী করিতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত; অথবা সরকারী ইমারত বা রাস্তার কাজে খাটাইয়া লওয়া হইত। অসৎ পাত্রে দান করিলে যে কি কুফল ফলে সে বিষয়ে রোমীয়গণের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাহারা কুঁড়ে গুলোকে পিপীলিকা অথবা মৌমাছির ছোট খাট সাধারণ তন্ত্রের আদর্শ দেখাইয়া কর্ম্মী করিতে চেষ্টা করিতেন। ভার্জ্জিল বলেন উক্ত শ্রম জীবিদের মধ্যে কুঁড়েদিগকে সাজাদিবার জন্য দস্তর মতন পুলিশ পাহারা মোতায়েন থাকে। বিবরেরা নাকি এই বিষয়ে পিপীলিকাদের চেয়ে কড়া। ঐতিহাসিক টাসিটাস বলেন প্রাচীন জার্ম্মানেরা কুঁড়েদিগকে বিলের পচা কাদার মধ্যে গাড়িয়া রাখিত। যাহারা নড়াচড়া করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে কষ্ট বোধ করে তাহাদিগকে এইরূপ অবস্থায় নড়াচড়া না করিয়াই দাঁত শিটকাইতে হইত।

ইউলিসিস্ যখন সন্ন্যাসীর বেশে ইউরিমাকাসের অতিথি হইলেন, তখন ইউরিমাকাস দেখিলেন লোকটা বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান, তিনি ইউলিসিসকে বলিলেন হয় কাজ করিয়া খাও, না হয় নিজের পথ দেখ। নিরো সবং টাইবেরিয়ানের রাজত্ব কালে রোমীয় কর্ম্মচারী দিগকে আদেশ করা হইয়াছিল—তাহারা যেন ভ্রষ্ট চরিত্রদিগকে সাহায্য না করে। কুঁড়েদিগের কুড়েমির প্রশ্রয় দেওয়ার চেয়ে তারা যে নিজদোষে শুটকী হইয়া মরে সেও ভাল।

প্রাচীনকালের পুলিশদের কুঁড়েদের সম্বন্ধে কড়া নজর রাখার জন্যই হউক বা পূর্ব্বের লোকের পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিবার বোধ প্রখর থাকার দরুনই হউক পূর্ব্বে মানব সমাজে কদাচার জনিত ব্যাধি এখানকার অপেক্ষা অনেক কম ছিল; অথচ তখনকার দিনে এত হাস পাতালের ছড়াছড়ি ছিল না। মানুষ ও মন্দ সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকিত না।

ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া কখন কখন ঐ সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি মানব সমাজে প্রবেশ লাভ করে এবং যে জাতি বা যে সমাজে ইহারা প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে ঝাঁঝরিয়া ঝুরা করিয়া ফেলিয়া দেয়। রাজা কনষ্টানটাইন দুর্দ্দশা গ্রস্ত খ্রীষ্টানগণের ভরণ পোষণের বিধি ঘোষণা করেন। তখন দলে দলে ভিক্ষুক জড়ো হইতে থাকে, সেকালে খ্রীষ্টান পরিবারের সংখ্যা ছিল অল্প, তাহাতে এত লোকের দাওয়া মিটিবে কেন ? সুতরাং রাজাদের তাহাদিগকে চালাইবার ভার নিজেদের ঘাড়ে লইতে হইল। রাজকর্ম্মচারী বা রুগ্ন, বিপন্ন, বিধবা এবং আতুর দিগের জন্য বিভিন্ন সত্র খুলিতে আরম্ভ করিলেন। সমগ্র ইউরোপে দীন সেবার মস্ত ঘটা পড়িয়া গেল।

নিষ্কর্ম্মারা একটা মহা সুযোগ পাইল। সহজে এমন চৌদ্দসুখে থাকিতে পারিলে তাহাদিগকে আর ভূতে কিলাইবে কেন ? তাহারা দলে দলে এহেন মস্ত লাভের ব্যবসায় আকড়াইয়া ধরিল। নিজেরা গায়ে দাগ কাটিয়া বেতের আঘাত বলিয়া দেখাইতে লাগিল। শিকলের দাগ বলিয়া একটা স্বকৃত চিহ্ন দেখাইয়া লোকের করুণার উদ্রেক করিতে লাগিল ; আর তাহার দৌলতে দিব্য সুখে থাকিতে পাইল। প্রবঞ্চকের দল গলায় মোটা ক্রুশের মালা ঝুলাইয়া এবং ক্রুশের ছাপমারা নামাবলী গায়ে জড়াইয়া অসৎ উপায়ের প্রভাবে সমগ্র সমাজে মহাঅনাচারের স্রোত প্রবাহিত করিল। তাহাদের অনাচারের মাত্রা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে তাহার ধাক্কা সামলাইতে গিয়া পশ্চাৎবর্ত্তী রাজাদিগকে অত্যন্ত কঠোর হস্ত হইতে হইল। তাঁহারা আইন করিলেন—এ বেকারগুলিকে যে যত পার ধরিয়া কাজে লাগাও। তাহারই ফলে ক্রীতদাস প্রথা আবার ইউরোপে পত্তন হইল।

চীন ও জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এককালে দয়ার হাট খুলিয়া দিয়াছিল। তাহাতে কুঁড়েমির পাপ সে সমাজে এমন ভাবে ঢুকে যে তাহার প্রতিক্রিয়া হেতু যে বিধি ঐ সমাজে প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল—তাহার উপায় চীনে ও জাপানে নিষ্কর্ম্মা ভিখারী এখনও পাতা পাড়িতে পায় না। বিখ্যাত বক্তা বার্ক বলিয়াছিলেন যে সুস্থ এবং যাহার অঙ্গ কর্ম্মক্ষম তাহাকে গরীব বেচারা বলিয়া অযথা দয়ার ভাজন করা উচিত নহে। বাস্তবিক, তাহারা গরীব বেচারা হইতে যাইবে কেন ? বাহুতে যাহাদের শক্তি, হৃদয়ে যাহাদের ধৃতি, কষ্টে যাহাদের সহিষ্ণুতা তাহারা গরীব হইবে কেন ? পরাধীনতা এবং পরের ভাগ্যের উপর নির্ভর করার চেয়ে মানব আত্মার সঙ্কোচক আর দ্বিতীয় নাই। ধর্ম্মের নামে মানব আত্মার সঙ্কোচক মহাবিষ কি মানব হৃদয়ে ঢালিয়া দেওয়া উচিত ? কর্ম্মী যিনি, ধর্ম্মী যিনি, তিনি জ্বলন্ত উৎসাহে নিজে ত জগতের কাজে লাগিয়া যাইবেনই আর যাহারা মূঢ়, যাহারা অন্ধ, যাহারা অলস—তাহাদিগকেও কর্ম্মে যোজিত করিয়া বলিবেন—

"অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

আলোচনা।

বাণরাজার শোণিতপুর কোথায় ?

রাজা বাণের নাম পুরাণ পাঠক ও পুরাণ শ্রোতা মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। 'উষাহরণ' বাঙ্গালা সাহিত্যে ও অনেকের নিকট সুবিদিত, উষাহরণ ঘটনা লইয়া কত কত, নাটক ও যাত্রা রচিত ও চলিত হইয়াছে, তাহার ও সীমাসংখ্যা নাই। বাণরাজার কন্যা উষার সহিত দ্বারকারাজ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও প্রদ্যুম্নেরপুত্র অনিরুদ্ধের প্রণয় সংঘটন ও বিবাহ বন্ধন ব্যাপারের কথাও সকলেই জানেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-স্কন্ধের ৬২ ও ৬৩ অধ্যায় বাণরাজার উপাখ্যান ও উষাহরণের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। ভাগবতের অমৃতময়ী কথায় সুবিস্তারিত বর্ণনা লইয়া নানাভাবে নানারচনা প্রচলিত রহিয়াছে। ভাগবতের কথক মহাশয়েরাও শ্রুতিসুখকরী ও লোকপাবনী ভাষায় বাণরাজার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া লোকের মনে শ্রীকৃষ্ণভক্তির উদ্রেক করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। বাণরাজা শিবভক্ত ছিলেন। উষার সহিত অনিরুদ্ধের গুপ্ত প্রণয় রাজার জ্ঞানগোচরে আসিলে বাণরাজা কর্ত্তৃক অনিরুদ্ধ কারাবদ্ধ হয়েন, পরে নারদমুখে শ্রীকৃষ্ণ এসংবাদ পাইয়া অনিরুদ্ধের উদ্ধার কামনায় যাদবসৈন্য সহ দ্বারকা হইতে শোণিতপুরে যুদ্ধযাত্রা

করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বাণরাজা স্বীয় অভীষ্টদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হন। আশুতোষ পরিতোষ সহকারে ভক্তের প্রতি অনুকূল হইয়া শৈব সৈন্য সহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। অন্যান্য সৈন্যের মধ্যে শিব জ্বর ও বিষ্ণুজ্বরের বর্ণনাও ভাগবতে আছে। পরে কৃষ্ণ-সৈন্যই জয়লাভ করে এবং বাণ রাজাও প্রীত ও প্রসন্নমনে অনিরুদ্ধের সহিত উষার বিবাহ কার্য্য মহোৎসবে ও মহাসমারোহে সম্পাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সবিশেষ নিদর্শন প্রদর্শন করেন। এই হইল শ্রীমদ্ভাগবতের উষাহরণ ব্যাপারের স্থূলমর্ম্ম। এখন বাণরাজা কে? এবং কোথায় তাঁহার রাজধানী তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৬২ অধ্যায়ের প্রথমেই পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বলিতেছেন :—

বাণঃ পুত্র শতজ্যেষ্ঠো বলেরাসীনমহাত্মনঃ।
যেন বামন রূপায় হরয়েহদায়ি মেদিনী ॥
তস্যৌরসঃ সুতো বাণ শিবভক্তি রতঃ সদা।
মান্য বদান্যো ধীমাংশ্চ সত্যসন্ধো দৃঢ়ব্রতঃ।
শোণিতাখ্যে পুরে রম্যে স রাজ্যমকরোৎ পুরা ॥

অর্থাৎ যে মহাত্মা বলিরাজ বামন রূপী হরিকে মেদিনী প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বলির শত পুত্রের মধ্যে বাণ নামক জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। তিনি নিরন্তর শিব-ভক্তি রত ছিলেন। বাণ রাজাও মান্য, বদান্য, ধীমান ও দৃঢ়ব্রত এবং সত্যসন্ধ ছিলেন। পুরাকালে এই বাণ রাজা শোণিতপুর নামক রমণীয় নগরে রাজ্য করিতেন।

আবার ৬৩ অধ্যায়ের প্রারম্ভে আছে :—

নারদাৎ তদুপাকর্ণ্য বার্ত্তাং বদ্ধস্য কর্ম্ম চ।
প্রযযুঃ শোণিতপুরং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণ দেবতাঃ ॥

অর্থাৎ অনন্তর নারদ মুখে তাঁহার (অনিরুদ্ধের) বন্ধন বিবরণ অবগত হইয়া কৃষ্ণ দৈবত বৃষ্ণি বংশীয় বীরগণ শোণিতপুরে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদের বংশে বাণ রাজার জন্ম। বাণাসুর সুবিখ্যাত দানশীল মহাত্মা বলিরাজার পুত্র। তিনি নিজেও অনেক গুণে ভূষিত। দেবাদিদেব মহাদেবের প্রতি নিয়ত ভক্তি প্রবণ সুতরাং শঙ্কর প্রসাদে সর্ব্ববিধ সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী। এ সকল পরিচয় আমরা পাইলাম। শোণিতপুর নামক রমণীয় নগর তাঁহার রাজধানী তাহাও জানিতে পারিলাম। এখন এই শোণিতপুর কোথায় তাহাই নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। আসামের অন্তর্গত তেজপুরকে শোণিতপুর পরিচিত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দে মহাশয় "বাণ ও শোণিতপুর" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া গৌহাটি বঙ্গ সাহিত্যানুশীলনী সভায় পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধ নব্যভারত পত্রিকার ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধে দে মহাশয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা জানাইয়াছেন যে বাণ রাজার বাস আসামেই ছিল। বর্ত্তমান তেজপুরই তাঁহার রাজধানী। তেজপুরকেই পূর্ব্বে শোণিতপুর নামে পুরাণে বর্ণনা করা হইয়াছে। তারপর শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'আসাম পর্য্যটন' নামক একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়া উক্ত সভায় পাঠ করেন। এই আসাম পর্য্যটন প্রবন্ধ ১৩১৭ সালের ১ম সংখ্যা সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আসাম ভ্রমণে নানা স্থানের সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা ও অবতারণা করিয়া তাহার পরিশিষ্টে নন্দিসংহিতা নামধেয় একখানি বহু প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তকখানি বহু পুরাতন এবং অগুরুত্বকে লিখিত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের নমুনাস্বরূপ গ্রন্থখানি উক্ত সভার পঞ্চম অধিবেশনে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই প্রাচীন পুস্তকের কয়েকটী পত্র উক্ত সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া জ্ঞাত হওয়া যায় যে তেজপুরেই বাণরাজার রাজধানী ছিল। শোণিতপুর যে তেজপুর তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার সুহৃদবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত গ্রন্থাংশ পাইয়াছেন। গ্রন্থাংশ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থের কয়েকটী পত্র মাত্র পাওয়া গিয়াছে। যে পত্র কয়টী মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে মহাদেব বাণ রাজার তপস্যায় প্রীত হইয়া আসামে বিশ্বনাথক্ষেত্রই দ্বিতীয় বারাণসীরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে নন্দি সংহিতায়

নয়খানি পাতা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও গোস্বামী মহাশয় অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। প্রবন্ধের শেষে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

যদি এই সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি (নন্দিসংহিতা) পাওয়া যাইত তবে হয়ত আসামের আরও অনেক তীর্থস্থলের বিবরণ জানিতে পারিতাম। ফলতঃ যোগিণী তন্ত্রের ন্যায় নন্দিসংহিতা আসামের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের এক প্রকৃষ্ট উপাদান। এই নন্দিসংহিতা খানি অনুসন্ধান পূর্ব্বক সমগ্র আবিষ্কার করিয়া প্রকাশিত করিবার প্রয়াস করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সাহিত্য জগতে সুপরিচিত কিন্তু তিনি যে একজন ভ্রমণকারী, তীর্থ-পর্য্যটক ও পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধায়ী এ সংবাদ খুব কম লোকেই জানেন এবং এই সকল গুণের পরিচয় অতি অল্প লোকেই লইয়া থাকেন। ১৩১৩ সালের পৌষমাসে পরশুরাম কুণ্ড পরিদর্শন ও ১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে বদরিকাশ্রম তীর্থ দর্শন পূর্ব্বক বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন ; পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও অবশ্য জ্ঞাতব্য নানা তথ্যে পরিপূর্ণ। এমনকি মুখ ভাগবত, গৃহ প্রিয় ও অলস প্রকৃতি বাঙ্গালী মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। বলাবাহুল্য ইহাতে জানিবার শিখিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় বেশ বিশদ ভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। পড়িতে আমোদ লাভ ও জ্ঞান লাভ একসঙ্গে হয় বলিয়া ক্রমশঃ কৌতূহল ও ঔৎসুক্য বাড়িয়া থাকে। গ্রন্থকার প্রথমেই লিখিয়াছেন "লোকে তীর্থ করিয়া তাহা প্রকাশ করে না, ইহাতে নাকি পুণ্য ক্ষয় হয়। এই দুইটি তীর্থ অতি কঠিন বিবেচনায় হিন্দু সাধারণ বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ ঐ দিকে কমই গিয়াথাকেন। যদি এই ভ্রমণ কাহিনী দ্বারা এই তীর্থদ্বয় দর্শনার্থ ধর্ম্ম প্রাণ বঙ্গীয় নর নারীর কিঞ্চিত মাত্রও প্রবৃত্তি জন্মে তাহা হইলে তীর্থ ভ্রমণ দ্বারা যে টুকু পুণ্য ক্ষয় হইবার সম্ভাবনা তাহার ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট হইল মনে করিব."

এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে পরশুরাম কুণ্ড গমণের বিবরণ সহ কুণ্ডের বিবরণও দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ কালে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় মহা গোলে পরিয়াছেন। আসাম পর্য্যটনে 'গুপ্তকাশী ও শোণিতপুর' লইয়া নন্দি সংহিতার প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তিনি আসামেই উক্ত স্থানাদির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এখন আবার বদরিকাশ্রম ভ্রমণে তিনি হিমালয় পর্ব্বতের উপরি ভাগে গুপ্তকাশী প্রভৃতির নাম ও পরিচয় পাইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

আমরা প্রথমতঃ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উক্ত ক্ষুদ্র পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠায় গুপ্তকাশী ও শোণিতপুর শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "কুণ্ড-চটি হইতে ৩ তিন মাইলের এক প্রকাণ্ড চড়াইয়ে উঠিলে… গুপ্তকাশী। অপরদিকে একটী জনপদ তাহার নাম শোণিতপুর। গুপ্তকাশীর ঠিক দক্ষিণে উষীমঠ। শোণিতপুর জনপদের মধ্যে বামসু নামক একটী গ্রাম আছে। প্রবাদ এই বাণাসুর এখানে বাস করিতেন। এই জন্য স্থানের এই নাম। উষীমঠের নামকরণ তত্ত্বানুসন্ধানে জানা যায় যে বাণকন্যা উষা এখানে দেবতারাধনা করিতেন। এই মঠের একতম মন্দিরে উষা, অনিরুদ্ধ, চিত্ররেখা, কৃষ্ণ, বলরাম প্রভৃতির মূর্ত্তিও আছে। শোণিতপুর হরিবংশের প্রসিদ্ধ বাণ রাজার রাজধানীর নাম। হিমালয়স্থ এই শোণিতপুরে নাকি বাণ ও অনিরুদ্ধের মন্দির আছে। আমরাত তেজপুরকেই শোণিতপুর বলিয়া সাহিত্য-জগতে ঘোষণা করিয়াছি। কিন্তু এ যে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে আমাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। বাণ শিবভক্ত ছিলেন শোণিতপুরে নাকি পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের মন্দির আছে। বাণের প্রার্থনায় তাঁহার অধিকারে কাশী স্থাপিত হয়, এবং এই শোণিতপুরের নিকটে একটী গুপ্ত-কাশী সশরীরে বিদ্যমান। হায় তবে কি আজ আমাদের আসামকে সাধের শোণিতপুর হিমালয়কে ছাড়িয়া দিতে হইবে ? হিমালয়ের দাবী খুব প্রবল সন্দেহ নাই, কিন্তু আসামের দাবীই মাতব্বর ! সাক্ষী আছে, সেই সাক্ষী নন্দিসংহিতার কয়েকখানি ছিন্নপত্র যাহা মল্লিখিত আসাম ভ্রমণ প্রথম প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) উপত্যকায় যে বাণের বসতি স্থান ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়।"

এখন পাঠকগণ একবার পূর্ব্বাপর শোণিতপুর বৃত্তান্তটী আলোচনা করিয়া দেখুন ও ভাবুন। ভ্রমণকারী অনুসন্ধান কারী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বন্ধুবর পদ্মনাথ যে সন্দেহে পড়িয়াছেন, উভয়স্থানে স্বয়ং দেখিয়া ও উভয়স্থানের স্থানীয় বিবরণ জানিয়া শুনিয়া তাঁহার ভ্রম তাহার সংশয় পূর্ণ মাত্রায় প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহারা উক্ত স্থানের স্থান পরিচয় ও ভূমি সংস্থান দেখিয়া শুনিয়া জানিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের মত গোলে পড়িয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

চাঁদ সওদাগরের বাড়ী কোথায় ছিল, বল্লালসেনের রাজধানী কোথায় ছিল? এসকল লইয়া পুরাতত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিকগণ যে সকল জল্পনা কল্পনা ও তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন ও করিতেছেন তাহা বঙ্গ সাহিত্যের পাঠকগণের অবিদিত নাই। মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত হউক বা না হউক সেতো পরের কথা। এই সকল পুরাণের পুরাতন কথার আলোচনায় যথেষ্ট আমোদ ও জ্ঞান লাভের আশা ও সম্ভাবনা আছে। আমরা পদ্মনাথ বাবুর অনুসন্ধান ও সন্দেহ মাত্র পাঠক পাঠিকাগণকে জানাইলাম। অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহল প্রিয় ভ্রমণকারী ও তীর্থ যাত্রিগণ এই বিষয়ের অনুসন্ধান ও সত্য নির্দ্ধারণে যত্নশীল ও অবহিত হইবেন এই আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

শিশু সাহিত্যে মনোমোহন সেন।

এই চির সুন্দর বঙ্গভূমির স্নিগ্ধ শ্যামল অঞ্চলে বসিয়া তন্ময় হৃদয়ে কত ঋষিকল্প কবি মহাকবি গান গাহিয়া যাইতেছেন! তাঁহাদের সে মন মাতান গানের তান নির্ঝরিণীর অস্ফুট কুলু কুলু গীতির ন্যায় ভারত জুড়িয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহাদের সে গানের একটী অস্ফুট ধ্বনি কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে আমার হৃদয় বীণায় ঝঙ্কার দিয়া আমাকে একজন নীরব কবির সঙ্গীত লহরী আলোচনা করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। এই কবি আমাদেরই গৌরবের ধন স্বর্গীয় মনোমোহন সেন। বাগ্‌দেবীর পূজা পাদোদকে যে গ্রাম ও যে বংশ ধন্য, মনোমোহনের উৎপত্তি সেই সোনারঙ্গ গ্রামে ও বিশারদ বংশে।

বঙ্গবাণীর পূজার মন্দিরে যাহারা আজ প্রাণের অর্ঘ রচনা করিতেছেন, বা যাহারা বঙ্গবাণীর রাতুল চরণে অঞ্জলি দান করিয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। মনোমোহন ও ধীরে ধীরে প্রাণের অর্ঘ রচনা করিয়া সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছিলেন, অতি অকালেই সাহিত্যাকাশের সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রটী চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইল; তাঁহার স্মৃতিস্বরূপ রহিয়া গিয়াছে—বঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার কিঞ্চিৎ দান।

মনোমোহন সহজ ভাবের ও সহজ ভাষার কবি ছিলেন; কারণ তিনি (রবি বাবুর মতে) নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি হইয়াছিলেন। তিনি নিজের কল্পনা তরণীর নিজেই কর্ণধার হইয়া আবশ্যক মত সে তরণীকে অর্ণবযানের মত ছুটাইয়াছেন—আবার কখন বা সেই তরণীকে পাষাণের মত দাঁড় করাইয়াছেন।

মনোমোহন যদিও বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-জননীর চরণ কমল অর্চ্চনা করিবার সুযোগ পান নাই, তথাপি তিনি যাহা দিয়াছেন; তাহাতেই তাঁহার নাম সাহিত্য ক্ষেত্রে অমরত্ব লাভ করিবে।

শিশু সাহিত্যে মনোমোহন অতি অল্প সময় মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিশুতোষ, খোকার দপ্তর, কোমল পাঠ ও মোহন ভোগের সহিত অনেকেই সুপরিচিত। তাঁহার কবিতাবলী বালক বালিকার প্রাণে প্রাণে যে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা জাগাইয়া তুলিয়াছে তাহা প্রকৃতই অভিনব, প্রকৃতই মনোমোহন। তাঁহার কবিতার ছন্দে ছন্দে মধুরতা ও পদে পদে কমনীয়তা বিরাজ করিতেছে। ভাবের প্রাচুর্য্যে, রসের মাধুর্য্যে ও ছন্দের লীলায়িত নর্ত্তনে তাঁহার প্রত্যেকটী ছত্র বাস্তবিকই উপভোগের সামগ্রী।

মনোমোহনের এই সকল ক্ষুদ্র কবিতা হইতে স্পষ্টই প্রতিমান হয় যে তাঁহার হৃদয়াকাশ যুগপত্ জ্ঞানের মধ্যাহ্ন সূর্য্যে যেমন উদ্ভাসিত, কবিত্বের বিমল চন্দ্রিকায় তেমনই নিয়ত পরিস্নাত। তাঁহার মোহনভোগে, এবং খোকার দপ্তরে ঘুম পাড়ানী মাসী পিসির ছড়া—

"আয় চাঁদ আয়,
বাঁশ বনের ভিতর দিয়ে,
চাঁপা গাছের উপর দিয়ে,
নীল সাগরে সাঁতার দিয়ে,
আয় চাঁদ আয়"

প্রভৃতি কবিতাগুলি বালক বালিকাদের নিকট অতুলনীয় সামগ্রীরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কবি মনোমোহন 'পরিতোষ' 'ফুলদানী' 'রেখা ও লেখা" এবং 'মণিকানন' নামে আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি জননীর রাঙ্গা চরণে উপহার দিবার পূর্ব্বেই তিনি চলিয়া গেলেন। কবি প্রণীত 'মণিকানন' যে বঙ্গসাহিত্যে উচ্চস্থান লাভ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাতে কবির উচ্চ অঙ্গের কবিতাবলী স্থান পাইয়াছে। তাঁহার 'ফুলদানী' ও 'পরিতোষ' অতি সুললিত ছন্দে বালক বালিকাদের জন্য লিখিত হইয়াছে। কবি সহজ ভাবে ও সহজ ভাষায় বালক বালিকার উপযোগী কবিতা লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের এক অভাব পূরণ করিয়া গিয়াছেন।

ভাষা এক প্রকার দর্পণ। সেই দর্পণে লেখকের প্রকৃত মূর্ত্তির অনেকটা প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। আমরা কবি মনোমোহনের সহজ ভাব ও সহজ ভাষার অন্তরালে তাঁহার ভাব প্রবণ ও প্রেম পূর্ণ, পবিত্র ও সরল হৃদয়খানির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করি। নিজে সরল ও অমায়িক ছিলেন বলিয়াই তিনি বালক বালিকার উপযোগী এরূপ সহজ ভাবাপন্ন কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

কবি পদ্য রচনায় যে মাধুর্য্য, সারল্য, লালিত্য, ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট অত্যন্ত উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে। তাঁহার কবিতার সকল স্থানেই যেন মণি মুক্তা হীরকাদি ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে। কবিতার তালে তালে তাঁহার অন্তর্নিহিত ভাবের উৎস শতধারায় উচ্ছসিত হইয়া আমাদের চিত্তে সুধা বর্ষণ করিতেছে। শিশুর নগ্নতা সম্বন্ধে কবিবর যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

" তোরা কি দেখিস্ নগ্ন !
সে যে যোগী ধ্যান মগ্ন
নগ্ন তাঁর পবিত্রতা তোরা কি বুঝিবি ? "

শিশুর স্তন্য পান সম্বন্ধে তিনিই অন্য স্থলে লিখিয়াছেনঃ—

" হাসিতে বুঝায় মায় ,
প্রাণ আর নাহি চায় ,
যা দিয়েছ মিটিয়াছে আকাঙ্খা আমার ,
এ ধারে যমুনা বহে
জাহ্নবী ওধার। "

কি সুন্দর ভাব, যেন এক সুরে সহস্র বীণা ঝঙ্কারিত হইতেছে। এই কারণেই কবি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

তাঁহার সুললিত ও সুমধুর ছন্দের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কবির উপমার ধ্বনিও বিশিষ্ট রচনা চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করে। সে উপমা বৈচিত্র্য অতি মনোহর। যাহারা মনোমোহনের সহিত পরিচিত তাহরা অবগত আছেন যে সাধারণ বাক্যালাপের সময়ও তিনি সুবিধা মত এমন উপমা চালিয়া দিতেন যে বাস্তবিকই তাহা উপভোগের জিনিষ। অনেকেই তাঁহার রসিকতার বিষয় অবগত আছেন। তিনি অনেক হাস্যরসাত্মক কবিতা লিখিয়াছেন। "ভারতীতে" প্রকাশিত "পেট কাটা র'এর উড়িষ্যা যাত্রা" নামক কবিতাটী যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই কবি মনোমোহনের রসিকতার দৌড় উপলব্ধি করিয়াছেন। র' মহাশয় আসাম হইতে দশসের ওজনের অনুস্বারের পুঁটুলী হস্তে উড়িষ্যা যাত্রা করিয়াছেন।—কবির কল্পনা এই যে র' মহাশয় ঐ পুটুলিটি কলিকাতা ফেলিয়া গেলেন। তারপর—

"কলিকাতা বাসী　　পেয়ে সে পুঁটুলী
তুলিয়া শুঁকিল নাকে।
(যেন) কামাখ্যা মায়ের　　পরম প্রসাদ
আগত আসাম থেকে ॥
হায়রে দুর্দ্দশা　　সে প্রসাদ খাসা
নাসায় লইল বাসা।
চন্দ্রবিন্দুরূপে　　হসন্ত ম'কার
ছাইয়া ফেলিল ভাষা ॥
তামাক ধরিল　　তাঁবাক চেংড়া
অবাক দেখিয়া সবে।

হাসিকে শুনিয়া হাঁসিতে দেশটা
ফাটিল হাসির রবে॥
হায় সে অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া
সকলে পাইল ভয়।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য রাণী সূর্পণখা
কখন করিল জয়॥"

কবি মনোমোহনের এই হাস্যরসাত্মক কবিতাটীর সম্বন্ধে বঙ্গবাসী কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় তৎপ্রণীত বানান সমস্যায় লিখিয়াছেন, "ময়মনসিংহের সুরসিক কবি মনোমোহন সেনের এই কবিতার বিরুদ্ধে পশ্চিম বঙ্গের বলিবার কি আছে?" Amusement and true knowledge hand in hand এমনটী আর বড় প্রত্যক্ষ করি নাই। যাহা হউক, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা তাঁহার হাস্য-রসের বিশেষ অবতারণা করিতে চাহি না; তবে ইহা ধ্রুব যে তাঁহার ভাব ও রসের ধারা সেতারের তানের ন্যায় নিয়ত একতানে একসুরে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রবাহিত হইত।

এই পুস্তক কয়খানি ব্যতীত আমরা অন্যত্রও কবির কবিত্বের বিকাশ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ—ময়মনসিংহ সহরস্থ অমরাবতী নাট্য সমাজের বসন্ত-উৎসবে লিখিত সঙ্গীতাবলীতে, দ্বিতীয়তঃ "আরতি" "নব্য ভারত", "উৎসাহ", "নির্ম্মাল্য", "ভারতী" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলিতে।

জীবনের প্রারম্ভে কবি চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির অনুকরণে অনেকগুলি রাধাশ্যাম বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন "সেগুলি যেন কোন একটী বাঁধা রাগিণীর গান" মিষ্ট লাগিতেছে কিন্তু নূতন ঠেকিতেছে না। এরূপ লিখিতে লিখিতে নিজের যেখানে মর্ম্মস্থান সেই স্থানটী আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। এতদিন ধরিয়া তিনি যেন পরের বাঁশী ধরে নিজের গান গাহিতেন। তাহাতে তাঁহার প্রাণের সকল সুর ফুটাইত না। ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা দেখিলেন তাঁহার প্রাণের মধ্যে একটা বাঁশী আছে। এতদিন পর তাহার প্রাণের সকল সুর বাজিয়া উঠিল। তিনিও ভাবে বিভোর হইয়া গাহিলেন :—

"কেয়ে যাও বেয়ে
ওরে ভাই নেয়ে,
হেথা আমি বসে আছি
যাও যদি নিয়ে।"

কবির আকুল প্রাণের ব্যাকুল গান সত্যসত্যই ভবের হাটের নেয়ের নিকট পৌঁছিল। তাই বুঝি নেয়েও শীঘ্র আসিয়া কবিকে সাদরে ওপারে লইয়া গেল।

গদ্য সাহিত্যেও কবির ক্ষমতার পরিচয় আমরা পাই। কবি ভক্তিশ্রদ্ধার কুসুমাঞ্জলীতে সাজাইয়া তাঁহার যে প্রবন্ধ ও কবিতাবলী বঙ্গবাণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হেতু "আরতির" পৃষ্ঠায় দান করিয়াছিলেন; সেইগুলি বাস্তবিকই কবির ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় জ্ঞাপন করে। কবি মনোমোহন যখন "মোহনভোগ" হস্তে সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, তখন সাহিত্যসমাজ তাঁহার নিকট লুচি সন্দেশেরও আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কবি কবিতাসুন্দরীর রাতুল চরণে মনোমত অর্ঘ্যদান করিবার জন্য মনে মনে যে স্বর্গ গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাহার পরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই তিনি অকালে জননী জন্মভূমির স্নিগ্ধশ্যামল ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলেন। জীবন-বসন্তের প্রথম প্রভাতে কবি ভাব ও কবিত্বের মধুর তানের মধ্য দিয়া যেমন করিয়া সাহিত্য সাধনায় অগ্রসর হইতেছিলেন, জীবন-সন্ধ্যার পূরবী রাগিণীর মধ্যে যদি সে আবেগের পরিসমাপ্তি হইত, তবেই তিনি সাহিত্যাকাশে পূর্ণাঙ্গ শশাঙ্কের মত সুবিমল ও সুস্নিগ্ধ প্রভা দান করিতে পারিতেন। তথাপি কবি বঙ্গসাহিত্যকে যাহা দিয়াছেন, তাহা চিরস্থায়ী। তাঁহার কবিতারূপিণী মন্দার মালায় বঙ্গভাষা চিরদিন সুশোভিত থাকিবে।

শ্রীপরিমল দাস গুপ্ত।

কার্য্যাধ্যক্ষের নিবেদন।

জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক মাসে স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে। "বন্ধের মাসে স্কুল কলেজে পত্রিকা পাঠাইলে তাহা পাওয়া যায় না"—এই আব্দার আমাদিগকে শুনিতে হয়। সেজন্য স্কুল কলেজের জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক মাসের পত্রিকা আমরা তৎ তৎ পরবর্ত্তী সংখ্যার সহিত পাঠাইয়া থাকি। এবারও স্কুল ও কলেজ সমূহের জ্যৈষ্ঠ মাসের "সৌরভ" আষাঢ় সংখ্যার সহিত একত্র পাঠান হইল

ময়মনসিংহ লিপিপ্রেসে—শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

সৌরভ

ষষ্ঠ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, শ্রাবণ ১৩২৫। | দশম সংখ্যা।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জুলাই মাসের ২রা আমরা কঙ্গো প্রদেশ ত্যাগ করিয়া জেঙ্গ দেশে প্রবেশ করিলাম। ইহার পশ্চিম দিকে সুপ্রসিদ্ধ গজল দেশ। এই স্থান হইতে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আসিয়া নীল নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ সমতল ভূমি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। শুনিলাম এই সব জঙ্গলে হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার নানা জাতীয় হরিণ ও পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। লোকালয় খুব কম। বন্যজন্তুর সংখ্যা এত অধিক যে, আমরা দিনের বেলায়ও নানা প্রকার জন্তু দেখিতে পাইতাম। একদিন প্রাতঃকালে আমরা নঙ্গর ফেলিয়া আহারাদির আয়োজন করিতেছি এমন সময় কিছুদূরে একটা গণ্ডার দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমাদের সঙ্গে দুইজন সাহেব ছিলেন। কাপ্তেন সাহেব পাঠকের পরিচিত। দ্বিতীয় সাহেব একজন ইঞ্জিনিয়ার। সাহেবরা লোভ সামলাইতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ দুই জনে বাহির হইলেন। তামাসা দেখিবার জন্য আমিও একটা বন্দুক লইয়া উঁহাদের সঙ্গ লইলাম।

গণ্ডারের চক্ষু বড় ক্ষুদ্র, কিন্তু ঘ্রাণশক্তি বড় প্রবল। ইহারা অনেক দূর হইতে শিকারীর আগমন জানিতে পারে। হাওয়া যদি শিকারীর দিক হইতে বহিতে থাকে, তবেই ইহাদের ঘ্রাণশক্তি কার্য্যকরী হয়। ঐ সময়ে হাওয়া কি ভাবে বহিতেছিল আমার ঠিক মনে নাই। তবে জানোয়ারটা যে ভাবে যাইতেছিল তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল যে সে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এত বড় জন্তু যে এত দ্রুত দৌড়াইতে পারে তাহা আমার ধারণা ছিল না। আমরা তিনজনে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়াইতেছিলাম। কিন্তু দুই চারি মিনিটের মধ্যে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, শীঘ্র উঁহাকে কাবু করিতে না পারিলে উহা অবিলম্বে আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া যাইবে। কি করা যায়? র সাহেব ইহার মীমাংসা করিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। তিনি সহসা একস্থানে দাঁড়াইলেন এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ঘোঁরা টিপিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য আমরা দুইজনেও গতিরোধ করিয়াছিলাম।

পৃথিবীর মধ্যে গণ্ডারের ন্যায় মোটা চামড়া আর কোনও প্রাণীর নাই। দুই একটী বিশেষ স্থান ভিন্ন ইহার অঙ্গের আর কোনও স্থানে গুলি বিদ্ধ হয় না। এইজন্য গণ্ডার শিকার করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সাহেবের গুলি উহাতে যে লাগিল তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, কারণ উহা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল এবং একবার আমাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মস্তক নীচু ও লেজ উঁচু করিয়া অতি তীব্রবেগে আমাদের দিকে ধাবিত হইল। আমরা তিন জনেই বন্দুক ছুড়িলাম কিন্তু ফল কিছুই হইল না। ক্রুদ্ধ দানবের ন্যায় জন্তুটা সমান বেগে আমাদের দিকে আসিতে লাগিল। তখন পলায়নই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবিয়া বন্দুক সেইখানে ফেলিয়া আমরা যে যে দিকে সুবিধা পাইলাম, পলায়ন করিলাম।

যখন নৌকার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, তখন হাফ ছাড়িলাম। পশ্চাতে চাহিয়া দেখি দুইজন সাহেবই অদৃশ্য।

তখন একটু চিন্তিত হইলাম। যে রকম অবস্থায় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, তাহাতে চিন্তিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আমি তিনজন সোমালিকে সঙ্গে করিয়া তৎক্ষণাৎ জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। খানিক দূর যাইয়া কাপ্তেন সাহেবের দেখা পাইলাম। তিনি কিন্তু র সাহেবের সম্বন্ধে কোনও সম্বাদ দিতে পারিলেন না। তিনিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বন্দুক তিনটা যেমন ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, সেই রকমই পড়িয়াছিল। কিন্তু র সাহেবের কোনও চিহ্ন পাইলাম না। তখন আমরা গণ্ডারের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় তিন চারি শত গজ দূরে যাইয়া আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে হাসিব কি কাঁদিব তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কাপ্তেন সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া দেখি তাঁহার মুখে নীরব হাস্যের বেশ স্পষ্ট রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য সোমালিরা মুখে এক ভাব মনে অন্য ভাব দেখাইতে জানিত না। তাহারা উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। ব্যাপার এই।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে এক অস্পষ্ট পথের রেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ রকম পথের চিহ্ন জঙ্গলের মধ্যে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। লোক বা বন্য জন্তুর চলাফেরায় এই প্রকার পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যাহা হউক, এই রকম পথের ধারে এক কণ্টকাকীর্ণ গভীর ঝোপ ছিল। ঐ ঝোপের উপর আমাদের র সাহেব বসিয়া ছিলেন। ঝোপের উচ্চতা প্রায় ৪॥ হাত। বসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র নড়িবার চড়িবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার ভারে ঝোপ খানিকটা অবনত হইয়া পড়িয়াছিল; ইহার উপর যদি তিনি উহার ভিতর হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই বড় বড় কাঁটাওয়ালা ঝোপের ভিতর পড়িয়া যাইতেন এবং তাহা হইলে উহার মধ্য হইতে মুক্তিলাভ করা যে তাঁহার পক্ষে বিশেষ কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত তাহা তিনি বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন। আমরা যখন ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন র সাহেব এমন আড়ষ্ট ভাবে বসিয়াছিলেন যে তাহা দেখিলে নিতান্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোককেও হাসিতে হইত।

আমরা দুইজনে অতি কষ্টে হাস্য দমন করিয়া সাহেবের উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। প্রথমে ত কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাইলাম না। কিন্তু একজন সোমালির প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সাহেবকে উদ্ধার করিলাম। ঝোপের উপর একটা বড় গাছ ছিল। ভাগ্যক্রমে একটা মোটা ডাল ঠিক ঐ ঝোপের উপর অবস্থিত থাকাতে আমরা দড়ির সাহায্যে সাহেবকে অনায়াসে উপরে টানিয়া তুলিলাম। সাহেবের দুর্ঘটনার কাহিনী এই :—

"আমি একদিকে সবেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলাম। খানিক দূর যাইয়াই বুঝিলাম যে গণ্ডারটার লক্ষ্য আমারই উপর। একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম কিন্তু তোমাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ঐ ভাবে দেখাতেই আমি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিলাম। রাস্তার উপর একটা গাছের ডাল পড়িয়াছিল। উহাতে পা আটকাইয়া সজোরে পড়িয়া গেলাম। উঠিতে না উঠিতে জানোয়ারটা আসিয়া পড়িল এবং তাহার শিংএর উপর আমাকে উঠাইয়া সজোরে একদিকে ফেলিয়া দিল। ভাগ্যক্রমে আমি ঐ ঝোপের উপর গিয়া পড়িলাম, এই জন্যই রাস্কেলটা আমার বিশেষ কোনও অনিষ্ট করিতে পারে নাই। ইহার পর সে সোজা চলিয়া গেল।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই জঙ্গল প্রদেশ উচ্চতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। তবে লোক না থাকাতে ইহার অধিকাংশ স্থান গভীর জঙ্গলে পূর্ণ। অবশ্য আফ্রিকার অনেক উৎকৃষ্ট স্থান লোকাভাবে জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই সব দেখিয়া আমার অনেক কথা মনে হইতেছিল। আমাদের দেশের লক্ষ ২ লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এমন অনেক লোক আছে যাহারা সপ্তাহে এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। ভারতের অনেক স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা একবর্গ মাইলে ৩০০—৫০০ পর্য্যন্ত। আমাদের দেশের গরীবেরা যদি আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করেন তাহা হইলে খুব অল্প দিনের মধ্যে ভারতের দারিদ্র্য সমস্যার সুন্দর মীমাংসা হইয়া যায়। এ প্রকার উপনিবেশ স্থাপিত হইলে দরিদ্র লোকদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। ভারতের উপকার হয় এবং আফ্রিকারও উন্নতি হয়। আমি কাপ্তেন সাহেবের নিকট শুনিলাম যে, ভারতের লোক যদি এ দেশে

আসিয়া বসবাস করিতে চায় তাহা হইলে ইংরেজ বাহাদুর বিনাকরে তাহাদিগকে জমি প্রদান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

এইসব বিষয়ে ইংরেজরা যে আমাদের চেয়ে কত বড় তাহা আমি আফ্রিকায় অবস্থানকালীন খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া ছিলাম। ইংরেজ যখন দেখে যে দেশে থাকিলে অনাহারে মরিতে হইবে বা অর্দ্ধাহারে কষ্ট পাইতে হইবে, তখন সে দেশ ছাড়িয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে বাহির হয়। যেখানে সুবিধা বুঝে সেইখানেই চলিয়া যায়। বাপ পিতামহের জন্মস্থান ছাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা দুঃখিত হয় না। তাহারা বেশ জানে, উদরের চিন্তাই মানুষের আসল চিন্তা। উদর পূর্ণ না থাকিলে, ধর্ম্ম, মোক্ষ প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় না।

আফ্রিকায় এইভাবে লক্ষ লক্ষ ইংরেজ আসিয়া বাস করিতেছে। দেশে তাহারা কোনও দিন দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। কিন্তু এখন তাহাদের অবস্থা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। গোলা ভরা ধান বা গম, গোয়াল ভরা গরু ও মহিষ, ছাগল, ভেড়া এমন কি গাড়ী ঘোড়া পর্য্যন্ত শতকরা ৯৫।৯৬ জনের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজ এমন অনেক স্থানে বাস করিতেছে যেখানে আসেপাশে ২০০।৩০০ মাইলের মধ্যে আর কোনও ইংরেজ নাই। তাহার জন্য কখনও তাহাকে দুঃখ প্রকাশ করিতে শুনিবে না। কিন্তু এই কথায় কেহ যেন মনে না করেন যে, ইংরাজের নিজ জন্মভূমি ও স্বদেশবাসীর উপর কোনও টান নাই। যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন সহস্র সহস্র ইংরাজ ঔপনিবেশিক নিজের যথাসর্ব্বস্ব ও নিজেকে যুদ্ধের জন্য সমর্পণ করিয়াছিল। যে কোনও কারণ বশতঃ নিজে যাইতে পারে নাই, সেও নিজের পুত্র:বা অপর কোনও নিকট আত্মীয়কে পাঠাইয়াছিল। মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ যুদ্ধের সময় ইংরাজ রাজ আফ্রিকার ইংরেজদিগকে আদৌ আহ্বান করেন নাই। নিজ জন্মভূমির উপর বিপদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া সকলে স্বেচ্ছায় ঐ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল। আমরা কথায় কথায় বড়াই করি যে, আমাদের জন্মভূমির প্রতি টান অতুলনীয়। খাইতে না পাইলেও ভাল, তবুও কিন্তু দেশ ছাড়িব না। কথাটা সত্য বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় জন্মভূমির প্রতি টান ইহার কারণ নয়। আমরা যে শীঘ্র দেশ ছাড়িতে চাহিনা ইহার আসল কারণ আমাদের ভীরুতা ও আলস্য। দেশের প্রতি যদি সত্য সত্যই আমাদের টান থাকিত, তবে আমরা দেশের মঙ্গলের জন্য নিজের সুখ ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিতে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করিতাম না। জাপানি সামুরিয়ারা যখন বুঝিল যে ছোট বড় ভেদ ছাড়িতে না পারিলে দেশের মঙ্গল হইবেনা—তাহারা তখনই নিজেদের প্রাচীন অধিকার সকল ত্যাগ করিল। এক কথায় দেশের সব এক হইয়া গেল। বঙ্গ দেশের লোকেরা নিজকে বড় উন্নত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ দিগের মধ্যে জাতি ভেদ লইয়া ঐ দেশে কি বিষম কলহের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কে না জানেন? ভারতের ছোট ২ জাতিদিগের মধ্যে সহস্র২ লোক উচ্চজাতির দুর্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া যে অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় লইতেছে তাহা কি আমরা জানি না? এমন করিয়াই বুঝি জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা দেখাইতে হয়?

যাহা হউক, এইখানে আমরা একজন ইংরাজ উপনিবেশ কারীর কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া দেখাইব এখানকার ইংরাজ অধিবাসীরা কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ইনি আজ প্রায় দশ বৎসর কাল হইতে নীল নদীর বাম তটে সেহানা নামক গ্রামের দুই মাইল দূরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইনি নিজে যে ভাবে নিজের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহাই যথাযথ লিপিবদ্ধ করিলাম।

"দেশে যখন দেখিলাম দুইবেলা দুইখানা মোটা রুটিও জুটিতেছে না, তখন অগত্যা দেশ ছাড়িবার সঙ্কল্প করিলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আফ্রিকা আসাই স্থির করিলাম। কিন্তু জাহাজের ভাড়া কোথায় পাওয়া যায়। যোগাড় করিয়া লিভারপুল আসিলাম, এবং কয়েক দিন অনবরত চেষ্টার পর মিসরগামী একজন বড় অফিসার আমায় ভৃত্যভাবে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকার পাইলেন। মিসরে আসিয়া ঐ অফিসারের নিকট তের মাস চাকুরি করিলাম। যখন কিছু অর্থ সংগ্রহ হইল, তখন চাষ বাসের উপযোগী কয়েকখানি অস্ত্র ও তিনটা বলদ খরিদ করিয়া এইস্থানে আসিলাম। আমার মনিবের দয়ায় আমি বিনা করে ৫০০০ একর জমি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম।

"প্রথমে একখানি ছোট কুড়ে ঘর প্রস্তুত করিয়াছিলাম অবশ্য নিজের হাতেই করিতে হইয়াছিল। তখন এইস্থান ঘোর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। দিনের বেলায় পর্য্যন্ত সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু দেখিতে পাইতাম। প্রথম২ বড় ভয় হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহা কাটিয়া গেল। তাহার পর পরিশ্রমের কথা। সে কথা এখন মনে হইলে আশ্চর্য্য হই যে একা আমি কি প্রকারে এই সব কাজ সমাপ্ত করিয়াছিলাম। প্রথমে বড় বড় গাছ গুলা কাটিয়া জঙ্গল সাফ করিলাম, তাহার পর হাল চালাইতে আরম্ভ করিলাম। সমস্ত দিন রাতের মধ্যে আহার ও নিদ্রায় ৫। ৬ ঘণ্টার অধিক ব্যয় করিতাম না। অবশিষ্ট সময় কাজ করিতাম। রাত্রে নিজের ঘরে বসিয়া চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি জিনিষ প্রস্তুত করিতাম। প্রায় তিন বৎসরকাল পর্য্যন্ত এইভাবে চলিয়াছিল। ভগবান জানেন ঐ তিন বৎসর আমি কি ভাবে কাটাইয়াছিলাম। একদিনও আমি কাজ হইতে অবসর লই নাই। এই স্থান ছাড়িয়া কোথাও যাই নাই।

"তাহার পর ঐ পরিশ্রমের ফল ফলিতে লাগিল। দ্রব্যাদি যাহা উৎপন্ন হইতে লাগিল তাহা বেচিয়া চতুর্থ বৎসরে বোধ হয় চারি শত পাউণ্ড লাভ পাইয়াছিলাম। এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে যখন অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইত, তখন বন্দুক লইয়া শিকারে বাহির হইতাম। যে সকল জন্তু শিকার করিতাম, তাহাদের চামরা বেচিয়াও বেশ দুপয়সা লাভ হইত। ইহার পর কাফ্রি চাকর রাখিতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার কাজ খুব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ৪০০ কাফ্রি ও স্লোসালি এখন আমার সাহায্য করিতেছে। তাহা ছাড়া-গরু, ঘোড়া, মহিষ, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি প্রায় ১৬০০ আমার নিকট রহিয়াছে। গত বৎসর হইতে—উটপাখী পুষিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহাতেও যে বেশ লাভ দাঁড়াইবে তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।"

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

রাজা দনুজেশ্বর রায়।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জিলা একটী সুপ্রসিদ্ধ স্থান। গৌড়, নবদ্বীপ, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলার ইতিহাসে সবিশেষ পরিচিত ও সুবিখ্যাত স্থান বলিয়া সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে পরিগণিত। হিন্দু ও মুসলমান বংশীয় অনেক শাসন কর্ত্তার ও অন্যান্য বিখ্যাত মহাত্মাদিগের বাসস্থান ও কীর্ত্তি কলাপের জন্য এই চারিটী স্থান এবং ইহাদের সমীপবর্ত্তী ও অন্তঃপাতী বিভিন্নগ্রাম, উপগ্রাম, পল্লীগ্রাম ও জনপদ প্রভৃতি নানাভাবে বিজড়িত। ঐতিহাসিকের পক্ষে, পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ীর চক্ষে এসকল স্থানের মহিমা ও গরীমা সর্ব্বতোভাবে অতুলনীয়। মহাদেশের, দেশের ও তদন্ত-র্গত প্রদেশের ইতিহাস সংকলন জন্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব সমূহ সংগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু ঐ সকল তত্ত্ব সংগ্রহ বিষয়ে অবহিত বা যত্নশীল হইতে হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম ও সামান্য সামান্য জনপদের বিবরণ সংগ্রহ করাও সম্পূর্ণভাবে আবশ্যক। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সলিল কণিকা একত্র সম্মিলিত হইলে সুবিশাল ও সুবিস্তীর্ণ মহা-সাগরের জলরাশিতে পরিণত হয় বা বিশাল জলরাশি পূর্ণ মহার্ণব নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম, উপগ্রাম বা পল্লী জনপদের ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও গ্রাম্য বিবরণ সংগৃহীত হইলেই সুবৃহৎ মহাদেশের বা সুবিস্তীর্ণ দেশ সকলের ইতিহাস রচনার উপযোগী উপাদান সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুপসিদ্ধ বা খ্যাতনামা রাজা, মহা-রাজ, সম্রাট, নবাব, জমিদার, সর্দ্দার বা বীর পুরুষদিগের জীবনী বা কীর্ত্তি কাহিনী সংকলিত বা সংগৃহীত হইলেই প্রকৃত ইতিহাস হয় না। ক্ষুদ্র বৃহৎ, নীচ মহৎ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ বা নিম্ন পদস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই কিছু কিছু অদ্ভুত ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের বা অসামান্য ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মহাদেশের ইতিহাস সংকলন জন্য ও তাহার উপাদান সংগ্রহের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পল্লীর ইতিবৃত্ত জানা যেরূপ আবশ্যক মানব সাধারণের মধ্যেও যাহারা মাননীয় বা গণনীয় ছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ সংগ্রহ করাও তেমনই প্রয়োজনীয়।

আমরা এই প্রবন্ধের শিরোদেশে যে মহাত্মার নাম লিখিয়াছি তিনিও মানব সাধারণের মধ্যে একজন খ্যাতনামা ও ক্ষণজন্মা পুরুষ। এই মহাত্মার রাজবাটী বা রাজধানী গণকর গ্রামে ছিল। গণকর অতি প্রাচীন গ্রাম। মুর্শিদাবাদ জিলার উপবিভাগ (মহকুমা) জঙ্গিপুরের দুই ক্রোশ দক্ষিণে এই গণকর গ্রাম অবস্থিত, সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক রাজদূত মেগাস্থিনিস নিজ বিবরণী মধ্যে যে সকল স্থানের নাম ও অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, গণকর তন্মধ্যে একটী গণনীয় স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং প্রায় সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত গণকর সমভাবেই আপন নাম বজায় রাখিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্বে রাণী ভবানী ও তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণের অধিকার কালেও গণকর গ্রাম অনেক বিষয়ে সুবিখ্যাত ছিল। গণকর একটী প্রসিদ্ধ পরগণা ও বৃহৎ ডিহি। এই গ্রামের অধীনে অনেক গ্রাম আছে, পূর্ব্বে এই গ্রামে থানাও ছিল, সেই থানা এখন কার্য্যবশতঃ মির্জ্জাপুরে উঠিয়া গিয়াছে। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমুদায় স্থান অপেক্ষা গণকর যেরূপ উচ্চভূমিতে অবস্থিত তাহাতে বেশ বোধহয় স্থানটী স্বাস্থ্যপ্রদ ভাবিয়াই উক্ত দনুজেশ্বর রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ তথায় আবাস গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন প্রাচীন গ্রামসমূহের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, গণকরও সে দুরবস্থার হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। ম্যালেরিয়ার প্রবল আক্রমণে ও উৎপীড়নে অন্যান্য গণ্ড গ্রামের ন্যায় গণকরও এখন হতশ্রী ও জনশূন্য হইয়া প্রায়শঃ জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্র ও অভদ্রলোকের বসবাস বিশেষতঃ চাষবাসের জন্য যে সকল দ্রব্য নিত্য প্রয়োজনীয় গণকর গ্রামে সে সকল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত এবং এখনও পাওয়া যায়। গণকর হইতে ভাগীরথী নদী অতি নিকট—প্রায় ১ মাইল দূরবর্ত্তী, অথচ বর্ষাকালে বন্যার প্রাবল্যে তৎসমীপবর্ত্তী গ্রাম সকলের লোকজন যেরূপ বিব্রত ও বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে, গণকরের অধিবাসিগণ সেসময়েও বেশ সুখ সচ্ছন্দে ও বিনা বিপদে বাস করিয়া থাকে। বরং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকলে বন্যার প্রাদুর্ভাব প্রবল হওয়ায় গোমহিষাদি পশুসমূহের নিরাপদস্থান ভাবিয়া পশুপালকগণ গণকর গ্রামেই আশ্রয় লইয়া থাকে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক ও কৈবর্ত্ত প্রভৃতি সকল রকম জাতিরই বাস ছিল। এখন কালের প্রভাবে অনেক জাতি স্থান ত্যাগ করিয়াছে এবং অনেক জাতির বংশধরগণ অতি হীন অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে। গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থায় অতি প্রাচীন চিহ্নসকল এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বারহারোয়া-কাটোয়া রেললাইন খোলার পর ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী গণ্ডগ্রামের প্রাধান্য ও প্রসিদ্ধি সম্যকরূপে জানিতে পারিয়া গতবৎসর "গণকর" নাম দিয়া একটী রেলওয়ে ষ্টেসন খুলিয়া দিয়াছেন। এই ষ্টেসন গণকর গ্রামের পশ্চিমে প্রায় এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। এই ষ্টেসন খোলার পর গণকর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রায় ৫০ খানি গ্রামের লোকের যাতায়াতের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে।

রাজা দনুজেশ্বর রায় মহাশয় কতকাল পূর্ব্বে গণকর গ্রামে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা এখন নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে পুরাতন কাগজপত্রে অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা করিয়া এবং কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া যতদূর বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহাতে জানা যায় সম্ভবতঃ তিনি বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাগিনেয় ঘনশ্যাম রায়ের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ না হইলেও ইনিও একজন সমৃদ্ধিশালী ও প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে। এই ঘনশ্যাম রায়ই ইতিহাস প্রসিদ্ধ খ্যাতনামা রাজা উদয়নারায়ণ লালার শ্বশুর। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায় মহাশয় লালা উপাধি দেখিয়া উদয়নারায়ণকে কায়েস্থ স্থির করিয়া তাঁহার রচিত মুর্শিদাবাদ কাহিনীর প্রথম সংস্করণে রাজা উদয়নারায়ণ লালাকে কায়স্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার শ্বশুরবংশীয় ব্যক্তিগণের নিকট প্রকৃত বিবরণ অবগত হইয়া এবং পুরাতন দলিল দস্তাবেজ দেখিয়া তিনি আপন ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন এবং তাঁহার মত ও নির্দ্দেশ পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের পর ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণও রাজা উদয়নারায়ণকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিখিল বাবুর প্রণীত মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে

ঘনশ্যাম রায়ের বংশাবলী ও তাঁহার বংশধরগণের নিকটস্থ অনেক দলিল মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ১০৮০সাল হইতে ১১১৫ সাল (বাঙ্গলা) পর্য্যন্ত ঘনশ্যাম রায়ের জমিদারী পরগণা গণকর ও তৎসংলগ্ন গ্রামসমূহে থাকার বিবরণ জানিতে পারা গিয়াছে। ১০৯০। ১০৯৬ সালের লিখিত ঘনশ্যাম রায়ের দস্তখতি কাগজপত্রও পাওয়া গিয়াছে। উক্ত সময়ে তিনি প্রবল জমিদাররূপে দেশমধ্যে বিখ্যাত ছিলেন।

রাজা উদয়নারায়ণ লালা আজিমগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বিনোদগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শুনিতে পাওয়া যায় বিনোদের নিকটস্থ বড়নগর গ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল। বাঙ্গলার নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর সহিত নানা কারণে মনোমালিন্য সংঘটিত হওয়ায় এবং পরে নবাবের প্রস্তাবমত তাঁহার সৈন্যদিগের রসদ প্রদানে অশক্ত হওয়ায় উদয়নারায়ণ নিজ শশুরালয় গণকর গ্রামে আশ্রয় লাভার্থ আগমন করেন। নবাবের সহিত বিবাদ করিয়া সুখ শান্তিতে বাসকরা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও বিপজ্জনক বিবেচনায় শশুর ও জামাতা উভয়েই নিজ নিজ পরিবার-বর্গসহ বীরভূম ও সাওতালপরগণা অঞ্চলে পলায়ন করিয়া লুকাইয়া থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঐ সময়েও বোধহয় পাঠানদিগের অত্যাচার ছিল। তাঁহারা যেসকল স্থানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সমুদায় স্থান তখন "পাঠানের মুলুক" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উদয়নারায়ণের এই হাঙ্গামায় পড়িয়া ঘনশ্যাম রায় আপন সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। ১০২০ সালে উদয়-নারায়ণ লালার এই গোলযোগ উপস্থিত হয়। ঘনশ্যাম রায় নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ও ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকিয়া ১১২৬ সালে মুর্শিদাবাদ নগরের পরপারস্থিত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ ডাহাপাড়া গ্রামে লোকান্তর গমন করেন। এই ডাহাপাড়াই ইতিহাস প্রসিদ্ধ বঙ্গাধিকারী-দিগের বাসভূমি বলিয়া সুপরিচিত। ঘনশ্যাম রায়ের তালুক মুলুক সমস্তই রাণী ভবানীর শশুরদিগের হস্তগত হইয়া যায়। উক্ত রাণীর শশুর রাজা রামজীবন ও তাঁহার ভ্রাতা রঘুনন্দন সেইসময়ে নবাব মুর্শিদ কুলিখাঁর প্রিয়পাত্র হওয়ায় তৎকালীন অনেক জমিদারের জমিদারীই তাঁহারা অতি সহজে লইতে পারিয়াছিলেন। এই সকল বিবরণ বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠকগণের নিকট সুবিদিত আছে, বলিয়া তাহার আর উল্লেখ করা বাহুল্য বিবেচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

রাজা দনুজেশ্বর রায় মহাশয়ের নাম ও কীর্ত্তি স্মরণ করিবার জন্য দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে, প্রথমতঃ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মীনারায়ণ মূর্ত্তি-শালগ্রাম। এই শালগ্রামমূর্ত্তি অতি সুন্দর, মনোহর ও দর্শনীয়। কদম্ব-কুসুমাকার, বনমালা বেষ্টিত, সুচিহ্নিত গহ্বরের চতুষ্পার্শ্বে চতুশ্চক্র সুশোভিত। স্বর্ণ রেখা ও স্বর্ণ বিন্দু দ্বারা দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব বিভূষিত। সমস্ত মূর্ত্তিটী এত ঘন কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ ও সমুজ্জ্বল যে কিছুকাল ধীর মনে ও স্থিরনেত্রে সন্দর্শন করিতে করিতে আপনিই হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া সর্ব্ব শরীরে সাত্বিক ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। অনেক স্ত্রী পুরুষ এই ভাবে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। শালগ্রাম শিলার দর্শন স্পর্শনপ্রভৃতি ত্রাটক যোগের সহায়তা করিয়া থাকে বলিয়া যোগরত যোগীগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সন্দর্শনে তাহা অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়।

রাজা দনুজেশ্বর রায়ের সময়ে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের নিত্য সেবার কিরূপ ব্যবস্থা বিধান ছিল তাহা সম্যকরূপে জানিবার কোন উপায় এখন নাই; তবে বংশপরম্পরায় লোক মুখে ও জনশ্রুতিমূলে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে শুনিতে পাওয়া যায় যে উক্ত দেবের প্রাত্যাহিক ভোগের নিমিত্ত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ব্যতীত ১৷০ সওয়া মণ দুগ্ধের পায়স প্রস্তুত হইত। নিত্য সেবার দ্রব্য সম্ভার কিরূপ প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হইত, ও নিত্যসেবা কি প্রকার সমারোহে সম্পাদিত হইত তাহার প্রকৃত পরিচয় এখন পাইবার উপায় নাই, তবে এই একমাত্র পায়সের পরিমাণ দ্বারাই কিয়ৎ পরিমাণে তাহার অনুমান করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত দ্রব্যই দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা স্বত্ত্বেও রাজা দনুজেশ্বর রায় মহাশয়ের বংশধরগণের অবস্থা অনেক বিষয়ে হীন হইলেও এখনও উক্ত দেবের নিত্যসেবার নিয়ম রীতি মত প্রচলিত আছে এবং নিত্য ভোগের নিমিত্ত অন্ন ব্যঞ্জন প্রভৃতির সহিত দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ও পায়সান্ন প্রত্যহ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

রাজা দমুজেশ্বর রায় মহাশয়ের বংশধরদিগের প্রতি উক্ত দেবের কিরূপ অনুগ্রহ তাহা পরিজ্ঞাপন করিবার জন্য একটী ঘটনার উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের গুণ মহিমা শ্রবণে তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া যান। সেই সময় স্বর্গীয় রামরতন রায় মহাশয় গণকর বাটীতে রাজ বংশের কীর্ত্তিকলাপ রক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার মত ক্রিয়ানিষ্ঠ সদাচার ভক্তিমান ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি প্রায় সচরাচর নয়ন-গোচর হয় না। ঠাকুর চুরি যাওয়ায় তিনি নিতান্ত বিহ্বল ও শোকাকুল হইয়া পড়েন, কিন্তু নানারূপ অনুসন্ধান করিয়াও কোন সুফল প্রাপ্ত হন নাই। পরে ১২৭৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে একখানি বেনামী চিঠি আসায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত আড়িয়া গ্রামে উক্ত দেবের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহার পর প্রায় দুই বৎসর পরে উক্ত রামরতন রায় মহাশয় শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের কৃপাবলে তাঁহাকে পুনরায় গণকর বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক অভিষেকাদি ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পাদন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ দেবের অপহরণ ও পুনঃ প্রাপ্তি এক অদ্ভুত ব্যাপার। প্রসঙ্গতঃ এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা গেল মাত্র।

রাজা দমুজেশ্বর রায় মহাশয়ের অপর কীর্ত্তি রাজার মা নামক পুষ্করিণী এখনও গণকর গ্রামে বিদ্যমান আছে। এই পুষ্করিণী উক্ত রাজার মাতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নাম অনুসারে ইহার নাম 'রাজার মা' রাখা হইয়াছে। পুষ্করিণীর পাহাড় সকল এখনও বেশ উচ্চ রহিয়াছে। জলকর পরিমাণ প্রায় ১৬/০ ষোল বিঘা হইবে। গণকর গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এই পুষ্করিণী অবস্থিত। পুরাতন দিঘী বা পুষ্করিণীর যেরূপ হইয়া থাকে, কালচক্রের আবর্ত্তনে অনিবার্য্য বিবিধ বিষয়ক পরিবর্ত্তনে 'রাজার মার' ও সেই দশা ঘটিয়াছে। রাজার বর্ত্তমান বংশধরগণের অর্থাৎ রায় পরিবারদিগের অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল না থাকায় এই পুষ্করিণীর রীতিমত পঙ্কোদ্ধার বা জীর্ণ সংস্কার অনেক দিন হয় নাই, সুতরাং জলজ শৈবালরাজী আপন প্রভাব বিস্তার পূর্ব্বক ইহার মধ্যে মধ্যে বেশ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু গ্রামে আর ভাল পুষ্করিণী না থাকায় বিশেষতঃ পানীয় জলের অভাব বশতঃ গ্রামের অধিকাংশ লোকই স্নান ও পানের জন্য 'রাজার মা'র জল ব্যবহার করিয়া থাকে। রাজা দমুজেশ্বর রায় মহাশয়ের মাতৃ ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এই পুষ্করিণীর খনন ও প্রতিষ্ঠা ব্যাপার স্মরণ করিলে এবং বর্ত্তমান কালে ইহার শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। এবং মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত বর্ণিত সুন্দর কবিতার অমোঘ বাক্য সহজেই সহসা স্মৃতিপথে উদিত হইয়া থাকে।

"সূর্য্যা পায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বাম ভিখ্যাম্॥"

অর্থাৎ—অস্তাচলে দিবাকর করিলে প্রবেশ।
কমল ধরে না নিজ কমনীয় বেশ॥"

শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ দেব ও 'রাজার মা' পুষ্করিণী ব্যতীত রাজা দমুজেশ্বর রায় মহাশয়ের আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তবে গ্রামের স্থানে স্থানে স্তম্ভাকৃতি প্রস্তর খণ্ড ও তাহার বসিবার জন্য চৌকীর আকারের ছোট ছোট পাথরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা দমুজেশ্বর রায় মহাশয় বোধ হয় শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ও রাঢ়ী শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ ভরদ্বাজ ও কাশ্যপ গোত্রে তাঁহার বংশীয়দিগের আদান প্রদানের সংবাদ অনেক স্থানে জানিতে পারা গিয়াছে।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

দণ্ডের মূল্য।

ইটালী ও ফরাসী দেশের সীমান্তের সংলগ্ন ভূমধ্য সাগরের তীরে একটী রাজ্য অবস্থিত। ইহার নাম মোনেকো। রাজ্যটী অতি ক্ষুদ্র, ইহার জনসংখ্যা সাত হাজারের বেশী হইবে না। অনেক ক্ষুদ্র সহরের অধিবাসীর সংখ্যাও এর চেয়ে অধিক। রাজ্যের সমগ্র ভূমি যদি প্রজাদিগের মধ্যে সমান বিভাগ করিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলেও কেহই এক একর জমির বেশী পাইত কিনা সন্দেহ।

রাজ্য ছোট হইলেও শাসনযন্ত্রের কোন অঙ্গেরই অভাব নাই। বড় বড় সাম্রাজ্যের ন্যায় এখানেও রাজা, মন্ত্রী, ধর্ম্মযাজক, সৈন্য, সেনাপতি সকলই বর্ত্তমান

আছে। সুবিচারের জন্য আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত রহিয়াছে।

রাজ্য যেমন ক্ষুদ্র আয়ও তেমনি সীমাবদ্ধ। এইজন্য রাজ্যের আয়ধারা কিছুতেই ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না। নানাবিধ কর স্থাপিত হইয়াছে। ভূমির কর এবং মাদকদ্রব্যের করত আছেই, তা ছাড়া প্রত্যেক অধিবাসীর উপর মুণ্ডকর স্থাপিত হইয়াছে। তবু কুলাইতেছে না। জনসংখ্যা অল্প কি না, তাই কোন কর হইতেই বেশী আয় হয় না।

অনেক ভাবিয়া মন্ত্রীরা রাজস্ব বৃদ্ধির এক নূতন পথ বাহির করিলেন। তাঁহারা রাজ্যের স্থানে স্থানে জোয়া খেলার আড্ডা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ঐ সকল আড্ডার আয়ের উপর কর স্থাপন করিলেন।

জোয়া খেলা মহাপাপ। একবার এই পাপে মত্ত হইলে কাহারও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এক এক জন জোয়া খেলিয়া যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেছে, কত পরিবার উৎসন্ন যাইতেছে, কত হতভাগ্য নৈরাশ্যের মর্ম্মবেদনায় আত্মহত্যা করিতেছে। জার্ম্মান সাম্রাজ্যে পূর্ব্বে জোয়া খেলার অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। প্রজারা তীব্র প্রতিবাদ করায় সম্রাট জোয়ার আড্ডা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইয়োরোপের অনেক রাজ্য হইতে জোয়ার আড্ডা উঠিয়াগিয়াছে। এখন ঐসকল দেশের লোক মোনেকো দেশে জোয়া খেলিতে যায়। তাই তথায় দিন দিন জোয়ার আড্ডা বাড়িতেছে। সুতরাং রাজস্ব ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

এইরূপে রাজস্ব বৃদ্ধি করা অন্যায়। মন্ত্রীরাও যে না বুঝিতেন তা নয়। কিন্তু কি করিবেন? খরচ তাদের যোগাইতেই হইবে। তারা বলিতেন আবগারী বিভাগের আয় দ্বারা রাজস্ব বৃদ্ধি করাও অন্যায়, তবুত কোন রাজ্য হইতেই আবকারী বিভাগ উঠিয়া যায় নাই।

প্রবাদে আছে "সাধু উপায়ে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হয় না"। মন্ত্রীরা সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিলেন।

(২)

কয়েক বৎসর হল মোনেকো রাজ্যে একব্যক্তি নরহত্যা অপরাধে ধৃত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ গুরু অপরাধ তথায় আর কেহই করে নাই। এই ব্যাপারে সকলেই স্তম্ভিত হইল। অতিশয় ঘটার সহিত আসামীর বিচার আরম্ভ হইল। আসামী স্বীয় পক্ষ সমর্থনের জন্য সুযোগ্য ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিল। সরকারী পক্ষের ব্যারিষ্টার দক্ষতার সহিত মোকদ্দমা চালাইলেন। উভয় পক্ষের সোয়াল জবাব শুনিয়া জজ বাহাদুর জুরী মহোদয়গণকে আইনের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। জুরী মহোদয়গণ ঘটনার সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা করিয়া আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। জজ বাহাদুর প্রচলিত আইনানুসারে আসামীর প্রাণ দণ্ডের হুকুম দিলেন। রাজাকে দণ্ডাজ্ঞা জ্ঞাপন করা হইল। রাজা হুকুম বহাল রাখিলেন।

বিচার অভিনয় নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইল। কিন্তু হুকুম তামিল করিতে গিয়া রাজপুরুষগণ যারপর নাই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। নরহত্যার অপরাধের জন্য আইনে ফাঁসীর বিধান থাকিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। স্মরণাতীত কাল যাবৎ এ রাজ্যে কেহ নরহত্যা করে নাই, তাই ব্যয় সংক্ষেপ করিবার জন্য রাজপুরুষগণ গিউলটিন্ (ফাসি দিবার যন্ত্র) ও প্রস্তুত করান নাই, এবং ঘাতকও নিযুক্ত করেন নাই।

প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়া ত জজ বাহাদুর ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন কিন্তু মন্ত্রীরা মহাসমস্যায় পড়িয়া গেলেন। এক বিশেষ সভার অধিবেশন হইল। অনেক চিন্তার পর ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটা গিউলটিন্ এবং একজন ঘাতক চাহিয়া আনার পরামর্শ হইল। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রেরিত হইল। যথা সময়ে উত্তর আসিল—তাহারা একটা গিউলটিন্ ও একজন সুদক্ষ ঘাতক পাঠাইতে রাজি আছেন, কিন্তু তজ্জন্য ১৬০০০ হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ দিতে হইবে। এই উত্তর রাজাকে জ্ঞাপন করা হইল। রাজা জানাইলেন—"এই হতভাগ্যের জীবন নাশের জন্য ষোল হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে আমি অসমর্থ এই জন্য আমার প্রজাদিগকে গড়ে দুই ফ্রাঙ্কের উপর কর দিতে হইবে। এর চেয়ে কম ব্যয়ে এ কাজ হয় কিনা, চেষ্টা করিয়া দেখুন।"

আবার মন্ত্রীসভা বসিল। এবার ইটালীর রাজার নিকট অনুরোধপত্র দেওয়া স্থিরীকৃত হইল। ফরাসী রাজ্যে

প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত। সেখানের অধিবাসীরা রাজশক্তির বিরোধি, সেই জন্যই ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অত্যধিক অর্থ চাহিয়াছে। ইটালীর রাজা নিশ্চয়ই অত্যল্প ব্যয়ে এ কার্য্য সমাধা করিয়া দিতে সম্মত হইবেন। রাজায় রাজায় সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক।

ইটালীর রাজার নিকট পত্র গেল। যথাসময়ে তিনি প্রত্যুত্তরে জানাইলেন—তিনি গিউলটিন ও ঘাতক পাঠাইতে রাজি আছেন কিন্তু মোনেকো রাজকে তজ্জন্য পাথেয়শুদ্ধ ১২০০ হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ দিতে হইবে। ব্যয় কতকটা কমিল বটে কিন্তু মোনেকো রাজ্যের পক্ষে বার হাজার ফ্রাঙ্ক সহজ ব্যাপার নয়! প্রত্যেক প্রজার উপর দুই ফ্রাঙ্ক করিয়া পাড়বে। এই পাপিষ্ঠের জীবনের জন্য এত মুদ্রা ব্যয় করিতে রাজা অসম্মত হইলেন।

এখন উপায়! আবার মন্ত্রী সভা বসিল। অন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাইবার আশা তাঁহারা পরিত্যাগ করিলেন। নিজ রাজ্যের মধ্যেই এই কার্য্যের একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। নানা মুনি নানামত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একজন মন্ত্রী প্রস্তাব করিলেন—আমাদের কোন একজন সৈনিক পুরুষ দ্বারাই একাজ সহজে সম্পন্ন করান যাইতে পারে"। তখন অপর সকলই বলিলেন—"হা ঠিক, একথা আগে কাহারো মাথায় খেলে নাই।"

অমনি সেনাপতির ডাক পড়িল। সেনাপতি আসিলে প্রধান মন্ত্রী কহিলেন—দেখুন, একটা লোকের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে। আপনার একজন এমন সৈনিক পুরুষ নিযুক্ত করিতে হইবে যে তলোয়ার দ্বারা এই অপরাধীর মাথা কাটিয়া দিবে। যুদ্ধে তারাতো বহুলোকের প্রাণ-বধ করে, এবং এই জন্যই সরকার হইতে বেতনও পায়। ওদের এ কাজে কোন আপত্তি হইতে পারে না। সেনাপতি সেনাদিগকে ডাকিয়া মন্ত্রীদের হুকুম জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের কেহই এ কাজ করিতে সম্মত হইল না। সকলেই কহিল আমরা যুদ্ধে শত্রুবধ করিতে রাজি আছি। কিন্তু ঘাতকের কাজ কিছুতেই করিতে প্রস্তুত নই।

সেনাপতি এই সংবাদ মন্ত্রীদিগকে জানাইলেন। তাঁহারা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

মন্ত্রীরা আবার সমবেত হইয়া উপায় নির্দ্ধারণের জন্য গভীর মন্ত্রণায় নিযুক্ত হইলেন কিন্তু, এই সমস্যার কোনই সমাধান হইল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা আসামীর মৃত্যুদণ্ড পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম দেওয়া সঙ্গত বোধ করিলেন। ইহাতে রাজারও দয়া প্রদর্শিত হইবে এবং দণ্ডের মূল্যও হ্রাস হইবে। রাজা প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

এই রাজ্যের জেলখানাটী অতি ক্ষুদ্র। অল্পদিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের জন্য ক্ষুদ্র একটী কক্ষ ছিল। আজীবন কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত আসামীর উপযোগী কোন সুদৃঢ় কক্ষ ছিল না। যাহাহউক একটা হাজত ঘর খালী করিয়া এই আসামীকে আবদ্ধ করা হইল। তাহাকে পাহারা দিবার জন্য একজন প্রহরী নিযুক্ত হইল। প্রহরী প্রতিদিন রাজার পাকশালা হইতে আসামীর জন্য খাদ্য আনিয়া দিত। আসামী সেই কারাগৃহে মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিল।

বৎসরান্তে রাজা স্বয়ং রাজ্যের আয় ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করেন। হিসাব পরীক্ষাকালে খরচের ঘরের একটী মোটা অঙ্ক তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহা যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ প্রাপ্ত আসামীর খরচ। একজন প্রহরীর বেতন ও আসামীর আহারাদির জন্য একবছরে মোট ৬০০ শত ফ্রাঙ্ক ব্যয়িত হইয়াছে! রাজা দেখিয়া অবাক! হতভাগা এখনও যুবক, তাহার শরীর বেশ সুস্থ ও সবল, সত্বর মৃত্যু ঘটিবার কোনই সম্ভাবনা নাই, সে আরও ৫০ বছর বাঁচিতে পারে। রাজা এই সকল কথা ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন।

রাজা মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া খরচের কথা জানাইলেন। মন্ত্রীরাও দেখিয়া শুনিয়া কহিলেন—"এ পাজীর জন্য বছর বছর এত অর্থ নষ্ট করা যায় না— একটা উপায় করিতেই হইবে।"

পরদিন আবার সভা বসিল। বাদানুবাদও খুব হইল। একজন মন্ত্রী প্রস্তাব করিলেন—"প্রহরী তুলিয়া দেওয়া হউক।" আর একজন প্রতিবাদ করিলেন "তাহা হইলে এই পাজী পালাবে।" মন্ত্রীরা এই আসামীকে লইয়া একটা বৎসর নানা রকমে বিব্রত থাকিয়া শেষ প্রহরী তুলিয়া

দেওয়ার প্রস্তাবই ধার্য্য করিলেন। হতভাগা পলাইয়া যায়, যাউক। অনাহারে মারা যাইবে, আমরাও রক্ষা পাইব। রাজা এই প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন। প্রহরীকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইল।

পরদিবস আহারের সময় যখন আসামী দেখিল, তাহার খাদ্যের বন্দোবস্ত নাই, তখন সে প্রহরীর সন্ধান লইল। সে যখন প্রহরীকে খুঁজিয়া পাইলনা তখন নিজেই রাজার পাকশালা হইতে নিজের খাদ্য আনিয়া খাইল। তারপর দরজা বন্ধ করিয়া সারাদিন নির্ব্বিকার চিত্তে কাটাইল। পরদিনও এইভাবেই গেল। তাহার পলাইবার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। মন্ত্রীরাতো শুনিয়া অবাক! তাঁরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন-"আর অপেক্ষা করা যায় না। দুইকে খুলিয়া বলা হউক রাজা তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন। সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাউক"।

তাহাই হইল। একদিন প্রধান বিচারপতি আসামীকে ডাকিয়া কহিলেন—রাজা তোমাকে মুক্তি দিয়াছেন, তুমি যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার। আসামী গম্ভীরভাবে কহিল—আমাকে যাইতে বলিতেছেন, আমি কোথায় যাইব? আমার যাইবার স্থান কোথায়? এখন আমি করিবই বা কি? আপনারা জেলে রাখিয়া আমার চরিত্র নষ্ট করিয়াছেন। এখন কেউ আমার দিকে ফিরিয়া তাকাইবে না। আমার কাজ করিবার ক্ষমতাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমার প্রতি আপনারা বড়ই অন্যায় করিয়াছেন। যখন আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়াছিলেন, তখন আমাকে ফাঁসী দেওয়াই কর্ত্তব্য ছিল। তাহা আপনারা করিলেন না, আমার যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিলেন। এখন আমাকে জেলখানা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিতেছেন, তা আমি পারিব না।

(৪)

মন্ত্রীরা দেখিলেন এতো বড় বিপদ! তখন সকলে স্থির করিলেন—ওকে একটা পেন্‌সন্ দিয়া বিদায় করা হউক, নতুবা এর হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। মন্ত্রীসভার পরামর্শে অপরাধীর জন্য ছয়শত ফ্রাঙ্ক বার্ষিক পেন্‌সন্ নির্দ্ধারিত হইল। আসামী শুনিয়া কহিল—যদি নৃপতিগণ এই পেন্‌সন্ রীতিমত দিতে প্রতিশ্রুত হন, তবে আমি অন্যত্র যাইতে রাজি আছি। মন্ত্রীরা সম্মত হইলেন।

আসামী পেন্‌সনের এক তৃতীয়াংশ অগ্রিম লইয়া মোনেকো রাজ্য পরিত্যাগ করিল। রাজ্যের সীমান্তের এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া সে তথায় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল। এবং যত্নে ও পরিশ্রমে নিজ বাটীতে অতি সুন্দর একটী ফল ফুলের বাগান প্রস্তুত করিল। সেই বাগান ও পেন্‌সনের আয় দিয়া তাহার সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাইতে লাগিল।

সে নির্দ্দিষ্ট দিনে মোনেকো রাজ্যে পেন্‌সন্ আনিতে যায়। পেন্‌সনের অর্থ হইতে সে দুই তিন ফ্রাঙ্ক বাজি রাখিয়া জুয়াখেলে। কোন দিন হারে, কোন দিন জিতে, তারপর বাড়ী ফিরিয়া আইসে। সে এখন সমাজের অপর দশজনের ন্যায় সাধুপথে থাকিয়া পরম শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

যে দেশের শাসন কর্ত্তারা আসমীকে ফাঁসী কিম্বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের জন্য রাজকোষ স্থিত অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না, সে দেশে এই ব্যক্তি অপরাধ করে নাই, ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য। *

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

সমুদ্রতত্ত্ব।

সমুদ্রের সকল প্রদেশেই প্রাণী বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিষুব রেখার নিকটস্থ উষ্ণ প্রদেশের জলে, মেরু প্রদেশের তুষার শীতল জলে, এমন কি সমুদ্রের বরফাবৃত স্থানের নিম্ন প্রদেশের জলে--সর্ব্বত্রই জলজ প্রাণী বর্ত্তমান। ভূমধ্য ও লোহিত সাগরের উষ্ণ ভারি জলে, নরওয়ের নিকটস্থ শীতল পরিষ্কৃত জলে, বিশাল সমুদ্রের গভীর ও অগভীর জলে, কোথাও প্রাণীর অভাব নাই। ফলকথা প্রাণীশূন্য কোন স্থানই আমাদের বিদিত নহে। স্থান বিশেষে সমুদ্রের তাপ ইত্যাদির অবস্থা অনেক বিভিন্ন, সেই জন্য কোথাও অল্প এবং কোথাও অধিক প্রাণী বর্ত্তমান। ভূখণ্ডেও আমরা দেখিতে পাই শ্যামল তৃণ লতা সমন্বিত স্থানে যেরূপ

* টলষ্টয় হইতে অনূদিত।

প্রাণীর আধিক্য মরু প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল।

ভূচর ও খেচরের আবাস জানিতে হইলে যেরূপ ভূগোল জানা দরকার সেইরূপ সামুদ্রিক জীবের অবস্থান জানিতে হইলে সমুদ্র সম্বন্ধে ও একটু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

সমুদ্রকে আমরা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। বৃহৎ সমুদ্র যথা—প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর। ক্ষুদ্র সমুদ্র যথা—ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর প্রভৃতি। যদিও পৃথিবীর ¾ অংশ জলাবৃত তথাপি কোন সামুদ্রিক প্রাণী ইচ্ছা করিলে কৃষ্ণসাগর হইতে জলের মধ্যে দিয়া হাড্‌সন (hudson) উপসাগরে (প্রাকৃতিক কোন অসুবিধা না ঘটিলে) চলিয়া যাইতে পারে।

সমুদ্রের গভীরতা এক এক স্থানে এক একরূপ। উত্তর মহাসাগরের গভীরতা ২৫০ ফেদমের অধিক নহে। কিন্তু প্রশান্ত এবং আটলান্টিক মহাসাগরের সাধারণ গভীরতা ২০০০ হাজার ফেদম। এবং কোন কোন স্থলের গভীরতা ৪৫০০ ফেদম বা ২৪০০০ ফিটের অধিক। আটলান্টিক মহাসাগরে ভার্জ্জিন দ্বীপ পুঞ্জের একটু উত্তরে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের নিকটে ঐরূপ গভীরতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। "পেন্‌গুইন" জাহাজ নিউজিলণ্ডের নিকটে ৫০০০ হাজার ফেদম গভীর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

সমুদ্রের তাপের তারতম্যেও সামুদ্রিক জীবের তারতম্য হইয়া থাকে। এই তাপের প্রধান নিয়ামক সূর্য্য। সামুদ্রিক আগ্নেয়গিরির দ্বারা এই তাপ এত সামান্য পরিবর্ত্তিত হয় যে উহা একরূপ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। কাজেই আমরা দেখিতে পাই যে বিষুবরেখার সন্নিধ-জল অপর স্থান অপেক্ষা অনেক উষ্ণ। কাজেই বিষুবরেখা হইতে যতই উত্তরে ও দক্ষিণে যাওয়া যায় সমুদ্রের জল ততই শীতল। জলের তাপ বিকিরণশক্তি মন্দ বলিয়া সূর্য্যের কিরণে কেবল উপরিভাগের জলই উষ্ণ হইয়া থাকে। বিষুবরেখার নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগের তাপ কখন কখন ৮০ ডিক্রি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ১০০ শত ফেদমনিম্নে তাপের পরিমাণ ৬০ ডিগ্রি এবং ৪০০ শত ফেদম নিম্নের তাপ মাত্র ৪৫° ডিগ্রি কিন্তু ১০০০ ফেদম নিম্নে প্রবেশ করিলে প্রায় বরফের মত শীতল বোধ হইবে।

স্থলভাগে উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে উঠিলে যেরূপ তুষার শীতল স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্রে নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশে প্রবেশ করিলে ঐরূপ শীতলস্থান পাওয়া যায়।

মেরু হইতে বিষুবরেখার দিকে আসিয়া তুষার শীতল স্থান পাইতে হইলে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে উঠিতে হইবে কিন্তু সমুদ্রে-মেরুদেশ হইতে বিষুবরেখার দিকে ঐরূপ শীতলস্থান পাইতে হইলে ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে যাইতে হইবে।

সমুদ্র ও স্থলপথে আর একটু বিভিন্নতা আছে। যদি কোন প্রাণী— যে ৩৫° ডিগ্রি তাপে বাঁচিতে পারে তাহার পক্ষে স্থলপথে একস্থান হইতে অপর স্থানে যাওয়া অসম্ভব। কারণ স্থলপথে বিভিন্ন স্থানের তাপ বিভিন্ন কিন্তু সমুদ্রের ভিতর দিয়া ঐ প্রাণী এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত অনায়াসে যাইতে পারে।

ইহা অনুমিত হইতে পারে যে সমুদ্রের কতিপয় ফেদম তলে তাপের পরিমাণ সর্ব্বত্রই সমান। বস্তুতঃ ব্যাপার তাহা নহে। বড়২ সমুদ্রে অনেকটা এই সিদ্ধান্ত খাটে বটে কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র সমুদ্রের পক্ষে ব্যাপার স্বতন্ত্র। যে স্থলে আটলান্টিক মহাসাগরের তাপ ২৮° ডিক্রি প্রশান্ত মহাসাগরের তত গভীরে তাপ হয়ত ৩৫° ডিগ্রি হইবে। কিন্তু বোর্নিও ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সুলু (Sulu) সাগরে ২০০০ ফেদম নিম্নের তাপ ৪০° ডিগ্রি। লোহিত সাগরের মধ্যদেশ ১২০০ ফেদম গভীর কিন্তু তথায় তাপের পরিমাণ ৭০ ডিগ্রি এবং বাবেলমাণ্ডব প্রণালী যদিও মাত্র ২০০ ফেদম গভীর, তথাকার তাপও লোহিত সাগরের অনুরূপ।

এই তাপের তারতম্যে সমুদ্রজাত প্রাণীর সম্ভবতঃ অনেক বৈষম্য হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্রজাত প্রাণী সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে উহারা যে স্থানে অবস্থান করে তথাকার জলের লবণাদিও একটা বিবেচনার বিষয়। সাধারণতঃ নদী ও হ্রদ অপেক্ষা সমুদ্রের জলে লবণের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। যদি একটী গ্লাসের অর্দ্ধেক সমুদ্রের জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তদোপরি ধীরে ধীরে নদীর জল ঢালিয়া গ্লাসটী পূর্ণ করা যায়, তাহা হইলে সমুদ্রজল ভারী বিধায়

নীচে পড়িয়া থাকিবে এবং নদীর জল উপরে ভাসিতে থাকিবে। সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণও সর্ব্বত্র সমান নহে। যদি আমরা ধরিয়া লই যে কোন স্থির সমুদ্রে একটী নদী প্রবাহিত হইয়া সুস্বাদু জল ঢালিতে থাকে, তাহা হইলে নদীর মোহনার অনেক দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রে মিঠা জল পাওয়া যায়। সেজন্য আমাজন কিম্বা মিসিসিপি নদীর মোহনায় সমুদ্রের কয়েক মাইল পর্য্যন্ত জল মিষ্টি। এই কারণেই অনেক সমুদ্রজলে লবণের তারতম্য হইয়া থাকে। কোন কোন সীমাবদ্ধ সাগর — যেখানে বৃষ্টি কম হয় এবং জল বাষ্পাকারে অধিক উড়িয়া যায় তথায় লবণের পরিমাণ অধিক।

বৃষ্টির জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব		১·০০
কৃষ্ণ সাগরের উপরের জলের	,,	১·০২৫
কেনেরি দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপরের জলের	,,	১·০২৭৫
ভূমধ্য সাগরের উপরের জলের	,,	১·০২৮
লোহিত সাগরের জলের	,,	১·০৩০
কেনেরি দ্বীপপুঞ্জের পাশ্চমে আটলান্টিক মহাসাগরের তলের জলের	,,	১·০২৯

জলের আবর্ত্তণ ও গতিবিধির উপরে তদভ্যন্তর বাসী জলজ প্রাণীর প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সেজন্য এই জলজ প্রাণী সম্বন্ধে জানিতে হইলে জলের আলোড়ন জোয়ার ভাটা সম্বন্ধে একটু জানা দরকার। দিবা রাত্রি চাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার জোয়ারভাটা হয়, ইহা সকলেই বিদিত আছেন। চন্দ্র সূর্য্যই যে এই জোয়ারভাটার কারণ তাহা বলাই বাহুল্য। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে যে জোয়ার ভাটার টান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে তাহাও আমরা জানি। যদি পৃথিবী সমস্তই জলমগ্ন থাকিত তাহা হইলে বিষুবরেখার নিকটে এই জোয়ারের পরিমাণ দ্বিগুণ হইত। বর্ত্তমান অবস্থায় ভূখণ্ডে ধাক্কা লাগিয়া জোয়ারের বেগ কমিয়া যায়। অনেক সময়ে নদীর মুখ দিয়া সমুদ্রের জোয়ারের বেগ প্রবেশ করিয়া বহুদূর গমন করে এবং বহু স্থান প্লাবিত করে; ইহাকেই আমরা নদীতে বান ডাকা বলি।

ফাণ্ডে উপসাগরে এই বানের জল ৭০ ফিটের কম উচ্চ হয় না। তীরদেশে এইরূপ প্রবল বানের জলের আলোড়নে বহু জলজ প্রাণীর মৃত্যু হয় এবং অনেকের আবার বৃদ্ধি পাইবার সুবিধা হয়। ইহাদ্বারা জলজ প্রাণীর স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

এই জোয়ার ভাটাদ্বারা যে স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা ভিন্ন সমুদ্রে আর একপ্রকার স্রোত আছে উহা নিরন্তরগামী বাতাসেরদ্বারা উদ্ভূত হইয়া সর্ব্বদা একদিকে চলিতে থাকে। সমুদ্র জলের গতিবিধি নির্দ্দেশক কোন একখানা মানচিত্র অবলোকন করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে বিষুবরেখার উত্তরে—প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে এক অবিরাম স্রোত চলিয়াছে। সেইরূপ বিষুবরেখার দক্ষিণে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। উহার গতি তৎপ্রদেশস্থ বাণিজ্য বাতাসের অনুকূল। উত্তর আটলান্টিকের গাল্‌ফ্‌ষ্ট্রীম (Gulf stream) ঐরূপ স্রোতের অপর একটী দৃষ্টান্ত।

এই জাতীয় স্রোত কেবল সমুদ্রের উপরি ভাগেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়া বোধ হয় ২০০ ফেদম নিম্ন পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এ সকল ভিন্ন সমুদ্রের গভীরতর প্রদেশে একরূপ ধীরস্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে।

উষ্ণমণ্ডলে সমুদ্রজল সূর্য্যেরদ্বারা উত্তপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই উত্তর ও দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতেছে। উহা শীত মণ্ডলের নিকটে আসিয়া তুষার শীতল ও ভারি হইয়া সমুদ্রের নিম্নদেশে গমন করে এবং ক্রমে তলদেশ দিয়া বিষুবরেখার দিকে চলিয়া আসে। এই স্রোতের গতিবিধি কিরূপ তাহা কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। ইহা সমুদ্রের তলদেশের অবস্থাদ্বারা ও তীর ভূমিদ্বারা সম্ভবতঃ অনেক পরিবর্ত্তিত হয়।

স্থলভাগের নিকটস্থ সমুদ্রের তলদেশ বিচিত্র; কারণ নদী সকল ভূখণ্ড হইতে নানাবিধ বস্তুসহ সমুদ্রে পতিত হয়। অধিকন্তু স্বল্পজলবাসী জীবজন্তুর কঙ্কালাদি তথায় থিতাইয়া পরে। কথিত আছে যে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর মোহানা হইতে প্রায় ১০০০ মাইল দূর পর্য্যন্ত তলদেশে উক্ত দুই নদীর দ্বারা প্রবাহিত কর্দ্দমাদি পাওয়া যায়। নদীদ্বারা নীত ও ভূভাগ বিধৌত কর্দ্দমাদি স্থলভাগের নিকটস্থ সমুদ্রের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত মারে সাহেব ইহাকে কর্দ্দমরেখা বলিয়াছেন। এই সকলস্থলে বিচিত্র সামুদ্রিক প্রাণীর আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কর্দ্দম রেখার মৃত্তিকায় বহুলপরিমাণে নানারূপ জীব কঙ্কাল, কোন কোন স্থলে আগ্নেয়গিরি নিসৃত ধাতবাদি এবং নানারূপ উপল খণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

অন্ধ কবি কোটীশ্বর।

কবি কোটীশ্বর, ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত দীঘজান গ্রামে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রমাকান্ত ও মাতার নাম সারদা ছিল।

কোটীশ্বর জন্মান্ধ ছিলেন না। অতি শৈশবে হাম, রোগে তাঁহার চক্ষুদ্বয় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু, তাঁহার রচিত অনেক গীতের ভণিতায় তিনি তাঁহাকে জন্মান্ধ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ভূমিষ্ট হইবার ২।৪ দিন পর অন্ধ হইলে আর জন্মান্ধের বাকিই বা কত?

যাহা হউক,—তিনি স্বীয় কর্ম্মফলে মাতৃগর্ভ মহান্ধকার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অন্ধতারূপ অমাবস্যার চির অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন;— এক অন্ধকার ছাড়িয়া আর এক অন্ধকারে আসিলেন। জড়জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভার তাহার পক্ষে সারাজীবনের জন্য এক অখণ্ড বিশ্বব্যাপী অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িল।

বাহ্য জগত, অন্ধ কোটীশ্বরের স্থুলদৃষ্টির অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময় অন্তর্জগত তাঁহার দিব্য দৃষ্টির সম্মুখীন হইতে লাগিল। কোটীশ্বর প্রেম ভক্তির পবিত্রালোকে আলোকিত হৃদয় লইয়া, এক অপার্থিব অভিনব সুখের রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। সময় ধীরে ধীরে তাঁহাকে শৈশবাদি কাল ত্রয়ের ভিতর দিয়া যৌবনে পহুঁছাইয়া দিল।

কোটীশ্বর কর্ম্মদোষে অন্ধ হইলেও, ভগবদ্‌কৃপায় শ্রবণশক্তি ও স্মরণশক্তি যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদা হাটুর উপর মাথা গুজিয়া বসিয়া থাকিতেন। নিকটদিয়া কুকুর বিড়াল কি মানুষ অতি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেও তিনি বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে?

দূরে থাকিয়া কেহ কিছু বলিলে, তিনি আপন শ্রবণ শক্তির প্রভাবে আমূল বৃত্তান্ত বুঝিয়া লইতে পারিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি এতই প্রবলাছিল যে, কেহ একটা গান কি প্রস্তাব বলিলে, তিনি একবার মাত্র শুনিয়াই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন।

অনেক যাত্রার পালা, গাজীর গালা, রামমঙ্গলের পালা তাঁহার মুখস্থছিল। পয়ার ত্রিপদীতে লিখিত রামায়ণ মহাভারতের প্রস্তাব ও শ্রাদ্ধের মন্ত্র প্রভৃতি তিনি শুনিয়া শুনিয়াই শিখিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত কোটীশ্বরের ত্রৈকালিক সন্ধ্যা পূজা অপতিতছিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শ্রীহরি নামের ছাপ, কপালে তিলক, গলায় তুলসীর কণ্ঠী, গায় নামাবলী অতি সুন্দর শোভা পাইত। বাস্তবিক কোটীশ্বর একজন ভক্তিমান্ স্বধর্ম্মপরায়ণ সাধুছিলেন।

অন্ধত্বের প্রতিবন্ধকতায় লেখাপড়া শিখিতে না পারিলেও, শুনিয়া শুনিয়া মুখে মুখে ফলা, বানান ও শব্দার্থ প্রভৃতি শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তিনি হাতের ঠাওরে বাঁশের বেতীদিয়া খারা, বিচুনী ও খালই বুনিতে পারিতেন।

গীতবাদ্যে তাঁহার প্রবলানুরাগছিল। তিনি গুণ্ গুণ্ করিয়া প্রায় সর্ব্বদাই হরিগুণ গান করিতেন। ভক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীত পিপাসা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

তিনি মালসী, হরি সংকীর্ত্তন ও বাউল সঙ্গীতাদি গাইয়া অনেক মানুষের প্রাণে অনাবিল আনন্দের জোয়ার আনিতেন। তাঁহার কণ্ঠও অতি মধুর ছিল।

দীঘজান নিবাসী স্বর্গীয় গোলোকনাথ আয়ন মহাশয় অতি শ্রদ্ধা সহকারে কোটীশ্বরের গান শুনিতেন। ২।৪ দিন পর পরই বৈঠক বসিত।

সঙ্গীত চর্চ্চা করিতে করিতে ক্রমশঃ কোটীশ্বর একজন ভাল বাদক বনিয়া উঠিলেন। খোল, খুঞ্জরী, খমক, ঢোলক, তবলা প্রভৃতি তিনি অতি সুন্দর করিয়া বাজাইতে পারিতেন। কে যেন তাঁহার হাত ধরিয়া শিখাইয়া দিয়াছিল। দীঘজানের শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ পাল মহাশয় ও সেকেরগাতির মৃত লোকনাথ বায়েন কোটীর বাদ্য শিক্ষার সহায়তা করিয়াছিলেন। কোটীশ্বর কৃত "তিনলাথ-পীরের পাঁচালী" ও কয়েকটী গীত প্রাগুক্ত লোকনাথ বায়েনের নিকটেই পাইয়াছিলাম।

ইষ্ট সাধনার প্রধান পথ সঙ্গীত বিদ্যায় প্রবিষ্ট কোটীশ্বরের মধ্যে ক্রমশঃ কবিত্ব শক্তির বিকাশ পাইতে লাগিল। তিনি ২।৪টী করিয়া,— হরিসংকীর্ত্তন, মালসী, হোলী, বাউল সঙ্গীত ও ঘাটুগান রচনা করিতে লাগিলেন। গীতগুলিও

অতি রসাল ও ভাবপূর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি বহু গীত রচনা করিয়া পরিশেষে অনতিদীর্ঘ একখানি "তিনলাথপীরের পঁচালী" রচনা করিয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার রচিত কয়েকটী গীত ও "তিনলাথপীরের পাচালী" লিখিত হইল।

(১)

(সুর,—প্রসাদী।)

কালীগো, মরি কালের ভয়ে।
তুইতো মা হয়ে দেখলেনা চেয়ে॥
অভয়ার পুত্র হয়ে,—দিবানিশি মরি ভয়ে।
কখন এসে কাল শমনে আমারে মা নেয় বান্ধিয়ে॥
কপাল মন্দ, আমি অন্ধ, দেখ্‌তে তো পারিনা চেয়ে।
তুইকি আমার মত অন্ধ হয়েছিস অকালে তোর তিন
চোক খেয়ে॥
অমর হৈল বাবা আমার, মাগো মা তোর চরণ পেয়ে।
কোটীর গেল কোটী জন্ম, কেবল পাবার আশা লয়ে॥

(২)

সুর, প্রসাদী।

মাগো, দেখলামনা তোর রূপটী কেমন।
আমি জন্ম, অন্ধ নাই মা নয়ন।
বাহিরে দেখিলে সে রূপ, অন্তরে রূপ হয় মা স্মরণ।
আমার অন্তরে বাহিরে আঁধার, কিরূপে রূপ করি
দরশন।
কারিকরে তোমায় গড়ে, ভক্ত জনের মনের মতন।
তোমায় যে সাজে যে সাজায়, সে সাজ ধারণ কর তখন।
কেউ বলে মা চতুর্ভুজা, দশভুজা বলে কয় জন।
কেহ বলে দ্বিভুজা মা, যার মনে মা জাগ যেমন॥
কেহ বলে কালা কালী, কেহ বলে সাদা বরণ।
কেহ বলে গৌরীরূপে আলো কর কৈলাস ভুবন॥
সাদা কালা কিছু বুঝি না, জন্ম অন্ধ আমি যখন।
আমি ভাবি মনে মনে, মা বুঝি ঠিক আমার মতন॥

(৩)

মন তোমার বেলা গেল, সন্ধ্যা হৈল,
খেলা ছেড়ে চল ঘরে।
দিন গেলে খেলা খেলে, রাত্রি হৈলে
পথ পাবে না অন্ধকারে॥
তুমি তো খেলার ঝোঁকে, পরম সুখে,
মজে আছ একেবারে।
যখনে ভাঙ্‌বে খেলা, পড়্‌বে বেলা,
ডাক্‌লে আর পাবে না কারে।
না চিনে পর কি আপন, রে অবোধ মন,
আপন বল যারে তারে।
কি কর্ত্তে পারে তারা, সুত দারা,
যখন শমন চড়ে ঘাড়ে॥
কোটি কয়, থাক্‌তে সময়, খুলে হৃদয়
ডাক দে রে মন আপনারে।
ডাক্‌লে সে দয়া করি, দুঃখ হরি
নিয়ে যাবে সঙ্গে করে॥

(৪)

মন কেন মায়া ভুলে, সংসার গোলে,
হারাইতেছ আখেরের ধন।
কি নিবে সঙ্গে করে, বল্ আমারে,
যে দিনে তোর হবে নিধন॥
যার জন্যে ভবে আসা, কি দুর্দ্দশা,
তাঁরে তুই কল্লে না স্মরণ।
পাইয়ে পুত্র নারী, টাকা কড়ি,
কল্লে না আর হরি সাধন॥
এই যে তোর সাধের সংস্থার, হবে ছারখার,
চিরদিন রবে না কখন।
ভাব্‌লেনা এই না ভবে, ক'দিন রবে,
এই যে তোমার মানব জীবন।
কেঁদে কয় কোটীশ্বরে, করযোড়ে,
মন কররে হরি সাধন।
পাইবে ভক্তি সুধা ভব ক্ষুধা এক্‌বারে হবে নিবারণ॥

(৫)

হরিহে! আমি কেন আইলাম সংসারে,—
প্রাণের দুঃখ জানাব কারে।
আমি আর কতকাল ডুবে রব হে,—
এমন অন্ধকার সাগরে॥
আমার মানব জীবন, হৈল অকারণ গো,
প্রভু না কল্লাম ভজন,—

আমি চক্ষু হীন, অতি দীন হে!—একবার
দেখিলাম না তোমারে॥
আমার চর্ম্ম চক্ষু নাই, আমার জ্ঞান চক্ষু নাই গো
তোমায় কিগো দেখতে পাই।
কেবল কর্ম্মদোষে জন্ম লয়ে হে,—
ভবে ঘুর্‌তেছি বারে বারে॥
দেও যত ইচ্ছা দুঃখ,—তাতে ভাবিনা অসুখ
হে দয়াল দুঃখে আমার সুখ,
আমার যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল,—
তুমি দিয়াছ সুবিচারে॥

(৬)

ঘাটুগান। শ্রীমতীর উক্তি।

বিরহ আগুনে আরে সখি, দিবা নিশি দহে মেরা মন।
(দিবা নিশি দহে মেরা মন—আরে সখি।)
পিউ রৈল পরবাসে, জিউ যায় মোর হা হুতাশে,
ধিক ধিক হামারি জীবন॥
(ধিক ধিক হামারি জীবন—আরে সখি।)
হাম নারী অভাগিনী হারায়ে আঁখির মণি,
আন্ধা হয়ে রয়েছি এখন।
(আন্ধা হয়ে রয়েছি এখন— আরে সখি)

(৭)

হোলীগান।

কি আনন্দ হৈল আজু মধুর মিলনে।
শ্যামের বামে রাই দাঁড়াইল নিকুঞ্জ বনে॥
কালবরণ নীলমণি, সোণার বরণ কমলিনী,
মেঘে যেমন সৌদামিনী শোভে গগণে॥
রতন আসন মাঝে, কিশোর কিশোরী সাজে,
সাজায়েছে ফুলের সাজে সঙ্গিনীগণে॥
যত সব সহচরী আতর গোলাব ভরি,
মারিতেছে পিচকারী, আনন্দ মনে॥
আবির কুমকুম গায়, চুয়া চন্দন দিতেছে পায়,
কোটী বলে কি শোভা হায়,—শ্রীবৃন্দাবনে॥

কবি কোটীশ্বরের গীত এই পর্য্যন্তই লেখা হইল। আরো লিখিতে গেলে অনেক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ যে সকল গীত সংগ্রহ করা হইয়াছে,—তাহার অধিকাংশই অঙ্গ হীন।

কোটীশ্বরকৃত হোলী গানটীতে রূপের বর্ণনা—সোণার বরণ, কালো বরণ, মেঘে যেমন সৌদামিনী, ইত্যাদি বর্ণ বোধ জন্মান্ধ ব্যক্তির কি প্রকারে জন্মিল ভাবিয়া অন্ধের অভিজ্ঞতার ধন্যবাদ দিতে হয়।

তিনলাখ পীরের পাঁচালী।

বন্দনা।

কায় মন চিত্তে বন্দুম শ্রীগুরুচরণ।
গুরু কৃপা হৈতে হয় বাসনা পূরণ॥
গুরু তুমি কল্প তরু জগতের সার।
কৃপা করি কর গুরু ভব নদী পার॥
আমি অন্ধ মন্দ ভাগ্য দেখিনা নয়নে।
ফুটেনা তোমার স্তুতি আমার বয়ানে॥
তিনলাখ পীরের গীত মহিমা গাইতে।
বড়ই বাসনা মোর হৈয়াছে মনেতে॥
তুমি যদি দয়া করি গাও সেই গান।
তবে সে গাইতে পারে এ অন্ধ অজ্ঞান॥
কর্ম্ম দোষে জন্ম অন্ধ আমি অপরাধী।
কৃপা কর গুরু মোরে তুমি কৃপানিধি॥
কেবল তোমার মাত্র চরণ ভরসা।
পূর্ণ কর দয়াময় অন্ধের আশা॥
সরেস্বতী মাত বন্দুম বিদ্যা অধিকারী।
তুমি কৃপা না করিলে কি বর্ণিতে পারি॥
তুমি যারে দয়া কর সেই হয় ধন্য।
ছোট বড় সকলে তাঁহারে করে মান্য॥
আমি মূর্খ চক্ষু হীন দীন দুরাচার।
কেবল করিছি মাগো ভরসা তোমার॥
জিহ্বা অগ্রে বসি কর কৃপা বিতরণ।
তিনলাখ পীরের করি পাঁচালী বর্ণন॥
শিব দুর্গা বন্দুম আর দেব নারায়ণ।
লক্ষ্মী সরেস্বতী তান ভার্য্যা দুইজন॥
কার্ত্তিক গণেশ বন্দুম চন্দ্র সূর্য্য-তারা।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বন্দুম হরি ভক্ত যাঁরা॥
কোটী কোটী প্রণাম করিয়া কহে কোটী।
অন্তকালে দিও গুরু শ্রীচরণ দুটী॥
তিনলাখ পীরের পদে মন কল্লাম স্থির।
তিনলাখপীর ২ দোহাই তিনলাখ পীর॥

(আবাহন।)

আইস ঠাকুর তিনলাথপীর ত্রিলোকের নাথ।
তোমার আসন দিলাম আমার মাথাত॥
আইস ঠাকুর তিনলাথ পীর বৈস আমার খাটে।
তোমার সেবক ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর ত্রিলোকের পতি।
তোমার চরণে মোর অসংখ্য প্রণতি॥

(ফলশ্রুতি।)

শুন শুন ভাই সব তিনলাথ পীরের কথা।
অপূর্ব্ব কাহিনী সেই মধুর বারতা॥
শুনিলে পাতক নাশে বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
ধন-পুত্র বাড়ে যায় রোগ পীড়ার ভয়॥
যে যাহা বাঞ্ছা করে পূর্ণ হয় তাই।
তিনলাথ পীরের গুণ আমি কিবা গাই॥
তিনলাথ পীরের সিন্নি যার ঘরে হয়।
আপদ বিপদ তার কিছু নাহি রয়॥
ঠাকুরের মহিমার কি দিব উপমা।
বেদাগম পুরাণেতে নাহি যার সীমা॥
তিনলাথ পীরের পদে লোটাইয়া শির।
আনন্দে বলহ সবে তিনলাথ পীর২
দোহাই তিনলাথ পীর॥

(কথারম্ভ।)

এক গৃহস্থ ছিল বড়ই সুজন।
ঘরে তার মাতা পত্নী পুত্র একজন॥
এক ঘরে চারিজন বেশী কেহ নাই।
মনোদুঃখে গিরস্থ থাকে সর্ব্বদাই॥
তার পুত্র তারে নাহি বাবা, বলি ডাকে।
ঠাকুরাইন, তার পত্নী না ডাকে তার মাকে॥
এই দুঃখে গিরস্থের দুঃখ সর্ব্বক্ষণ।
সর্ব্বদা কন্দল ঘরে দারিদ্রের কারণ॥
কার সঙ্গে কার নাই প্রণয়ের লেশ।
পরস্পর চারিজনে সর্ব্বদা বিদ্বেষ॥
একদিন সেই গিরস্থ বাজারেতে যায়।
পথে বৃক্ষতলে বসি করে হায় হায়॥
বৃক্ষে থাকি একজন ডাকদিয়া কয়।
কোন স্থানে যাও তুমি কহত নিশ্চয়॥
সে বলেবাজারে যাই ফিরিব এখনি।
আপনি কে বৃক্ষ ডালে সত্য কহ শুনি॥
গাছে থাকি বলে তবে সেই মহাশয়।
যাবার সময় দিব আমার পরিচয়॥
আমার ফরমাইস্ এক তোমার নিকটে।
আমার সদায় আনিবা যদি যাও হাটে॥
তিন পয়সার বস্তু তুমি কিনিয়া আনিবা।
যাইবার কালে মোরে ডাক দিয়া দিবা॥
এক পয়সার পান গুবারি এক পয়সার তেল।
এক পয়সার সিদ্ধি হৈলে সিদ্ধি হৈয়া গেল॥

এত বলি তিন পয়সা গিরস্থকে দিল।
গিরস্থ লইয়া পয়সা বাজারে চলিল।
কিছু দূর গিয়া পুন ফিরি আসি কয়।
কেমনে আনিব তেল কহ মহাশয়॥
তেলের বাসুন এক দেহ মোর ঠাই।
না হৈলে কেমনে তেল আনি কহ চাই॥
সেই বেক্তি গাছে থাকি কয় বুঝাইয়া।
আনিবা আমার তেল কাপড়ে বান্ধিয়া॥
শুনিয়া গিরস্থ তবে ভাবে মনে মনে।
কাপড়ে বান্ধিয়া তেল আনিব কেমনে॥
একি অসম্ভব কথা বলেন আপনি।
কাপড়ে তেল থাকে কভু নাহি শুনি॥
গাছে থাকি সেই ব্যক্তি বলে পুনর্ব্বার।
তেল পড়িয়া গেলে কি দোষ তোমার॥
তবে সে গিরস্থ শীঘ্র বাজারেতে গেল।
নিজের সদায় আগে সকল কিনিল॥
তারপর পান গুয়া সিদ্ধি কিনিয়া।
তেলীর দোকানে গেল তেলের লাগিয়া॥
তেলী বলে তেলের বাসুন দেও চাই।
গিরস্থ বলিল ভাই তাত কিছু নাই॥
কাপড়ের কোণে তেল লইব বান্ধিয়া।
এত বলি দাঁড়াইল কাপড় পাতিয়া॥
পয়সা লৈয়া তেলী তেল কাপড়েতে দিল।
এক বিন্দু তেল নাহি চোয়াইয়া পড়িল॥

দেখিয়াত তেলী বেটা অবাক্ হইল।
গিরস্থও মনে মনে ভাবিতে লাগিল॥
এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিনা কখন।
গাছে থাকি পয়সা দিল কোন্ মহাজন॥
এইমত ভাবি গিরস্থ বাড়ীতে চলিল।
পথে সেই বৃক্ষ তলে আসি দাঁড়াইল॥
ডাক দিয়া বলে কোথা আছেন আপনি।
আনিয়াছি আপনার বস্ত্র কয় খানি॥
গাছে থাকি হাত পাতি সদায় লইল।
তখন গিরস্থ তাঁরে কহিতে লাগিল॥
কে বট আপনি দেও সত্য পরিচয়।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিম্বা আর কিছু হও॥
কোন গুণে কাপড়েতে তেল বান্ধা রৈল।
অসম্ভব দেখি মোর মনে সন্দে হৈল॥
সেই ব্যক্তি বলে শুন শুন আরে ভাই।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু তোমাকে জানাই॥
তিনলাথপীর ঠাকুর হন সত্য নারায়ণ।
তাঁহার সেবক আমি, অতি অভাজন॥
ঠাকুরের সেবা আমি করি সর্ব্বদায়।
কাপড়েতে তেল থাকে তাঁহান কৃপায়॥
ঠাকুরের সেবা দিতে তিন পয়সা লাগে।
পান গুবারি সিদ্ধি তেল ভাগে ভাগে॥
তাঁহান সেবার লাগি আনিছি সদায়।
সত্য কথা ওরে ভাই কহিলাম তোমায়॥
শুনিয়া গিরস্থ বলে কহ মহাশয়।
করিলে তাঁহান সেবা কোন সিদ্ধি হয়॥
গাছে থাকি সেই ব্যক্তি বলে ওরে ভাই।
ইহান মহিমা কিছু বলি তোর ঠাই॥
এই তিনলাথপীরের সেবা করে যেই জন।
অনায়াসে হয় তার বাসনা পূরণ॥
যে যাহা বাঞ্ছা করে তাহা পূর্ণ হয়।
সর্ব্বসিদ্ধি দাতা এই ঠাকুর মহাশয়॥
ভক্তিভরে ঠাকুরের পূজা যেই করে।
চিরকাল লক্ষ্মী বান্ধা থাকে তার ঘরে॥
এতেক শুনিয়া তবে গিরস্থ সুজন।
মানসিক করে অতি ভক্তি যুক্ত মন॥
যদি মোর পুত্র মোরে বাবা বলি ডাকে।
ঠাকুরাইন আমার স্ত্রী ডাকে আমার মাকে॥
কিছু মাত্র কন্দল না থাকে মোর ঘরে।
দরিদ্রতা দোষ আমার কিছু যায় দূরে॥
তবে আমি পূজিব এই ঠাকুর তিনলাথপীর।
তিনলাথ পীরের পদে লোটাইব শির॥
মানসিক ক'র গিরস্থ বাড়ীর দিকে যায়।
প্রণাম করিয়া সেই গাছের তলায়॥
বাড়ী হৈতে কিছু দূরে গিরস্থ যখন।
পুত্র তার মাকে কয় সহাস্য বদন॥
চাইয়া দেখ মাগো ঐ বাবা আসিতেছে।
বাবা বাবা বলি তবে দৌড়িয়া ছুটিছে॥
বাবা বলি বালক যখন নিকটেতে গেল।
মুখে চুমা দিয়া তারে কোলেতে তুলিল॥
অসম্ভব ভাবি গিরস্থ মনেতে চিন্তিল।
তিন লাথের কেরামত তখনই বুঝিল॥
ভাবিল গাছেতে যেই মহাজন ছিল।
বাজারে যাইতে যেই তিন পয়সা দিল॥
তিন লাথের দাস বলি করিল প্রকাশ।
এই তিনলাথপীর জানিলাম নির্য্যাস॥
গিরস্থের স্ত্রী বলে শাশুড়ীর কাছে।
শুনছেন গো ঠাকুরাইন আবু কি বলিছে॥
শুনিয়া ঠাকুরাইন শব্দ পুত্র বধূর মুখে।
আহ্লাদে আটখানা বুড়ী বলিছে কৌতুকে॥
তুমি ত মা কোন দিন কও না এমন।
শুনিয়া ঠাকুরাইন শব্দ জুড়াইল মন॥
গিরস্থ আসিল ঘরে পুত্র কোলে লৈয়া।
তিনলাথ পীরের গুণ মহিমা ভাবিয়া॥
পরদিন গিরস্থ সকালে উঠিল।
তিন পয়সার সেবার বস্তু কিনিয়া আনিল॥
সন্ধ্যাকালে কয় জন করি নিমন্ত্রণ।
ভক্তিভাবে করিল সেবার আয়োজন॥
তিনলাথ পীরের আসন করিয়া স্থাপন।
সভা করি বসিলেক ভক্ত কত জন॥

হেন কালে পাষণ্ড এক আসি উপস্থিত।
কিসেতে কি হয় নাহি বুঝে হিতাহিত॥
দেখিয়া ঠাকুর সেবার এত আয়োজন।
জিজ্ঞাসিলএখানে কি কর কয়জন?
সভায় একজন বলে শুন ওরে ভাই॥
তিনলাথ পীরের সেবা করিব এথাই॥
এই ঠাকুর পুজিলে সে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
অন্তকালে নাহি থাকে যমদূতের ভয়॥
শুনিয়া পাষণ্ড বেটা হাসিয়া কহিল।
কলিতে নূতন ঠাকুর কোথা হৈতে আইল॥
সুবুদ্ধি আছিল তার কুবুদ্ধি লাগিল।
ঠাকুরের নিন্দা তবে অনেক করিল॥
যত সব গাঞ্জা খোর একত্র হইয়া।
গাঞ্জা খাইবে আজ সেবার কথা কৈয়া॥
ধুমধাম করিবারে সৃজিল উপায়।
কে বলে ঠাকুর সেবা হইবে গাঞ্জায়॥
তিনলাথ পীর বেদ বিধি কিছুতেই নাই।
গাঞ্জা খোরে বলে ত্রিনাথ গোষাঁঞি॥
গাঞ্জা দিয়া সিন্নি দেয় সেই গাঞ্জা খায়।
দেবতার নাম করি মানুষ ভুলায়॥
এই মত নানা নিন্দা করি তার পরে।
সেই পাষণ্ড বেটা চলি গেল ঘরে॥
ঘরে গিয়া দেখে তার বিপদ হৈছে ভারি।
মুখে রক্ত উঠি তার পুত্র গেছে মরি॥
গোয়াইলে মরিয়া আছে পালের পরধান গাই।
সন্ধুকের টাকা পয়সা কিছু মাত্র নাই॥
তখনে বুঝিল ইহা ঠাকুরের কাণ্ড।
ঠাকুর নিন্দায় এই হইয়াছে দণ্ড॥
ভয় পাইয়া সেই বেটা তার স্ত্রীকে লইয়া।
গলায় কাপড় বান্ধি ভূমিতে পড়িয়া॥
তিনলাথপীরের সেবা মানসিক করে।
দৌড়িয়া গেল সেই গিরস্থের ঘরে॥
কান্দিয়া কহিল সেই গিরস্থের পাশ।
ঠাকুরের নিন্দাতে মোর হৈল সর্ব্বনাশ॥
মুখে রক্ত উঠি মোর পুত্র গেছে মরি।
সন্ধুকেতে কিছু নাই যত টাকা কড়ি॥
গোয়াইলে মরিয়া আছে পাল বাছা গাই।
কি উপায় করি এখন কহ শুনি ভাই॥
গিরস্থ বলিল শুন সত্য কথা বলি।
ত্রৈলকা নাথের কিছু লইয়া যাও কলী॥ *
সেই কলী মাখ নিয়া মড়া পুতের গায়।
নিশ্চয় বাঁচিবে তাতে কিছু চিন্তা নাই॥
মানসিক কর এই ঠাকুরের সেবা।
ক্ষেমা চাও নিন্দা আদি করিয়াছ যেবা॥
তবে সেই বেটা কিছু কলী লৈয়া গেল।
মড়া পুত্র মড়া গাইয়ের সর্ব্বাঙ্গেতে দিল॥
ঠাকুরের কৃপা ফল তখনে ফলিল।
মড়া পুত্র মড়া গাই বাঁচিয়া উঠিল॥
সন্ধুকে আসিল তার যত ছিল ধন।
দেখিয়াত হৈল তার আনন্দিত মন॥
পর দিন সেবার বস্তু সংগ্রহ করিয়া।
তিনলাথের সেবা করে তিন পয়সা দিয়া॥
সেই হৈতে ঠাকুরের মহিমা জানিয়া।
মাসে মাসে সেবা করে ভক্তি যুক্ত হৈয়া॥
দেশে দেশে এই কথা হইল প্রচার।
ঠাকুর তিনলাথ পীর পূর্ণ অবতার॥
হিন্দু মুসলমান তার ভেদ কিছু নাই।
ঠাকুর তিনলাথ পীর সকলের গোষাই॥
তান পূজা ঘরে ঘরে সকলেই করে।
কেরামত জারী হৈল সকল সংসারে॥
তিনলাথ পীরের কথা হৈল সমাপন।
আনন্দেতে হরি হরি বল সর্ব্বজন॥
তিনলাথ পীরের পদে লোটাইয়া শির।
সবে বল—তিনলাথ পীর-তিনলাথ পীর—
দোহাই তিনলাথ পীর॥

শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য।

---

*"কলী" গাঁজা পোড়া ভস্ম। শব্দটি আভিধানিক নহে, গ্রাম্য।

জীবনচরিত।

মহাপুরুষ—জাতির প্রধান সম্পদ। তাঁহাদের ভিতর দিয়াই, সাহায্যেই—লোকসমাজে জাতির মহিমা প্রচারিত হয়—জাতি পরিচিত হয়। কার্লাইলের মতে, ইঁহাদের জীবন ইতিহাসই প্রকৃত প্রস্তাবে জাতির ইতিহাস। ইঁহারা যে ভাব দিয়া যান, সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী লোকসমূহ তাহাই আয়ত্ব করিয়া ও ফুটাইয়া তুলিয়া, জাতিকে উন্নতির দিকে লইয়া যায়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের সমর প্রাঙ্গনে শৌর্য্যবীর্য্য, বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার আধার শ্রীকৃষ্ণ যে গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, আজিও তাহা ভারতবাসীর জীবন মরণের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে; মোহম্মদের আবির্ভাব ও শিক্ষার ফলে অর্দ্ধসভ্য বেদুইন দস্যুগণ ধর্ম্মোন্মত্ত শক্তিসম্পন্ন পুরুষসিংহে পরিণত হইয়া এক হস্তে কোরাণ অন্য হস্তে কৃপাণ লইয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিজয়পতাকা অর্দ্ধ জগতে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল; ভল্‌টায়ার ও রুসো যে সাম্যবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অধুনা এই ভয়াবহ রণনির্ঘোষের ভিতর দিয়াও ইয়ুরোপের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইতেছে এবং প্রেমাবতার শাক্যমুনি যে ন্যায়, জ্ঞান ও প্রেমের ধর্ম্ম ভারতে বিলাইয়া গিয়াছিলেন, তাহার মহিমা এক্ষণেও জগতের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছে। এই সকল মহাপুরুষকে বর্জ্জন করিলে, মানবজীবনের ইতিহাস নিতান্তই অসার ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। ইঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই মানব জীবন যাপন লোভনীয়; নচেৎ মনুষ্য ও পশুতে বিশেষ পার্থক্য থাকিত না।

সকল সমাজেই এ সকল লোকের জীবনী জনসাধারণের পাঠ্য ও মহা আদরের সামগ্রী। ভারতবর্ষে পূর্ব্বাপরই জাতীয় জীবনের ধারা ধর্ম্মরূপ সাগরমুখে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। দেশ বা জাতির জন্য আমরা অন্য কোনও দিক হইতে চিন্তা করাকে শ্রেয় মনে করি নাই। ভারতবাসী চিরকালই আত্মচিন্তায় এবং ধর্ম্মের ভাবে বিভোর। সেই প্রথম বেদের কাল হইতে উপনিষদ ও বেদান্তের ভিতর দিয়া, জাতীয় জীবন কাহিনী একই সুরে ধ্বনিত হইতেছে। তাই, ভারতে ধর্ম্মোপদেষ্টা, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মসংস্কারকগণ পূর্ব্বাপর লোকের কাছে যে প্রকার ভক্তি অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, এমন কুত্রাপি কেহ পায় নাই। ইহারাই আমাদের আদর্শ মহাপুরুষ। ইহাদের জীবনের অনুসরণ করিয়াই পূর্ব্বাপর জাতীয় জীবন গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ববিজয়ী এলেক্‌জেণ্ডার, রণনিপুণ সিজার বা অসীম পরাক্রমশালী নেপোলিয়ান—যাঁহারা শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নররক্তে বসুন্ধরার বক্ষ রঞ্জিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ইয়ুরোপে আদর্শ পুরুষরূপে বিবেচিত হইয়াছেন কিন্তু তাহাদের সমশ্রেণীর লোক ভারতে নরকলঙ্করূপে লোকের হৃদয়ের ঘৃণা উৎপাদন করিয়াছে মাত্র। আমাদের আদর্শ পুরুষ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, বিষয়বাসনা-বর্জ্জিত, ধ্যানী যোগী—যাহার চক্ষে আত্মপর ভেদ নাই, যিনি জাতিনির্ব্বিশেষে সকলের ভিতর সমানভাবে প্রেমবারি বিলাইয়া দিতে সমুৎসুক। আমাদের আদর্শপুরুষ বিষয়-বিরাগী সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ রাজকুমার সিদ্ধার্থ, সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য এবং ধর্ম্মবীর রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ।

এই সকল মহাপুরুষের জীবনকাহিনী জাতির মহা আদরের সামগ্রী। সাহিত্য, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ ইত্যাদি অন্যক্ষেত্রেও যাহারা জাতীয় জীবনের উপর ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের জীবন ইতিহাসের সহিত সম্যকরূপে পরিচিত হওয়াও নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জীবনচরিতের দিকে দৃষ্টি করিলে প্রথমই মনে হয়, যে ইহার ভিতর যত মিথ্যা স্থান পাইয়াছে, এমন সাহিত্যের আর কোনও অংশেই নয়। ইতিহাসেও সত্য-মিথ্যা ঘটনার সমাবেশ। সে ক্ষেত্রে স্বজাতি ও স্বধর্ম্মপ্রীতি অনেককেই শত্রুর গুণ বর্ণনায় বিমুখ ও নিজদের মাহাত্ম্য বর্ণনায় উদ্বোধিত করে। তাই, বিজেতা কর্ত্তৃক বিজিতের ইতিহাস অনেক সময়ই বিজিতের কলঙ্ককাহিনীতে পূর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঈদৃশ স্বকপোলকল্পিত ইতিহাসের বিষময় ফলে, বিজিতের পক্ষে মনুষ্যত্বের সোপানে পুনঃ আরোহণ অনেক সময়ই কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। কারণ, যে জাতি কোন কারণে একবার আত্মমর্য্যাদা ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়াছে, তাহার ভবিষ্যৎ নিতান্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন। মেকলের বিদ্বেষবিজৃম্ভিত ইতিহাস-নামধেয় উপন্যাসাবলী পাঠে

বাঙ্গালী এতদিন আপনাদিগকে অপদার্থ, ভীরু, শঠ ও কাপুরুষ বিবেচনা করিয়া আসিতেছিল; তাহার বিষময় ফল যে এখনও সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হইয়াছে—বলা যায় না। যে জাতি এক সময়ে সুদূর সিংহলে যাইয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, যাহার বিজয়কাহিনী জাভা ইত্যাদি স্থান এখনও বহন করিতেছে এবং যাহার শৌর্য্য বীর্য্যের মহিমা এক সময় পূর্ব্ব ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই পরাক্রমশালী, উদ্যমশীল জাতিকে কাপুরুষ ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়া তাহার ভবিষ্যতের ললাটে কি কালিমার চিহ্নই না আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দুদিগের বিজয়ের ইতিহাস ও ঈদৃশ মনঃকল্পিত আখ্যায়িকাসমূহে পরিপূর্ণ। ঐতিহাসিকগণের গবেষণার ফলে এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে যে সামান্য সতর জন মুসলমান সৈন্য কর্তৃক বঙ্গবিজয়, মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বিবৃত এ কাহিনী নিতান্তই গল্প বিশেষ। বস্তুতঃ, ঈদৃশ কাল্পনিক ইতিহাস বিজেতার হস্তে বিজিতকে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার একটী মহা অস্ত্র বিশেষ এবং পূর্ব্বাপর সর্ব্বদেশেই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে।

শুধু বৈদেশিকগণ কর্তৃক লিখিত ইতিহাসের দোষোদ্ঘাটনের প্রয়োজন কি? হিন্দুগণই কি ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন? তাহারাও কি একই পন্থা অনুসরণ করেন নাই? যাহাদের জাতীয় ইতিহাসে সত্যবাক্য কথনকেই মানব চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের রচিত ইতিহাসে মিথ্যার সমাবেশ কখনই সঙ্গত নহে। অতি পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ যখন ভারতে আসিয়া, অনার্য্যগণকে কতক সংহার ও কতক তাড়িত করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন, তখন অনার্য্যেরা আর্য্যদিগের লেখনীতে 'রাক্ষস' অথবা 'দৈত্য' রূপ নরপশু ভাবে বর্ণিত হইয়াছিল। তারপর, এই যে তিন সহস্রেরও অধিক বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণ অন্যান্য বর্ণান্তর্গত লোক সমূহের মনের উপর ব্রাহ্মণমহিমা বিস্তার করিয়া আসিতেছে, তাহাও কি স্বকপোলকল্পিত আখ্যায়িকা সমূহের প্রভাবে নয়? রামায়ণ, মহাভারত ও অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে পূর্ব্বাপর ব্রাহ্মণকে একপ্রকার ভগবানের সমান অধিকারী, সমান ক্ষমতাশালীরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। কথায় কথায় সে লোককে ভস্মীভূত করিতেছে, কথায় কথায় পুনঃ প্রাণ দান করিতেছে, এক গণ্ডুষে সাত সমুদ্রের জল পান করিতেছে—যুগযুগান্তর ধরিয়া কর্ণকুহরে এসকল বাক্যের প্রবেশ হেতু ও সর্ব্বপ্রকার দৈনিক আচার ব্যবহারে ব্রাহ্মণের আধিপত্যের দরুণ ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ যে অন্য বর্ণের ন্যায় সমক্ষমতাপন্ন সমানস্বভাবসম্পন্ন সাধারণ মানব তাহা এক্ষণেও অনেকে মনে করিতে সাহস করেনা। শাস্ত্রবর্ণিত ব্রাহ্মণদের ক্ষমতার তুলনায় বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণকে নিতান্ত হীন দেখিয়া, অনেকে এখনও মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে পূর্ব্বের তপোবল নাই বলিয়াই ব্রাহ্মণ পূর্ব্বের ন্যায় স্বীয় ক্ষমতার নিদর্শন দিয়া উঠিতে পারিতেছেনা। যে তপোবল ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা ও পরাশর প্রভৃতি চরিত্রের মুনিগণের আয়ত্ব ছিল, বর্ত্তমান যুগের এত সাধু সন্ন্যাসীর ভিতর কি একজনেরও তাহা আয়ত্ব হইল না? অন্ধ বিশ্বাসীদিগের মনের উপর যুগযুগান্তর ধরিয়া এত সব কুসংস্কারের পাল পড়িয়া রহিয়াছে যে তাহা হইতে মুক্ত হইতে তাহাদের না জানি কত বৎসরের প্রয়োজন হইবে।

জাতীয় জীবনের ঘটনাবলীকে যথাযথ বিবৃত করা ইতিহাসের একটী প্রধান কার্য্য। যেখানে ইহা সংসাধিত না হয়, এবং ইতিহাস মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে, সেখানেই ইহার গৌরব ম্লান হয়। জীবন চরিত ইতিহাসেরই অঙ্গবিশেষ। সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের জীবনের কাহিনী ও ঘটনাবলী ইতিহাসের প্রধান অংশরূপে বিবেচিত। মূল ইতিহাস ক্ষেত্রে যেমন মিথ্যার প্রবেশ লাভ দৃষ্ট হওয়া যায়, জীবনচরিত ক্ষেত্রেও তদ্রূপ বা তদপেক্ষাও বেশী।

কথিত আছে, জনৈক চিত্রকর ক্রমওয়েলের ছবি তুলিতে গিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি যেমন তেমন মূর্ত্তিই তুলিও, আমাকে তদপেক্ষা সুশ্রী দেখাইবার দরকার নাই, কারণ তাহা হইলেতো আর আমার মূর্ত্তি হইল না। বীরশ্রেষ্ঠ ক্রমওয়েলেরই উপযুক্ত কথা। চরিতাখ্যায়িকা লেখকগণের মনে ঈদৃশ কথা প্রায়ই স্থান পায় না। তাহাদের হস্তে যে মূর্ত্তি গড়িয়া উঠে, তাহার সঙ্গে সত্যিকার মানুষটীর সঙ্গে প্রায়ই

আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হয়। অনেক সময়ই জীবন চরিত লেখক যাহার জীবনী লেখেন—তাহার ভক্ত বিশেষ। তাই, আরাধ্য পুরুষের দোষ তিনি দেখিয়াও দেখেন না এবং জানিলেও পাশ কাটাইয়া যান; তাহা না হইলে যে তাঁহার আদর্শ পুরুষ লোকচক্ষে খাটো হইয়া পড়ে। অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে অনেক সময়ই নিতান্ত সাধারণ লোকও দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং অনেক ভণ্ড প্রবঞ্চকও ভগবানের প্রতি দেয় ভক্তি অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেক সময়ই বর্ণিত চরিত্রের লোক সমূহ যে সাধারণ মানুষ ছিলেন তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়।

অধিক দিনের কথা নয়, শ্রীচৈতন্য আমাদের এই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন কাহিনীর সঙ্গেই বা কত সব অত্যাশ্চার্য্য কাহিনী জড়িত হইয়া আছে। তাঁহার আখ্যায়িকা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে তিনি শেষ অবস্থায়, ধর্ম্মোন্মাদ এবং অনেকটা জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। একপ্রকার অজ্ঞান অবস্থায় তিনি কৃষ্ণকেলীভ্রমে সমুদ্রের জলে নিজকে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণ হারান। ভক্তগণের পক্ষে তাঁহার ঈদৃশ ভয়াবহ মৃত্যু পছন্দ হয় নাই। তাই, কেহ প্রকাশ করিলেন, যে তিনি দারুময় জগন্নাথ-বিগ্রহে বিলীন হইয়া যান; কেহ বলেন তিনি গদাধর প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ-বিগ্রহে লয়প্রাপ্ত হন এবং অন্য কেহ বলেন, তিনি অজ্ঞাতে পলাইয়া গিয়া আউলে মহাপ্রভুরূপে কাঁচরাপাড়ায় প্রকাশ পাইয়াছিলেন। কেন এসকল বৃথা প্রয়াস? শ্রীচৈতন্য যে বাঙ্গলার একজন অতি প্রধান মহাপুরুষ ছিলেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা, ভগবানে ভক্তি, জীবে দয়া ও প্রেম, এবং অদম্য উৎসাহ বলে যে তিনি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে নূতন ভাবের বন্যা আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা কে না জানে? কিন্তু, তজ্জন্য তিনি যে আমাদেরই প্রকৃতিবিশিষ্ট মানব ছিলেন, তাহাই বা ভুলিব যাইব কেন? তাঁহার ভিতর যদি উন্মাদ রোগের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে তবে সে কথা গোপন করার কি প্রয়োজন? জগতের আরও কত প্রতিভা সম্পন্ন লোকও ঈদৃশ পীড়াগ্রস্ত হইয়া অবশেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। বিখ্যাত জার্ম্মেণ দার্শনিক নিটৃজে—বর্ত্তমান যুগের সমস্ত জার্ম্মেণগণই যাহার শিষ্যবিশেষ—যে উন্মাদগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা বোধ হয় অনেকের অবিদিত নয়? বরং, এই সকল সত্য ঘটনার সহিত পরিচিত হইলে—আমরা সাধারণ লোক এ শিক্ষালাভ করিতে পারি যে ভগবানের প্রতি ভক্তিরও একটা সীমা আছে এবং শুধু তাহার চর্চ্চা করিতে যাইয়া দেহপুষ্টির দিকে দৃষ্টিহারা হইলে, অবশেষে অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। কোনও ভক্তের নিমন্ত্রণ অবহেলা করিতে অক্ষম হইয়া বুদ্ধদেব শূকর মাংস ভক্ষণ করেন ও তদ্দরুণ বৃদ্ধ বয়সে আমাশয় রোগে প্রাণত্যাগ করেন। অনেক ভক্তের চক্ষে, প্রভুর এ ভাবে মৃত্যু বড়ই লজ্জাকর বিবেচিত হইয়াছে। তাই, এই "শূকর মাংসের" নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার নানা সময় চেষ্টা হইয়াছে। এই ভাবে সর্ব্বত্রই সত্যকে মিথ্যার চাপে ঢাকিয়া রাখিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করায়, জাতীয় জীবন ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ঠিক সত্য যাহা, তাহার সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইবার যেন সাহস কাহারও নাই এবং লোকে নানাবিধ অবতারবাদের ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছে। যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি শুধু ভগবানেরই প্রাপ্য ছিল, সমস্বভাবসম্পন্ন মনুষ্যসমূহকে তাহা দান করিয়া মানব স্বীয় শক্তির অপব্যয় করিয়াছে ও তাহাতে অবিশ্বাসী হইয়া আছে।

বর্ত্তমান কালেও আমাদের দেশে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জীবনচরিত পাঠে অনেক সময়ই তাঁহাদের জীবনের সঠিক ইতিহাস জানা যায় না। মোট কথা সত্যকে গোপন করিয়া চলাই যেন চরিতাখ্যায়কের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। খাঁটী লোকটী কি, তাহাই কলমের মুখে ফুটিয়া উঠিবে ইহাই তাহার আদর্শ হওয়া উচিত। মিথ্যা কল্পিত চরিত্র লইয়া কি করিব? তাহার জন্যতো উপন্যাসের উর্ব্বরক্ষেত্রই পড়িয়া আছে।

কথিত আছে রাজা রামমোহন উৎকোচ গ্রহণ করিয়া অর্থশালী হইয়া ছিলেন এবং ইহাও ঘোষিত হইয়াছে যে তাঁহার নৈতিক চরিত্র বর্ত্তমান কালের মানদণ্ডে দোষ বিবর্জ্জিত ছিল না। তাঁহার জীবনী লেখক এসব বিষয় গোপন করিয়া যাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। গোপনের এমন

কি প্রয়োজন ছিল? যে সময় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় এ সকল তেমন দোষরূপে বিবেচিত হইত না। হইলেও, কালে যে তিনি এ সবের প্রভাব হইতে নির্মুক্ত হইয়া নূতন বিমল ভাব সমূহ প্রচার ও নানাভাবে সমাজ সংস্কার করিয়া দেশের মহামঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার হৃদয়ের মাহাত্ম্য ও শক্তিরই পরিচয় দিতেছে। এমন প্রতিভাবান ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগে ভারতে আবির্ভূত হয় নাই। কিন্তু তিনি আমাদের ন্যায় সাধারণ মানুষই ছিলেন। তাই তাঁহার চরিত্রেও কলঙ্ক দৃষ্ট হইয়া থাকে। তজ্জন্য দুঃখ করিব, কিন্তু তাহা ঢাকিবার চেষ্টা করিব কেন?

কেশবচন্দ্র প্রশ্নোত্তরপত্র নকল করার জন্য পরীক্ষাগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এ অতি সামান্য কথা; কিন্তু তাঁহার চরিতাখ্যায়কগণ এ কথাটী প্রকাশ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইলে যে তাঁহার গৌরবের লাঘব হয়। তাহা হইলে যে তিনি বিষয়বিশেষে সামান্য মানব হইতেও নিকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তিনি নিজে ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাস করাইয়া, আবার নিজ কন্যাকেই তাহার স্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধে যখন চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের পূর্ব্বেই বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই শুধু স্বার্থপ্রণোদিত অতীব গর্হিত কার্য্যকে "ভগবানের আদেশ" পালনরূপে ব্যাখ্যা করিবার জন্যই বা জীবনী লেখকগণ কতই বিফল প্রয়াস করিয়াছেন! কেশবচন্দ্র সাম্যবাদের প্রবর্ত্তক, জাতিভেদের বিরুদ্ধবাদী, অসবর্ণ বিবাহের উদ্বোধন কর্ত্তা; কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রচারক, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা; তাঁহার মত হৃদয়মাহাত্ম্যে ও অলৌকিক প্রতিভায় কে এমন গরীয়ান্? সেই কেশবচন্দ্র যখন এই বিবাহ উপলক্ষে সামান্য স্বার্থের তাড়নায় জীবনের অত্যুচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার যে পতন হইল, তাহা শুধু তাঁহার পতন নয়, সমস্ত বঙ্গবাসী ও ভারতবাসীর মহা লজ্জার ও ক্ষোভের বিষয়। তজ্জন্য দুঃখ করিতেছি, কিন্তু সত্যকে গোপন করিয়া ভগবানের আদেশ ইত্যাদি বড় বড় কথা আনিয়া প্রহেলিকার জাল সৃষ্টি করিব কেন?

আজিকার দিনে আত্মজীবনী লিখিবার প্রথা আমাদের সাহিত্যেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ সব আত্ম-চরিত অনেক সময়ই আত্মপ্রশংসার তালিকা বিশেষ। এই সকল গ্রন্থ পড়িলে প্রায়ই মনে হয়, যেন রচয়িতা কোনও কুকার্য্যই এ জন্মে করেন নাই, এবং বাল্যকাল হইতেই তাহার জীবন কি এক মহা উদ্দেশ্যের দিকেই ভগবান কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আসিতেছিল। যাহারা সঠিক সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন এসকল গ্রন্থের অনেক বিষয়ই মিথ্যার সমষ্টি বিশেষ। বহু বৎসর পূর্ব্বে দার্শনিক নিট্জে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, যে ঠিক আত্মজীবনী এ পর্য্যন্ত কেহই লেখেন নাই। একমাত্র কবি বাইরণ একখানা লিখিয়াছিলেন; তাহাও কাটিয়া ছাটিয়া ভদ্রসমাজের উপযুক্ত করিতে যাইয়া তাঁহার বন্ধু কবি মুর তাহার দফারফা করিয়াছেন।

বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনী বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মধুসূদনের জীবনচরিত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী কবিবর নবীনচন্দ্র লিখিত "আমার জীবন"। সত্যের যে সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্যদানের একটি শক্তি আছে, উভয় গ্রন্থ পাঠেই তাহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যোগেন্দ্রনাথের হস্তে দোষেগুণে মধুসূদনের চরিত্র এমনি ফুটিয়া উঠিয়াছে যে মনে হয়, তিনি আমাদেরই নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। এমন ব্যক্তি যখন নিজ দোষে হাঁসপাতালে অসহায় অবস্থায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন—তখনকার সে দৃশ্যের বিষয় মনে পড়িয়া কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয় না জীবনী লেখকের সঙ্গে কাঁদিয়া কাটিয়া আকুল হইয়াছে। তাও মনে হয়, মধুসূদনের গুণের তুলনায় চরিত্র-দোষ তেমন যথাযথ ভাবে বর্ণিত হয় নাই। কবিবর নবীনচন্দ্রের "আমার জীবন" যখন খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয় তখন তাঁহার ভক্ত পাঠকগণ মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ে ভয় হইয়াছিল, যে তাহা পাঠে লোকে তাঁহার প্রতি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবে এবং ইহার ফলে পরোক্ষভাবে তাঁহার কবি যশ ক্ষুন্ন হইবে। কিন্তু এক্ষণে সে ভয় দূর হইয়াছে। এক্ষণে অনেকেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে এই আত্মজীবনীর সাহায্যে তাঁহার যশ আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত হওয়ার সুবিধা

হইয়াছে। ভাবে, ভাষায়, বর্ণনায়—এগ্রন্থ অপূর্ব্ব। বিশেষতঃ, বঙ্গভাষায় বলিতে গেলে ইহাই একমাত্র জীবনীগ্রন্থ যাহা পাঠে রচয়িতা ঠিক কেমন লোকটী ছিলেন এবং কি প্রকার পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর ভিতর ও সাহায্যে তাঁহার কবি-প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার সহিত আমরা সম্যক পরিচিত হইতে সক্ষম হই। গ্রন্থকার অবশ্য অনেক স্থলেই নিজে বাহাদুরী নিয়াছেন এবং নিজকে অত্যুজ্জলরূপে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু নিজকে 'সাধু' রূপে বর্ণনা করিবার প্রয়াস কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। রাজনারায়ণ বসুর স্বরচিত জীবনীও অনেকটা এই কারণেই বেশ সুপাঠ্য।

অনেকের মতে মৃত ব্যক্তির দোষ বর্ণনায় কোনও লাভ নাই; তাই, তাহাকে যথাসম্ভব ঢাকিয়া তাহার গুণ বর্ণনা করাই উচিত। দোষ ও বুঝিনা, গুণ ও বুঝিনা—খাঁটী লোকটী কেমন ছিল, তাহাই লোক সমাজকে জানিতে দেওয়াই জীবনচরিত লেখকের প্রধান কর্ত্তব্য। কাল্পনিক চরিত্র লইয়া কি করিব? মিথ্যা দেবতা সৃষ্টি করিয়া কি লাভ? জীবনচরিতের ভিতর মিথ্যার অত্যধিক সমাবেশ হেতু, কেহ আর তাহাদের বর্ণিত ঘটনাবলীতে তেমন বিশ্বাস স্থাপন করে না। বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগে পূর্ব্বের ন্যায় আজগুবি গল্পে পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকৃত সুধীবৃন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা তেমন সহজ ব্যাপার নয়। সে দিন বঙ্কিমচন্দ্রের একখানা ক্ষুদ্র জীবনী পাঠ করিতেছিলাম। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার জন্ম গ্রহণের সময় আকাশে শঙ্খধ্বনি হইতেছিল। বোধ হয় দেবতারাই এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই প্রকার যাহার তাহার জন্মগ্রহণ উপলক্ষেই যদি স্বর্গে শঙ্খ বা দুন্দুভি বাজিতে থাকে এবং দেবতাগণ অস্থির হইয়া পড়েন, তাহা হইলে যে আমাদের জন্ম ও অস্তিত্বের প্রতি আমাদের নিতান্তই ঘৃণার উদ্রেক আসিয়া পড়ে এবং আমাদের দ্বারাও যে সংসারে কোন কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে, সে বিষয় যে আমরা নিতান্তই আস্থাহীন হইয়া পড়ি। বৃথায় নেক্কারজনক ঘটনাবলী লোক সমাজে উদ্ঘাটন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, কিন্তু লোকটীকে প্রকৃতভাবে বুঝিবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহার বর্ণনায়ও যেন আমরা কুণ্ঠিত না হই। প্রকৃত সাধু বা স্বদেশ সেবক যিনি, তিনি যেন আমাদের ভক্তি অর্ঘ্য পান; পক্ষান্তরে ধূর্ত্ত, কপট ও ভণ্ড চিরকালের জন্য ঘৃণিত হইয়া থাকুক। প্রকৃত মহাপুরুষ যিনি, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর সহিত সম্যকরূপে পরিচিত হইয়া তাঁহার প্রভাবে যাহাতে জাতীর চরিত্র ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়—ইহাই বাঞ্ছনীয়। জীবন চরিত ক্ষেত্রে—মিথ্যা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত।

নিশীথে।

(১)

বিজন বাস, নিঝুম রাত্তি আঁধার দিয়ে ঢাকা;
এমন সময় এক্‌লাটি আর যায় না ঘরে থাকা!
তুমি—ওগো—তুমি আমার—চিরদিনের তুমি!
ওগো আমার প্রেমের জন্মভূমি!
তাইতো এখন তোমায় মনে জাগে!
দুঃখ সুখের দোসর এস গভীর অনুরাগে!
তুমি ছাড়া বন্ধু আমার আরতো কেহ নাই!
বিজন হৃদি সজন কর, বেদন ভুলে যাই!

(২)

তোমার স্মৃতি মনে যখন যায়গো চাপা পড়ে,
তখনি তো একটুকুতেই চোখটি আসে ভরে'!
ওগো—তুমি—আমার তুমি—চিরদিনের তুমি!
ওগো আমার প্রেমের জন্মভূমি!
যখন তুমি মনটি থাক জুরে,
দুখটি তখন চুপটি করে যায় গো যোজন দূরে!
পুলক তখন উছ্‌লে পড়ে, জীবন তখন খাসা!
ধন্য স্নেহ, ধন্য প্রেম, ধন্য ভালবাসা।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সুষমা—সঙ্গীত গ্রন্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী কাব্যবিনোদ প্রণীত, ময়মনসিংহ সুহৃদ যন্ত্রে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"আরতি"র শঙ্খঘণ্টা নীরব হইয়াছে সত্য; কিন্তু উহার সাহিত্য-সাধনা নিষ্ফল হয় নাই। অধুনা ময়মনসিংহের যে সকল সাহিত্য-সাধক পূজার অর্ঘ হস্তে বঙ্গ-বাণীর মণি-মন্দিরে উপস্থিত হইতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই যে দীক্ষাগুরু "আরতি" তাহা ময়মনসিংহের পূর্ব্বতন অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অকুণ্ঠিত-চিত্তে স্বীকার করিবেন। "সুষমার" গ্রন্থকারও সেই শিষ্যবৃন্দেরই অন্যতম।

গ্রন্থ প্রকাশে পণ্ডিত রজনীকান্তের এই প্রথম প্রয়াস। সেই জন্যই নবীন গ্রন্থকার স্বকীয় শক্তিসামর্থ্যের প্রতি সন্দিহান হইয়া, ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে প্রথমেই বাগ্দেবী সকাশে নিবেদন করিতেছেন,—"মমকণ্ঠে বিরাজিত হও: গো আনন্দে"। তাঁহার এ কাতর প্রার্থনা বাণীর শ্রীচরণকমলে পঁহুছিয়াছে। বস্তুতঃই "সুষমা"র অনেকগুলি সঙ্গীত আমাদের ভাল লাগিয়াছে। 'আকাঙ্ক্ষা', 'জীবনসন্ধ্যা', 'মহিমা', 'নিবেদন', 'মাহাত্ম', 'রাকাসন্ধ্যা' প্রভৃতি কয়েকটী সঙ্গীত গ্রন্থননৈপুণ্যে এবং ভাবমাধুর্য্যে বড়ই উপদেয় হইয়াছে। গানে, প্রাণের গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে অসঙ্কোচ চিত্তে বলিতে পারি, রজনী বাবুর চিত্তরাজ্যে ভগবৎ প্রেমের বিমলালোক প্রবেশ করিয়াছে।

তরুণ গ্রন্থকার হৃদয়ের নিভৃতকক্ষে সর্ব্বদাই এক করুণ স্মৃতি পোষণ করিতেছেন, তাই তাঁহার পরমার্থ চিন্তা এবং রঙ্গরসিকতার মাঝখানেও এক একটা প্রতপ্ত প্রশ্বাসে অরুন্তুদ বেদনা প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। পত্নীবিয়োগ বিধুর সরল গ্রন্থকার এই দারুণ বেদনা সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে নিজেই বলিয়া ফেলিয়াছেন—

"সে বামা-প্রমদা মম হৃদি রাণী ভুলিতে কি পারি তাহারে।"

তাঁহার এ করুণ সঙ্গীতগুলিও মর্ম্মস্পর্শী।

এই গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কতকগুলি সঙ্গীত আছে, সেগুলি কেবল রসিক-রসিকার চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হইতে পারে। আমরা বর্ত্তমান যুগের স্থায়ী সাহিত্যে এরূপ আদি রসাত্মক কবিতা অথবা সঙ্গীতের পক্ষপাতী নহি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, প্রাচীন ভাব ও রুচির প্রভাব হইতে আজও বাঙ্গালা দেশ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে নাই।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র রায়।

সাহিত্য-সংবাদ।

ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের নূতন উপন্যাস 'অনুপমা' বাহির হইয়াছে। আট আনা সংস্করণে উক্ত গ্রন্থকারের 'তোড়া' ও 'তপস্যা' সত্বর বাহির হইবে। তাঁহার 'সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অনেক দিন হইল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এবার তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে বাহির হইবার আয়োজন হইয়াছে।

'প্রহেলিকা' প্রণেতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের 'জীবন' নামক আর একখানি নূতন উপন্যাস যন্ত্রস্থ। পূজার পূর্ব্বেই বাহির হইবে।

শ্রীমৎ স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী প্রণীত তত্ত্বানুশীলন গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। যিনি যাহা দিবেন তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা পরিষদ সম্পাদক নিকট পাঠাইতে হইবে।

নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত 'আশিস্' বাহির হইয়াছে। ইহা আশুতোষ লাইব্রেরীর আট আনা সংস্করণ ভুক্ত।

ময়মনসিংহ, লিলিপ্রেসে—শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

২৫এ জুন আমারা পর্ত্তসা নগর অতিক্রম করিয়া গেলাম। বেলা তখন ২টা বলিয়া আমরা তখন গতিরোধ করা আবশ্যক মনে করিলাম না। এই স্থানে নৌকা সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ করি। প্রত্যেক নৌকায় আটখানি দাঁড় ও তিনখানি পাল ছিল। যে দিন হাওয়ার সুবিধা থাকিত— পাল তুলিয়া দেওয়া হইত। তাহা না হইলে ছয়জন লোক গুণ টানিত। সন্ধ্যার পর অমরা নঙ্গর ফেলিতাম। যেখানে নদীর ধারে জঙ্গল থাকিত সেখানে নদীর মাঝখানে নঙ্গর, করা হইত।

সেদিনও আমরা জঙ্গলাকীর্ণ এক স্থানে সন্ধ্যার পর নঙ্গর ফেলিলাম। আহারাদির পর আমরা ছাদে বসিয়া ধূম পান করিতেছি, এমন সময় অদূরে এক অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাইলাম। বোধ হইল যেন অনেকগুলা জানোয়ার সাঁতার দিতে২ আমাদের দিকে আসিতেছে। প্রথমে আমরা ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ৫।৭ মিনিট পরে যখন আমরা বুঝিতে পারিলাম তখন ভয়ে আমাদের মুখ শুখাইয়া গেল। দেখিলাম, একদল হাতী সাঁতার কাটিতে২ আমাদের নৌকার দিকে আসিতেছে। দলে বোধ হয় ৫০।৬০ টা হাতী ছিল। কাপ্তেন সাহেব আদেশ দিলেন— কেহ কোনও প্রকার শব্দ না করে, এবং হস্তীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কোনও প্রকার অস্ত্রাদি নিক্ষেপ না করে।

অনতিবিলম্বে উহারা আমাদের নিকট আসিল এবং নৌকা ঘিরিয়া ফেলিল। নৌকার সমস্ত আলো নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং আমরা সকলে তাহাদের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছিলাম। উহারা বোধ হয় বজরা দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিল। অনেকে শুঁড় বাড়াইয়া বজরা স্পর্শ করিতে লাগিল, এবং কেহ কেহ শুঁড়ে জল ভরিয়া নৌকার উপর ফেলিতে লাগিল। যেন বজরার সহিত খেলা করিতেছে। ভাগ্যক্রমে তাহারা আমাদের উপর কোনও প্রকার অত্যাচার করিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে, উহারা আস্তে২ চলিয়া গেল। আমরাও হাফ ছাড়িলাম।

ইহার তিন দিন পরে আমরা সুদনে প্রবেশ করিলাম। ৩০এ জুন আমরা নদীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত মুয়া সহরে উপস্থিত হইগাম। বেলা তখন প্রায় ১০টা। আহারাদির জন্য আমরা ঐ স্থানে নঙ্গর ফেলিলাম। আহারাদি করিতেছি এমন সময় একজন সাহেব আমাদের বজরায় উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম তাঁহার নাম হ সাহেব। ইহার করুণ কাহিনী শুনিয়া আমরা কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কাহিনীটি এই :—

"আমি প্রথমে সস্ত্রীক খার্ত্তুম সহরে চাকরী করিতাম। সংসারে আমার স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্র ভিন্ন আর কেহই ছিল না। একদিন শুনিলাম, দক্ষিণ সুদনে অনেক জমি পড়িয়া আছে, খুব সস্তায় পাওয়া যায়। তখন আমার হাতে কিছু অর্থ জমিয়াছিল। উহার প্রায় সকল ব্যয় করিয়া ৬০×৩৫ একর জমি সংগ্রহ করিলাম। তাহার পর একদিন অশুভ মুহূর্ত্তে সপরিবার খার্ত্তুম ত্যাগ করিলাম।

যথা সময়ে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। আমার জমি এই থান হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। কয়েকদিন অগ্রে আসিয়া আমি ঐ স্থানে একটি ছোট কুটীর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলাম। কয়েকজন কুলির সাহায্যে দ্রব্যাদি লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। কুলিরা আমাদের দ্রব্যাদি পঁহুছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমি ছেলে মেয়েকে ও স্ত্রীকে কুটীরের মধ্যে বসাইয়া আগুনের জন্য কাষ্ঠের সন্ধানে গেলাম। এই কাজে আধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে নাই। আমার হাতে একটা হাত লণ্ঠন ছিল; যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন রাত্রি হইয়াছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার পরিপূর্ণ।

যখন আমি কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলাম তখন ভিতরে কোনও প্রকার শব্দ না শুনিতে পাওয়ায়, আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। সকলেই কি ঘুমাইয়া পড়িল? ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার সর্ব্বাঙ্গে এমন এক ব্যাপার উপস্থিত হইল, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার ন্যায় অবস্থায় যে পড়িয়াছে সে ভিন্ন তাহা আর কেহই বুঝিতে পারিবে না। দেখিলাম

ঘরের চারিদিকে ২৫।৩০ টা ভীষণ কাল সাপ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা মেজের উপর পড়িয়া আছে। সাপগুলা তাহাদের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছে। বোধ হয় দুই তিন মুহূর্তকাল আমি পাথরের মূর্ত্তির মত নীরব নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর হঠাৎ একশতটা দানব যেন আমার মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি লণ্ঠনটা একদিকে রাখিয়া দুইটা বড়২ কাঠ উঠাইয়া লইলাম, এবং এক লম্ফে তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর ১০।১৫ মিনিট কাল কিযে করিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে নাই। যখন চৈতন্য হইল, দেখিলাম ২৭ টা মৃত সর্প পড়িয়া রহিয়াছে।

সেই রাত্রেই কবর খুড়িয়া, যাহারা এই জগতে আমার সকলের অপেক্ষা প্রিয় ছিল, যাহাদের সুখ শান্তির জন্য এক মিনিট কোনও দিন আলস্যে অপব্যয় করি নাই, তাহাদিগকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত সেই ঘোর জঙ্গলের এক স্থানে পুতিয়া ফেলিলাম। যখন সমস্ত শেষ হইয়া গেল, আমি তাহাদের কবরের পাশে বসিয়া ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিলাম যে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, সাপের বংশ নির্ব্বংশ করা ছাড়া আর কোনও কাজ করিব না। সে আজ সাত বৎসরের কথা। তাহার পর দিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত সেই সপথ বর্ণে২ পালন করিয়া আসিতেছি। এখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুরা পর্য্যন্ত আমায় চিনিয়া নিয়াছে। আমাকে দেখিলে তাহারা সরিয়া যায়।"

সাহেবের চেহারা দেখিয়া বাস্তবিকই ভয় হয়। আজ সাত বৎসর কাল তাঁহার দাড়ি, গোঁফ, চুল ও নখের সহিত নাপিতের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। বড়২ জটা পাকান চুল এবং গোঁফ, দাড়িতে মস্তক ও বুক পরিপূর্ণ। এক একটা নখ ৪।৫ ইঞ্চি করিয়া লম্বা। পোষাক পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন। পায়ের সহিত জুতার অনেক দিন হইতে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। চক্ষুদ্বয় ঘোর রক্তবর্ণ। কাপ্তেন সাহেব তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, সঙ্গে লইয়া গিয়া চাকরী করিয়া দিতে পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন। কিন্তু হ সাহেব শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, এ স্থান ছাড়িতে পারিব না। আমার জীবনের শান্তি তাহাদের সঙ্গে২ লোপ পাইয়াছে। আমার সর্ব্বদা মনে হয় তাহারা আমার কাছেই রহিয়াছে। এ স্থান ছাড়িয়া গেলে তাহাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইব।" সাহেব বসিয়াছিলেন, সহসা দণ্ডায়মান হইলেন, এবং জঙ্গলের দিকে দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই আসিতেছি বলিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম, আসিয়া আর কাহাকেও দেখিলাম না। ওগো! আর তাহাদের পাইলাম না। মরিবার সময় না জানি আমায় কতবার তারা ডাকিয়াছে! কিন্তু কই, আমিত আসিতে পারিলাম না!" সাহেব নক্ষত্রবেগে চলিয়া গেলেন। নৌকা ঠিক তীরের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। তিনি এক লম্ফে কিনারার উপর পরিলেন এবং দেখিতে দেখিতে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

মঙ্গল।

পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী গ্রহ বুধ (Mercury) ও শুক্রের (Venus) আবর্ত্তনের পথ ও সময় পৃথিবী হইতে অনেক কম। পৃথিবীর বহিস্থ গ্রহগণের প্রথম গ্রহ মঙ্গল (Mars)। কাজেই ইহার আবর্ত্তন পথ ও সময় পৃথিবী হইতে অনেক অধিক। ইহার লোহিত বর্ণ হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার নাম মার্স বা যুদ্ধ দেবতা রাখিয়াছেন। কিন্তু আর্য্যগণ ইহার নাম কেন মঙ্গল রাখিলেন তাহা বলা যায় না।

ইহার গাত্রে অদ্ভুত চিহ্ন দেখিয়া কোন কোন পণ্ডিত মনে করিয়াছিলেন যে মঙ্গলবাসিগণ বিচক্ষণ বুদ্ধিশালী এবং মঙ্গলে জল কষ্ট নিবারণ জন্য তাঁহারা তথায় নানারূপ খাল কাটিয়া জলের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই অনুমান কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না।

চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে যত দূরে অবস্থিত মঙ্গল তাহা হইতে শতগুণের অধিক দূরে। চন্দ্রকে আমরা খালি চক্ষে যেরূপ দেখিতে পাই, প্রবল দূরবীক্ষণ যোগেও মঙ্গলকে আমরা সেরূপ দেখি না।

মঙ্গল পৃথিবী হইতেও একটী ক্ষুদ্র গ্রহ। ইহার ব্যাস মাত্র ৪৮০০ মাইল। উপরিভাগের পরিমাণ ফল পৃথিবীর একচতুর্থাংশের কিঞ্চিৎ অধিক। ইহার আয়তন পৃথিবীর

সৌরভ

ষষ্ঠ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, ভাদ্র ১৩২৫। | একাদশ সংখ্যা

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চ সাহেবের (পূর্ব্বোক্ত সাহেব) নিকট আমরা দুইদিন ছিলাম। প্রথম দিন আমার উপর যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পাঠক জানেন, চ সাহেব কতকগুলি উটপক্ষী রাখিয়াছেন। বুঝিয়া কাজ চালাইতে পারিলে ইহাতে বিশেষ লাভ হয়। উটপাখীর বুকের নরম পালক অত্যন্ত উচ্চ দরে বিক্রয় হয়। ইহার ডিম এখানকার লোকে বিশেষ আগ্রহের সহিত খায়। সাধারণতঃ এক একটা ডিম বারটা হইতে পনরটা হাঁসের ডিমের সমান হয়। আফ্রিকার লোকে এই ডিম সংগ্রহ করিবার জন্য জঙ্গলা ও মরুভূমির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা ডিমের একদিকে একটা বড় ছিদ্র করে, তাহার পর উহাকে আগুনের উপর রাখিয়া একটা কাঠি দিয়া ভিতরটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেয়। ৫।৭ মিনিটের পর ভিতরট. বেশ সুসিদ্ধ হইয়া যায়। তখন ইহা সুখাদ্য।

অপরাহ্ন তিনটার সময় আমি একা উটপক্ষী দেখিবার জন্য গমন করিলাম। একদিকে প্রায় ৩০০×২০০ গজ জমি ঘিরিয়া উহাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার মধ্যে ৬টা পক্ষী রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সময় ২টা পক্ষীণী ডিম দিয়াছিল। আমি তাহা জানিতাম না। উহাদিগকে তা দিতে দেখিয়া আমি ব্যাপারটা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য উহাদের নিকটবর্ত্তী হইলাম। একটা পক্ষীণী সরিয়া গেল, কিন্তু দ্বিতীয়টা সবেগে আমার দিকে আসিতে লাগিল। আমি শুনিয়াছিলাম যে, রাগিলে ইহারা বড় ভীষণ হয়। তখন সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই আক্রমণ করে। ইহাদের ঠোঁটে এত জোর যে, উহার আঘাতে ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তুর শরীর হইতে নাড়ী ভুড়ি প্রভৃতি বাহির হইয়া আসে। আর ইহারা এত জোরে দৌড়ায় যে, এক হইতে দেড় মিনিটের মধ্যে এক মাইল অতিক্রম করিয়া যায়। এদেশের অনেকে এই পাখীর উপর চড়িয়া গমনাগমন করে।

এইসব কথা আমার জানা ছিল বলিয়া আমি পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলাম না। কিন্তু আত্মরক্ষা করি কি প্রকারে? হাতে একটী ক্ষুদ্র ছড়ি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। বিপদের সময় প্রায়ই মানুষের বুদ্ধি বড় শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য করে। আমারও তাহাই হইল। পাখীটা আমার সম্মুখে আসিবামাত্র আমি এক লম্ফে তাহার সুদীর্ঘ গলাটা দুই হাতে প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিলাম। একটা পাখীর দেহে যে এত বল থাকিতে পারে তাহা আমার ধারণাই ছিল না। প্রথমে সে আমাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিল। যখন বুঝিল তাহা অসম্ভব, তখন যুগপৎ লাথি ছুড়িতে ও কামড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু যে জন্যই হউক তাহাতে সফলকাম হইল না। ইতি মধ্যে চ সাহেবের কয়েকজন সোমালি চাকর উপস্থিত হওয়াতে আমি রক্ষা পাইলাম। শুনিলাম দুই মাস পূর্ব্বে এই পাখীটাই একজন কাফ্রিকে মারিয়া ফেলিয়াছে।

১৪ই জুন আমরা সোল্লাক প্রদেশের কোদোক নগরে উপস্থিত হইলাম। ইহা নদীর বাম তীরে অবস্থিত। মেনেক ছাড়িবার পর আমরা এত বড় সহর আর দেখিতে পাই নাই। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২৫০০০ হাজারের কম হইবে না। কয়েকজন য়ুরোপীয় এখানে ব্যবসায় উপলক্ষে বাস করেন। আমরা বিশ্রাম করিবার উদ্দেশে এই সহরের ট সাহেবের অতিথি হইয়া দেড় দিন বাস করিয়াছিলাম। সাহেব এখানে প্রায় ছয় বৎসর যাবত রহিয়াছেন। সাহেবের স্ত্রী পুত্রাদি সঙ্গেই রহিয়াছে। ভাবে বোধ হইল সাহেব বেশ দুই পয়সার সংস্থান করিয়াছেন। চ সাহেবের মত ইনিও প্রথমে বিশেষ কষ্ট পাইয়া স্বদেশ ত্যাগ করেন। ছয় বৎসরের মধ্যে বিশেষ উন্নতি করিয়াছেন।

ইনি এদেশীয় চাকরদের বিষয়ে বড়ই অসন্তোষ ভাব প্রকাশ করিলেন। উনি বলিলেন যে, এ দেশীয় লোকেরা প্রায়ই মিথ্যাবাদী ও চোর হয়। ২।৪ শত চাকরের মধ্যে কদাচিত দুই একজন ভাল হইয়া থাকে। সার্টিফিকেট সম্বন্ধে ইহাদের অদ্ভুত ধারণা। চুরি করিবার জন্য হয়ত তুমি চাকরকে তাড়াইয়া দিলে। পরদিন সে বেশ ভদ্র ভাবে তোমার কাছে আসিয়া প্রশংসা পত্রের দাবি করিবে।

রাত্রে আসিয়া সকলে আহার করিতেছি এমন সময় ট সাহেবের এক চাকর দ্রুতপদে ঐস্থানে আসিয়া একবারে টেবিলের তলায় চলিয়া গেল। আমাদিগকে বিস্মিত হইতে দেখিয়া ট সাহেব বলিলেন, "সে এই সময় আমার জুতা বদলাইয়া দেয়।" ভাল চাকরের এদেশে এত অভাব যে, ভাল চাকর পাইবার জন্য সাহেবদের মধ্যে রীতিমত কলহ, এমন কি হাতাহাতি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। একজন ভাল চাকরের মাসিক বেতন ২০ হইতে ৩০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার উপর তাহার আহার ও কাপড় চোপড় আছে।

এইসব দেশে গম ও চাল ভারতবর্ষ অপেক্ষা সস্তা বলিয়া মনে হইল। ঘৃত এদেশের লোকে ব্যবহার করেনা। খাঁটি সরিষার তৈল কোথাও পাওয়া যায় না। তিল ও চিনেবাদাম মিলাইয়া একরকম তেল প্রস্তুত হয়। এখানকার সকলেই তাহা ব্যবহার করে। তরকারীর মধ্যে আলু, সিম, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। পটল কাহাকে বলে, তাহা কেহ জানেনা। পান, সুপারির চলন একেবারেই নাই। মৎস্য (অবশ্য নদীর তীর ও নিকটবর্ত্তী স্থানে) নানা জাতীয় ও খুব সস্তা। এখানকার লোক চতুষ্পদ ও দ্বিপদ জন্তুর মধ্যে কাহাকেও বাদ দেয় না, এমন কি সাপ, কুমীর, জলহস্তীও ইহাদের কাছে অতি উপাদেয় খাদ্য। হস্তী এসব স্থানে যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং ইহারা নানাপ্রকার উপায়ে উহাদিগকে হত্যা করে। একটা হাতী মারিলে গ্রামে মহোৎসব উপস্থিত হয়।

এদেশের লোক বড় অদ্ভুত উপায়ে বন্য মহিষ শীকার করিয়া থাকে। ৪০।৫০ জন লোক ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হয়। প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া বরছা থাকে। সকলেই জানেন মহিষেরা সর্ব্বদা দলবদ্ধ ভাবে জঙ্গলে বাস করে। এক এক দলে ৫০।৬০ হইতে ৫০০। ৭০০ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শিকারীরা সন্ধান করিয়া করিয়া মহিষের দলের কাছে উপস্থিত হয়। প্রথমে বিশেষ সন্তর্পণের সহিত অগ্রসর হইয়া দলকে ঘিরিয়া ফেলে। তাহার পর খুব উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। তখন মহিষেরা ভয় পাইয়া চারিদিকে পলাইতে আরম্ভ করে। ঐ সময় শিকারীরা বরছাদ্বারা উহাদিগকে আক্রমণ করে। এই কাজে ইহারা এমন নিপুন যে, প্রায়ই এক আঘাতে মহিষের ভবলীলা সাঙ্গ করে। যদি কোনও জন্তু কাহাকেও আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তবে অপর একজন শিকারী পশ্চাদ্দিক হইতে উহাকে আহত বা নিহত করে। এক এক সময় ইহারা এই কাজে এতদূর উৎসাহিত হইয়া পড়ে যে নিজের ঘোড়া হইতে মহিষের পিঠের উপর লাফাইয়া পড়ে এবং কোমর হইতে ছোরা বাহির করিয়া এক আঘাতেই উহার মস্তক দেহ হইতে পৃথক করিয়া দেয়।

এইরূপে একদিনের শিকারে অনেক মহিষ মারা পড়ে। মহিষের মাংস গ্রামবাসীদিগের মধ্যে তুল্য ভাবে বিভক্ত হয়। গৃহস্থেরা সমস্ত মাংস শুখাইয়া বা আগুণে ঝলসাইয়া লয়। এই মাংস অনেকদিন পর্য্যন্ত ঠিক থাকে, নষ্ট হয় না। হস্তীর মাংসও ইহারা এই ভাবে রক্ষা করিয়া থাকে।

ছায়া চিত্রের দ্বারা ইরস্ Eros নামক একটী উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী উপগ্রহ দলের একটী কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহার কক্ষটী একটু বিচিত্র। ইহা কিছু সময় মঙ্গলের বহির্দেশে এবং কিছু সময় মঙ্গল ও পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়া চলিয়া যায়। ইহা পৃথিবীর কক্ষের এক কোটী চল্লিশ লক্ষ মাইল নিকট আসিয়া থাকে। ইহার ব্যাস মাত্র ২৫ মাইল।

পূর্ব্বোক্ত উপগ্রহ সকলের সমষ্টির পরিমাণ ফল অত্যন্ত কম। ইহা হয়ত আমাদের পৃথিবীর ১/৪ অংশ হইবে।

সৌরজগতের যে স্থানে আমরা একটী গ্রহ পাইব আশা করিয়াছিলাম সে স্থানে এতগুলি ক্ষুদ্র-উপগ্রহ কেন হইল তাহা কেহ বলিতে পারেন না। কেহ কেহ অনুমান করেন একটী গ্রহ বিদীর্ণ হইয়া এতগুলি উপগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

আবার কেহ কেহ মনে করেন যে সৌরজগতের অপরাপর গ্রহগণের উৎপত্তি যেরূপ নীহারিকা পুঞ্জ হইতে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, এই ক্ষুদ্র উপগ্রহাবলীর নিমিত্ত কারণও ঐরূপ এক নীহারিকা পুঞ্জ; কিন্তু প্রবল বৃহস্পতির কক্ষের নিকটে থাকাতে উহা আর ঘণীভূত হইয়া একটী গ্রহে পরিণত হইতে পারে নাই। কারণ আয়তনে বৃহস্পতি অপর গ্রহ-সমষ্টি হইতেও বৃহৎ। এই প্রবল বৃহস্পতি অনেক ক্ষুদ্র উপগ্রহকে কক্ষ-চ্যুত করিয়া দিয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

সিরিস প্রভৃতি যে সকল উপগ্রহ সম্বন্ধে এত সময় আলোচনা করা গেল, সম্ভবতঃ উহারা গোলাকার নহে; কারণ উহাদের কোনদিক অত্যন্ত উজ্জল এবং কোন দিক অত্যন্ত ক্ষীণপ্রভ বোধ হয়। ইহাতে মনে হয় যে উহারা এক একটী পর্ব্বতের মত অসম। কাজেই সকল দিকে আলো সমান প্রতিফলিত হয় না। ইহাদের অসম আকৃতিতে মনে হয় যেন ইহারা একটী ভাঙ্গিয়া বহু হইয়াছে, অথবা বহু একত্র হইয়া এক হইতেছিল।

শ্রীহরিচরণ গুপ্ত।

কুণাল।

মৌর্য্যকুল ধুরন্ধর মহাত্মা অশোকের সাম্য-মৈত্রী-নীতি-পরিচালিত শাসন মহিমায় সমগ্র ভারতভূমি ধীরতায় ও বীরতায়, ধর্ম্মে ও পবিত্রতার মধুর মিলনে অতুল সুখময়ী ও শান্তিপ্রবণা। কিন্তু অকস্মাৎ নির্ম্মল রাকা শশধরে এক কাল মেঘ দেখা দিল। প্রকৃতির অনন্ত সুষমাময়ী ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক প্রান্ত দারুণ অন্তর্বিদ্রোহে কাঁপিয়া উঠিল। উপাংশু নর ঘাতকের তরবারির লক্ লক্ জিহ্বায় অসংখ্য নিরীহ ব্যক্তির জীবন বিনষ্ট হইতে লাগিল। পতিহীনাসতী, পুত্রহারা জননীর করুণ বিলাপধ্বনিতে কাশ্মীর-প্রান্ত-তক্ষশীলা মহা শ্মশানে পরিণত হইতে লাগিল। ধনীর ধন, সতীর সতীত্ব ও মহতের গৌরব সেই বিপ্লব কালে উদ্ধারের উপায় না হইয়া কাল স্বরূপ গণ্য হইল। দুরাত্মা বিদ্রোহীবৃন্দের পাশবিক অত্যাচারে তক্ষশীলা প্রত্যক্ষ ভীষণ নরকাগার ধারণ করিল। প্রজার করুণ ক্রন্দন নবনীত কোমল প্রজারঞ্জক অশোকের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিল।

ইতিকর্ত্তব্য নিদ্ধারনার্থ সচিববৃন্দ প্রাসাদে সমাসীন। যুবরাজ কুণাল আর্য্যাবর্ত্তেশ্বর পিতা অশোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান। সম্রাট স্নেহমধুর গম্ভীরস্বরে প্রাণাধিক পুত্র কুণালকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তোমাকেই এই বিদ্রোহ দমনার্থ অবিলম্বে তক্ষশীলায় গমন করিতে হইবে। কুণাল সস্মিত বদনে পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাজ সভা পরিত্যাগ করিলেন।

বিশাল চতুরঙ্গ সেনা সজ্জিত হইল। যুবরাজ প্রিয়তমা পত্নী কাঞ্চনমালা সহ অবিলম্বে সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া তক্ষশীলা যাত্রা করিলেন। সাম্য ও মৈত্রীর পবিত্র দূত কুণালের আগমন বার্ত্তা শ্রবণমাত্র বিদ্রোহীদল নায়ক স্বীয় প্রচণ্ডতা পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা অশোকের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শান্তির মারুত হিল্লোলে তক্ষশীলা নাচিয়া উঠিল। পতি বিরহিণী সতীর প্রাণে আশার জীবন সঞ্চারিণী বীজ উপ্ত হইল। ধনীর ধমনীস্থিত উষ্ণ শোণিত প্রবাহ স্তম্ভিভূত হইল। কোকিল শাখে শাখে বসির উষার প্রভাতীতানে শান্তির বিজয়িনীবাণী

ঘোষণা করিতে লাগিল। তক্ষশীলার শোক তাপ যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মায়াপ্রভাবে অচির কাল মধ্যে পলায়ন করিল।

(২)

যুবরাজ কুণালের তক্ষশীলার অবস্থিতি কালে সুষুপ্ত মহারাজ অশোক একদিন স্বপ্নে দেখিলেন, প্রাণাধিক পুত্র কুণালের প্রফুল্ল বদন ম্লান বিশীর্ণ ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অশোক স্বপ্ন কাহিনী জ্যোতিষীদিগকে জানাইলে, তাঁহারা গণনা করিয়া কহিলেন, কথিত স্বপ্নে, মহানিষ্টত্রয় সূচিত হইতেছে। প্রথম জীবন নাশ, দ্বিতীয় ঐহিক বন্ধন ত্যাগ পূর্ব্বক যতি বেশ ধারণ; তৃতীয় দর্শন শক্তির বিলোপ। গণকদিগের কথা শুনিয়া প্রবল বাত্যাতাড়িত কদম্বরেণুবৎ ভারতেশ্বরের বীরদেহ কাঁপিয়া উঠিল। ভয়শঙ্কাকুলমনে মহারাজ অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পুত্রবৎসল মহারাজ, যুবরাজ কুণালের ভাবী অনিষ্ট সূচনায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রাজকার্য্য-বিরত হইলেন।

অশোকের অন্যতম পত্নী কুণালের বিমাতা তিষ্যরক্ষা পীড়িত মহারাজের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। চতুরা ও ছলনাময়ী রাণীর আদেশানুসারে রাজকর্ম্মচারিগণ যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে লাগিল। সামদানাদি নীতি চতুষ্টয় পারদর্শিণী রাণীর আদেশ সর্ব্বত্র রাজাদেশতুল্য গণনীয় হইতে লাগিল।

শ্রীযামিনীকুমার কাব্যভূষণ।

(৩)

"সংবাদ কি? মগধের পত্র পাঠ করে আপনার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল কেন? বলুন, সম্রাটের কুশলত! মগধের কোন দুঃসংবাদ নাইত! আমি কিন্তু আপনার মুখ দেখে বড় অধীর হয়ে পড়েছি"।

দুর্গাধ্যক্ষ কহিলেন "কুমার-মগধের সব কুশলে আছেন। সেজন্য আপনি ভাবিত হবেন না। কিন্তু—'

"কিন্তু কি—আমি স্বয়ং এ পত্র দেখতে চাই"। দুর্গরক্ষক ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কুমার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখ পানে চাহিবা মাত্র; তিনি কম্পিত করে পত্রখানি যুবরাজের হাতে অর্পণ করিয়া নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। "

"বেশ ত! দুর্গরক্ষক, তবে আর সম্রাটের আদেশ পালনে বিলম্ব কেন? প্রস্তুত হউন।"

সবিনয়ে দুর্গেশ্বর কহিলেন "যুবরাজ, আপনার মত উদার, মহত, অতুলনীয় গুণগ্রাম ও সৌন্দর্য্যের অধিকারী নরলোকে আমি দেখি নাই। আপনার মত নিরপরাধের প্রতি এই কঠোর দণ্ড বিধান যুক্তি যুক্ত মনে করি নাই।"

দুর্গরক্ষক! আপনি ভারত সম্রাটের কার্য্যের বিচার করিতেছেন—আর তার সম্মুখে করিতেছেন—যে সেই সম্রাটের পুত্র—সাবধান!"

"আমি সম্রাটের এ আদেশ পালন করিব না। তার পরিবর্ত্তে যে দণ্ড দিতে হয়, দিন্—গ্রহণ করিব।"

"দুর্গরক্ষক! কুঞ্জরকর্ণ! এও কি সম্ভব, যে সামান্য একটা দুর্গের অধ্যক্ষ, সে আজ মহারাজ অশোকের আজ্ঞা পালনে, আমার সম্মুখে অস্বীকার করিতেছে।"

'হা যুবরাজ, বিনা অপরাধে আমি আপনাকে দণ্ড দিতে অসমর্থ।'

"সম্রাটের উপর ন্যায় অন্যায়ের বিচারকর্ত্তা তুমি? তোমার সাহস! তারপর কুমার গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "কে আছ?"

চারিজন সশস্ত্র সৈনিক প্রবেশ করিলে, তিনি কহিলেন "এই ব্যক্তিকে বাঁধো। এ রাজদ্রোহী!"

কুমার স্বহস্তে সম্রাটের নামে পত্র লিখিয়া মগধের দূতের নিকট অর্পণ করিলেন। তারপর যোড়হাতে কহিলেন "পিতা, আজ বড় আনন্দে আপনার আদেশ পালন করিতেছি। এত আনন্দ জীবনে আর পাই নাই। ভাগ্যবান রামচন্দ্র পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। আমি পিতার আদেশে সামান্য দুইটী চক্ষু দিতে পারিব না? তবে দুঃখ এই পিতার এ আজ্ঞা দুর্গস্বামীর হাতে এলো কেন? আমি কি এমনই অধম যে স্বয়ং পিতৃ আজ্ঞা পালনে দ্বিধা বোধ করিব?" এই বলিয়া যুবরাজ কুণাল স্বহস্তে তীক্ষ্ণধার ছুরিকাদ্বারা আপন নয়ন যুগল বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্খলিত দুর্গস্বামী একটা চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মগধের দূত ভীত ও বিস্মিত হইয়া পলায়ন করিল।

(৪)

"কাঞ্চন! কাঞ্চনমালা!"

"কি প্রিয়তম আমার!"

⅑ ভাগ এবং পরিমাণ পৃথিবীর ⅒ অংশেরও কম। পৃথিবীর উপাদান ইহা অপেক্ষা অনেক ঘন সন্নিবিষ্ট। পৃথিবীতে যে বস্তুর ওজন ৫০ সের মঙ্গলগ্রহে তাহার ওজন মাত্র ১৯ সের হইবে।

আয়তনে ক্ষুদ্র বলিয়া মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর অর্দ্ধেকেরও কম সূর্য্য কিরণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কাজেই ইহা পৃথিবী অপেক্ষা অনেক শীতল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর গড়পরতা দূরত্ব ৯,৩০০০০০০ মাইল কিন্তু মঙ্গলের গড়পরতা দূরত্ব ১৪,১৩৯০০০০ মাইল। মঙ্গল যখন সূর্য্যের অতি নিকটে থাকে (Perihelion) তখন সূর্য্য হইতে তাহার দূরত্ব ১২,৮২০০০০০ মাইল এবং অতি দূরে (Aphelion) থাকিবার সময় দূরত্ব ১৫,৪৫৮০০০০ মাইল।

মঙ্গল যখন সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে (Superior conjunction) তখন পৃথিবী হইতে মঙ্গলের দূরত্বের গড় ২৩,৪৪০০০০০ মাইল কিন্তু যখন উহা পৃথিবীর বিপরীত দিকে (Opposition) থাকে (অর্থাৎ যখন পৃথিবী সূর্য্য ও মঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী থাকে) তখন পৃথিবী হইতে মঙ্গলের দূরত্বের গড় ৩,৫৫০০০০০ হইতে ৬১০০০০০০ মাইল। মঙ্গলের এই পৃথিবীর বিপরীত দিকে স্থিতি (opposition) ২৬ মাস অন্তর অন্তর হইয়া থাকে এবং তখন দ্বিপ্রহর রাত্রির সময়ে মঙ্গলকে নভোমণ্ডলের উর্দ্ধে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে ইহাকে একটী প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল দেখায়। মঙ্গলকে পর্য্যবেক্ষণ করার ইহাই উপযুক্ত সময়। গ্রহটীর স্থিতির পরিবর্ত্তন অনুসারে ইহাকে ছোট ও বড় দেখাইয়া থাকে।

প্রতি সেকেণ্ডে ১৫ মাইল বেগে চলিয়া মঙ্গল ৬৮৭ দিনে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গলের দিনমান আমাদের দিন হইতে ৩৭ মিনিট অধিক। পৃথিবীর মত ইহার মেরু প্রদেশ কিঞ্চিৎ চাপা।

পৃথিবীর মত মঙ্গলও তাহার কক্ষে অক্ষ রেখা লম্বভাবে না রাখিয়া ২৪ ডিগ্রি ৫০ সেকেণ্ড কাত হইয়া ঘুরিতে থাকে। কাজেই উহার ঋতু অনেকটা পৃথিবীর মত। ইহার সূর্য্য কিরণ প্রতিফলিত করিবার ক্ষমতা শুক্র হইতে যদিও কম কিন্তু তুলনায় চন্দ্র ও বুধ হইতে অনেক অধিক। ইহা পৃথিবীর বহির্দ্দেশে অবস্থিত বলিয়া ইহাতে চন্দ্রের মত কলা দৃষ্ট হয় না, কেবল কখনও ছোট কখনও বড় দেখায়। খালি চক্ষে ইহাকে একটী লোহিত বর্ণের তারকার মত দেখা যায়। না চিনিলে ইহাকে ঠিক করা কঠিন, কারণ ঐরূপ অনেক তারকা রহিয়াছে।

মঙ্গল যখন পৃথিবীর বিপরীত দিকে থাকে তখন কিছু সময়ের জন্য উহা পশ্চিমদিকে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বকার জ্যোতিষিগণ যাঁহারা পৃথিবীকে স্থির মনে করিতেন তাঁহারা মঙ্গলের এই গতি বিভ্রম দেখিয়া অনেকটা গোলে পড়িয়া যাইতেন।

মঙ্গলের একটী বায়ুমণ্ডল আছে কিন্তু তাহা আমাদের বায়ুমণ্ডল হইতে অনেক হালকা। মঙ্গলগ্রহের শীত ঋতুতে উহার মেরুদেশে প্রচুর শুভ্র বরফের চাপ দৃষ্ট হয় এবং গ্রীষ্মকালে উহা ক্ষীণ হইয়া যায়। কখন কখন শ্বেত এবং অপর রকমের চিহ্নও মঙ্গলগ্রহে দৃষ্ট হয়; উহাদিগকে মেঘ বলিয়া মনে করা যায়। ইহাতেই অনুমিত হয় যে মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলে জলীয় বায়ু বর্ত্তমান।

আলোক পরীক্ষার যন্ত্র দ্বারাও (Spectroscope) নির্দ্ধারণ করা যায় যে মঙ্গলের বায়ু মণ্ডল আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ঐ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিবার সময়ে আলো পৃথিবীর বায়ু মণ্ডল ভেদ করিয়া আসে বলিয়াই ঐরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু বায়ু মণ্ডলহীন চন্দ্র ও মঙ্গল উভয়ের আলোক-ছায়া গ্রহণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে বায়ুহীন চন্দ্র ঐরূপ হয় না।

মঙ্গলের দুইটী অতি ক্ষুদ্র চন্দ্র বর্ত্তমান আছে। ইহা-দিগকে সহজে দেখা মুস্কিল। ১৮৭৭ সনে প্রফেসর হল (Professor Hall) বহু চেষ্টার পরে প্রবল দূরবীক্ষণ দ্বারা ইহা নির্দ্ধারণ করেন। তিনি ও প্রথমতঃ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ইহার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার স্ত্রীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পুনরায় চেষ্টা করিয়া একটীর পরে আর একটী চন্দ্র আবিষ্কার করেন।

প্রথমতঃ পৃথিবীর এক চন্দ্র, বৃহস্পতির ৪ চন্দ্র এবং শনির ৮ চন্দ্র দেখিয়া লোকে মনে করিত মঙ্গলের ও দুইটা চন্দ্র আছে। কারণ পৃথিবীর বহির্দ্দেশের প্রত্যেক গ্রহেরই

তাহার অভ্যন্তরস্থ গ্রহ হইতে দ্বিগুণ চন্দ্র দৃষ্ট হয়। কাজেই পৃথিবীর একটী চন্দ্র থাকিলে তাহার অব্যবহিত পরের গ্রহ মঙ্গলের দুইটী থাকা স্বাভাবিক।

এই দুইটী চন্দ্রের নাম ডেইমস্ (Deimos) এবং ফবস্ (Phobos)। মঙ্গলের এই দূরস্থ চন্দ্র ডেইমস মঙ্গল হইতে ১৪৬০০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার এক পূর্ণিমা হইতে অপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ৫২ দিন লাগিয়া থাকে। এই চন্দ্রটীর ব্যাস মাত্র ৫। ৬ মাইল হইবে। আমাদের চন্দ্রের ১২০০ ভাগের এক ভাগ আলো মাত্র ডেইমস্ মঙ্গল গ্রহে প্রদান করিয়া থাকে।

মঙ্গলের নিকটস্থ চন্দ্র ফবস্। ইহা মঙ্গল হইতে ৮০০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার ব্যাস ৭ মাইল। ইহা মঙ্গল গ্রহে আমাদের চন্দ্র কিরণের ১৬ ভাগের এক ভাগ কিরণ প্রদান করে। মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ইহার ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট সময়ের প্রয়োজন। মঙ্গলের এক দিনে ফবস্ মঙ্গলকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে। কাজেই ইহা পশ্চিম দিকে উদিত হইয়া পূর্ব্ব দিকে অস্ত যায়।

মঙ্গল গ্রহের কোন ২ স্থানের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কেহ ২ মনে করেন ঐ সকল স্থানে বৎসরের কোন সময়ে একরূপ গাছপালা উৎপন্ন হয় এবং তাহা প্রাকৃতিক কারণে মরিয়া যায়। তাহাতেই ঐরূপ বর্ণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। খালের মত যাহা দেখা যায়, তাহা যে কি এখনও স্থির বলা যায় না।

মঙ্গলও সৌরজগতের একটী ক্ষুদ্র গ্রহ মাত্র। সূর্য্যমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, এবং মঙ্গল এই কয়টীকেই ক্ষুদ্র গ্রহ বলা যায়। মঙ্গলের পরেই একটী বিশাল ফাঁক এবং তাহার পরে ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর গ্রহ বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস্, নেপচুন। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে যে ব্যবধান তাহার মধ্যেও একটী বৃহৎ গ্রহ বর্ত্তমান আছে বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল। জ্যোতির্ব্বিদ বোডে (Bode) একটী নিয়ম বাহির করিয়াছিলেন তাহাতেও ঐ মধ্য প্রদেশে একটী গ্রহের অভাব দৃষ্ট হয়। তাহার নিয়মটী এই যে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের—গড় ১ ধরিয়া সেই অনুপাতে অপরাপর গ্রহের দূরত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; অনুপাতে তাহা বাহির করিতে হইলে এইরূপ হইবে—বুধ $\frac{৪}{১০}$, শুক্র $\frac{৪+৩}{১০}$, পৃথিবী $\frac{৪+৩\times২}{১০}$, মঙ্গল $\frac{৪+৩\times৪}{১০}$ তৎপর যে গ্রহ হইবে $\frac{৪+৩\times৮}{১০}$, বৃহস্পতি $\frac{৪+৩\times১৬}{১০}$ ইত্যাদি। কেবলমাত্র নেপচুন এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছে। অতএব এই পঞ্চম স্থলের গ্রহটী অর্থাৎ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্ত্তী গ্রহটী আবিষ্কার করিবার জন্য জ্যোতির্ব্বিদগণ বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্যোতির্ব্বিদগণ ইহা আবিষ্কার করিবার জন্য এক সমিতি গঠন করেন কিন্তু কিছুতেই ইহা আবিষ্কৃত হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ১ লা জানুয়ারী তারিখে সিসিলী দ্বীপের পিয়াজি (Piazi) নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ ঐ ইপ্সিত স্থলে একটী উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। তাঁহার প্রথম সন্দেহ হয় যে উহা একটী নক্ষত্র কিনা? কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা ইহা স্থিরিকৃত হয় যে উহা একটী উপগ্রহই বটে। তিনি রোহিণী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া এই ক্ষুদ্র উপগ্রহ প্রাপ্ত হন। তখন কেহ কেহ উহাকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়া সন্দেহ করিলেন, উহা হয়ত একটী ধূমকেতু হইবে। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ বোডে স্থির করিলেন যে উহা একটী উপগ্রহ এবং তাঁহার আবিষ্কৃত নিয়মে সম্ভাবিত গ্রহের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইল সেরিস (ceres)। অতঃপর অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত গয়াস (Gauss) ইহার কক্ষ আবিষ্কার করেন। ইহার পরে ঐ কক্ষে পেলাস্ (Pallas), জুনো (Juno), ভেষ্টা (Vesta) এবং আরও ৪টী ক্ষুদ্র উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইল। অতঃপর কিছুকাল এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান স্থগিত রহিল, এখন এই কক্ষে ক্রমে প্রায় শত শত উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই উপগ্রহ সমূহের প্রথম আবিষ্কৃত সিরিস্ সর্ব্ববৃহৎ। ইহার ব্যাস প্রায় ৫ শত মাইল এবং ইহাদের অন্যতম ভেষ্টা সর্ব্বোজ্জ্বল। এমন কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি থাকিলে ইহাকে খালি চক্ষেও দেখা যায়। এই বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র উপগ্রহ পূর্ব্বকালের মত দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিতে চেষ্টা না করিয়া ছায়াচিত্রের (Photography) দ্বারা আবিষ্কার করা সহজ হইয়াছে। এই উপগ্রহ সমূহ যে কক্ষে বিচরণ করে তাহা প্রস্থে ১৯ কোটী মাইল।

"বড় কষ্ট হচ্ছে— নয়?

"কিসের কষ্ট নাথ! তবে কোনদিন পথ চলতে হয় নাই, ভিক্ষা করার অভ্যাস নাই;— তাই কি!— শিগগীর শোধরাবে। এখনইত বেশ পারি। আর তুমি আমার হাত ধরে আছ, আমি সব পার্ব্ব।"

"কাঞ্চন, তোমায় কত মানা করলাম, শুনলে না। আমার আর কোন দুঃখ নাই; একমাত্র তোমার দুঃখে আমি ম্রিয়মাণ।"

"একি কথা নাথ! আমায় এ মর্ম্মবেদনা দাও কেন? তুমিত কোন দিন কাকেও কিছু দুঃখ দেওনি প্রিয়তম;— তবে আমি কি অপরাধ করেছি, যে আমায় বেদনা দিচ্ছ।"

"বেদনা নয়, কাঞ্চন! সত্য কথা! ভারত সম্রাটের পুত্রবধূ— যে একদিন ভারতেশ্বরী হ'ত সে আজ—"

"সবাইত ভারতেশ্বরী নয়— সবারই মনে কি দুঃখ আছে? আমি যে রাজ্য পেয়েছি, তার তুলনায় পৃথিবীর আধিপত্য ধূলি মুষ্টির মত, উপেক্ষা করতে পারি। আমার যে সান্ত্বনা—তার তুলনা নাই—তুমি আমার স্বামী—এর মত গৌরব কি আছে।—"

"কাঞ্চনমালা আমার! তোমার মুখখানি দেখছি না— কিন্তু বোধহচ্ছে তা বড় মলিন হয়ে গেছে — নয়?"

"কেন মলিন হবে নাথ! তোমার মুখ প্রফুল্ল দেখলে আমি পুলকিতা থাকি। তোমার মুখে কালিমাত কোনদিন দেখি নাই— তবে আমার দুঃখ কিসের?"

"কাঞ্চন! এই পথ পর্য্যটন, এই শীতাতপ, তোমায় বড় যাতনা দিচ্ছে।"

"না, প্রিয়তম। আমরাত অতি সামান্য পথই অতিক্রম করে থাকি। মহারাজ অশোকের রাজ্যে পান্থ নিবাসেরও অভাব নাই; আশ্রয়ের জন্যও চিন্তা নাই।"

"আমি চক্ষুহীন সঙ্গী; তুমি যুবতী, সুন্দরী— দীর্ঘ পথ—"

"নিশ্চিন্ত হও প্রিয়তম! এ মহারাজ অশোকের রাজ্য। আমি দেখছি পথের পার্শ্বে মূল্যবান সামগ্রী, ধনরত্ন রেখে পথিক নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। আর প্রাণনাথ, তোমার ঐ মোহন রূপের উপর আমি ভষ্ম মেখে দিয়েছি। আমারও সর্ব্বাঙ্গ ভস্মে আবৃত। এই দুই দীনহীন পান্থের দিকে কেউ ফিরেও চায় না।"

(৫)

মগধের রাজসভায় তক্ষশিলার দূত সম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। সম্রাট অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন— "কে তুমি?"

পুনরায় অভিবাদন করিয়া সবিনয় দূত কহিল "আমি তক্ষশিলা হতে বন্দী দুর্গস্বামীকে নিয়ে এসেছি।"

"বন্দী দুর্গস্বামী! কোন্ দুর্গস্বামী"?

"দুর্গস্বামী কুঞ্জরকর্ণ।"

"কুঞ্জরকর্ণ! তাকে কে বন্দী কর্লে?"

"কুমার স্বয়ং বন্দী করেছেন।"

দুর্গস্বামী আমার অতি বিশ্বস্ত প্রাচীন কর্ম্মচারী। তাঁর কি অপরাধ? অথচ কুণালের মত ধীমান্—যাও দূত দুর্গ ধ্যক্ষকে সভায় আনয়ন কর।"

দূত প্রস্থান করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শৃঙ্খলিত দুর্গাধ্যক্ষ রাজ সভায় আনীত হইলেন।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"দুর্গপতি! এর কারণ কি?"

মাথা নোয়াইয়া কুঞ্জরকর্ণ কহিলেন—"মহারাজাধিরাজ! আমি রাজাদেশ প্রতিপালনে অক্ষম—তাই যুবরাজ আমার ন্যায্য দণ্ড বিধান করেছেন।"

"তুমি আদেশ অমান্য করলে কেন কুঞ্জরকর্ণ? চিরদিন রাজভক্ত বলে তোমায় জানি—আজ তার অন্যথা হলো কেন?"

"মহারাজ! আজ আর আমার জীবনের ভয় নাই;— যা বলব—নির্ভয়েই বলে যাব।—রাজ্যেশ্বর! আমি বুঝলাম, যে রাজাদেশ আমার উপর অর্পিত হয়েছে, হয় তা জাল, নতুবা মহারাজ কেনো দুর্বিপাকে পড়ে এই হুকুম দিয়েছেন। আর যদি তা প্রকৃত পক্ষেই রজার আজ্ঞা হয়—আমি নির্ভয়ে তা পালনে অসম্মত।"

"কি আদেশ পালনে তুমি এত দৃঢ় অসম্মত কুঞ্জরকর্ণ? আমিত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।"

দুর্গস্বামীর ইঙ্গিতে দূত মহারাজের আদেশলিপি রাজ পদে অর্পণ করিয়া দাঁড়াইল।

মহারাজ অশোক স্বহস্তে সেই পত্র পাঠ করিয়া, দ্রুতপদে সিংহাসন হইতে অবতরণ করতঃ—স্বয়ং দুর্গাধ্যক্ষের বন্ধন মোচন করিলেন। তারপর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—"ধন্য দুর্গস্বামী কুঞ্জরকর্ণ! তুমি প্রকৃতই মনস্বী! এ পত্র জালই বটে—!" তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিলে কুঞ্জরকর্ণ কহিলেন—

"রাজাধিরাজ! এ আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে আমি সফল মনোরথ হতে পারিনি। কুমার স্বয়ং স্বহস্তে রাজাদেশ পালন করেছেন।"

রুগ্ন মহারাজ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

(৬)

"রাজরাণী কোন্ স্বার্থের প্রেরণায় এ পৈশাচিক কাজ করেছিলে! আজ আবার কি বুঝে পায় ধরে ক্ষমা চাচ্ছ? আমি ক্ষমা কর্ব্বো না। আমিত আগে জানতাম না—তোমার হাতে রাজ্যের রশ্মি ছেড়ে দিয়ে নিজের বুকে নিজে ছুরি মেরেছি। ক্ষমতা হাতে পেয়ে তুমি তার কি দারুণ অপব্যবহার করেছ রাণি! আমি তোমায় কঠোর শাস্তি দিব।"

রাজরাণী গর্ব্বিতা তিষ্যরক্ষা আজ ভীষণ শাস্তি সম্মুখে দেখিয়া বড় ভয় পাইলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর সম্রাট অন্তঃপুরে আপন শয্যার উপর শয়ন করিয়া যখন রোদন করিতেছিলেম, তখন কম্পিত কলেবরে পাংশুবদনী তিষ্যরক্ষা—ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার মুখে কথাটী নাই। কেবল অবিরল অশ্রুজলে সম্রাটের পদ সিক্ত করিতেছিলেন।

যে প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকাকেও সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেন, যাহার রাজ্য হইতে হিংসা নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, আজ প্রৌঢ় জীবনে তিনি আত্ম সংযমের জন্য হৃদয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতেছিলেন। আজ জয়লাভ করা অশোকের অসাধ্য হইয়া উঠিতেছিল। "রাণি! মূঢ়, রমণি! আমি তোমায় ক্ষমা করার কল্পনাও করতে পাচ্ছিনা! সহানুভূতির ক্ষুদ্র বিন্দু হৃদয়ের এক কোণেও উপনীত হবা মাত্র দশদিক হতে তারে বিদ্রোহের উষ্ণতায় শুষে লয়। রাণি, প্রস্তুত হও—আমি তোমায় হত্যা কর্ব্বোনা;—হত্যা —না—আমি তোমায় মরণাধিক যন্ত্রণা দিব। উঃ—কি ভীষণ!—বিমাতার কি পৈশাচিক চক্রান্ত!—কুণাল—পিতৃভক্ত পুত্র আমার—না—না—রাণী—তুমি ক্ষমা পেতে অধিকারিণী নহ।—এই—কে আছ?"

দ্বার রক্ষিণী পেশোয়ারী প্রহরিণী পর্দ্দা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করতঃ মহিষী ও সম্রাটকে আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল।

"প্রহরিণী, এই রমণীকে নিয়ে যা—অন্তঃপুরে—কারাগারে বন্দিনী রাখ—"

প্রহরিণী সবিস্ময়ে প্রকোষ্ঠের চারিদিকে অপরাধীর অনুসন্ধানে দৃষ্টিপাত করিতেছিল।

তিষ্যরক্ষা—উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

(৭)

"কাঞ্চন, কাঞ্চনমালা! এখন যেন মনে হচ্ছে, এখানে না আসাই ভাল ছিল। ভিক্ষু আর ভিক্ষুণী বুদ্ধের নাম করিয়া দেশ পর্য্যটন করিতাম, তাই কি ভাল হতো না। এই মগধে আমাদের কি প্রয়োজন?

"তুমি আদেশ করেছ—তাই এসেছি! কেন প্রাণেশ্বর, তুমিইত মগধের সব—তুমি আসবে না কেন?"

"হাঁ তাও বটে! না এলে পিতার প্রতি অন্যায় করা হতো। পিতৃ আজ্ঞা পালন করে, পরে ভক্তিহীনতা হয়?—না—তা হয় না, হতে পারে না। তবে কথাটা হচ্ছে এই—মা—আমার মা'র মনে বড় দুঃখ হবে।"

"না প্রভু, মা যখন শুনবেন তুমি রাজ আজ্ঞা, পিতৃ আজ্ঞা স্বচ্ছন্দে পালন করেছ, তাঁর দুঃখ অনেকটা হাল্কা হয়ে যাবে। তিনি কেবলি মা নহেন—তিনি রাজরাণী, তিনি এ রাজ্যের রাজলক্ষ্মী। রাজার বিচারে তিনি বিদ্রোহী হবেন না।"

"আজ মনটা একটু চঞ্চল! নিদ্রা হচ্ছে না। কাল প্রভাতে রাজ সভায় যখন যাব—পিতাকে যে দেখতে পাব না, এটা বড় দুঃখ। আর দুঃখ নাই।—"

"দুঃখ নাই! দুঃখ নাই!—একি সান্ত্বনা স্বামী আমার। তুমি মগধের সম্রাট তনয়, তুমি ভারতের ভাবী সম্রাট, আজ পুর-প্রবেশে অনধিকারী! সামান্য দ্বাররক্ষী তোমায় সরোষে

বলছে—সূর্য্যাস্তের পর অপরিচিতের পুর-প্রবেশ নিষেধ। এ— শুনতে হলো! আমাদের সৌভাগ্য যে দয়া করে হস্তিশালার অধ্যক্ষ আমাদের জন্য একটু স্থান দিয়েছে।"

"কি যায় আসে কাঞ্চন! আমিত কিছু ভাবছি না—তুমি কি অসহ্য মনে করছ! কষ্ট হচ্ছে?"

"কিছু মাত্র না। আমার অনুভূতি তোমার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু নাথ-এটা কি ভাব্‌বার কথা নয়, যে ভারতের ভাবী সম্রাট—আজ সেই দুয়ারের ভিখারী! এই মাত্র—আর কিছু নয়।"

"যাক্—এসব কথার দরকার কি?—আচ্ছা কাঞ্চন, আজ বড় জ্যোছনা উঠেছে না?"

"হাঁ প্রভো—কি করে জানলে?"

"আমার গা'র উপর যেন জোছনা ঢেউ খেলছে—প্রাণের মধ্যে যেন ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে। কাঞ্চন—দাওত একবার আমার বীণাটী—"

(৮)

"তক্ষশিলার দূত ফিরে এলো—কুমার সেখানে নাই—রাজলক্ষ্মী আমার বৌ মাও সেখানে নাই! হায় হায় কি করলাম। পুত্রশোকে দশরথ মরেছিলেন—আমিও মর্‌ব! পুত্র আমার উপর অভিমান করে দেশ ছেড়ে গেছে! গেল কোথায়? রাজ্যময় ঘোষণা করব! উঃ—চলে গেছে, যাবে বৈকি—এমন নিষ্ঠুর—এমন অবিচারী— এমন অত্যাচারী পিতার প্রতি পুত্র ভক্তি দেখাবে — এমন পিতার রাজ্যে জল গ্রহণ কর্‌বে?—এও কি সম্ভব! কি পুত্রই হারাইছি। কুণাল! কুণাল! লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখিছি—এমন দুটী চক্ষুত দেখি নাই—রাক্ষসী সেই চক্ষু দুটী নষ্ট করেছে—!"

মহারাজ অশোকের শয্যাকণ্টক উপস্থিত। আজ দুই সপ্তাহ মধ্যে তিনি এই প্রাসাদে বন্দীর মত আছেন। কাহারো সঙ্গে দেখা করেন না,—জ্যেষ্ঠা মহিষীর সঙ্গেও না। অতি সামান্য মাত্র আহার্য্য জোর করিয়া দেওয়া হয়—। অশোক কুণালের জন্য বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।

দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া সম্রাট কহিলেন "প্রভু তথাগত, হৃদয়কে যে কিছুতেই শান্ত করতে পাচ্ছিনা! তোমাতে ও যে আত্মদান করে নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছিনা। "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং—একি এ কার বীণার ঝঙ্কার!—অ্যা—একি আর কেউ পারে? ওগো—ওগো—এযে তারি—এযে তারি আঙ্গুলের ঘা,—আমি চিনেছি—আমি ঠিক ধরেছি—এ বীণা—আমার—কুণালের,"—

পাগলের মত ভারত সম্রাট কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। তাঁহার দুর্ব্বলতার কথাটি আজ তাঁর মনে নাই। বিস্রস্ত বসনে সম্রাট ছুটিলেন,—দ্বাররক্ষী তাঁহার অনুসরণ করিল। প্রত্যেক দ্বারের প্রহরিগণ বিস্ময়ে দ্বার খুলিয়া দিল—সম্রাট দ্রুতপদে ছুটিলেন। যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল—তাহারা কেহই কিছু বুঝিল না। বলিবার সাহসও কাহার ছিল না।

হস্তিশালার—ছিন্ন চটের উপর জ্যোছনালোকে বসিয়া কুণাল বীণা বাজাইতে ছিলেন। কাঞ্চনমালা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। সহসা: ভারত সম্রাট তীরের মত ছুটিয়া যাইয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

* * * * * *

"যাও রাণি, তোমায় মুক্ত করে দিলাম। আজ সে তোমায় যে ক্ষমা করেছে—তার তুলনা নাই। চেয়ে দেখ—তার মুখে কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ—কি সরলতা—কি মাধুরী! অকপটে—সে তোমায় ক্ষমা করেছে!

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আদ্যাশক্তি।

(Lotze.)

আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোড়ায় যে আদিভূত সত্য নিহিত আছেন তাহার প্রকৃতি কিরূপ—উহা জড়বিজ্ঞানের পদার্থ (matter) না ধর্ম্মদর্শনের ভগবান—তাহা নিরূপণ করিতে হইলে আমরা যদি বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী অবলম্বন করি, তবে আমাদিগকে এই বিশ্বজগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তি প্রভৃতি ভাল করিয়া জানিতে হইবে। এবং ঐসকল বস্তু ব্যক্তি প্রভৃতি কি ভাবে গঠিত হয় ও কি উদ্দেশ্য হইতে তাহাদের ঘটন কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহাও তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু মানুষের জীবন এত দীর্ঘ নয়,

তাহার অবকাশ ও সুবিধা এত প্রচুর নয় যে এতগুলি বিষয় মানুষ জানিয়া উঠিতে পারে। তবে কি আমরা বিশ্বের আদি সত্তার বিষয় কিছুই জানিতে পারিব না! বিজ্ঞানের সুচিন্তিত যুক্তি প্রণালীতে তাহা কি তবে ধরা দিবে না! আমাদের হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। চিন্তা জগতে আমরা নিতান্ত শিশু নহি। বিশ্বমানবের চিন্তার ধারা আমাদের ভাষা, জাতীয়তা এবং সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় আচার নিয়মে এমন ভাবে আবদ্ধ ও পরিস্ফুট থাকে যে জন্ম হইতেই আমরা ঐ গুলির সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়া পড়ি এবং তাহার ফলে আমাদের মনে এই বিশ্বের আদ্যাশক্তি সম্বন্ধে একটা ধারণা সুগ্রথিত হইয়া যায়। এখন যদি আমরা বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে দেখাইতে পারি যে আমাদের ঐ ধারণাটীর সহিত বিশ্বজগতের সর্ব্বপ্রকার সামঞ্জস্য বর্ত্তমান আছে এবং আদিভূত সত্তার যে যে প্রকৃতি থাকা উচিৎ তাহা যদি আমাদের ধর্ম্মদর্শনের ধারণাটীতে বর্ত্তমান থাকে, তবেই আমরা বলিতে পারি বিজ্ঞান সম্মত চিন্তা প্রণালী মতে ধর্ম্মদর্শনের ভগবানকে অগ্রাহ্য করা মোটেই চ.ল না। বরং ঐ মতটী তাঁহার অস্তিত্ব ও প্রকৃতি প্রতিপন্ন করিয়া দেয় এবং তাহার ফলে ধর্ম্ম ও দর্শনের মধ্যে চিরন্তন বিবাদটাও আর অমীমাংসিত থাকিতে পারে না। এই সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা আরও দেখাইতে পারি যে অন্যান্য প্রকার ব্যাখ্যার সহিত বিশ্বনিহিত আদিভূত সত্তার ও অন্যান্য বস্তু প্রভৃতির তেমন সামঞ্জস্য নাই— এক ভগবানের কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই তেমন ভাবে বিশ্ব ও বিশ্বের আদি সত্তার ব্যাখ্যা করিতে পারে না, তাহা হইলে ঐ আদি সত্তা যে ভগবান তদ্বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু আমাদিগকে সর্ব্বদা ভাল করিয়া দেখিতে হইবে বিশ্বের সহিত ভগবান কল্পনার কোনও গড়মিল কিম্বা বিরুদ্ধ ভাব আছে কি না। যদি কখনও গড়মিল থাকা প্রতিপন্ন হয়, তবে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে বিশ্ব নিহিত আদিসত্তা কিছুতেই ভগবান হইতে পারে না। *

এই কথা কয়টী মনে রাখিয়া আমরা একে একে বিশ্বের আদি সত্তা সম্বন্ধে যে কয়টী প্রধান প্রধান অভিমত আছে তাহার বিচার করিয়া দেখিব তাহারা সুচারুরূপে বিশ্বের গঠন ও নিয়ম ব্যাখ্যা করিতে পারে কি না।

প্রথমতঃ আমরা খাটি জড়বাদ (out and out materialism) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই জড়বাদের মতানুসারে জড়ের বাস্তবতা ব্যতীত অন্য কাহারও বাস্তবতা স্বীকার করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। যা কিছু আমরা দেখি শুনি ভাবি ও অনুভব করি তাহা জড় হইতে উদ্ভূত। জড় ব্যতীত এ জগতে আর কিছুই নাই। জগতের আদি সত্তাও সেই জন্য জড় ব্যতীত আর কিছুই নয়। জড় হইতে বিশ্ব গঠিত হইয়াছে এবং জড় হইতেই গাছপালা জীবজন্তু ব্যক্তি ও মানবের উদ্ভব হইয়াছে। ইংরেজীতে এই জড়বাদের নাম Materialism.

জ্ঞানবাদ সম্বন্ধে জড়বাদের প্রধান আপত্তি এই যে অতীন্দ্রিয় যে সমস্ত সত্তা জ্ঞানবাদ মতে কল্পিত হয়, তাহাদের বাস্তবতা মোটেই নাই। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কথা এবং ঠিক তাহার বিরোধী আর একটা কথা একত্র সমাবেশ পূর্ব্বক যাবতীয় বস্তু ও তাহার কার্য্য প্রণালী জ্ঞানবাদিগণ কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের কোনও আবশ্যকতা ও বাস্তবতা নাই ও থাকিতে পারে না। জড়বাদ মতে অতীন্দ্রিয় বস্তু সমূহের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা এক বিন্দুও নাই। স্বর্ণ ও মৃগ এই দুইটী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু। কিন্তু স্বর্ণমৃগ বলিয়া একটা জিনিস কল্পনায় গঠন করা চলে কিন্তু তাহার কোনও বাস্তবতা নাই। এই স্বর্ণমৃগের ন্যায় আরও এমন অনেক বস্তু জ্ঞানবাদীরা কল্পনা করিয়া লন; যাহার অভিজ্ঞতা আমাদের নাই এবং যাহা শুধু কল্পনা রাজ্যে অবস্থিত, তাহা জড়বাদিগণ স্বীকার করেন না। যাহা কিছু সত্য ও বাস্তব তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। এই অভিমতটীর উপরেই জড়বাদ অবস্থিত।

কিন্তু ঠিক এই অভিমতটীর দিক হইতে বিচার করিতে গেলে জড়বাদ এক মুহূর্ত্তও টিকিতে পারে না এবং তাহাকে অথাদ সলিলে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়। যাহা আমরা

---

* Whether the religious ideas worked out long ago, of the nature of God, are compatible with what we find true in *our experience*, in such a way that we should identify just the conception of God which they involve with that which we have already discovered of a single principle of the world——Lotze.

জড় বলিয়া ধরিয়া লই তাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিতে গেলে আমাদিগকে হতাশ হইতে হয়। দুঃখের বিষয় যে জড়ের উপর আমাদের এত বিশ্বাস সেই জড়ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু নয়। এই জড় আমাদের জ্ঞান কল্পিত বস্তু বিশেষ মাত্র। জড় পদার্থ যে মানস রাজ্যের গড়া জিনিস তাহা জড়বাদিগণ অজ্ঞাতসারে ধরিয়া লইতে বাধ্য হন। কারণ আমরা দেখিতে পাই—জড়বাদের দিক হইতে জড়পদার্থটী যে কি বস্তু তাহা আমরা বলিতে পারি না। জড়পদার্থ মানব মনে কি কি অনুভূতি জাগাইয়া দেয়, কেমন ভাবে জড়পদার্থ তাহারই মত অন্য একটী জড়ের সহিত ব্যবহার করে তাহাই শুধু জড়বাদ আমাদিগকে বলিয়া থাকে। কিন্তু জড় পদার্থ নিজে কোন ধাতুতে গঠিত তাহা আমরা জড়বাদের নিকট হইতে পাই না। জড়পদার্থ কল্পনার বিষয় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে জড়বাদিগণ যদিও বলিয়া থাকেন যে অতীন্দ্রিয় কোন কিছুই তাঁহারা স্বীকার করেন না, তথাপি প্রকারান্তরে গোড়াতেই যে জড়ত্বের উপর তাহাদের দর্শন প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাতে তাহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস বিদ্যমান সেই জড়ত্ব সম্বন্ধেই ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত কল্পনা করিয়া বসেন। ইহা হইতে আমরা এই শিক্ষালাভ করি যে, অতীন্দ্রিয় কোন কিছু সাধারণতঃ আমাদের স্বীকার করা বা ধরিয়া লওয়া অন্যায় ও অসঙ্গত। কিন্তু যখন আমরা যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত মতে দেখিতে পাই অতীন্দ্রিয় বস্তুর কল্পনা না করিলে আমরা আমাদের জ্ঞানরাজ্যেরও অস্তিত্বের সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি না অর্থাৎ কিনা যখন আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অভিজ্ঞতা আমাদিগকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে অতীন্দ্রিয় কোনও কিছু ধরিয়া লইতে বাধ্য করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই অতীন্দ্রিয় বস্তুটীর প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, কেবল তখনই আমাদিগের অতীন্দ্রিয় বস্তু কল্পনা করা বা ধরিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। লটজার কথা কয়টী এখানে সকলের ভাল লাগিবে ভাবিয়া তাহা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন—

"We must not assume a reality beyond sense without good reason; we must only assume it; if our sensuous experiences directly or indirectly compel us to assume it and at the same time define the nature of that which is to be assumed.

এতখানি স্বীকার করিয়াও জড়বাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, জড়ত্বের কল্পনার মত সাদাসিধে ঘোর পেচশূন্য কল্পনা আর নাই এবং একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাকে বোধগম্য করিতে হইলে আমরা জড়ের কল্পনা না করিয়া পারি না। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, জড়ের উপরই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রেও আমরা জড়বাদিগণের সহিত একমত হইতে পারি না। জড়পদার্থের কল্পনা যে সাদাসিধে ঘোরপেচ শূন্য নহে এবং উহার মত অস্পষ্ট কল্পনা যে খুব অল্পই মানব করিতে পারে তৎসম্বন্ধে বলিবার ও ভাবিবার অনেক আছে। বাহিরে সাদাসিধে দেখা গেলেও জড়পদার্থ সহজে মোটেই বোধগম্য করা যায় না। প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মনে যে সমস্ত অনুভূতি হইতেছে তাহার সংখ্যা ও প্রকার অগণিত। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে আমরা মনের মধ্যে যাহা পাই তাহা বাস্তব জগতের ওজন বিশিষ্ট ব্যোমাংশ দখলকারী কোনও বস্তু বিশেষ নহে—তাহা ঐ সকল বস্তু বিশেষের মানস প্রতিচ্ছবি মাত্র। এই সমস্ত প্রতিচ্ছবির কোনও ওজন নাই—ইহারা কোনও স্থান অধিকার করিয়া থাকে না। বাস্তব জগতের বস্তুগুলি যদি আমাদের জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ না করিতে পারিল, তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া জড়পদার্থ জানিতে পারি—সে বিষয়টা সর্ব্বপ্রথম ভাবিয়া দেখা উচিত। আমাদের মানসপটে প্রতিবিম্বিত অনুভূতিগুলির পশ্চাতে বহির্জগতে যে জড় পদার্থ আছে বলিয়া সাধারণতঃ আমরা বিশ্বাস করি, তাহা আমরা কেমন করিয়া জানি? কেমন করিয়া আমরা সকলেই অভ্রান্তভাবে বুঝিতে পারি যে আমাদের মনের মধ্যে যে সমস্ত অনুভূতি জাগিয়া উঠে সেগুলি প্রতিচ্ছবি মাত্র জড়জগতের পদার্থ নহে। যে পরিদৃশ্যমান জগতে সকলে পরস্পরের প্রতি ঘাত প্রতিঘাত করিয়া অশেষবিধ পরিবর্ত্তন অবিশ্রান্ত গতিতে সংঘটিত করিতেছে সে জগতের বিষয় আমরা কি করিয়া অবগত হই। আমাদের যত কিছু মেলামেশা জানাশুনা তাহা কেবল যদি মানসিক অবস্থা ও ভাবনা চিন্তার সহিতই হয়, তবে তদতিরিক্ত বস্তু বিশেষের সহিত আমরা কেমন করিয়া পরিচিত হইব তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। জড়বাদের দিক হইতে এ

সমস্যার সম্যক উত্তর দেওয়া সুকঠিন। লট্‌জা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সুযোগ্য দার্শনিক প্রবর ক্যাণ্টের (Kant) পথ অনুসরণ করিয়া এক্ষেত্রে বলিয়াছেন যে এই জড়জগত আমরাই মানসরাজ্যে তৈয়ার করিয়া লই। আমাদের মানসরাজ্যে যে সমস্ত প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠে সেগুলির অর্থ ও প্রকৃতি বুঝিবার জন্য আমরা জড়পদার্থ নামক বস্তু ও বহির্জগত নামক একটী জ্ঞানাতিরিক্ত জগৎ কল্পনা করিয়া লই। বাস্তবিকপক্ষে বহির্জগৎ ও জড়বাদের জড়পদার্থ উভয়েই কল্পনাপ্রসূত। উহাদের বাস্তব কোনই অস্তিত্ব নাই। তারপর এই কল্পনা গঠিত বহির্জগৎও জড়পদার্থের সহিত প্রতি মুহূর্ত্তে অভ্যস্ত হওয়ার ফলে আমরা প্রায় ভুলিয়াই যাই যে উহারা কল্পনার জিনিস এবং অজ্ঞাতসারে আমরা বিশ্বাস করিয়া বসি যে এই বহির্জগৎ ও জড়পদার্থ-বাহিরের ও বাস্তবরাজ্যেরই বটে।

এখন দেখা যাইতেছে—যে জড়বাদ দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী কথার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম কথাটা হইল এই যে, আমাদের মন ও মানসিক অনুভূতি ও চিন্তা সকলই জড়পদার্থ হইতে উদ্ভূত। আর দ্বিতীয় কথাটী হইল এই যে জড়পদার্থ ও বহির্জগতের কোন বাস্তবসত্তা নাই। উহারা মানসপ্রসূত কল্পনা বিশেষ মাত্র অর্থাৎ মন দ্বারাই উহারা গঠিত হয়। জড়বাদের এই অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্যতাকে ইংরাজীতে Paralogism of materialism বলে।

এই অস্পষ্টতা ও অসামঞ্জস্যতা দোষই জড়বাদের প্রধান দোষ নহে। যে দার্শনিক যুক্তির উপর এই জড়বাদ প্রতিষ্ঠিত তাহাতে যে অসামঞ্জস্যতা বিদ্যমান আছে তাহাই জড়বাদের প্রধান দোষ। জড়বাদিগণের মতে মৌলিক জড়পদার্থ অবিনশ্বর ও অপরিবর্ত্তনীয়। জড়বাদীরা আরও বলিয়া থাকেন যে মৌলিক সত্যবস্তুর কোনও পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নয়। কিন্তু আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে এই জড়বাদিগণই আবার বলিয়া থাকেন যে সর্ব্বপ্রথম হইতে সর্ব্বপ্রকার জড়পদার্থগুলি পরস্পর ঘাত প্রতিঘাত করিয়া নিজেও পরিবর্ত্তিত হইতেছে আবার অন্যকেও পরিবর্ত্তিত করিতেছে। সুতরাং জড়পদার্থ যদি সত্য বস্তু হয় তবে আমরা মানিতে বাধ্য হই যে সত্যবস্তু অনবরতঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে আর এই হাজার হাজার পরিবর্ত্তনের মধ্যে নিজে যা ছিল তাহাই রহিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে গোড়াতে জড়বাদিগণ মৌলিক জড়পদার্থের যে পরিবর্ত্তন নাই বলিয়া কথাটা বলিয়া ছিলেন তাহা শেষ পর্য্যন্ত তাহারা মানিয়া চলেন নাই। পরন্তু ঐ কথাটীর ঠিক বিরুদ্ধ উল্টা কথাটা মানিয়া লইয়াছেন। এই কথাটীর সঙ্গে প্রশ্ন উঠিতে পারে—যদি অনবরত পরিবর্ত্তন হওয়াই এবং এই অপরিমিত পরিবর্ত্তনের মধ্যে আপনার স্বরূপত্ব বজায় রাখাই যদি মৌলিক সত্য বস্তুর চিরন্তন স্বভাব হইল তবে সেই প্রকারের কোন কিছু আমরা কোথাও জানিতে পারিয়াছি কি না? ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে ঐরূপ বস্তুর পরিচয় আমরা আমাদের আপন আপন ব্যক্তিত্বে পাইয়া থাকি। জড়জগতে ঐরূপ বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। জড়পদার্থ পরিবর্ত্তিত হইলে তাহা আমূল পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু আত্মা ও মনের তেমন পরিবর্ত্তন হয় না। তবে জড়বাদিগণ বলিতে পারেন—কেন, কল্পনা করিয়া লইয়াইত পরিবর্ত্তিত জড়পদার্থে তাহার পূর্ব্বতন স্বরূপ বজায় থাকিয়া যায়। ইহার উত্তরে আমরা বলিব দর্শন শুধু কল্পনার জিনিস নয়। আরও বলা যাইতে পারে—জড়বাদিগণত কল্পনাকে একবারে অগ্রাহ্য করেন, তবে আবার কল্পনার স্মরণ লওয়া কেন? কল্পনার সহিত অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য থাকা কর্ত্তব্য, নতুবা কল্পনার কোন মূল্য থাকে না। যদি উদাহরণ দিয়া তেমন কিছু দেখাইতে পারি তবেই কল্পনা সার্থক হয়। সে উদাহরণ শুধু আমাদের আপন আপন আত্মায় পাওয়া যায়। জন্মাবধি আমরা সকল বিষয়ে কতপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছি। আমাদের শরীর মন ও অভিজ্ঞতার দিন দিন কত অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। শিশু যুবা হইতেছে, যুবক প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিতেছে, প্রৌঢ় যে সে আবার বৃদ্ধ হইতেছে, ধনী নির্ধন হইতেছে, কাঙ্গাল যে সে আবার ক্রোড়পতি হইয়া দাঁড়াইতেছে, জ্ঞানহীন পণ্ডিত হইতেছে, এইরূপ আরও কত প্রকারে যে আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছি তাহার কেহও সংখ্যা করিতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এত পরিবর্ত্তনের মধ্যে আমরা যা' ছিলাম তাহাই ঠিক থাকিতেছি অর্থাৎ কিনা আমাদের স্বরূপ যাহা ছিল, তাহাই

রহিয়া যইতেছে এবং বুঝিতেছি ও প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের মূল প্রকৃতির অর্থাৎ আমাদের স্বরূপের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না অর্থাৎ আমাদের অন্তরাত্মার সাময়িক অবস্থা ও অনুভূতির মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে কিন্তু ভিতরকার মূল সত্তাটুকুর বিন্দুমাত্রও বিপর্য্যয় ঘটিতেছে না। লটছা লিখিয়াছেন—

"Spirit alone is a unity for it feels and asserts itself to be such. It alone has changing states, which yet do not remove its identity, for the simple reason that, at the same time that it feels them, it only allows them to rank as states of itself and refers them to its identical core of being."

জড়বাদিগণ যদি এই কথাটীর উপর লক্ষ্য করেণ তবে তাহারাও আমাদের সঙ্গে স্বীকার করিবেন যে বিশ্বের আদি সত্তা জড় নয় চেতন এবং উহার প্রকৃতি আধ্যাত্মিক ও মনধর্ম্মাবলম্বী (mental.)

এই দার্শনিক যুক্তি প্রণালীর অসামঞ্জস্যতা দোষটী ব্যতীত আরও একটী তৎ সমতুল্য দোষ এই জড়বাদে দেখিতে পাওয়া যায়। জড়বাদিগণের কথিত মতে যদি আমরা ধরিয়াই লই যে এই বিশ্বের আদিভূত সত্তা জড়, তবে আমরা এমন কঠিন ও জটিল সমস্যার মধ্যে পতিত হই যে তাহা মীমাংসা করা জড়বাদিগণের পক্ষে কঠিন হইয়া পরে। বিশ্বের আদিভূত সত্তা যদি জড় হয় তবে তাহা হইতে প্রাণ ও মন কি করিয়া উদ্ভূত হইল তাহা মীমাংসা করা খাটি জড়বাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। জড় হইতে জড়ের জন্ম হইতে পারে কিন্তু জড় হইতে প্রাণ ও মন জন্মিতে পারে না। কিন্তু এই বিশ্বে আমরা প্রাণের ও মনের অসংখ্য পরিচয় পাইতেছি। যে মৌলিক জড়পদার্থ হইতে এই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া জড়বাদিগণ বিশ্বাস করেন তাহা যদি এই প্রাণ ও মনের ব্যাখ্যা দিতে না পারিল তবে জড়বাদিগণের কথাও বিশ্বাস যে ভ্রমপূর্ণ সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। লটছা লিখিয়াছেন—"We can therefore say that materialism of this kind is no more than a matter of words."

তবে জড়বাদ হইতে যে আমাদের কিছুই শিক্ষণীয় নাই তাহা সত্য নয়। জড়বাদ অবিশ্বাস্য ও ভ্রমপূর্ণ হইলেও আমাদিগকে এই কথাটা নির্দেশ করিয়া দেয় যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত কার্য্য প্রণালীতে জড়পদার্থকে অজ্ঞান ভাবে কর্ম্ম করিতে দেখি প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ জড়পদার্থ প্রাণমনহীন জড় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও জড় নহে। একটু ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় এই বিশ্বে যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে তাহার মধ্যে দুইটী মৌলিক গুণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে উহাদের একটী গুণ হইতে বৃক্ষলতা পশুপক্ষী ও মানব-মন উদ্ভূত হয় এবং অপর গুণটী হইতে যাহা জড় বলিয়া সাধারণতঃ চোখে পরে তাহার কারণ (condition) সম্বন্ধ (relation) ও নিয়ম (law) উদ্ভূত হয়।

এইরূপে দেখা যাইতেছে আমরা জড়বাদ হইতে ক্রমে ক্রমে ইংরাজীতে যাহাকে Parallelism বলে সেই বাদটীতে আসিয়া পড়ি। এই মতানুসারে লটছা বলেন বিশ্বের আদিভূত সত্তা আত্মাও (Sprit) নয়, জড়ও নয় (matter), তবে উহা এমন একটী বস্তু যাহা হইতে জড় ও আত্মার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

লটছা এই মতটা যুক্তিপূর্ণ ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন না। কারণ চেতন ও অচেতন পদার্থের সমন্বয়কারী কোনও বস্তুর কল্পনা করিতে আমরা পারি না। আর কল্পনা করিতে পারিলেও ঐরূপ বস্তুকে চোখের সামনে তেমন ভাবে আমরা ধরিতে পারি না। চেতন ও অচেতন পদার্থ ব্যতীত অন্য কোনও উচ্চতম পদার্থও আমরা চিন্তা করিতে সক্ষম নই। একই বস্তু চেতন ও অচেতন হওয়ায় সম্ভবপর নয় সুতরাং দেখা যাইতেছে parallelism এর কথা মানিয়া চলিলে হয় আমরা আদি সত্তাকে অচেতন নয় চেতন বলিয়া অবশেষে ধরিয়া লইতে বাধ্য হই। যদি আমরা আদি সত্তাকে অচেতন ধরিয়া বসি, তবে আমরা জড়বাদিগণের দলে যাইয়া মিশিয়া পড়ি। আর যদি আদি সত্তাকে চেতন বলিয়া ধরি, তবে আমরা জ্ঞানবাদী হইয়া পড়ি। পূর্ব্বেই আমরা জড়বাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছি। এখন আমরা লটছার পথানুসরণে জ্ঞানবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জ্ঞানবাদ বা Idealism যদি বিশ্বের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা হয়, তবে আমাদিগকে সর্ব্ব প্রথম ভাল করিয়া

বুঝিতে হইবে জড়বাদ ও জ্ঞানবাদের মধ্যে বিশেষ তারতম্য কোনস্থানে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি জড়বাদিগণের মতে মন আত্মা ও চিন্তা প্রভৃতি যবতীয় মানসিক ব্যাপার জড়পদার্থ হইতে সম্ভূত। জড়জগত হইতে উহাদের পৃথক কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কিন্তু জ্ঞানবাদিগণ উহার ঠিক বিপরীত কথাই বলিয়া থাকেন। ইহাদের মতে আমাদের অভিজ্ঞতা যাহাকে জড়জগৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, তাহা আমাদের মনের দ্বারা সৃষ্ট পদার্থ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা জড় বলিয়া জানি তাহা আমাদের মানস রাজ্যেই অবস্থান করে এবং মন হইতে তাহা জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানবাদিগণের মতে একটী আদিভূত ইচ্ছাশক্ত (will) আপন উদ্দেশ্য (idea) সিদ্ধির মানসে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড গঠিত করিয়াছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তে এই বিশ্বের উৎকর্ষতা বর্দ্ধিত করিতেছে।

এই জ্ঞানবাদটিই যে যথার্থ যুক্তি সঙ্গত তাহা আমরা মনোবিজ্ঞানের দিক হইতেও বুঝিতে পারি। যে প্রণালীতে আমরা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি আর জ্ঞানলাভ করিবার ক্ষমতা আমাদের কতখানি এই-দুইটি দিক হইতে আমাদের জ্ঞান রাজ্যের সমালোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে জড়জগতের যাহা কিছু অস্তিত্ব তাহা আমাদের মানস রাজ্যেই। আমরা আমাদের চিন্তা অনুভূতি ইত্যাদি মানসিক অবস্থার বাহিরে কোনও কিছু বুঝিতেও পারি না জানিতেও পারি না। শুধু আমরা এইটুকু বুঝি যে আমাদের মানস রাজ্যের বাহিরে এমন কিছু আছে, যাহার জন্য আমাদের মনে অনুভূতি জাগিয়া উঠে। কিন্তু সেই বস্তুটি যে কি তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। স্পেনসারের ভাষায় উহা অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত (unknown and unknowable)। এই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত রাজ্যের প্রভাবে আমাদের মানস রাজ্যে যে সমস্ত অনুভূতি জাগিয়া উঠে তাহা হইতেই আমরা একটী বিশ্বরাজ্যের কল্পনা গড়িয়া ফেলি। যে জড়জগতের উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠীত, তাহা এই কল্পনা গঠিত জগৎ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে উল্লিখিত অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত শক্তি আমাদের দর্শনের জ্ঞান ও চেতনা বিশিষ্ট আদ্যা শক্তি (Spritual or mental power) হইতে পারে কি না। অর্থাৎ জ্ঞানবাদিগণের মতে যে আদ্যাশক্তি আপন উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আপনাকে বিবর্ত্তীত করিয়া এই বিশ্ব রাজ্য গঠিত করিয়াছেন ও করিতেছেন সেই আদ্যাশক্তি আর এই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় শক্তি যাহার প্রভাবে আমাদের অনুভূতি প্রভৃতি মানসিক অবস্থা জাগিয়া উঠিতেছে তাহা এক হইতে পারে কিনা। ফিকটে, সেলিং হিগেল প্রভৃতির মত লটজাও জ্ঞান বাদটাই যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। বিজ্ঞান বাদের তথা কথিত জড়জগতের অস্তিত্ব থাকিলেও তাহা আমারা কোন মতেই জানিতে পারিতাম না। কিন্তু এখন কথা হইতেছে এই যদি মন ধর্ম্মাবলম্বী কোনও আদ্যাশক্তি দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে তবে আমরা কেমন করিয়া জড়ের প্রকৃতিগুলি ব্যাখ্যা করিতে পারি। আমরা জানি জড়-পদার্থের আকৃতি (form) ও বিস্তৃতি আছে। মানসিক অনুভূতির কোনও বিস্তৃতিও নাই আকৃতিও নাই। তবে সমস্যা হইল এই—মানসরাজ্য হইতে জড়পদার্থের ঐ দুইটী গুণের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর কিনা এবং সম্ভবপর হইলে কেমন করিয়া মন হইতে ঐ দুইটী গুণের জন্ম হয়। লটজার মতে জ্ঞানবাদীগণের দিক হইতে ঐ সমস্যার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। লটজা বলেন—The properties of matter are no obstacle to this view. লটজা আরও বলেন—There is nothing in any of these properties to compel us to assume a something which stands originally in opposition to what is real in spirit (p 51.) অর্থাৎ কিনা জড়জগতের কয়েকটা বিশেষ প্রকৃতি আছে বলিয়াই যে জ্ঞানবাদ অসত্য হইবে এমন কোনও কথা নাই। ঐ সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে এমন কোন কিছু নাই যেহেতু আমরা আমাদের জ্ঞানবাদকে অযৌক্তেয় বলিয়া ধরিয়া লইতে বাধ্য হইব। এই কথাটী প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত লটজা জড়পদার্থের গুণাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন জড়পদার্থের গুণের সহিত জ্ঞানবাদের কোনও বিরোধ নাই।

প্রথমতঃ লটজা জড়পদার্থের বিস্তৃতির কথা আলোচনা করিয়াছেন। ইংরেজীতে বিস্তৃতিকে extension ও বলা যায় space ও বলা যাইতে পারে। হিন্দুদর্শনে বিস্তৃতির পরিবর্ত্তে ব্যোম বা আকাশ ব্যবহৃত হয়। আমরা ইংরাজ

সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া space শব্দটাই ভাল বুঝি। তবে বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে বলিতে গেলে আমার মনে হয় extension কথাটা অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও অর্থযুক্ত। পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন আমি space এই শব্দটাই ব্যবহার করিব।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় আমরা সকলেই space এর মধ্যে অবস্থান করিতেছি। চেতন অচেতন পদার্থ সকলই space এর মধ্যে রহিয়াছে। এই সকল পদার্থ যদি একবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তথাপ space যেমন আছে তেমনই থাকিবে। space অবিনশ্বর ও অনন্ত। সাধারণতঃ আমাদের মনে হয় আমাদের মনের সহিত space এর কোনও সম্পর্ক নাই, বিশ্বরাজ্যে যদি সমস্ত চিন্তাশক্তি বা মন বিলুপ্ত হইয়া যাইত তবেও space এর কিছুই হইত না। space যেমনটী ছিল তেমনটীই থাকিত। এখন কথা হইতেছে এই যে এই সাধারণ বিশ্বাসটীর গোড়ায় কতটুকু সত্য নিহিত আছে? বিখ্যাত দার্শনিক ক্যাণ্ট প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সুবিস্তৃত বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রণালী দ্বারা দেখাইয়াছেন যে এই সাধারণ বিশ্বাসটী ভ্রমপূর্ণ ও গ্রহণ যোগ্য নহে। ঐ সকল দার্শনিক যে যুক্তি সঙ্গত মতটী নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দর্শন শাস্ত্র হইতে আমরা এই সত্য লাভ করি যে আমরাই এজগতের একমাত্র সত্যবস্তু নহি। আমরা ব্যতীত আরও অনেক অগণ্য সত্যবস্তু এই বিশ্বে বর্ত্তমান আছে এবং প্রতি নিয়ত তাহারা কার্য্য করিতেছে ও পরস্পরের উপর ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে। এই সমস্ত সত্য বস্তুর প্রকৃতি সর্ব্ব বিষয়ে এক নহে। তাহাদের প্রকৃতিতে অনেক বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রকারের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত সত্য বস্তুর বিস্তিতি নাই এবং ইহারা space এর মধ্যে অবস্থানও করে না। তাহাদের প্রকৃতিগত বৈষম্য হেতুই তাহাদের মধ্যে যা কিছু পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। সত্যবস্তু সমূহের মধ্যে যখন তাহাদের প্রকৃতিগত গুণাবলি একই প্রকারের বলিয়া বুঝিতে পারি তখন আমরা ঐ সকল সত্য বস্তুকে যেমন এক জাতীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করি ঠিক তেমনই অন্য বস্তুর গুণাবলীর বৈষম্য হেতু তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিভিন্ন প্রকারের বলিয়া ধরিয়া লই। সত্যবস্তুর মধ্যে যাহা কিছু বৈষম্য তাহা তাহাদের গুণের পার্থক্য জন্যই এই সকল সত্য বস্তুকে একটী সঙ্গীতের স্বর লহরীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই স্বর লহরী পরস্পর হইতে পৃথক থাকিয়াও যেমন ওতঃপ্রোত ভাবে তাহারা জড়িত হয় ও তাহার ফলে সুমিষ্ট সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া বসে তেমনই সত্য বস্তুগুলি পৃথক থাকা সত্ত্বেও অর্দ্ধাঙ্গী ভাবে জড়িত হইয়া এই বিশ্ব গঠিত করিয়া ফেলিয়াছে। সঙ্গীতের স্বর লহরীর মধ্যে যেমন কোনও ব্যবধান নাই তেমনই এই সত্য বস্তুগুলির মধ্যে কোনও স্থানের ব্যবধান নাই। কিন্তু যদিও এই সকল সত্য বস্তুর সহিত Space এর কোনও সম্পর্ক নাই তথাপি আমাদের মনের উপর তাহারা আঘাত করিতে পারে। এই আঘাতের ফলে আমাদের মানস রাজ্যে যে অনুভূতি জাগিয়া উঠে তাহাদের অর্থ অবধারিত করিতে যাইয়া বিশ্ব রাজ্যের মধ্যে আমরা Space এর কল্পনা করিয়া বসি এবং সমস্ত বস্তুই Space এর মধ্যদিয়া দেখিতে থাকি এবং সমস্ত চিন্তার মধ্যে Space এর কল্পনাটী জড়াইয়া ফেলি। অর্থাৎ আমরা সত্য বস্তু হইতে যে আঘাত পাই এবং যে আঘাত হইতে আমাদের মনে অনুভূতি জাগিয়া উঠে তাহার উপর আমাদের মন প্রতিঘাত করে এবং ঐ সকল আঘাতকে স্থান জ্ঞাপক সম্বন্ধতে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহাদের এই ব্যাখ্যা প্রদান করে যে যে সকল সত্যবস্তু হইতে আমরা ঐ সকল আঘাত প্রাপ্ত হই তাহারা যে বিশ্ব জগতে অবস্থিত তাহা অনন্ত বিস্তৃত Space এ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরাও ঐ সকল সত্যবস্তু এই বিরাট ব্যোমে অবস্থান ও চলা ফেরা করিতেছি এবং আমরা অন্যান্য সত্যবস্তু হইতে আঘাত পাইতেছি। এই সকল সত্যবস্তু মধ্যে অশেষবিধ সম্পর্ক বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের এই কল্পিত বিশ্ব বাস্তব বিশ্বের সহিত কিছুতেই এক হইতে পারে না। বাক্য ও ভাব যেমন পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে ঠিক তেমনই আমাদের কল্পিত বিস্তৃতি বিশিষ্ট বিশ্ব বাস্তব বিশ্বের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের হইলেও উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের কল্পনা গঠিত বিশ্ব স্থিত সত্য বস্তুর মধ্যে আমরা যে সকল সম্বন্ধ অবধারিত করি তাহা বাস্তব বিশ্ব স্থিত সত্যবস্তু মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ বাস্তবিকই বিদ্যমান

আছে তাহাদের চিহ্ন (Symbol) মাত্র। এইরূপ কল্পনার সাহায্যেই আমরা আমাদিগকে বিশেষতঃ আমাদের শরীরটাকে এই ভাবে দেখিয়া ফেলি যে আমাদের মনে হয় যে আমরা একটু স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা Space এর মধ্যে অবস্থান করিতেছি না, Space ই আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছে এবং ঐ Space কে আমাদের মনই কল্পনা ও সৃষ্টি করিয়াছে।

যাহারা দুপাতার মধ্যে দর্শনের মূল সূত্র জানিতে চাহেন তাহারা লটছার Philosophy of Religion নামক গ্রন্থখানির ৫২ ও ৫৩ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। জ্ঞানবাদিগণ Space সম্বন্ধে যে মতটী পোষণ করেন তাহা লটছা ঐ খানে যে ভাবে কহিয়াছেন তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য প্রদত্ত হইল। "We ascribe to ourselves or rather to our bodies, a difinite place in the space thus intuited, but as a matter of fact it is not we who are in space, but it is space which is in us."

দ্বিতীয়তঃ লটছা বিজ্ঞান জগতে শক্তিপুঞ্জের কথা বলিয়াছেন। সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই জড় জগতের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাত রহিয়াছে। কিন্তু জ্ঞান জগতে তেমন কোনও ঘাত প্রতিঘাতের খবর আমরা পাই না। এখন প্রশ্ন হইল এই—জ্ঞান বাদের দিক হইতে বিজ্ঞান জগতের এই শক্তিপুঞ্জের ন্যায় সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে কিনা? ইহার উত্তরে লটছা বলিয়াছেন ঘাত প্রতিঘাত করে বলিয়াই যে ঘাত প্রতিঘাত কারী শক্তিকে জড় বলিয়া ভাবিতে হইবে এমন কোনও ন্যায় সঙ্গত যুক্তি নাই। বরং ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে যাহা কিছু শিক্ষণীয় আছে তাহার অর্থ এই যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কতকগুলি শক্তি এক জাতীয় অর্থাৎ মিত্রশক্তি এবং অপর কতকগুলি শক্তি বিভিন্ন জাতীয় অর্থাৎ বিরোধী শক্তি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জড় বলিয়া পরিকল্পিত হইলে যেমন শক্তিপুঞ্জের মধ্যে ঐক্য ও অনৈক্য থাকিতে পারে ঠিক তেমনই আমরা যদি বিশ্বাস করি এই বিশ্ব চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি হইতে উদ্ভুত তথাপি ঐ শক্তিপুঞ্জের মধ্যে ঐক্য অনৈক্য থাকিতে পারে। লটছা এই শক্তিপুঞ্জের সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন যে জ্ঞান জীবন সম্পন্ন আত্মার পরিকল্পনার ফলেই ঐ শক্তিপুঞ্জকে আধ্যাত্মিকতা শূন্য বাহিরের জড়জগতের বস্তু বলিয়া বোধ হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা আমাদের মত জ্ঞান জীবনময় আধ্যাত্মিকতা বিশিষ্ট সত্যবস্তুর অন্তর্নিহিত অবস্থার ফল স্বরূপ। অর্থাৎ লটছার মতে চিন্ময় সত্যবস্তুর পারস্ফুটনের প্রক্রিয়া হইতে তথাকথিত জড়জগতের শক্তিপুঞ্জের আর্ভিাব হয়। ঐ শক্তিপুঞ্জ আমাদের মনের কলে পড়িয়া বাহিরের জড়জগতের বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে লটছা দেখাইয়াছেন যে জগতের গোড়াতে যে আদ্যাশক্তি বা আদিভূত সত্যবস্তু নিহিত আছে তাহা যদি আমরা আধ্যাত্মিক বলিয়া ধরিয়া লই, তবে জড়ের প্রকৃতিগুলি ও জড়জগতের শক্তিপুঞ্জকে তাহাদ্বারা আমরা সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি। বিজ্ঞান আলোচনায় যেমন আমরা একটা Hypothesis করিয়া লইয়া দেখি উহাদ্বারা সমস্ত বিষয় ব্যাখ্যা করা যায় কিনা, লটছাও এখানে তেমনই জ্ঞান বাদের Hypothesis টী ধরিয়া লইয়া দেখাইয়াছেন উহাদ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। লটছা আরও দেখাইয়াছেন যে অন্যান্য কোনও Hypothesis দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা যে জ্ঞানবাদই এই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা এবং আদ্যাশক্তি চিন্ময়ী জড় নহে।

বারান্তরে জ্ঞানবাদের এই চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি সম্বন্ধে লটছার আরও কয়েকটী কথা সুধীজনের নিকট উপস্থিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রিয়গোবিন্দ দত্ত, এম, এ, বি, এল।

সাহিত্যসেবীর সদুপদেশ।

সাহিত্যক্ষেত্রে সদ্য প্রবেশী লেখকগণের সাধারণকে অধৈর্য্য করিবার অদম্য অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতিভার দ্বারে ধন্না দিয়া ইঁহাদের অধিকাংশকেই বিফল মনোরথ হইতে হয়; কিয়দ্দিবস পরে ইঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থরাজীর সংখ্যাব্যতীত সাধারণের স্মৃতিপথে ইঁহাদিগকে জাগরুক রাখিতে অপর কিছুই অবশিষ্ট রহেনা। পাদরী ম্যারোলিস্ এই শ্রেণীর লেখক ছিলেন। দুরদৃষ্ট

ক্রমে জনসাধারণ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে বিমুখ হইলেও তিনি যে প্রতিভাশালী এবং মুদ্রাকরবর্গের অদ্বিতীয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই।

পাদরী ম্যারোলিস ভীষণ স্বেচ্ছামান লেখক ছিলেন; মুদ্রনস্পৃহা তাঁহার ইদৃশ বলবতী ছিল যে, তিনি তদীয় বন্ধুবর্গের নামের সুদীর্ঘ ও সুশৃঙ্খলিত তালিকা প্রকাশেও কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন না। তাঁহার লিখিত একখানি গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে তাঁহাকে যাঁহারা পুস্তকদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের নামও যোজিত হইয়াছিল। দেখা গিয়াছে, তিনি স্বব্যয়ে পুস্তক প্রকাশ করিতে উৎসাহশীল ছিলেন। জনৈক সুপ্রতিষ্ঠ সমালোচক ম্যারোলিসের পুস্তক সমালোচন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, আমি পাদরী সাহেবের পুস্তকের প্রশংসা করি, তাহার কারণ এই যে পুস্তকগুলির বাঁধাই এত সুন্দর এবং সেগুলি এরূপ পরিষ্কার ,পরিচ্ছন্ন যে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।

জীবনের শেষভাগে অপর কার্য্য হাতের মাথায় না পাইয়া পাদরী মহাশয় বাইবেল গ্রন্থের অনুবাদরূপ বিরাটকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তদীয় সংস্কার স্পৃহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিচারসভা উহা অচিরাৎ বন্ধ করিয়া দেন। কাব্য জগতে ও ম্যারোলিস মহারথীরূপে মস্তকোত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিবেচনাশক্তির বিন্দুমাত্র ব্যয় না করিয়া অনায়াসে কবিতার ঝঙ্কার তুলিয়া সাধারণকে চঞ্চল করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহার নাম সার্ব্বজনীন আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছিল। ম্যারোলিস স্বলিখিত জীবনবৃত্তে সমসাময়িক সুধীবর্গ তাঁহার প্রতি সুবিচার করেন নাই বলিয়া তীব্র অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এতদ্দেশীয় জনসাধারণের আনন কৃতজ্ঞতার আবেশে রঞ্জিত না হইলেও মদীয় অশ্রান্ত লেখনি অটল অধ্যবসায় সহকারে তাঁহাদের দ্বারে সর্ব্বসমেত ১৩২১২৪টি কবিতা অর্ঘ্যরূপে উপস্থিত করিতে বিমুখ হয় নাই। পাদরী সাহেবের অধ্যবসায়ের ইহাই চূড়ান্ত নিদর্শন নহে। অনুবাদক মূলের মর্ম্মগ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াও যে কতদূর জঘন্য অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারেন, তাহার মূর্ত্তিমান সাক্ষ্যের অবতার তিনি।

জীবনের প্রথমভাগ হইতেই উক্ত দূরদৃষ্ট লেখক অত্যন্ত উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। প্রথমতঃ তিনি রাজনৈতিক মহারথীরূপে জাকিয়া বসিতে চেষ্টিত হন; তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া সাহিত্যের সেবার্থ আপনাকে উৎসর্গ করেন! মৌলিক লেখকোচিত সামর্থ্যের অভাব বশতঃ তিনি অনুবাদকের অপেক্ষাকৃত সরলপথে সুপ্রতিষ্ট হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিদারুণ দুর্ভাগ্য তাঁহার নিত্যসহচর বলিয়া তৎপ্রণিত অন্যূন অশীতি সংখ্যক বিপুলাবয়ব গ্রন্থরাশির একখানিও সমালোচকবর্গের প্রীতিপ্রদ হয়নাই।

ম্যারোলিসের একটী অনন্য সাধারণ গুণ ছিল, যাহা সাহিত্যসেবীর মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট হয় না, তাহা এই যে, তিনি বিনয়ী এবং সত্যসন্ধ ছিলেন। কোন কঠিন অংশের অনুবাদে অসমর্থ হইলে তিনি তৎপার্শ্বে লিখিয়া রাখিতেন—আমি এ অংশের অনুবাদ করিতে নিরস্ত হইলাম, কারণ, ইহা বড়ই দুরূহ—প্রকৃতপক্ষে ইহা আমার অবোধ্য।

লেখকদের একটী ধর্ম্ম আছে, ছাপার অক্ষরে স্বীয় রচনা দেখিলে তাঁহারা যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহার তুলনায়--"সুখানি গোষ্পাদয়ন্তে ব্রহ্মাণ্যপি" ব্রহ্ম সুখও অতি তুচ্ছ বোধ হয়। ম্যারোলিস জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করিতে নিরতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার পুস্তক পাঠ করিবার উপযুক্ত লোক সমাজ দীর্ঘকাল সরবরাহ করিতে পারে নাই; অচিরেই তৎসংখ্যা অসম্ভবরূপে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছিল। এজন্য ম্যারোলিস পরিশেষে স্বীয় বন্ধু বান্ধব বর্গের মধ্যেই তাঁহার নব প্রকাশিত পুস্তকগুলি বিতরণ করিয়া তদীয় নিস্পৃহ বদান্যশক্তির সুপরিচয় প্রদানের সুন্দর অবকাশ লাভে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

যিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ভরিয়া মহান্ আত্মত্যাগ ও অপূর্ব্ব অধ্যবসায় সহকারে সাহিত্য সেবির কঠোর জীবন যাপন করিয়াছেন, জনসাধারণ যে তাঁহার জীবনবৃত্ত অবগত হইবার জন্য অত্যুগ্র আগ্রহ সহকারে প্রতীক্ষা করিবে তীক্ষ্ণধী ম্যারোলিস ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। তিনি সাধারণের আকাঙ্খা পরিপুরণার্থ তদীয় স্বভাবদৃঢ় পর

হিতৈষণা প্রণোদিত হইয়া অসামান্য ক্লেশ সহকারে আত্ম জীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। উক্ত জীবন বৃত্তের ভূমিকায় ম্যারোলিস সাহিত্যিক বর্গের প্রতি যে অমূল্য উপদেশ দান করিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য।

"আমি আপনাদিগকে বলিতে ভুলিয়াছি যে, আমি আমার আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধব বর্গের কাহাকেও আমার ন্যায় শিক্ষা সাধনায় বিশেষতঃ যশ কিংবা সম্পদের প্রত্যাশায় পুস্তক রচনা কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পরামর্শ দান করি না। আপনাদিগকে একটী কথা না বলিয়া পারিলাম না, জগতের মধ্যে সাহিত্যিকগণ যত তুচ্ছের পাত্র অপর কেহ তত নহে। সাহিত্যের সেবা করিয়া যাহারা প্রতিষ্ঠ হইয়াছেন (বর্ত্তমান দুই তিন জনের অধিক নাম আমার মনে হইতেছে না) তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে তাহাতে উহা কাহারও মনের উপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ নহে। উহাতে এমন কিছুই নাই যাহা কারণরূপে দর্শাইয়া কাহাকেও তৎপ্রতি প্ররোচিত করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে। ইহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ এবং আমার পরিচিত বহু ব্যক্তি যাহারা সম্প্রতি আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিয়া সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপদ হইয়াছেন তাহারা, উহা সমর্থন করিবেন। ভদ্র মহাশয়গণ, আমার কথা প্রনিধান করুন, আপনাদিগকে যদি সৌভাগ্যশালী রূপে জাকাইয়া তুলিতে চাহেন, তবে স্বার্থকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্য দান করিবেন।

"যাহারা সম্পদ বা প্রতিষ্ঠাশালী, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের খোসামোদী এবং হাঁ-হুজুরী করিতে হইবে। যাহাতে আপনাদের সাজসজ্জা ও সাধারণের আকর্ষণীয় হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। শক্তের ভক্ত সাজিতে পর্য্যাপ্ত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবেন। পদস্থ ব্যক্তিবর্গ যখন আপনাদিগকে বিদ্রূপ এবং অবজ্ঞাভাজন করিয়া তাঁহাদের অন্তরঙ্গের সম্মান দান করিবেন ও আপনাদের সহিত রস-রঙ্গে প্রমত্ত হইবেন, তখন আপনাদিগকে তাঁহাদের বদন চাহিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে মুচ্‌কি হাসিতে হইবে। চক্ষু লজ্জার মাথা চিবাইয়া খাইবেন, হৃদয় প্রস্তরের তুল্য দৃঢ় করুন। সৎলোকেরা বিপন্ন হইলে তাহাদিগকে অপমানিত করিতে ক্রটী করিবেন না। সত্যকথা পার্য্যমানে বলিতে যাইবেন না। সুকৌশলে ধর্ম্মের ভড়ং দেখাইয়া সাধু সাজিবেন অথচ যাহাতে স্বার্থের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় এরূপ কর্ত্তব্যসমূহ দ্বিধাশূন্যচিত্তে লঙ্ঘন করিতে নিত্য তৎপর থাকিবেন। ভদ্রমহোদয়গণ, উক্ত গুণগুলি যদি অর্জ্জন করিতে পারেন তবে অপর কিছু বাহুল্য মনে করি।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

সন্ধ্যায়।

নীল আকাশে সূর্য্য ঠাকুর ডুব্‌ছে ধীরে ধীরে,
রক্ত মাখা অস্ত কিরণ পড়্‌ছে বকুল শিরে;
কিরণ পেয়ে রক্তে রাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘের তরী,
ছুট্‌ছে যেন তড়িত বেগে স্বর্গ বিজয় করি;
মেঘে গড়া আকাশ ভরা যোদ্ধা সৈন্যদল,
একে একে তীর ধনুকে দেখায় বাহুবল;
একদিকেতে মহাবিজয় অন্য দিকে ক্ষয়,
আকাশ খানি রক্তে রাঙ্গা রক্ত গঙ্গা বয়!
শকুনি, গৃধিনী যত উর্দ্ধমুখে ধায়,
রক্ত পাণে তৃপ্ত করে রুধির পিপাসায়;
স্বর্গে আজি বিজয় রোল বিজয় কেতন হাসে?
সেই বিজয়ে বিশ্ব যেন নাচে জয়োল্লাসে!
বকুল তলে বকুল ফুলে হাস্‌ছে বিজয় হার!
উড়ো পাখীর শ্যামল পাখা বিজয় পতাকার!
মাঠখানি আজ শ্যামল ধানে বিজয় নিশান গড়ে!
ধীর বাতাসে শ্যামল ঘাসে বিজয় কেতন নড়ে!
আঁধার নাশি জয়োল্লাসী উঠ্‌ছে শশী হাসি!
প্রাণের বিষাদ বিজয় করে পুলক বাজায় বাঁশী!
সন্ধ্যা-রাণীর আনন খানি দিব্যালোকে মাখা।
আঁধারকে তার বিজয় করে আলোক নিয়ে থাকা!
আজ্‌কে আমার পরাণ প্রিয়ার প্রেমের বিজয় হার,
বিরহটা বিজয় করে দিচ্ছে উপহার;
বিষাদ ব্যথা জয় করে যে সোহাগ ভরে ডাকে,
বিশ্বভরা বিজয়ের রোল- বিজয়-রেণু মাখে!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

চাষার গান।

(২)

চাষার গানের আর একটা বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে শব্দসম্পদের সাময়িক উত্তেজনা নাই। ইহা প্রাণের ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হয়। গৈরিক নিঃস্রাবের মত যখন বুকের আটকানো বা জমানো ভাব সম্পদ মুখ দিয়া বাহিরে আইসে তখন শব্দের ওজন করিবার অবকাশ থাকে না, অভিধান খুলিবার বা আওড়াইবার সময় হয় না ;—যাহা ভাবের বেলায় মুখ দিয়া বাহির হয় ঐ ই বেশ। শব্দ বদলাইয়া দেওয়া বা মিল খুঁজিতে হয়রাণ হওয়ার হাঙ্গামা ইহাতে নাই। স্বতঃ নিঃস্থত গঙ্গা যমুনার ধারার মত এই সঙ্গীত একান্তই স্বাধীন এবং পরম পবিত্র। চাষা যখন গায়—

পরাণ বঁধুরে—
ঘরের কোণায় থাকিরে আমি, তুমি থাকরে মাঠে,
কাঠ ফাটা রইদে (রৌদ্রে) রে তোমার মাথা ফাটে,
তোমার লাগিয়া বন্ধুরে আমি ছেঁওয়ায় (ছায়ায়)
পাইরে যে তাপ।
কি জানি কোন্ জন্মেরে-বন্ধু কইরাছিলাম পাপ।
শাওনের রৈদরে বন্ধু নিমের পাতার তিতা
বিচ্ছেদ হৈতে অনেক ভাল তেঁতৈ (তেঁতুল)কাঠের
চিতা।

তখন কি মনে হয় না চাষা তাহার মনের দমকা হাওয়া মুখে বাহির করিবার সময় পাঁজি পুথি খোঁজ করে নাই, কিম্বা ছন্দবন্দের ছায়া মাড়ায় নাই ? সাহিত্যের আসরে এ সকল গানের মূল্য আছে কি না আমরা তাহা জানি না। সাহিত্যিকেরা সে সকলের শ্রেণী বিভাগ করিয়া যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিবেন। খোলা মাঠের রৌদ্রে চাষার মুখ হইতে যখন এই সকল গান বাতাসে মিশিয়া আমাদের বিশ্রামের আড্ডায় প্রবেশ করে, তখন আমরা একান্ত মুগ্ধ হইয়া যাই। যাহারা বড় বড় ভাব সম্পদের মহাসাগরে খেলামেলা করেন তাঁহাদের খবর লইয়া আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা এই চাষার গান যখনি শুনি তখনি মনে হয়—

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিয়া দিল প্রাণ।"

ষ্টার-মিনার্ভার কোকিলকণ্ঠবিনিন্দিত সঙ্গীত লহরী যেমন এক কাণ দিয়া প্রবেশ ও অপর কর্ণে প্রস্থান করে—চাষার মেঠো সঙ্গীত ত আমাদের তেমন ক্ষণস্থায়ী হয় না। হয়ত আমাদের পাড়াগাঁয়ে বাস করার অপরাধ ; কিম্বা চাষা ভূষার সঙ্গে বাস করি বলিয়া প্রতিবেশীদের গানগুলি অধিকতর মিষ্টি লাগে।

পল্লীর নিরক্ষর কবিগণের রচনার মধ্যে আমরা একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকি। বহু সংখ্যক সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া শ্রেণীবিভাগ করিতে পারিলে এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হইত। হয়ত তাহা দ্বারা কোনও গুপ্ততথ্য আবিষ্কারের উপায় হইত।

কথাটা "কানু ছাড়া কীর্ত্তন নাই"—এই প্রাচীন সত্য সর্ব্বত্রই পরিগৃহীত। পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিচ্ছেদ, বিরহ, মান প্রভৃতিতে কানুর একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু বৈবাহিক আচার অনুষ্ঠানে কানুর দেখা সাক্ষাৎ নাই। জন্ম, কর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি কার্য্যে আমরা কানুকে পাই না। "রাধাকৃষ্ণ" ততদূর পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন নাই। এ সকল ক্ষেত্রে রামসীতা ও হরগৌরীর অধিকার। রামের জন্ম, বিবাহ, উমার জন্ম, শিবের জন্ম তাঁহার তপস্যা এবং বিবাহ লইয়া এদেশের ঘর গৃহস্থালীর সঙ্গীত রচিত। 'কিষণজীর গান' ঘর গৃহস্থালীর নহে। সেগুলিকে নায়ক নায়িকার, প্রেমিক প্রেমিকার হাত ছাড়া করা যায় না।

বঙ্গের বৈবাহিক অনুষ্ঠানে রামসীতা বা হরগৌরীর গানেরই প্রসার। পূর্ব্ববাঙ্গালার কোনও কোনও স্থানে—হরগৌরীর আধিপত্যই বেশী, রাম সীতাও সেখানে সম্মানিত। কিন্তু কোনও কোনও স্থানে হরপার্ব্বতীর গানের চেয়ে রামসীতার গানের আদর বেশী। এ মর্য্যাদা নূতন নহে। অনেককাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে।

এই সকল পল্লী সঙ্গীত সম্বন্ধেও আমাদের একটা বক্তব্য আছে। সঙ্গীতগুলি আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়—আমাদের মেয়েলী সঙ্গীতও পল্লীর নিরক্ষর কবির রচিত। এমন কি কোনও কোনও গান বৌ-ঝিদের রচিত বলিয়াও মনে হয়। মেয়েদের গানের

মধ্যে কতকগুলি এত অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট যে সেগুলি কি করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের আঙ্গিনায়ই বাঁচিয়া রহিল —বুঝিতে পারি না।

সে সকল সঙ্গীতের ভাষার পদরেণু স্পর্শ করিতে ভারতচন্দ্রও সমর্থ হয়েন নাই। ঐ সকল গান আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ প্রতিবেশিনী সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পাড়া বেড়াইয়া গাইয়া থাকেন। অবশ্য বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে ঐ সকল গানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমরা বুঝি না, কি করিয়া মা, মেয়ে, খাশুড়ী, বৌ একই দলভুক্ত হইয়া এই অশ্লীল গান গাহিয়া পাড়া প্রদক্ষিণ করেন। আজিও পাড়াগাঁয়ে এই অশ্লীল গানের আধিপত্য লুপ্ত হয় নাই। যাঁহারা এই সকল গানের রচক এবং রক্ষক তাঁহাদের রুচির চেয়ে চাষার গান রচয়িতার স্থান বহু উর্দ্ধে। চাষার গানে কখন কখন আমরা অশ্লীলতার গন্ধ পাই, কিন্তু তাহা আড়ালে ঢাকা, আর এগুলি স্পষ্ট।

চাষার গানের সময় অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ আছে। কিন্তু রাগ রাগিণীর সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে তাহারা নিরেট অজ্ঞ; লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহারা কদাচিৎ সকাল বেলায় ভাটিয়ালী বৈকালিক গান ধরে, কিম্বা অপরাহ্নে গোষ্ঠ গায়। তাহাদের শরীর মনের ধাত তাহাদিগকে এই স্বাভাবিক ক্ষমতা দিয়াছে কিনা জানিনা। তবে তাহারা যে এই নিয়ম কখনই লঙ্ঘন করে না, এমন কথা বলিতে পারি না যদি মনেলয় তবে তাহারা দিনকে রাত রাতকে দিন করিতেও নারাজ হয় না।

চাষার গানের ভিতর আজ কাল নিমাই সন্ন্যাস প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা অতি নূতন কিনা ঠিক জানিনা। সে দিন শেষ রাত্রে জ্যোৎস্না বড়ই নির্ম্মল ছিল, চারিদিকছাপাইয়া কোকিল পাপিয়া দোয়েল গাহিয়া উঠিতেছিল। তখনও রাত্রি পোহায় নাই। আমাদের বাড়ীর পাশের জমিতে চাষী পাটের সার--শুষ্ক গোবর ছড়াইতে ছড়াইতে গাহিতে ছিল—

কাঁচা সোণার বরণ গৌর আমার,
জনিক সন্ন্যাসীর সাথে,
ওগো তোমরানি কেউ দেখেছ যাইতে॥
হায়রে চাচর কেশ তার নবীন বয়েস হরির নামে বড় আবেশ,
বৈষ্ণবের বেশ।

ও নগরবাসী দেখ গো তোরা আমার নিমাই নি কেউ দেখেছ যেতে।

শয়ন মন্দিরে ছিল; নিশাভাগে কোথায় গেল হায় কি হলো।

সে যে মা বলিয়ে, ডেকে গেল অভাগী শুনলেম্না কাল নিদ্রা বশে।

হরির নামে মালা ঝুলছে গলে, একখানা নামাবলী শ্রীঅঙ্গেতে।

ওগো ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া, সে যে ধূলায় পড়ে কাঁদতে আছে।

তোমরা নি কেউ দেখেছ যেতে॥"

এমনই মধুর কণ্ঠে--বুঝি অশ্রুজলে অভিষিক্ত কৃষক এই গানটী শেষ করিয়াছিল যে আমি দুইবার গাহিবার পরও তাহাকে পুনরায় গাহিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। অনুরোধে ঢেকিগেলার মত তৃতীয় বারের গাওনাটা নিতান্তই অন্তর ছাড়া বোধ হইয়াছিল।

এ গানটী চাষার গান নহে—কিন্তু তাহারাও এই শ্রেণীর গান তৈরি করিয়া গায়। আমরা সময়ান্তরে চাষার গান সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি, সহৃদয় পাঠকগণ আমাদের এই কার্য্যে সহায়তা করিলে একান্ত বাধিত হইব।

চাষার গানের সামিলে আমরা এখানে আর একটা কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। এদেশে দুর্গাপূজার সময় নবমী পূজা অন্তে চৈতাল গাহিবার রীতি আছে। গ্রামের চাকর বাকর উঠানে জল ঢালিয়া সকলে কাদায় লুটি পাটি হয়। তারপর পূজার বাড়ীর ঢাকী ঢোলী সঙ্গে লইয়া কুৎসিৎ গান গাহিয়া গ্রামময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আগেকার দিনে নাকি এই ষাঁড়ের দল নেশায় ভোর হইয়া চেঁচাইত। প্রতি বাড়ী হইতে নারিকেল, ভাজা চিড়া, তামাক ইত্যাদি আদায় করিয়া লইত এবং গ্রাম ঘুরিয়া আসিয়া স্নানাদি সারিয়া সেগুলি ভক্ষণ করিত। কেবল চাকর বাকরের উপর ঐ সকল গানের দোষ চাপাইলে সত্য গোপন করা হয়। ঐ প্রকৃতির কর্ত্তারাও সচ্ছন্দে আপন ছেলে মেয়ে বৌ ঝির সম্মুখে যাহা ইচ্ছা তাহা গাইতেন এবং কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিয়া স্ফুর্ত্তি উপভোগ করিতেন। রুচি!

এখনও 'চৈতাল' গান উঠিয়া যায় নাই, কেন যায় নাই' জানিনা। কোনও কোনও পল্লীতে এই অসভ্যোচিত অশ্লীল গীতির প্রচার আছে। 'চাষা' বলিতে যদি নাসিকা কুঞ্চিত করিতে হয়, তবে এই শ্রেণীর 'খেঁউড়' রচক ও গায়কগণকে 'চাষা' বলিলে ঐ উদ্দেশ্য ঠিক সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ এই গান গুলিকে ইতরের গান বলিলেই মানান সই হয়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত-শাস্ত্রী

গ্রন্থ-সমালোচনা।

অনুপমা—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত, সামাজিক উপন্যাস মূল্য ২৲ টাকা।

আজ কাল বাজারে চক্চকে ছাপা, ঝক্ঝকে বাঁধাই, সোনার জলে নাম লিখা মেলা ই পুস্তক বাহির হইতেছে। কিন্তু তাহার প্রায়গুলিই অন্তঃসার শূন্য—ভিতরে সেই মামুলী প্রেমের কথা, কাজের কথা কিছুই নাই। দেশের সামাজিক সমস্যাগুলি ক্রমে জটিল হইয়া দাঁড়াইতেছে। পল্লীর প্রাণ কৃষক কুলের কথা কেহ বড় একটা ভাবেন না। ধনী সন্তানেরা দেশকে ম্যালেরিয়া ও পানাপুকুরের হাতে সপিয়া দিয়া 'চাচা আপন বাঁচা' নীতির অনুসরণ করিতেছেন। একথা একটু ভাবেন না যে ইহাদিগকে দিয়াই তাঁহাদের অর্থ ও প্রতিপত্তি এবং কাজের সময় "কাজি" বলিয়া যাহার আদর অন্তত পক্ষে দরকার হয়, কাজ ফুরাইলে তাহাকে "পাজি" বলিয়া দূর করা অসঙ্গত। তাহার পর বিধবা বিবাহ" "বিধবা বিবাহ" করিয়া চীৎকার করিয়া সভা সমিতিতে সমাজ সংস্কারের দল বক্তৃতায় আসর জমকইতেছেন। যতীন্দ্র বাবু তাঁহার এই গ্রন্থে উভয় প্রশ্নেরই সমাধান করিয়াছেন।

প্রথমতঃ পল্লী সমস্যার দিকটাই ধরি। শৈলেন্দ্র নিজে উচ্চ শিক্ষিত যুবক। তাহার পিতা সাহেব ঘেষা এবং হাতবাক্সে বড় বড় সাহেব সুবার ২।১ খানা পত্র রাখার স্পর্দ্ধা করেন; সেই খাতিরে সে একটা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইলেও হইতে পারিত; উকালতী করিয়াও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিত। নিতান্ত পক্ষে—একটা প্রফেসারী অথবা কেরাণীগিরি করিয়া খাইতে পারিতই। কিন্তু তাহাতে যতীন, দেবেন্, প্রভৃতি হইতে কিছু বিশেষত্ব লক্ষিত হইত না। সে তাহার জীবন পল্লী গ্রামের উন্নতির জন্য উৎসর্গ করিল। এবং সেই সাধনাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। আমাদের দেশের ধনী সন্তানেরা যদি তাহার চরিত্রকে ধ্রুবতারা করিয়া সেই লক্ষ্যে আপনাদিগকে চালিত করেন, তবে ম্যালেরিয়াবাহী মশক সঙ্কুল খানা ডোবার স্থলে আবার পল্লীর সেই শ্যামশোভা দেখিতে পাইব। প্লীহা স্ফীতোদর কঙ্কালসার পল্লী কৃষকের স্থলে, আবার হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ কর্ম্মক্ষম দেহ কৃষককুল দেখিতে পাইব, দেশের সমস্ত দুর্গতির অবসান হইবে; বাঙ্গলাদেশ শৈলেন্দ্রের আদর্শে গঠিত আদর্শ গ্রাম-পূর্ণ দেশে পরিণত হইবে।

শৈলেন্দ্রের অকাল মৃত্যুতে চোখের জলে ভাসিয়াছি। তাহার কার্য্যের শেষ ফলটা দেখিতে পাইলাম না বলিয়া একটা অরুন্তুদ দুঃখ হয়। কিন্তু লেখক বোধ হয় দ্বিতীয় সমস্যা—বিধবা বিবাহ—প্রশ্নের সমাধানের জন্যই তাহাকে এত শীঘ্র অপসারিত করিয়াছেন।

বাল বিধবার বিবাহ দাও বলিয়া যে রব উঠিয়াছে, যদি সত্য সত্যই বিধবা বিবাহ সমাজে চলে, তবে কিছু দিন পরে সন্তানের জননীরাও এই সুবিধাটুকু ছাড়িবেন কিনা ভাবিবার বিষয়। এই কথাটী লেখক অনুপমার মার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। ঠিক জানিনা মুসলমান সমাজ এইরূপেই বর্ত্তমান অবস্থায় পৌছিয়াছে কি না। আর আমাদের ব্রাহ্ম সমাজে এবং ইংরাজ সমাজের মেয়েরা যদি ২৫।৩০ বৎসর পর্য্যন্ত এবং সময় সময় আজীবন অবিবাহিতই থাকিতে পারে, তবে আমাদের বালবিধবাদের বিবাহের এমন কি নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা থকিতে পারে বোঝা যায় না। অমৃত বাবু খাসদখলে গিরিবালার মুখে একটী কথা বলাইয়াছেন— "মোহিত—বিধবা বিবাহকি মন্দ? গিরিবালা—"আকাশ পিদ্দিম কি চাঁদ?" কথাটুকু ঠিক। কেবল মেয়েদের বেলা নয় পুরুষদের বেলায়ও কথাটা বোধ হয় খাটে। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহটা কিরকম ভুক্তভোগীরাই বলিতে পারেন! তবে পুরুষের

বেলায় দ্বিতীয়বার বিবাহে বাধে না। আর মেয়েদের বেলায়ই যা একটু আটাআটী।

হিন্দু সমাজের মেয়েরা এরূপ ভাবে গঠিত যে বিবাহ সম্পূর্ণ পূর্ব্বরাগ বর্জ্জিত হইলেও বিধবার পত্যন্তর গ্রহণে তাহাদের কেমন একটা অন্তর্নিহিত ঘৃণা, একটা বিজাতীয় বিদ্বেষ খুব স্বাভাবিক। তাহা শিখাইয়া দিতে হয় না; দাঁত ওঠা চোখ ফোটার মতই তাহা আপনি নারীর হৃদয়ে স্থান পায়। বাল বিধবা অনুপমার অকাল বৈধব্যে যেমন একদিকে কোন হৃদয়বান ব্যক্তিই চোখের জল সম্বরণ করিতে পারেন না, তেমনি অন্য পক্ষে তাহার চরিত্রের দৃঢ়তায় একটা বুকভরা সম্ভ্রমে সকলেরই হৃদয় ভরিয়া যায়। বালিকা অনুপমা বিধবা বিবাহটাকে ঘৃণা করিতে শিখিল কোথায়? সংস্কার (Intuition) হইতেই উহার সৃষ্টি। সুতরাং বিধবা বিবাহের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা নাই ইহা লেখক দেখাইয়াছেন। তবে যদি কেহ ব্যভিচারের আশঙ্কা করেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—উহা সকল অবস্থাতেই হইতে পারে এবং সকল সমাজেই অল্প বিস্তর আছে।

মেয়েদের বড় করিয়া বিবাহ দেওয়া, কনের বাজারে ষোড়শী সপ্তদশীর আমদানি করা ও পূর্ব্বরাগসমন্বিত বিবাহের যে একটা স্রোত ইংরেজ সমাজের অনুকরণে আমাদের সমাজে প্রবেশ করিতেছে লেখক উহাও সমর্থন করেন বলিয়া মনে হয় না। এই প্রকার বিবাহে নানা রকম অসুবিধা। হয়তো যুবক যুবতী প্রেমে পড়িল; ছেলের মা বা মেয়ের বাপ কোন কারণে অমত করিলেন। ফলে মেয়ে কেরোসিনে আত্মহত্যা করিল, ছেলে বোম্বে বা বর্ম্মায় পলায়ন করিল। অল্প বয়সে মেয়েদের বিবাহ দিলে এসব বালাই থাকে না। তারপর আভিজাত্যাভিমান এই প্রকার যুবক যুবতীর মিলনে পরিপন্থি। যিনি যতই সাম্যবাদী হউন না কেন "*Too high to be enthralled to low*" কথাটী কেহ ভুলেন না। ইহাও লেখক দেখাইয়াছেন।

তা ছাড়া এই পুস্তকে প্রেমে পড়া, প্রেমে বাঁধা, নায়কের পলায়ন, নায়িকার বিরহ এবং শেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ—মিলন সকলই আছে। বারান্তরে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানার একটী২ করিয়া চরিত্রের সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এবার মোটামুটী কথা কয়টীই বলিলাম। এই প্রকার বই দেশে যতই প্রচারিত হইবে ততই সমাজের মঙ্গল। এই পুস্তক লিখিয়া যতীন্দ্র বাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রী

জননীর কর্ত্তব্য—

শ্রীআনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত মূল্য দেড় টাকা।

সন্তান পালন, সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনাদি বিষয়ে উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ আজকাল বঙ্গভাষায় প্রচুর না হইলেও বিরল নহে। যে সকল গ্রন্থকার এই প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে 'জননীর কর্ত্তব্য' প্রণেতা অন্যতম।

আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণের নিকট এই প্রকার গ্রন্থ সমধিক আদৃত হওয়া উচিত। হালের গৃহিণী ছেলেমেয়ের সামান্য অসুখে কিরূপ অস্থির ও হতবুদ্ধি হইয়া ডাক্তার কবিরাজের শরণাপন্ন হন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এখন কথায় কথায় ডাক্তার আর গণ্ডায় গণ্ডায় শিশির স্তূপ রোগীর বিছানার চারিপার্শ্বে যেমন জাকাল ভাবে শোভাপায় কিছুদিন পূর্ব্বে বোধকরি এতটা ছিলনা। আর গৃহকর্ত্তার আয়ের অনেকাংশ ডাক্তারের ভিজিট ও ঔষধের মূল্যে ব্যয়িত হইয়াও ব্যধির কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাহার এতটা উৎকণ্ঠা পূর্ব্বে বড় দেখা যাইত না। সে কালের 'গিন্নীরা' কিন্তু ছেলেমেয়ের অসুখ বিসুখে হামেসা ডাক্তার কবিরাজের উপদেশ না লইয়া, এবং সর্ব্ব-ব্যাধি সংহারক 'ডজের' মহিমা এতটা উপলব্ধি না করিয়াও তাহারা সামান্য সামান্য রোগের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া লইতেন। অবশ্য 'আজ' আর কাল নাই। তথাপি এখনও আমাদের গৃহিণীগণ যাহাতে আশু রোগ চিকিৎসার প্রণালী সম্যক অবগত হইয়া ব্যবহারিক জীবনে তাহা কার্য্যকরী করিতে পারেন তদ্রূপ করা সঙ্গত। মহিলাগণের শিক্ষার ব্যবস্থা যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের এই প্রয়োজনীয় কথাটী ভুলিলে চলিবে না। আমাদের বিশ্বাস সমালোচ্য গ্রন্থখানা এই বিষয়ে মহিলাদের বিশেষ সাহায্য করিবে।

চারুদর্শন—শ্রীপার্ব্বতীচরণ কবিশেখর কবিরাজ প্রণীত। ইহা একখানি উপন্যাস গ্রন্থ। কবিরাজ মহাশয় ইহাতে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঔষধেরও বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সাধু। লেখক গল্পে সম্প্রদায় বিশেষের উপর কটাক্ষ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, এটী অন্যায়।

অমৃত।

ময়মনসিংহ, লিলিপ্রেসে—শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক [illegible] প্রকাশিত।

সৌরভ

ষষ্ঠ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, আশ্বিন ১৩২৫। | দ্বাদশ সংখ্যা।

শেষ অঞ্জলি।

(১)

আষাঢ়ের ঘন বর্ষার সারাদিন বৃষ্টির পরে বৈকালে মেঘগুলি যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ছাতা বগলে করিয়া কবি-বন্ধু নিরুপমের বাসার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াগিয়াছে; যাতায়াত একপ্রকার বন্ধ। তথাপি আলস্যটুকু ভাঙ্গিবার জন্য ইহার মধ্যেই জলকাদা ভাঙ্গিয়া নিরুপমের বৈঠকখানায় যাইয়া হাজির লইলাম। দেখিলাম, নিরুপম একখানা র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া নীরবে বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, "এর মধ্যে এলে? বসো।"

"দিনটা ভারী বিশ্রী হয়েছে হে। মনটা ঘরে টিক্‌ছিল না, তাই ভাবলুম তোমার এখানে আসি।"

"তা বেশ করেছ। আমার দিনগুলোও যেন আর কাট্‌ছে না।" বলিয়া নিরুপম একটু ক্ষীণ হাসি হাসিল।

আমি লক্ষ্য করিলাম আজ যেন সে অন্য দিন অপেক্ষা একটু বেশী বিষণ্ণ। বহুদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি তাহার সেই প্রথম যৌবনের হাসিটুকু আর নাই, তাহার মুখে একটা বিষাদের কালিমা ছাপিয়া উঠিয়াছে। তাহার কবিতার ভিতর যে দীপক রাগিণী ছিল, তাহা নামিয়া এস্রাজের করুণ সুরটীর মত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার জীবনটা যেন শুকাইয়া চৈত্রের নদীর মত হইয়া চলিয়াছে। যখন কলেজে পড়িতাম, তখন নিরুপমের মত সদানন্দ খুব কমই দেখিয়াছি। সে কলেজে একজন উৎসাহী যুবক বলিয়া পরিচিত ছিল; কিন্তু আজকাল একি!

একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, ঠিক বলবে ভাই?" নিরুপম প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইল।

আমি বলিলাম, "আমার মনে হয়, তোমার প্রাণে এমন একটা কিছু হয়ে গেছে, যাতে তুমি এমন হয়ে পড়েছ।"

সে একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "কি রকম"?

"তোমার সেই হাসির উৎস কোথায় ভাই? যা তোমার বিশেষত্ব ছিল। আগেকার উৎসাহ যে তোমার নিবে গেছে। তুমি নিজে হয়ত বুঝতে পারছ না, কিন্তু যে তোমায় দেখবে সেই বলবে যে তুমি দিন দিন ভেঙ্গে পরছ। এর কারণ কি কিছুই নাই? সত্যি করে বল দিকিন।"

নিরুপম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "শুন্‌বে? শোন তবে—সে একটা মস্তরকম ট্র্যাজেডি!" সে আমার দিকে চেয়ারটা টানিয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

"সে আজ আট বছরের কথা। এম্, এ, পরীক্ষা দিয়ে এসে বাড়ী বসলুম। কোন কাজ নেই। কেবল কবিতা লেখি, আর সময় সময় একটু আধটু বেড়াই। দিনগুলো ভারী বিশ্রী লাগতো।

"পূজার কিছু পূর্ব্বে সরোজের পিতা—ঐ যে আমাদের মেসের সরোজ ঘোষ, মনে আছে ত? তার বাবা বদ্‌লি হয়ে কুমিল্লায় এলেন। পূজার ছুটির সঙ্গে সঙ্গে সরোজও এসে পড়্‌ল; সে মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীও আসত। তার সংবাসে দিনগুলো কাটছিল মন্দ নয়। তাকে নিয়ে কখন কখন 'লালমাই' পাহাড়ে শীকার করতে যেতুম, কখন কখন রাজার পুকুরে মাছ ধরতুম, এম্নি করে দিন-গুলোকে উড়িয়ে দিতুম।

"তারপর—" নিরুপম একটু থামিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "হাঁ, তারপর একদিন—সে দিনটা আজকের মতই গুমট করেছিল— ষ্টেসনে গিয়েছিলুম, একজন বন্ধুকে আন্‌তে। তিনি এলেন না। বাড়ীর দিকে রওনা হলুম। পথে ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হল। সঙ্গে ছাতা ছিল না, ভিজ্‌তে ভিজ্‌তেই চল্লুম। সরোজদের বাসার কাছে আস্‌তেই সরোজ বললে, "একি, নিরু বাবু যে! ভেতরে আস। ওরে একখানা কাপড় দিয়ে যা।" আমার দিকে ফিরে বললে, তুমি বসো আমি চা'র যোগাড় করে আসছি। সরোজ ফিরে এলে নানা রকম গল্প আরম্ভ হল। সাহিত্যের কথা, কলেজের কথা, থিয়েটারের কথা— এই কত কি।

"এম্‌নি সময়ে দেখলুম একটী কিশোরী ট্রে'তে করে কেট্‌লি ও টি কাপ্ নিয়ে ঘরে ঢুকেই চঞ্চল পদবিক্ষেপে ফিরে গেল। সরোজ তাকে ডেকে বললে, 'এই যাচ্ছিস কেন, বেলা? এযে আমাদের নিরু বাবু, যার গান কল্‌কাতায় শুনেছিস"। কিশোরী অতি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে হেট মুখে চা তৈরী করতে লাগল।

"দেখলুম, কিশোরী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী না হলেও সুন্দরী বটে। এই বিকাশোন্মুখ যৌবনে তার সর্ব্বশরীরে যেন লাবণ্য ঝরে পড়ছিল। তার পরিধানে একখানা জাম রঙের শাড়ী, হাতে দু'গাছা করে সোণার চুড়ি। এতে তাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমি পূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলুম, সে চকিতে চোক নামাল। অনুমানে বুঝলুম বেলা সরোজের বোন্।

"সন্ধ্যে হয়ে এল, বৃষ্টি কিন্তু একটুও কম্‌ল না, আমি উঠে পড়তেই সরোজ বললে, "এর মধ্যে যাবে কি করে? আজ থাক না, কোন কাজ ত নেই। বাসায় খবর পাঠিয়ে দিই"। আমি আপত্তি কর্‌লুম; কিন্তু সরোজের মা এ বৃষ্টিতে কিছুতে যেতে দিলেন না। অগত্যা একটু থেকে যেতে হল। সরোজের মা বললেন, একটা গান গাও না নিরু, অনেক দিন শুনিনি।" 'তা গাবেই ত' বলে সরোজ হারমোনিয়াম নিয়ে এল। দু'টা গানের পর বললুম, 'তুমি একটা গাওনা সরোজ।' সরোজ হেসে উঠল। মা বললেন, ও গেতে পারে না। তবে বেলা একটু একটু পারে। আমি সঙ্কোচের সহিত বল্‌লুম, তা উনি একটা গান না? আমি একা আর কত গাইব? সে রাজী হল না দেখে আমায় আবার বলতে হল "গান্ না, আপনি একটা গান।" "ছিঃ নিরু, বেলা ছেলে মানুষ, ওকে আপনি বলো না।" সরোজের মা'র কথায় একটু লজ্জিত হলুম।

বেলা হারমোনিয়াম ধরে গাইল—

"সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুল-হার,
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।"

তার সুর পরদার পর পরদায় খেলে বেড়াতে লাগল। বাইরে শুধু পাগ্‌লা হাওয়া বইছিল। বৃষ্টির টিপটিপ শব্দ ছাড়া আর কোন সাড়া শব্দ ছিল না। কক্ষ নিস্তব্ধ, শুধু তার কণ্ঠস্বর ভেসে বেড়াতে লাগল—

"নীল অম্বর চুম্বন-নত চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার।"

কখন গান থেমে গেল, টেরও পেলুম না। আমার কানে শুধু বাজতে লাগল—

"ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন, তোমা পানে ধায় যত ক্রন্দন,
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন, বন্দন উপহার।"

সে হারমোনিয়াম ছেড়ে উঠে গেল। এর পরে গান আর জমল না। তা কি জমতে পারে?

একটু বেশী রাত্রে বাড়ী ফির্‌লুম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুম এল না। কেবল সেই কণ্ঠস্বর মস্তিষ্কের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার সঙ্গীত যেন কোন এক কল্পপুরের স্বপ্নের আবেশ এনে দিয়েছিল, তা তখন বুঝতে পারিনি। তার গানের সুরটুকু তাকে বেষ্টন করে ধরে আমার চোকের সাম্‌নে একটা সুষমার ছবি এঁকে দিল। শেষরাত্রে একটু ঘুম এল। সে তন্দ্রাখানির মত সুখভোগ আমার জীবনে আর হয় নি। কেবল সেই সঙ্গীত লহরীর নৃত্য, আর কেবল সেই রূপস্মৃতি!

(২)

"পরদিন সরোজ এসে বললে, মা আজ তোমার খাওয়ার যোগাড় আমাদের ওখানে করেছেন। একটু সকাল করে যেও কিন্তু, নইলে মা দুঃখ করবেন।" এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলুম না, কিম্বা করবার ইচ্ছাও ছিল না।

দশটার সময় সরোজদের ওখানে গেলুম। আর কেউ নিমন্ত্রিত হয় নি দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সরোজের মা এসে দু' এক কথা জিজ্ঞেস করলেন; সরোজ এসে নানা গল্প সুরু করে দিলে; কিন্তু তাকে ত দেখলুম না। আমার তৃষিত দৃষ্টি চারদিকে ঘুরতে লাগল। লজ্জায় সরোজকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারলুম না; কেমন একটা সঙ্কোচ এসে পড়ল।

"বৈকালে একটু রোদ পড়্‌তেই সরোজদের বাসা হতে বের হলুম। ইচ্ছে হল একবার জিজ্ঞেস করে যাই তার কথা। লজ্জায় গলা আটকে গেল। রাস্তা হতে জানালার দিকে চাইলুম, কি জানি যদি দেখা পাই। দেখলুম, সত্যি সত্যি বাতায়ন পথে দু'টী আঁখি ফুটে উঠেছে। আমার দৃষ্টিতে তা চকিতে নিবে গেল। এই কি সেই? তার আঁখিও কি আমার জন্যে জেগে থাকে?

"কখন বাড়ী এলুম বুঝতে পারলুম না। একটা আকুল চিন্তা মনটাকে উলট পালট করে দিল। একবার ইচ্ছে হল, যাই আর একবার। আবার ভাবলুম, ছিঃ যদি দেখে, তবে সে কি মনে করবে?

"পরদিন—একটা, দুটো, তিনটে—সময় আর ফুরায় না। চারটে বাজতেই বেরিয়ে পড়্‌লুম। একটা তীব্র নেশা আমায় ঐ রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে চল্‌লো। বাসার কাছে এসে পা আর চলে না। বুক দুরু দুরু করতে লাগল; মাথা হেট হয়ে পড়্‌ল। তবু জোর করে জানালার দিকে চাইলুম—সেই আঁখি; আজ সে দৃষ্টি অচঞ্চল, পলকশূন্য। কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম জানিনে, একখানা গাড়ী এসে পড়্‌তেই চমক ভাঙ্গল। একবার চারিদিকে দেখলুম, কেউ দেখেনি ত?

"ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরলুম। আমার মনের অবস্থা যে কি হল তা তোমায় বুঝাতে পারব না, ফণী। এ রাস্তা আমার তীর্থস্থান হয়ে উঠল। সেই করুণ আঁখি দু'টি আমার সকল কাজে, সকল চিন্তায় ভেসে উঠ্‌তে লাগল।

"এর মধ্যে কয়েকদিনের জন্যে আমার পিস্‌তুত ভাই শচীনের বিয়েতে কাশীপুর যেতে হল। সেখান হতে ফিরতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগল। বাড়ী এসে দেখি আমার টেবিলের উপর, আমার শিরোনাম লেখা একখানা খাম। তা ছিড়েই যা দেখলুম, তাতে সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্‌ল, শিরায় শিরায় তাড়িৎ প্রবাহ বইল। পত্রখানা এখনও আমার কাছে আছে। দেখবে? বসো, নিয়ে আসছি।" নিরুপম তাহার ট্রাঙ্ক হইতে একখানা পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল।

পত্রখানা পড়িয়া নিরুপমের হাতে দিলাম। সে বলিল, "দেখ্‌লে? এখন শোন।—পত্র পড়েই বসে পড়লুম। মাথা ঘুরতে লাগল। এর আগেত একবারও ভাবিনি, যে এ আকুল তৃষা মিটবার নয়। আমি যে ব্রাহ্মণ কিকরে হবে?

"সে দিন সমস্তরাত্রি কি করে কেটে গেল, তা ভগবান জানেন। শেষে ঠিক করলুম, তাকে ভুলতে হবে। আর তার হৃদয় হতে আমার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত মুছে ফেলে দিতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে? কিছু ঠিক করতে পারলুম না। সহসা একটা চিন্তা আমাকে শয্যা হতে টেনে তুলল। তখন রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। মা'র দরজায় ঘা দিয়ে ডাক্‌লুম, 'মা!' মা ব্যস্ত হয়ে দোর খুলেই চম্‌কে উঠে বললেন, 'কিরে, নিরু তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন? চোক্ যে ফেটে পড়ছে।' আমি কম্পিতস্বরে বল্‌লুম 'মা, আমি বিয়ে করব। তুমি সম্বন্ধ খোঁজ।' মা যেন আকাশ হতে পড়লেন। যা শত সাধ্য সাধনা করেও আমার মত করাতে পারেননি, আজ আমি আপনা হতেই সে কথা বলছি! মা হয়ত ভাবলেন, একটা কিছু হয়ে গেছে। তিনি বললেন, 'তা হবে। এখন তুই আমার কাছে একটু শো। দেহটা মাটি করবি দেখছি।'

(৩)

তারপর একদিন নির্লজ্জের মত একটী বালিকাকে বিয়ে করে নিয়ে এলুম। একবার ভেবেও দেখলুম না, যে এ'তে কত বড় ব্যথা একজনের বুকে বাজবে। ফুলশয্যার রাত্রে ভাবলুম, ইন্দুকে সব বলে বুকের ভার একটু হাল্কা করে নিই। কিন্তু এত দুর্ব্বল আমি যে সে সাহসটুকু পর্য্যন্ত হলনা। তার সঙ্গে ভাল করে কথা কইতেও পারলুম না। সত্যি বলতে কি ফণী, আজ পর্য্যন্ত ইন্দুকে প্রাণ খুলে কোন কথা বলতে পারিনি। তার কাছেও

যেন আমি কত অপরাধী। সে কিন্তু আমার এ তাচ্ছল্যতার নিজের দোষ বলে ধরে নিয়েছে। একদিন সে আমায় কি বললে জান? সে বল্লে, 'তোমায় যে সুখী করতে পারলুম না এর বাড়া দুঃখ আমার আর কিছুই নেই। ওগো, আমায় শিখিয়ে নাওনা, কি চাও তুমি।' সে দিন ও তাকে কিছু বলতে পারলুম না। দেখেছ ফণী, কত বড় অপদার্থ আমি!

"যাক্ কি বলছিলুম—হাঁ, সে দিকে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলুম। যাবই বা কোন লজ্জায়?

"কিছুদিন পরে যখন শুন্‌লুম যে সে একে একে তার সমস্ত সম্বন্ধগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে, তখন মনে কি হল কি বলব ফণী! থাক্, বলে কাজ নেই। বলবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত রাখিনিত।

"কিছুদিন পরে পাটনায় চলে গেলুম, একটা মাষ্টারী পেয়ে। জানইত সে বৎসর মা সরস্বতী বিমুখ হলেন। আর পড়বার ইচ্ছেও ছিলনা, সামর্থ্যও ছিলনা। মা বললেন 'তোর চাকরীর দরকার কি?' আমি সে কথা শুন্‌লুম না; হৃদয়ের জ্বালা যদি এতে একটু জুড়ায়।

"মা ও ইন্দু উভয়েই চললেন। দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ এক প্রকার ঘুচিয়েই চল্‌লুম।

(৪)

"পাটনায় একে একে পাঁচটা বছর কাটিয়ে দিলুম। আমার ঘর তখন শিশুর কলকণ্ঠে মুখরিত। মা হাস্‌তেন, ইন্দু হাস্‌ত; আমার চোকে জল আস্‌ত। হাস্‌ব কিকরে? আমি যে একজনকে এ হাসি হতে চিরদিনের মত বঞ্চিত করেছি।

"দিবারাত্রির এই দুঃসহ জ্বালা দেহের উপর আধিপত্য বিস্তার কর্‌ল; কয়দিন সয়! স্বাস্থ্য ক্রমে ভেঙ্গে পড়ল। মা বল্লেন, 'কোথা হতে একটু ঘুরে আয়না। শরীর যে দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। হাসি এল; ইচ্ছে হল যে বলি 'চিতায় যাওয়ার আগে এ দেহ ভাল হবে না মা।' মা ব্যথা পাবেন বলে চুপ করে রইলুম।

"শেষে একদিন মা'র তাড়নায় বেরিয়ে পড়লুম, পুরীর দিকে। আমার মামা বরদা বাবুর বাসায় যেয়ে উঠলুম। তাঁর বাসাটা সমুদ্রতীর থেকে খানিকটা দূরে ছিল। তা সত্বেও সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতুম। সমুদ্র ভিন্ন পুরীতে আর কিছু আমার ভাল লাগত না।

"একদিন—আমার বেশ মনে আছে, একটু সকাল করেই বাসা হতে বের হয়েছিলুম। সমুদ্রের ধারে যেতেই একজন ব্রাহ্মণ ব্যস্ত ভাবে এসে বল্‌লে 'বাবা এখানে ডাক্তার বাবুর কোন বাড়ী?" জানইত আমি হোমিওপ্যাথি নিয়ে একটু নাড়া চাড়া করতুম; জিজ্ঞেস করলুম 'কেন কি হয়েছে?' সে বললে তুমি ডাক্তার কি? বাবা, বড় মুস্কিলে পড়েছি; সেই দুপুরে সে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল, এখনও চৈতন্য হচ্ছে না। আমি একা মানুষ রোগী ফেলে ডাক্তারও ডাক্‌তে পারিনি; আর এখানেও কাউকে দেখিনি। ঠাকুর জগন্নাথ তোমায় মিলিয়ে দিয়েছেন। তা, বাবা, একটু শীগ্‌গীর করে এস।" বলে ব্রাহ্মণ হাঁটতে আরম্ভ কর্‌ল। আমিও তার পিছে পিছে চল্‌লুম। নিকটে একখানা ছোট সুন্দর বাসায় আমরা ঢুকে পড়্‌লুম। দেখি, একটী যুবতী শয্যায় পড়ে আছে'। দেহ অত্যন্ত শীর্ণ, হাত ধরে বুঝ্‌লুম— শরীর অসাড় হয়ে আসছে। মাথার কাছে বসে চোকে একটু একটু করে জল দিতে লাগ্‌লুম। হঠাৎ 'উঃ, করে পাশ ফিরতেই মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে আমার কাপড় রাঙ্গা করে দিল। তাড়াতাড়ি হাত ধরে বুঝলুম—সব শেষ!

বৃদ্ধের নিকট যুবতীর পরিচয় পাইয়া জানিলাম—বিপদের আশু সম্ভাবনা দেখিয়া তাহার শ্বশুর শাশুড়ী একটা বৃদ্ধা ঝি ও এই বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর হাতে তাঁহাদের এই যুবতী বধূকে রাখিয়া আজ ভুবনেশ্বরে চলিয়া গিয়াছে। বুঝলেম এ কে? এ যে আমারই কৃত অত্যাচারের শেষফল; সে তার বুকের রক্তদিয়ে আমায় শেষ অঞ্জলি দিয়ে গেল ফণী!

"একবার সেই মুখের দিকে চাইলাম,। মুখে যেন শান্তির হাসিটুকু লেগে রয়েছে। তার অর্দ্ধোন্মিলিত নয়ন যেন বল্‌ছে 'দেখ, নারীর প্রেম! আমি পাগলের মত বের হয়ে এলুম।'

এইখানে নিরুপম নীরব হইল। দেখিলাম তাহার চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ।

তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। বাহিরে ঘোর অন্ধকার।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

লাঞ্ছিতার সম্মান।

(১)

"তুমি কি বলছ বিমল দা? নেশা টেশা করেছ নাকি? যাও, এখুনি এখান থেকে চলে যাও।" পুকুরের ঘাটে মাছ ধুইতে ধুইতে ক্রোদ্ধা সিংহিনীর মত গ্রীবা বক্র করিয়া, তীব্র ঘৃণার সহিত স্থির অপলক দৃষ্টিতে বিমল কুমারের মুখেরদিকে চাহিয়া যখন মনোরমা এই কথা কয়টী উচ্চারণ করিল, তখন তাহার নয়নের তীব্র জ্যোতিতে, বিমল কুমারের অন্তর যে না কাঁপিয়া উঠিয়াছিল এমন নহে। কিন্তু তীব্র লালসায় উন্মত্ত, মদ্যপানে অপ্রকৃতিস্থ যুবক, দু এক পা পিছাইয়াই আবার মনোরমার দিকে অগ্রসর হইল।

সান্ধ্য গগনে তখন পূর্ণিমার চাঁদ ধীরে ধীরে কেবলমাত্র উঠিতেছে, চারিদিকে আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতির বাগানপরিবেষ্টিত, মুখুজ্জে মহাশয়দের প্রকাণ্ড পুকুর। ঘনপত্র রাজির অন্তরাল হইতে ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের কিরণ আসিয়া পড়িয়া আধ আলো ও আধ ছায়ার অপূর্ব্ব সমাবেশে, পুকুরের জলে এক মনোহর, সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এমনি সময় জনশূন্য বাঁধা ঘাটলায় এই বিসদৃশ দৃশ্যের অভিনয় হইতেছিল।

মনোরমা আবার বলিল "বিমল দা! তুমি এতটা অধঃপাতে গেছ? আমি তোমার সম্পর্কে বোন, ছোটবেলা থেকে তোমায় দাদার মতন দেখে আস্‌ছি, দাদাবলে ডাক্‌ছি, আমার উপর অত্যাচার কর্ত্তে চাও? একটু লজ্জাও হলো না? ছিঃ!" জড়িত স্বরে বিমল বলিল "বেশ লেক্‌চার দিতে শিখেছ তো? হবেনা কেন? সহর ফেরতা মেয়ে——এই গুণেই তো তোমায় এত ভালবাসি।"

এই বলিয়া পাষণ্ড মনোরমাকে ধরিতে অগ্রসর হইল মনোরমা একটু সরিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল——"আর একপা এগুলে আমি চেঁচিয়ে লোক জড় করব।"

বিমল উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিল "বুঝেছি, সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠ্‌বে না। চেঁচাতে চাও চেঁচাও। কিন্তু একটা কথা আগে শোন। আমি ইচ্ছা কল্লে তোমার বাবার আর তোমার মুখে চুণ কালী দিতে পারি। আস্‌ছে পোনরই তোমার বে,—— আমি একটা কথা বল্লে তোমরা মত জাত-নাসা মেয়েকে কেউ ঘরে নিতে চাইবে না। ভেবেছ যে রাওলপিণ্ডির সেই মোকদ্দমার কথা দেশে কেও জানে না, কেমন? আমি সব খবর রাখি।"

মনোরমার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে বসিয়া পড়িল।

দুই বৎসর পূর্ব্বে, এমনি সময়ে তার জীবনের উপর দিয়া একটা প্রকাণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। একমাত্র কন্যা মনোরমা ও পত্নীকে লইয়া তাহার পিতা অবনীন্দ্র নাথ রায়, চাকুরীস্থল রাওলপিণ্ডিতেই অধিকাংশ সময় থাকিতেন। দুই তিন বৎসর পর পর অল্প সময়ের জন্য বাড়ীতে আসিতেন। তিনি যে বাসায় থাকিতেন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটী বাসায় পাড়ার যত নিষ্কর্ম্মা ষণ্ডা ছেলেদের একটা আড্ডার মতন ছিল। সেখানে তাস, পাশার, তবালার চাটী অষ্টপ্রহর লাগাই থাকিত, এবং সন্ধ্যার পর মদ ভাঙ্গ খাইয়া আড্ডাধারিগণ একত্র মিশিয়া অনেক প্রকার বীভৎস অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইত। অবনী বাবু অন্য একটী বাসা খুজিতে ছিলেন, কিন্তু সুবিধামত বাসা না পাওয়ায় এই বাসা ছাড়িতে বিলম্ব হইতেছিল। এই বিলম্বই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। একদিন উন্মুক্ত বাতায়ন পথে অনিন্দ্য সুন্দরী যৌবনোন্মুখী, মনোরমাকে দেখিয়া ঐ আড্ডার কয়েকটী নরপশুর হৃদয়ে লালসা বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তাহার কয়দিন পরে, একদিন সন্ধ্যার সময় সেই পাষণ্ডেরা অবনী বাবুর বাসার পশ্চাৎ ভাগস্থ পুকুরের ঘাঠ হইতে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া, মুখ বাঁধিয়া মনোরমাকে দূরস্থিত অপর একটী আড্ডায় লইয়া যায়। তিনদিন পর পুলিশ অভাগিনীকে উদ্ধার করে; বিচারে পাষণ্ডদের ছয় বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হয়।

বিবাহ যোগ্যাকন্যার এই লাঞ্ছনায় পিতার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এই সংবাদ দেশে প্রচারিত হইলে কন্যার বিবাহ দেওয়া যে অসম্ভব হইবে তাহা অবনী বাবু বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এবং সেই জন্যই রাওলপিণ্ডিতে যে সকল সংবাদ পত্রের সংবাদ দাতাগণ ছিলেন তাঁহাদের নিকট যাইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া

যাহাতে এই সংবাদটা কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পর অবনী বাবু বাড়ী আসিয়াছেন; গ্রামে আসিয়া এসম্বন্ধে কোন কথাই শুনিতে পান নাই। বাড়ীতে আসার পাঁচ' ছয়দিন পর পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া, গ্রামের সামাজিক দলপতি কয়জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া ছিলেন, তাঁহারা আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াগিয়াছেন। কাযেই তাঁহার মনে বিশ্বাস হইয়াছে—দেশে এই সংবাদ প্রচারিত হয় নাই, সুতরাং তিনি নিশ্চিত মনে কন্যার বিবাহ স্থির করিয়া, আবশ্যক উদ্যোগে ব্রতী হইয়াছেন।

তাহার জন্য তাহার পিতাকে যে কি অশান্তি ভোগ করিতে হইতেছে তাহা মনোরমা জানিত। তাহার পিতার ন্যায় তাহারও মনে বিশ্বাস ছিল যে দেশের কেহ এ সংবাদ অবগত নহে। কিন্তু এখন, বিমলকুমার তাহার সেই সর্ব্বনাশের কথা জ্ঞাত আছে, এবং তাহার পাপ প্রস্তাবে সম্মত না হইলে সেই কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া তাহাকে ও তাহার পিতাকে অপদস্থ করিবে, এই কথা শুনিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল। সে অপদস্থ হউক তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার স্নেহময় জনক, স্নেহময়ী জননী লোক সমাজে যে মুখ দেখাইতে পারিবেন না, পিতা হয়ত এই অপমানে আত্মহত্যাও করিতে পারেন এই সকল চিন্তায় অভাগিনী ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তাহাকে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া এবং তাহার মুখ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া বিমলকুমার বুঝিতে পারিল যে মনোরমা অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে। তখন সে অত্যন্ত সহানুভূতির স্বরে বলিল "একেবারে বসে পল্লে যে? ভয় নেই আমার কথামত চল, কেউ আর একথা জান্‌তে পারবে না। আমি কাউকে বলবো না।"

মনোরমার প্রাণের ভিতর একটা প্রবল সংগ্রাম চলিতেছিল। সে একবার মনে করিতেছিল যে তাহার যে সর্ব্বনাশ হওয়ার তাহা তো হইয়াই গিয়াছে, এই পাষণ্ডের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে যদি সকল কথা গোপন থাকে, পিতা মাতাকে সমাজে অপদস্থ হইতে না হয়, তাহা হইলে সম্মত হওয়ায় ক্ষতি কি? কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সমুদয় নারী প্রকৃতি এইপ্রকার ঘৃণিত আপোষের প্রস্তাবের বিরোধী হইয়া উঠিল, সে তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বটে, কিন্তু আমি নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হবার মতন কোন কাজ করিনি; আজ তোমার কথা শুন্‌লে বাইরে আমার মান বজায় থাক্‌লেও, নিজের কাছে নিজে আমি বড়ই ছোট হয়ে পড়বো। আমি চল্লেম। তোমার যা খুসী করো, মনে রেখো উপরে ভগবান আছেন।"

কথা কয়টী বলিয়াই দ্রুত গতিতে পাশ কাটাইয়া মনোরমা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কিন্তু বিমলকুমারও ততোধিক দ্রুত গতিতে তাহার সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইল। নিমেষ মধ্যে মনোরমার হস্তস্থিত বটী দা সজোরে বিমল কুমারের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। বিমলকুমার সভয়ে পশ্চাৎদিকে সরিয়া গেল। এই অবকাশে মনোরমা বিদ্যুৎবেগে অন্তর্হিত হইল, বিমলকুমার আর তাহাকে ধরিতে পারিল না।

(২)

ব্যর্থ মনোরথ বিমলকুমার আপনমনে বকিতে বকিতে যাইতেছিল। তাহার নেশা কতকটা ছুটীয়াছে। এই উপেক্ষার জন্য সে ভয়ানক প্রতিশোধ লইবে, লোক সমাজে মনোরমা ও তাহার পিতাকে অপদস্থ করিবে, এই সকল কল্পনা করিতে করিতে সে অগ্রসর হইতেছিল; এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে যেন সহসা তাহার ঘাড় সজোরে চাপিয়া ধরিল। চমকিত হইয়া সে মুখ একটু ফিরাইয়া দেখিল—আক্রমণ কারী তাহারই গ্রামবাসী বিনোদবিহারী।

বিনোদবিহারী গ্রামের প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। কলিকাতা কলেজে এম্ এ পড়িতেছে, গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ীতে আসিয়াছে। ছেলে বেলায় গ্রাম্য এণ্ট্রেন্স স্কুলে সে বিমল কুমারের সহিত একত্র পাঠ করিয়াছে।

অল্প বয়সেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, এবং কৃপণ স্বভাব পিতার সঞ্চিত কতকগুলি অর্থ একযোগে হস্তগত হওয়ায়, অসৎ সংসর্গে পড়িয়া বিমলকুমারের বিদ্যা এণ্ট্রান্স ক্লাশেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। অতঃপর মদ্যপান ও বেশ্যালয়

গমন প্রভৃতি কুকীর্ত্তি প্রভাবে সকলের ঘৃণার ও ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে বিনোদবিহারী শিক্ষায় এবং চরিত্রের উৎকর্ষতায় সকল শ্রেণীর লোকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

বিনোদকে এইপ্রকার ভাবে আক্রমণ করিতে দেখিয়া বিমলকুমার স্তম্ভিত হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল "একি বিনোদ! এমন করে আমার ঘারে ধরলে যে?"

বিনোদ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল "গোটা কতক লাথি মারব বলে।"

নিয়মিত ব্যায়ামদ্বারা বলিষ্ট যুবক ইচ্ছা করিলে যে তাহাকে অনায়াসে প্রহার করিতে পারে, একথা সে বিশ্বাস করিত এবং সে প্রহার করিলে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোন প্রকার প্রতিকার লাভ করা যে সহজ নহে এ কথাও বিমলকুমার একটু চিন্তা করিয়াই বুঝিতে পারিল। কাজেই সে নম্র কণ্ঠে উত্তর করিল "কেন ভাই, আমি কি করেছি!" বিনোদ মুষ্টিবদ্ধ হস্ত উত্তোলন করিয়া কঠোর স্বরে বলিল "কি করেছিস জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হয় না? তোর যন্ত্রণায় ভদ্রলোকের ঝি বউ পথ চলতে পারবে না, কেমন? ইচ্ছা হচ্ছে—ঘুসিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেই।"

বিমলকুমার বুঝিতে পারিল কোন গুপ্ত স্থান হইতে বিনোদ সকল কথা শুনিয়াছে। সে তখন কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল "নেশার ঝোঁকে এমনটা করে ফেলেছি, এবার মাপ কর ভাই, আর এমন কাজ করব না।"

বিনোদ বলিল "কি গুপ্ত কথা প্রকাশ করে দিবি বলে মেয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছিলি? সেই টে বল, তারপর তোকে ছেড়ে দিব।" বিমলকুমার সমুদয় ঘটনা খুলিয়া বলিল। বিনোদ আবার জিজ্ঞাসা করিল "তুই এসব খবর কি করে পেলি."

বিমলকুমার বলিল আমার জনৈক বন্ধু রাওলপিণ্ডির সেই আড্ডায় যাতায়াত করত। কিছুদিন হল কলকাতায় তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এবং তার নিকটই এ সংবাদ পেয়েছি।

বিনোদ বলিল "তোকে ছেড়ে দিচ্ছি—কিন্তু যদি তোর মুখ থেকে এইসব কথা আর বেরোয়, আর এই মেয়েটার কোন অনিষ্ট হয়, তা হলে তোকে আমি খুন করে ফেলব। এ কথা যেন মনে থাকে। যা দূর হ—।"

এই বলিয়া গলা ধাক্কা দিয়া বিমলকুমারকে দূরে ফেলিয়া বিনোদবিহারী ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক ভাবে বাড়ীর দিকে ফিরিল। তাহার মনশ্চক্ষে মনোরমার সেই তেজোময়ী মূর্ত্তিখানি বারবার উদিত হইতেছিল এবং "আমি নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হবার মতন কোন কাজ করিনি—তোমার কথা শুনলে আমি নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাব।" এই সগর্ব্ব উক্তি বার বার তাহার প্রাণের ভিতর ধ্বনিত হইতেছিল।

(৩)

মনোহরপুর গ্রাম খানিতে, বহু ব্রাহ্মণের বাস। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই প্রধান। দাস দাসী আত্মীয় কুটুম্ব কর্ম্মচারী বরকন্দাজ, প্রভৃতিতে তাঁহার গৃহখানি পরিপূর্ণ; তিনি আদর্শ জমিদার ও নিষ্ঠাবান হিন্দু; তাঁহার বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ লাগিয়াই আছে; পরোপকার, দান, অতিথি সেবা প্রভৃতি কার্য্যে তিনি মুক্ত হস্ত। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত বহু পুরাতন হস্ত লিখিত পুঁথি তাঁহার লাইব্রেরীতে সংগৃহীত ছিল। পুত্র বিনোদ ইংরেজী পড়ার পর হইতে নানা প্রকার ইংরেজী ও বাঙ্গলা পুস্তকের আবির্ভাবে, সেই লাইব্রেরীর আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

দীর্ঘ অবকাশে যখন বিনোদ বাড়ী আসিত তখন এই সকল প্রচীন হস্ত লিখিত পুঁথি সে পাঠ করিত এবং যেখানে না বুঝিত পিতার নিকট হইতে বুঝিয়া লইত। কখন কখন পিতাই আবার ছাত্র হইয়া বসিতেন, এবং বিনোদকে ইংরেজী সাহিত্য ইংরেজী দর্শন প্রভৃতি পড়িয়া পড়িয়া বাঙ্গলা করিয়া পিতাকে বুঝাইতে হইত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনা-সমালোচনায়, পিতা ও পুত্রে মাঝে মাঝে বেশ তর্ক যুদ্ধও হইত! মুখোপাধ্যায় মহাশয় লোকের নিকট বলিতেন "আমি বিনোদের সংস্কৃতের মাষ্টার, আর বিনোদ আমার ইংরেজীর মাষ্টার।" তাঁহাদের পিতা ও পুত্রের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে একটী অদ্ভুত বিশেষত্ব লক্ষিত হইত, পিতার স্নেহ ও পুত্রের ভক্তি, একটা সঙ্কোচহীন অনাবিল সখ্যতার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া

উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ যেন শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। বিনোদের বিবাহের বহু লোভনীয় সম্বন্ধ আসিয়াছিল কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি—বলিতেন "ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরু গৃহে পাঠ সমাপন করিলে, তবে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের যোগ্যতা জন্মে। যত দিন পড়াশুনা করিবে, ততদিন ব্রহ্মচারী থাকিতে হইবে।" কাজেই বিনোদ এখনও অবিবাহিত।

সুসজ্জিত লাইব্রেরীতে বসিয়া পিতা ও পুত্রে কথোপকথন হইতেছিল। সেই দিন রাত্রেই মনোরমার বিবাহ। মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রের নিকট সকল সংবাদই অবগত হইয়াছিলেন, এবং পুত্রের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া এই লাঞ্ছিতা রমণীর প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তিন চারদিন পূর্ব্বে অবনী বাবু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আসিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "আমি একরকম বিদেশী, কেমন করে কি কত্তে হয়; কিছুই জানিনে, আপনি দয়া করে পায় ধুলো দিয়ে আমাকে এই দায় থেকে উদ্ধার করে দিবেন, এই ভরসায় আপনার কাছে এসেছি।"

তাহার পর হইতেই অবনী বাবুর কোন কাজের জন্য একটুও বেগ পাইতে হয় নাই। মুখুজ্জে মহাশয়ের দেওয়ানজী আসিয়া অবনী বাবুর বাড়ীতে ভাড়ারের ভার লইয়া বসিয়াছেন; যে সকল বাসন পত্র, সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতির অভাব হইতেছে সবই সেখান হইতে আসিতেছে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকজনই নানাস্থান হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজে প্রত্যহ দুই তিনবার করিয়া আসিয়া খোজ খবর লইতেছেন। কেবল অবনী বাবুর বাড়ী বলিয়া নহে, গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীর কার্য্যেই এই প্রকার সাহায্য করা মুখুজ্জে বাড়ীর বংশানুক্রমিক প্রথায় পরিণত হইয়াছে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রকে বলিতেছিলেন—"তুই অবনী বাবুর ওখানে যা—আমি আহ্নিক পুজো সেরে যাচ্ছি। ভালয় ভালয় কাযটা হয়ে গেলে বাঁচি।"

বিনোদ বলিল "বর পক্ষ তো এসেছে। যদি বিমল কথাটা প্রকাশ করে দেয় তাহলে কি হবে? অবনী বাবুরই বা কি দশা হবে, আর সেই মেয়েটারই বা কি গতি হবে?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন "ভাবিস কেন? বিপন্নের সহায় মধুসূদন আছেন—একটা উপায় হবেই।"

বাল্যকাল হইতেই পিতার বাক্যে বিনোদের অটল বিশ্বাস ছিল। পিতার মুখে এই কথা শুনিয়া তাহার চিন্তার ভার অনেকটা হালকা হইয়া গেল। সে অবনী বাবুর বাড়ীতে যাওয়ার জন্য কক্ষ হইতে বাহির হইল

(৪)

"ভয়ানক কথা"

"ঘোর কলি"! ঘোর কলি!"

"কোথায় রায় মহাশয়? ডাক তাকে।"

"ভদ্রলোকের জাত মারবার চেষ্টা—এত বড় আস্পর্দ্ধা"

"আঃ শোনই না, কথাটা মিছেও হতে পারে
শত্রুপক্ষের রটনাও হতে পারে।"

"না হে না মিছে কথা নয়। সে সেই মোকদ্দমার রায়ের
নকল পর্য্যন্ত এনেছে।"

"বটে. এত বড় জোচ্চুরী, কোথায় সে রায়, মার শালাকে—" হঠাৎ এই প্রকার কোলাহল বিবাহ সভা মুখরিত হইবামাত্র বিনোদ বুঝিতে পারিল যে সে কয়দিন হইতেই যে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিল তাহাই ঘটিয়াছে। সংবাদ লইয়া জানিতে পারিল যে পাত্র পক্ষ আসিয়া সভায় বসিবার অল্পক্ষণ পরেই বিমলকুমার কোথা হইতে আসিয়া বর কর্ত্তাকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া সকল কথা বলিয়াছে ইতিমধ্যে সে রাওলপিণ্ডি লোক পাঠাইয়া, সেই মোকদ্দমার রায়ের নকল আনিয়াছে, এবং প্রমাণ স্বরূপ সেই নকল খানাও দেখাইয়াছে। সভার এক পার্শ্বে বিমলকুমার দাড়াইয়া, এক প্রকার পৈশাচিক হাস্যে তাহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত, দেখিয়া বিনোদের ইচ্ছা হইতে লাগিল যে তখনই কয়েক ঘা বসাইয়া দেয়। অতি কষ্টে সে আত্ম সম্বরণ করিল।

বিবাহ সভা তখন মহা কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই বক্তা শ্রোতা কেহই নাই। অবনী বাবু প্রস্তর মূর্তির মত নিশ্চলভাবে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইয়

এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। অতি কষ্টে গোলমাল কতকটা থামাইয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর কর্ত্তাকে নিকটে ডাকিয়া অনেক বুঝাইলেন—কন্যা ইচ্ছাপূর্ব্বক পতিতা নহে, এ প্রকার ঘটনা প্রত্যেক পরিবারেই ঘটিতে পারে, তারপর অবনী বাবু এই ঘটনার পর শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুযায়ী রাওলপিণ্ডিতে কন্যাদ্বারা যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছেন, এ কন্যা গ্রহণ করিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ কোনই দোষ হইতে পারে না, গ্রহণ না করিলেই বরং নিরপরাধিনী বালিকার অযথা নির্য্যাতন জনিত পাপের ভাগী হইতে হইবে। ইত্যাদি অনেক কথাই তিনি বুঝাইলেন; কিন্তু সামাজিক দলপতি নামধারী গ্রাম্য দেবতাগণ, যাঁহারা যুক্তি বিচারের কোনই ধার ধারেন না, দলাদলির সৃষ্টিতেই যাহাদের আনন্দ, তাঁহারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই সকল যুক্তি পূর্ণ কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। বরপক্ষের সকলেই সভাস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। গ্রামের সামাজিক দলপতিগণও সভাস্থল পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। বিনোদ রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ওষ্ঠাধর মৃদুহাসে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈস্বরে বলিলেন "বরপক্ষ চলে যাচ্ছেন যান—আমার গ্রামস্থ যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের নিকট আমার একটা নিবেদন আছে; তাঁরা একটু অপেক্ষা করে আমার সেই নিবেদনটা শুনে যান, এই আমার অনুরোধ।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধ অনেক সময়েই আদেশের ন্যায় ফলপ্রদ হইত। সে ক্ষেত্রেও হইল, সকলেই থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। অবনী বাবু একপার্শ্বে পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া ছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নিকট যাইয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সভাস্থ সকলেই শুনিতে পায় এই প্রকার উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"আপনি অনুমতি কল্লে এই লগ্নেই মনোরমার বিবাহ হতে পারে। আমার পুত্র বিনোদের জন্য আমি আপনার কন্যাকে প্রার্থনা কচ্ছি।"

সভাস্থ সকলেই কথাটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। অবনী বাবু বুঝিতে পারিলেন না যে তিনি জাগ্রত অবস্থায় কি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছেন। আনন্দাতিশয্যে তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না—মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইটী হাত ধরিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। আর বিনোদ—একটা বিরাট বিশাল গর্ব্বে তাহার বক্ষস্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, সে কেবলি ভাবিতেছিল—সকলেরইতো পিতা আছে, কিন্তু আমার পিতার মত হৃদয়বান পিতা কজনার?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন সমবেত সামাজিক ভদ্র (?) মহোদয়গণের দিকে তাকাইয়া করযোড়ে বলিলেন "এই লগ্নেই আমার পুত্র শ্রীমান বিনোদ বিহারীর সঙ্গে শ্রীমতী মনোরমার শুভ বিবাহ সম্পাদন করবো। আমি করযোড়ে আপনাদের নিকট প্রার্থনা কচ্ছি, আপনারা উপস্থিত থেকে বিবাহ ব্যাপার নির্ব্বাহ করাবেন। সময় সঙ্কীর্ণ প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী যেয়ে যথারীতি নিমন্ত্রণ কত্তে হলে লগ্ন ভ্রষ্ট হবে, কাজেই এক সঙ্গে সকলকে এখানেই নিমন্ত্রণ কচ্ছি, সকলেই আমার আত্মীয়, আমার এ ক্রটী সকলেই ক্ষমা করবেন এ ভরসা আমি অবশ্যই কত্তে পারি।"

সামাজিক দলপতিগণ, পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিলেন। দরিদ্র বিদেশবাসী অবনী বাবুকে নিপীড়ন, ও গ্রামের প্রবল প্রতাপশালী জমিদার হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ, এক কথা নয়—ইহা বুঝিতে কাহারই বিলম্ব হইল না। অন্তরালে যাইয়া অল্পক্ষণ আলোচনার পর ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিয়া বিবাহ সভার শোভাবর্দ্ধন করিলেন।

বিবাহ সভার গোলমালের প্রারম্ভে, অবনী বাবুকে গালাগালি করিতে যে সকল সামাজিক দলপতিগণ উচ্চকণ্ঠ হইয়াছিলেন, নববধূর পাকস্পর্শ ব্যাপারে ঘন ঘন লুচি চাহিবার সময়ও তাঁহাদেরই কণ্ঠস্বর সকলের কণ্ঠস্বরের উপর দিয়া শোনা গিয়াছিল।

ক্রোধ ও ক্ষমা।

ক্রোধ কহে ক্ষমা তব কোন শক্তি নাই,
নীরবে সহিছ সব অপমান তাই।
ক্ষমা কহে বটে তব ক্ষমতা দুর্জ্জয়,
কিন্তু তা যে শেষে হয় আমাতেই লয়।

শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য।

কাকাবাবু।

(১)

স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়া পোষাক ছাড়িতে না ছাড়িতেই অনিলের কাকা মহেশ বাবু আসিয়া বলিলেন, "দেখ, অনিল, তোমায় আর এ বাড়ীতে থাকা হবেনা। তুমি তোমার পথ দেখে নাও।" অনিল বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে তাঁহারদিকে চাহিয়া রহিল, কথাগুলির একটি বর্ণও সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার উপর কাকাবাবুর এ কঠোর আদেশ কেন? কৈ সেত কোন অপরাধ করে নাই, তবে?——না, না, নিশ্চয়ই সে কোন অপরাধ করিয়াছে, নইলে কাকাবাবুত কোনদিন তাহাকে একটা কড়া কথাও বলেন নাই। তিনি যে অনিলকে ছোট বেলা হইতে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন।

কিন্তু বালক হইলেও সে এটা লক্ষ্য করিয়াছিল, যে কাকীমার ভাই এখানে আসার পর হইতে কাকা বাবুর মেজাজটা মাঝে মাঝে যেন কেমন কেমন হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, কেন এমন হইত তাহার সন্ধান সে লইত না। যাহা হউক এত বড় একটা শক্ত কথার প্রত্যাশা সে কোনদিন মনেও করেনাই। তাই এই অপ্রত্যাশিত আদেশ শুনিয়া সে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মহেশ আবার বলিলেন, "তুমি যে এমন বদ্‌ছেলে কে জান্‌তো। আমিত কাজের ঝঞ্ঝাটে কিছু দেখ্‌তেই পারিনে। ভাগিস ভবেশ ছিল। আমি এমন বদ্‌ছেলেকে কিছুতেই বাড়ীতে থাক্‌তে দিতে পারিনে শেষে কোন্‌দিন নিজেশুদ্ধ বিপদে পড়্‌ব।"

ভবেশ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া অনিলের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল; অনিল কাহাকেও কোন কিছু বলিল না; কাকাবাবু তাহার কোন্ বদ্‌কাজের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করিল না। সে বুঝিয়াছিল, এসমস্ত ভবেশেরই কারসাজি। একবার মনে করিল ভবেশের গুণকাহিনী, যাহা সে জানে, কাকাবাবুর কাছে বলিয়া দেয়। কিন্তু তখনই মনে ভাবিল, তাহা হইলে কাকাবাবু মনে করিবেন যে, সে নিজের দোষ কাটাইবার জন্য অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছে। সে নিঃশব্দে মাথা নীচু করিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল।

মনের মধ্যে কোন আঘাত পড়িলেই মানুষের পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতি জাগিয়া উঠে। কাকাবাবুর কঠিন বাক্যবাণে আহত অনিলের মনের মধ্যেও তাহার পূর্ব্ব সুখ স্মৃতিগুলি উঁকি মারিতে লাগিল। সে পোষাক না ছাড়িয়াই তক্তপোষের উপর পড়িয়া রহিল। মনে পড়িতে লাগিল, তাহার সেই ছোটবেলার কথা——পিতার সেই স্নেহ চুম্বন, মাতার সেই শান্তিময় কোলের কথা। তাহার এমন সুখময় জীবন যে বিধাতার কোন্ অভিশাপে ব্যর্থ হইয়া গেল, তাহা সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। আর কাকাবাবুও তো তাকে কম ভাল বাসেন নাই। মা মরিয়া যাইবার বছর খানেক পরে যখন তার বাবাও তাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন কাকাবাবুই তাকে বুকে তুলিয়া লন—— সে কথা অনিলের অল্প অল্প মনে পড়ে। তারপর হইতে এই দীর্ঘ আট বছর কাকাবাবুই তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, একদিনের জন্যও অযত্ন করেন নাই। সেই কাকাবাবু এমন হইয়া গেলেন?——সে আর ভাবিতে পারিল না, অলস ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল।

(২)

রাত্রে বামন ঠাকুর আহার্য্য লইয়া আসিয়া দেখিল, অনিল ঘুমাইতেছে। আহার্য্য যথাস্থানে রাখিয়া ডাকিল অনিলবাবু?"

অনিল মাথা তুলিয়া দেখিল, বামন ঠাকুর আহার্য্য লইয়া আসিয়াছে। বলিল, "আমি আজ খাবনা, অসুখ করেছে।"

আজ বৈকালের ব্যাপার বামুন ঠাকুর কিছু কিছু জানিত। তাই সহানুভূতির স্বরে বলিল, "তা রাগকরে' না খেয়ে থাক্‌লে কি হবে, অনিল বাবু? রাগের মাথায় বাবু দুটো কথা বলে ফেলেছেন, কালই কত দুঃখ করবেন।" তারপর স্বর আরও একটু নামাইয়া বলিল," আর বল্‌বো কি, অনিল বাবু, এ ভবেশ বাবুরই কাজ—— তিনিই বাবুর কাছে আপনার নামে লাগিয়েছেন, এমান মাঝে মাঝে লাগিয়ে থাকেন। বাবুর তো মানুষের শরীর, তাই আজ রেগে গেছেন।"

অনিল সবই বুঝিল, কিন্তু বামন ঠাকুরের সঙ্গে বাক্যব্যয়

করিবার মত অবস্থা তখন তাহার নয়। তাই বলিল, "আচ্ছা, রেখে যান আপনি।" কেন জানিনা, মাতৃ-পিতৃহারা বলিয়া বোধহয়, বামুন ঠাকুরও তাহাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখিত; বলিল "না খেয়ে থাক্‌বেন না যেন।" অনিল সংক্ষেপে বলিল' "আচ্ছা।"

বামুন ঠাকুর চলিয়া গেল। অনিল ধীরে ধীরে বিছানা হইতে উঠিয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে তখন বাদল নামিয়াছিল, প্রকৃতির একটা তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছিল। অনিল জানালা খুলিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া অনিল নানা কথা ভাবিতে লাগিল। বাহিরের ন্যায় অনিলের অন্তরের মধ্যেও একটা বিপ্লব চলিতেছিল। সে ভাবিল, "সত্যিই কি কাকাবাবু রাগের ঝোঁকে কথাটা বলে ফেলেছেন——অন্তরের সাথে তার যোগ নেই? তাই হবে, নইলে তিনি এমন হতে পারেন না।" ভিতরের অভিমান অমনি মাথা চাড়া-দিয়া উঠিল, বলিল, "তাই যদি হবে তবে তিনি কি রাত্রে একবার এসে সান্ত্বনাও দিয়ে যেতে পারতেন না? অন্তরের যোগ না থাক্‌লে এমন হতে পারত না।" এমনি নানা কথা বলিয়া অবশেষে অভিমানই জয়লাভ করিল। অভিমান-ক্ষুব্ধ অনিলের মন ক্রমেই উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। একপা একপা করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে তখনও বাদলের উদ্দাম নৃত্য সমভাবেই চলিতেছিল। অনিলের সেদিকে লক্ষ্য নাই——কোথায় চলিয়াছে তাহারও চিন্তা করিবার অবসর নাই। যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত সে খালি পায়ে খালি মাথায় ভিজিতে ভিজিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদূর গিয়া সে একবার থামিল, মুক্ত জানালারদিকে একবার ফিরিয়া চাহিল, একবার কি একটু ভাবিল, তারপর বাদলের অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

(৩)

পরদিন বেলা নয়টার সময় ভবেশ আসিয়া বলিল, "শুনেছেন, সরকার মশায়, কি ভয়ানক কাণ্ড!"

"কেন কি হয়েছে?" সভয়ে মহেশ এইকথা বলিলেন। "আমি গিয়েছিলুম থানার দারোগার কাছে, অনিলের খবর নেবার জন্যে বল্‌তে। সেখানে গিয়ে যা শুন্‌লুম——ভয়ানক!"

"আঃ, বলেই ফেল না কি হয়েছে। কেবল ভয়ানক ভয়ানকই কর্‌ছ।" অস্বস্তিচিত্তে মহেশ শ্যালককে এইকথা বলিল।

"হাঁ, কথাটা ভয়ানকই বটে! সেখানে গিয়ে শুন্‌লুম কি জানেন, অনিল নাকি দারোগার কাছে আপনার বিরুদ্ধে এজাহার দিয়ে এসেছে।"

"আমার বিরুদ্ধে!——কেন?"

ভবেশ বলিতে লাগিল, "তবে শুনুন ব্যাপারটা, খোলাসা করেই বলি। দারোগা বাবু বল্লেন যে, কাল রাত্তিরে অনিল গিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত। গিয়ে আপনার নাম করে' বল্লে যে তার পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তি আপনি তো এতদিন তাকে ঠকিয়ে ভোগ কচ্ছেনই, তার উপর কাল তাকে মেরে এই বাদলের ভেতর বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিয়েছেন!"

ইতিমধ্যে মহেশের গৃহিনী আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভ্রাতার নিকট সমস্ত শুনিয়া তিনি ঝঙ্কার-দিয়া উঠিলেন, "একেই বলে দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা" আমি তখনি মিন্সেকে বলেছিলুম, কাজ নেই পরের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে——পরের ছেলে কখন আপনার হয়?"

মহেশ প্রথমে কথাটা ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কারণ তিনি ছোটকাল হইতে অনিলকে দেখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে ভবেশের কথিত অনিলের অভিযোগের প্রায় সবটাই সত্য— কেবল মারের কথাটা বাদে, তখন তাঁহার অবিশ্বাস করিবার কিছু থাকিল না। তিনি মনে মনে একটু ভীত হইয়া পড়িলেন। তথাপি মুখে বলিলেন, "দারোগা বাবু নিশ্চয়ই একথা বিশ্বেস করেন নি— তাঁর সাথে আমার বেশ জানা-শুনা আছে।"

"আমিও দারোগাকে বলেছিলুম যে 'এ কথা কি আপনার বিশ্বেস হয় মশায়?' দারোগা বল্লেন 'তাতো হয় না। কিন্তু ভেবে দেখুন, একথাই বা কি করে মনে করি যে, বিশেষ কোন কারণ না ঘটলে একজন ভদ্রলোকের ছেলে খালি মাথায় খালি পায় এমন বাদলের মধ্যে এতদূর হেঁটে

এসেছেন? সত্য মিথ্যা আমার বল্‌বার কি আছে, মশায়, আদালতই এর বিচার করবেন।"

মহেশ কাতরভাবে বলিলেন, "এখন কি করা যায় বলতো, ভবেশ? তুমি বয়সে ছোট হলেও তোমার মাথায় এসব বেশ খেলে।"

ভবেশ বলিল, "আমিতো কোন উপায় দেখ্‌ছিনে তবে এক উপায়— দারোগাকে পান খাবার খরচটা যুগিয়ে দেওয়া। আর দারোগার সাথে আপনার জানাশুনা আছে এই যা ভরসা।"

"কত টাকা লাগ্‌বে মনে কর?"

শো তিনেকের কমত নয়ই। একটা এজাহার গাপ করে' ফেলা কি সোজা কথা!

"তিন্‌-শো- টা-কা! যাক্‌, কি আর করব, দিতেই হবে। পাজিটাকে একবার পেতুম তো মাথাভেঙ্গে গুড়ো করে' দিতুম। আচ্ছা, হতভাগাটা কোথায় জান্‌তে পেরেছ?"

"দারোগাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, বল্লে না।"

মহেশ আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে আসিয়া তিনশত টাকা ভবেশের হাতে দিয়া বলিলেন, "আমাকে এখনি কুটিতে যেতে হচ্ছে। যা কর্‌বার তুমিই করো—আমার ধন প্রাণ সবি-ই তোমার হাতে, বুঝ্‌লে? যাও, এখন চান্‌ করে' এসগে।"

ভগ্নীপতি যে আজ কুঠিতে যাইবেন, তাহাকেই যে টাকাদিয়া দারোগার কাছে পাঠান হইবে, ভবেশ তাহা পূর্ব্বেই জানিত। সে বলিল, "আপনার কোন চিন্তা নেই, যেরূপে হোক্‌ আমি দারোগাকে রাজী করাবো-ই। আমার সাথেও তাঁর বেশ পরিচয় আছে।"

মহেশ নিশ্চিন্ত হইয়া নিজকার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

(৪)

প্রায় এক মাস পরে একদিন মহেশ ব্যস্তসমস্তভাবে বাড়ী আসিয়াই বলিলেন, "গিন্নি, ভবেশ কোথায়?" তাঁহার দুইচক্ষু রক্তবর্ণ, কপালের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে; এই কয়টী কথা বলিয়াই কাঁপিতে কাঁপিতে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ও চোখ মুখের ভাব দেখিয়া গৃহিণী সশঙ্কিত হইয়া বলিলেন, "ওকি, তুমি অমন কচ্ছো কেন?— তোমার হয়েছে কি?"

কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া মহেশ বলিলেন, "সে শুনো পরে, আগে আমি যা জিজ্ঞেস করছি তাই বল।"

"তার ঘরে আছে বোধ হয়।"

"শীগ্‌গির ডেকে নিয়ে এস।" বিনাপ্রতিবাদে গৃহিণী চলিয়া গেলেন। এঘর ওঘর খোঁজ করিয়া তিনি কোথায়ও ভবেশের অস্তিত্বের সন্ধান পাইলেন না।

তাঁহাকে ফিরিতে দেখিয়া মহেশ বলিলেন, "পাওয়া গেলনা বুঝি? তা আমি আগেই বুঝেছি। হতভাগাটা আমার সর্ব্বনাশ করে, এখন সরে পড়েছে। পাজি শূয়োর।"

"ওগো, তুমি মিছে মিছি ওকে গাল দিচ্ছ কেন?"

মহেশ টেবিলে সজোরে এক মুষ্টাঘাত করিয়া বলিলেন "গাল দেবনা?—একশবার দেব, হাজারবার দেব। হাঁ, মিছেমিছি! আমার সর্ব্বনাশ কর্‌ল,—তবু বলে মিছেমিছি।

তোমার কি সর্ব্বনাশটা কর্‌ল, তাই শুনি?"

উত্তেজিত ভাবে মহেশ বলিল, "সর্ব্বনাশ নয়! তুমি একে সর্ব্বনাশ বলনা? অনিল এজাহার দিয়েছে বলে মিথ্যে করে আমার কাছ থেকে তিনশো টাকা খেয়েছে।— আর বাছা আমার কোথা চলে' গেল তার খোঁজ নেবার অবসরও আমায় দেয়নি। উঃ কি পাষণ্ড!"

"কে জানি মিছে করে' ভবেশের নামে তোমার কাছে লাগিয়েছে।"

"গিন্নি, আমি ঠিক না জেনে কাউকে কিছু বলিনে। একবার বলে' খুব আক্কেল হয়েছে— আর কর্চ্ছিনে।— দারোগা বাবু নিজে বলেছেন, যে, তিনি ভবেশ বলে কাউকে চেনেন না, আর অনিল কোনদিন রাত্তিরে তাঁর কাছে যায়নি।" গৃহিণী চুপ করিয়া রহিলেন।

"আর শোন, যে জন্যে অনিলকে আমি বাড়ী হ'তে বেড়িয়ে যেতে বলেছিলুম—যার জন্য বাছা আমার অভিমান করে চলে' গেছে— তাতে তার কোন দোষ ছিল না। সকলই এই হতভাগার কীর্ত্তি। ও নিজে সারবার জন্যে নিজের সব দোষ অনিলের ঘারে চাপিয়ে দিত। এইমাত্র আমার এক বন্ধু এসব বল্লেন।—ওঃ! কি অপদার্থ আমি, একবার সন্ধানও নিলুম না—একবার ভেবেও দেখ্‌লেম না যে এ তারপক্ষে অসম্ভব!" মহেশবাবু টেবিলের উপর নিজের হাতেরমাঝে মুখ লুকাইলেন।

কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী কি বলিতে যাইতেই মহেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "না, না, কিছু শুনতে চাইনে। যাও তুমি, আমি এখন একা থাক্‌ব।"

গৃহিণী চলিয়া গেলে মহেশবাবু বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে ছিল। অনেকক্ষণ এইভাবে পড়িয়া থাকিয়া, হঠাৎ লাফদিয়া বিছানা হইতে উঠিলেন এবং কাগজ কলম লইয়া লিখিলেন—

"অনিলকুমার সরকার নামক ত্রয়োদশ বর্ষীয় একটী বালক গত ১৫ই শ্রাবণ রাত্রিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। যিনি তাহার ঠিক সন্ধান আমাকে জানাইতে পারিবেন তাঁহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। বালকের চেহারা উপরের প্রতিকৃতির অনুরূপ।

শ্রীমহেশচন্দ্র সরকার।
রেষা—দ্বারভাঙ্গা।

অনিলের প্রতিকৃতিসহ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন বাহির হইল। কিন্তু দিনেরপর দিন গড়াইয়া চলিল, কেহই এই পুরস্কারের দাবী করিল না। আশার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া মহেশ, কোথাও যাইতে পারিল না, ঘরে বসিয়া দিন গণিতে লাগিলেন—আর সহস্র বিশ্চিকের দংশনযাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন।

অকর্ম্মা।

পল্লীর দ্বারে দিনরাত ঘুরে' সুধীর সুধায় সবে,—
"ভালতো শরীর?" "হয়নি তো কিছু?"
"খুব সাবধানে র'বে।"
'ভাল নেই আজ' শুনিলে অমনি ডাক্তার বাড়ীতে ছোটে;
লোকে বলে তারে ওরেরে অকর্ম্মা, বুদ্ধি তোর নাই ঘটে।
শুনে যদি কারো ঘর পুড়ে' যায় ভাবেনাকো কোন কথা,
অমনি দৌড়ায়, আগুন নিবায়, পোড়া গায়ে সয় ব্যাথা।
মোট বয় কারো, কারো কাটে ঘাস—টাকা কড়ি নাহি চায়—
গরীবেরে তাহা দিয়ে ফেলে, কেহ সেধে যদি দিয়ে যায়।
হাড়িরাম ডোম মরিল সেদিন,—কেহনা পোড়াতে চায়,
'বোল হরি' বলি কাঁধে শব তুলি' অকর্ম্মা পোড়াতে যায়।
ছি ছি ছি ছি বলি' লোকে দেয় গালি, মারে কেহ লাথি ঝাটা
'বাগ্দী ডোমেরে পোড়ে নিজ করে হ'য়ে বামুনের বেটা!'
করে 'দূর দূর' সে যায় যেথায়—কেহনা আদর করে,
সদানন্দ ময় অকর্ম্মা তবুও, মৃদু হেসে যায় ধীরে।
অসহায় যারা তারা শুধু জানে কর্ম্মের সন্ধান তার,
সমাজ-লাঞ্ছনা তিলক করিয়া দীনে কয় আপনার।

বিস্মুদের শেষ।

হিন্দু শাস্ত্র মতে জ্যোতিষের প্রাদুর্ভাবে আমরা জানিতে ও বুঝিতে পারি যে দিবসের কতিপয় সময় প্রত্যহই বারবেলা আছে। অজ্ঞ লোকেরা কেবল শনিও বৃহস্পতির শেষকেই গ্রাহ্য করিয়া থাকে, হিন্দুর ঘরে অতিবড় অহিন্দুও এই দুইটীকে পারিয়া না পারিয়া মানিয়া চলেন। বাঙ্গালা ১৩০৭ সনের শীতকালে আমি গোয়ালিয়ার রাজ্যের রাজধানীতে রাজ অতিথিরূপে বাস করিতে ছিলাম। আমি ভারতের যে সকল স্থানে গিয়াছি নিজ অভ্যাস বশতঃ সে সমস্ত স্থানের ভদ্র অধিবাসীদিগকে নিজগুণে না হউক তাহাদের গুণে আপন করিয়া লইয়াছি। গোয়ালিয়ারের অপরিচিত বাঙ্গালীগণ অচিরেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তারপর তথাকার অর্দ্ধ স্বাধীন মহারাজা আমাকে পাইয়া তিনিও আমাকে তাঁহার আপনার জন করিয়া লইয়া ছিলেন।

গোয়ালিয়ার রাজধানী হইতে সে রাজ্যের গুণা পর্য্যন্ত তখন নূতন রেল হইয়াছে। গুণাতে মহারাজার অধীনে একজন চিফ্ আছেন। তিনিও মহারাজ উপাধিধারী। তাঁহার একজন বাঙ্গালী প্রাইবেট্ সেক্রেটারী আছেন তাঁহার নাম বাবু উমানাথ বাগছি বি, এ তাঁহার নিবাস ময়মনসিংহ জেলায় আগুজিয়া গ্রামে। উমানাথ বাবু সম্প্রতি পেন্‌সন্ লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। তাঁহার এইকার্য্য ছাড়া পলিটিকেল এজেণ্ট একজন ইংরেজের আফিসে তিনি হেড্‌ক্লার্ক বা তাঁহার প্রাইবেট' সেক্রেটারী এবং তিনি সেখানকার চিফের (মহারাজার) স্থাপিত এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড্‌মাষ্টার তা ছাড়া তিনি চিফের

(মহারাজার) পুত্রের গৃহ শিক্ষক। সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার মাসিক আয় চারিশতের ও অধিক টাকা। এতগুলা কাজ টাকার লোভেই তিনি করিতে পারিতেন।

আমি যখন গোয়ালিয়ারে রাজ অতিথি তখন রেলের দুইজন বাঙ্গালী ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত হই। একজন ডাক্তার পাল (ডাক্তার শরচ্চন্দ্র পাল এল্, এম্, এস্) আর একজন ডাক্তার প্রমদাচরণ বাগছি। তাঁহার বাড়ীও ময়মনসিংহে তিনি পূর্ব্বোলিখিত উমানাথ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার সঙ্গে তাহাদের বেশ খাতির। ডাক্তার পালের বাড়ী তালতলা ডাক্তারের গলি (ডক্‌চার্লেন) কলিকাতা।

রেলের যিনি ইঞ্জিনিয়ার তিনি একজন বিলাতি সাহেব। তাঁহাকে সকলে বড় সাহেব বলিয়া কহে। আমিও তাঁহাকে সেই নামেই কহিব। আমি তাঁহার সঙ্গে সাধারণমত পরিচিত হইয়াছি, রেলের ডাক্তার বন্ধুদ্বয়ের দৌলতে। একদিন আমাদের আহারের পূর্ব্বেই আসিয়া ডাক্তার বন্ধুদ্বয় কহিলেন, "আমাদের বড় সাহেব আজই শিকারে যাইবেন আপনিও যাইবেন কি ?" আমি কহিলাম "আপনাদের সাহেব আমাকে সঙ্গে লইবেন কেন ?" তাঁহারা কহিলেন "সাহেবও আপনাকে সঙ্গে নিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাদের যাত্রার সময়।" আমি কহিলাম "আজ যে বৃহস্পতিবার, আমি হিন্দুদের শেষে যাইব কেমন করিয়া।" ডাক্তার বাগছি বলিলেন "সাহেবকে একবার বলিয়া দেখা যাউক, হয়, তিনটার পূর্ব্বে যাত্রাকরি না হয় আগামী কল্য প্রাতে।"

যেমন কথা তেমন কার্য্য। আমরা তিন জনই সাহেবের নিকট যাত্রার আয়োজন করিলাম। সাহেবের কাছেগিয়া হিন্দুদের শেষ বারবেলার কথা কহিলাম। সাহেব কহিলেন "টুমরা বারবেল ক্যা করেগা' হাম নাহি সুনেঙ্গে ডেম তোমরা বারবেল্।" অগত্যা আমরা পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বেলা যখন প্রায় চারিটা তখন আমরা পেট পুরিয়া আহারের আয়োজন করিলাম। আর অতি অল্প পরেই আমাদের যাত্রা। সাহেব আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে তব পাঠাইয়াছেন। আমি আহারে বসিয়া কহিলাম "সকলেই পেট ভরিয়া আহার করুণ বলা যায় কি আজ হিন্দুদের শেষ আমাদের কতটা কি করে।" ডাক্তার পাল কহিলেন "বামুন জাতেরই যত গোলমাল, পাঁজি খুলিলে কোনদিনই বামুনেরা কোন দিকেই যাত্রার বিধান করে না। আমরা কিন্তু আপনার বিধি গ্রাহ্য করিব না।"

আমি সর্ব্বাগ্রে আহার করিয়া আছি। এ বিষয়ে আমি বেশ ক্ষিপ্রহস্ত। ডাক্তার বাগছি সেও আমি আহার করাইয়াছি, এমন সময় বড় সাহেব উটের গাড়ীর ভিতর হইতে ডাকিলেন "Dr Paul ready ? ডাক্তার পাল তখন একগাল পুরিয়া লুচি মুখে দিয়াছেন। আমি উত্তর দিলাম "Yes sir we are ready" তখন চারিটা বাজিয়া গিয়াছে, সূর্য্যদেব লাল হইয়াছেন।

গোয়ালিয়ার জঙ্গলময় প্রদেশ। শিকারের অভাব নাই। বাঘ, ভালুক, হরিণ, মহিষাদির অভাব নাই। পাখীর মধ্যেও অভাব নাই ; ময়ূরাদি নানা জাতীয় পক্ষী। সাহেবের সঙ্গে দুই তিনটী বন্দুক, ডাক্তার পাল ও ডাক্তার বাগছি প্রত্যেকে একটী করিয়া এবং আমিও রাজ দরবার হইতে ভাল দুইটী বন্দুক চাহিয়া আনিয়াছি। আমাদের সঙ্গে একজন সে দেশীয় ভৃত্য আর সাহেবের সঙ্গে চাপ-রাশীও বাবুর্চ্চি। সাহেবের সঙ্গে যেমন ষ্টোভ্ ও পেয়ালা ইত্যাদি আমাদের সঙ্গেও তাই।

সে প্রদেশে উটের গাড়ী গুলা প্রায়ই দুইটা করিয়া উটে টানিয়া থাকে। আমাদের গাড়ীও দুইটা উটের। গাড়ী দোতালা নীচের তলায় সাহেবকে লইয়া আমরা চারিজন উপর তলায় আমাদের লট বহর আর ভৃত্যাদি। আমাদিগকে লইয়া গাড়ী বেশ চলিতে লাগিল। সূর্য্যদেব অন্ধকারের হাতে চার্জ্জদিয়া সে দিনকার মত বিদায় লইতে ছিলেন আর অন্ধকার ও দস্তুর মাফিক্ চার্জ্জ বুঝিয়া লইয়া তার রাজ্য গ্রহণ করিতেছিলেন এমন সময় পুবেরদিকে চাহিয়া দেখি ক্ষুদ্র একটী পাহাড় ডিঙ্গাইয়া পুবের আকাশ আলো করিয়া একটা গোলাকার রক্তথালা উপরে উঠিতেছে। আমি কহিলাম "ডাক্তার পাল, আজ ও পূর্ণিমা, পঞ্চাস্তে মরণং ধ্রুবং।" ডাক্তার পাল কহিলেন "রেখে দিন আপনার ধ্রুব, বামুন জাতেরই যত অদ্ধি সদ্ধি এত লট ঘট। স্ফুর্তিকরে চলুন, কোন বেটা ধ্রুবই কাছে এগুতে পারে না।" সাহেব কহিলেন ক্যা বাতহ্যায় ?

ডাক্তার পাল বুঝাইয়া দিলে সাহেব কহিলেন "হামত ইন্ দেশ মে বহুত বামুন দেখা হ্যায়। এতনা থোরা আক্কেল কভি নাহি দেখা। বামুন লোগ্‌কা অগি চ্যুব আওর পক্কাপন হাম লোক্‌কাগ ক্যা করেগা সাহেব, আমার ও ডাক্তার বাগাছর দিকে চাহিয়া বেশ একগাল হাসিয়া লইলেন। আমিও চুপ করিয়া তাহাদের ঠাট্টাটা বেমালুম হজম করিয়া লইলাম। উপায় কি ?

রাত্রি যখন নয়টা তখন চাঁদের আলো পৃথিবীতে ছাইয়া পড়িয়াছে দূরের মানুষও বেশ করিয়া চেনা যায়। সূচ পড়িলেও বুঝিবা কুড়াইয়া লওয়া যায়। ডাক্তার পাল কহিলেন "ঐ যে দুইটা ঘোড়া দৌড়িতেছে, দেখা যাইতেছে। গাড়োয়ান কহিল "সাহেব, সের বাবু সের, সের." আমরাত সেরের নামেই অবাক্, সাহেব বীর-দর্পে কহিলেন "কাহা হ্যায়, গুলি চালাও।" চাপরাশীকে বন্দুক দিতে হুকুম করিলেন। গাড়োয়ান কহিল "সাহেব গুলি মৈত চালাও, তব্ হাম লোক তামাম মরেগা। এক গুলিছে বাঘ মরেগা নাহি আওর হাম লোক তামাম খোলাসা কর দেগা। "সাহেব তথাপি গুলি চালাইতে চাহেন, আমরা কহিলাম "গাড়োয়ানের উপদেশই গ্রাহ্য যোগ্য—সুতরাং গুলি চালাইবেন না তাহা হইলে হয়ত আমরাও বাঘের পেটে যাইব।"

সাহেব আসিলেন তারপরই ধপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল। গাড়োয়ান কহিল "হুজুর সের উট্‌কা উপর পাপ্পা মারা হ্যা হুজুর হুসিয়ার হো।" আমরাও হুসিয়ার হইলাম কিন্তু কিছুই করিবার উপায় নাই। ক্রমে আরও দুইবার ধপাস্ করিয়া আওয়াজ হইল। আমরা তখন টীন বাজাইতে লাগিলাম। গাড়োয়ান নীচে নামিয়া তাড়াতাড়ি খড় কুটা লামাইয়া আগুন জ্বালিল। আমাদের সঙ্গের ল্যাম্পেও আলো ধরাইলাম। আর আমাদের ট্রাঙ্ক ও টিনের বাল্‌তিতে জোরে কাটি দিয়া বাজাইতে লাগিলাম। গাড়োয়ান কহিল "পহেলে এক উট ছোড় দেনা আচ্ছা হ্যাব। বাকী একটো লেকের হাম লোক চলনে সকেগা। ওহি আচ্ছা হ্যায়।" আমরাও এই ব্যবস্থাকে সমীচীন মনে করিলাম। গাড়োয়ান একটা উটের বাঁধ ছাড়িয়া দিল। আমাদিগকে এক উটেই টানিয়া চলিল।

রাত্রি যখন প্রায় ১২টা তখন আমাদের সম্মুখ দিকে দেখিতে পাইলাম, দুইখানা উটের গাড়ী আসিতেছে। সে গাড়ী হইতে একটা বন্দুকের আওয়াজ হইল। আমাদের গাড়ী হইতেও একটা আওয়াজ হইলে উহারা হয়ত বুঝিতে পারিল আমরাও তাহাদের সম ব্যবসায়ী। কিন্তু কতক দূর অগ্রসর হইলেই যখন তাহারা বুঝিতে পারিল আমরা পথিক তখন তাহারা হাকিল "কোন হ্যায় ঠাহেরো।" সাহেব সজোরে, রোষে কহিলেন "চালাও।" গাড়োয়ান কহিল "হুজুর ডাকো ডাকো সামনে চলেঙ্গে তব মার ডালেগা।" বাঘের বেলায় সাহেবকে লম্ফ ঝম্প করিতে দেখিয়া ছিলাম ডাকাতের বেলায় কিন্তু তাহার মুখ চুণ, গাড়ীর এক কোণায় ভয়ে গিয়া ঠাঁই লইয়াছেন। মুখে যেন ধুলা উড়িতেছে—নিঃশব্দ আমি এত দুঃখেও মনে মনে হাসিলাম।

গাড়ী থামিল, ডকাতের গাড়ী নিকটবর্ত্তী হইলে তাহা হইতে কয়েকজন লোক আমাদের গাড়ী খানাতল্লাস করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দিল, মনে ভাবিলাম কোন্ পুণ্য বলে বাঁচিয়াছি। তারপর আমাদের গাড়ী চলিল। ডাকাতের গাড়ী হইতে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইলে সাহেবের মুখে কথা ফুটিল। তিনি তখন সদম্ভে কহিলেন "গুলি চালানেছে বিলকুল আদমি সাফ্ হো যাগা।" "সাহেব বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের হাতেও যে বন্দুকছিল। এ প্রদেশে অস্ত্র আইন নাই। যার তার হাতে বন্দুক দেখিতে পাওয়া যায়। সরকার তাহার খবরও করেন না। ভাল ভাল শিকারী এ প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ন্যায় ইহারা ভীরু ও দুর্ব্বল নহে।

রাত্রি যখন দুইটা তখন আমরা দূর হইতে বৃহৎ এক অগ্নিকুণ্ড দেখিতে পাইলাম, যেন এক রাবণের চিতাগ্নি জ্বলিতেছে। আমি যখন "আগুন আগুন" বলিয়া উঠিলাম, তখন সকলের মুখেই হাসি দেখা দিল। সাহেব কহিলেন ওই হামারা কুলীলোককা ছাউনি হ্যায়। কুলিরা হিংস্র জন্তুর ভয়ে রাত্রে চারিদিকে বিস্তৃত আগুন জ্বালাইয়া তাহার মধ্যে তাহারা চালা ও তাম্বু খাটাইয়া বাস করে। আমরা গিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে কুলীর সর্দারেরা আসিয়া

সেলাম দিল আমিও ফাও স্বরূপ সেলাম পাইতে বঞ্চিত হইলাম না, উহারা হয়ত মনে করিয়াছিল আমিও ওদের একজন কর্ত্তা। তাহাদের তাম্বু ছাড়িয়া দিয়া আমাদের রাত্র বাসের স্থান করিয়া দিল। আমরা দুই তাম্বুতে তাড়াতাড়ি গিয়া চিৎহয়ে পড়িলাম। অবিলম্বেই নিদ্রা আসিয়া আপ্যায়িত করিল।

যখন চারিটা বাজিয়াছে তখন চারিদিকে বহু লোকের বীকট চীৎকার শুনিয়া আমাদের গভীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কুলীরা সকলে কহিল "হাম লোককা ছাগর ছোর লে গিয়া।" আমি কহিলাম "যদি আমাদের বাকী উট টাও নিয়া থাকে তবে সর্ব্বদিক্ই আমাদের ফরসা হয়।" আমার এ কথায় কেহই উত্তর দিলেন না। সকলেরই মুখ চিন্তা জড়িত। আমাদের গাড়ী ও উট ভিতরে আসিবার জন্ত যে আগ সরাইয়া অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পথ করিয়াছিল, রাত্রি অধিক নাই বিবেচনা করিয়া পথ আর বন্ধ করে নাই সেই পথ দিয়া বাঘ আসিয়া ছাগল লইয়া গিয়াছে। আমাদের আর নিদ্রা হইল না। আমাদের হুকায় তামাক দিয়া গেল, টানিতে লাগিলাম, নিশ্চিন্ত হইয়া। সাহেবের জন্ত চা উঠিল, আমাদেরও চা উঠিল।

প্রাতে পুনরায় আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল। পার্ব্বত্য প্রদেশে শীতে কোয়াসা বেশী হয় না। আমাদের গাড়ী পথ দেখিয়া বেশ চলিতে লাগিল। আমরা সাহেবের বাঙ্গালা হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে আছি তখন বেলা ৯টা আমরা এখানে পথ মধ্যে শুনিতে পাইলাম, সাহেবকে পথে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে, সংবাদ পাইয়া তাহার মেম ঘোড়ায় চড়িয়া সাহেবের সন্ধানে বাহির হইয়া গিয়াছেন। সাহেব ইহা শুনিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। আমরা বাঙ্গলায় পঁহুছিয়া মেমের অনুসরণ করিতে কহিলাম কিন্তু সাহেব তা না শুনিয়া পীঠে বন্দুক ও কোমরে তরবারি ঝুলাইয়া মিলিটারী সাজ লইলেন, তারপর রেলের একজন ওভার-সিয়ারের ঘোড়া লইয়া যাত্রা করিলেন। আমাদের গাড়ী গন্তব্য পথে চলিল। আমরা কতক দূর অগ্রসর হইয়া শুনিলাম মেম সাহেবকে বাঘে খুন করিয়াছে। আমরা সাহেবের বাঙ্গলায় গিয়া শুনিলাম সাহেব মেমের মরা লাস লইয়া গরুর গাড়ীতে করিয়া এ দিকে আসিতেছেন।

সাহেব পত্নী প্রাণপণে ঘোড়া দৌড়াইয়া আমাদিগকে যেখানে বাঘ আক্রমণ করিয়াছিল সেখানে গিয়া শুনিলেন জঙ্গলে বাঘ বসিয়া বসিয়া সাহেবকে খাইতেছে। মেম সেখানে গিয়া দেখেন দুইটা বাঘ একটা মরা উট সামনে লইয়া বসিয়া আছে। ঘোড়ায় চড়া মেমকে দেখিয়া বাঘ দুইটা তাঁহাকে তাড়া করিলে তিনি প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইলেন, প্রাণ ভয়ে সাহেবের কথা ভুলিয়া গেলেন। হঠাৎ তিনি ঘোড়া হইতে পাথরের উপর পড়িয়া গেলেন। ঘোড়া তখন স্বাধীন হইয়া পলাইল, মেম সাহেবের আঘাত স্থান হইতে রক্ত পড়িতেছে তিনি অচৈতন্য। স্থানীয় ভীলেরা মেম সাহেবকে কাঁধে করিয়া তাদের গৃহে লইয়া গেল কিছু পরে তার চেতনা আসিল, তাহারা হাতে মুখে জল ও নেকড়া দিয়া পটি বাঁধিয়া দিল।

সাহেব পথে আসিতে আসিতে শুনিলেন মেমকে বাঘে ধরিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে নিকটবর্ত্তী ভীলেরা মেমের মরা লাস তাদের বাড়ী নিয়া রাখিয়াছে। সাহেব দ্রুত অশ্ব চালাইয়া ভীলদের বাড়ী গিয়া দেখেন মেমের শরীরে নানা স্থানে বড় চোট লাগিয়াছে। তিনি গরুর গাড়ী ডাকিয়া তাহাতে তাহাকে শুয়াইয়া লইয়া চলিলেন। গো যান বাঙ্গলায়দিকে চলিল। তখন আমরা বাঙ্গলায় বসিয়া বিস্ময়ের শেষের কথা লইয়া খুব আমোদ করিতেছি। ইতিমধ্যে শুনিতে পাইলাম মেম সাহেবকে কবর দেওয়ার জন্ত তার লাস সাহেব গো যানে করিয়া বাঙ্গলায় লইয়া আসিতেছেন। একথা শুনিয়া ডাক্তার পাল সাহেবের এক ঘোড়া লইয়া সেদিকে অগ্রসর হইলেন।

গরুর গাড়ীতে সাহেব ও মেম, ঘোড়ায় তাহার পশ্চাতে ডাক্তার পাল। বেলা অবসান হইলে তাহারা বাঙ্গলায় আসিলেন। আমি কহিলাম "কেমন করিয়া মেম মারা গেলেন?" সাহেবকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় কহিলাম "আজই কি মেমকে কবর দিতে ইচ্ছা করেন?" বিমর্ষ সাহেব তখন হাসিয়া ইংরেজীতে কহিলেন "ঈশ্বর বাচাইয়া-ছেন, মেম মরে নাই।" গাড়ীর ভিতর হইতে মেমকে ধরাধরি করিয়া ঘরে তুলিয়া শয্যায় লইয়া গেলাম। মেমের মুখে দেখি যেন খই ফুটিতেছে। কি সংবাদ পাইয়া বাঙ্গলা হইতে কেমন করিয়া প্রাণপণে ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া উট ও

বাঘ দেখিয়া কেমন করিয়া ঘোড়া পলাইল তারপর যা যা হইয়াছিল সবিস্তারে মেম বলিয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার পাশ শিশি হইতে ঔষধ বাহির করিয়া ঘাগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া বান্ধিয়া দিলেন।

মেম সাহেব ভাল হইলেন সাহেবের মনে স্ফূর্ত্তি আসিল। একদিন সাহেব আমাকে কহিলেন "পণ্ডিতজী, তোমরা বারবেল্ কৌন কৌন রোজ কোন কিস্তছে আতাহে, হামারা চাপরাসীকো শিখলায় দেও। বারবেল্ লেকড় হাম কভি নাহি যায় গা।" আমি চাপরাশিকে বারবেলার জীবন চরিত কহিয়া দিলাম, সে লিখিয়া লইল। তারপর সাহেব যখন যেখানে যাইতেন তখন চাপরাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "চাপরাসী, দেখো, বদমায়েস বারবেল্ কাহাহ্যায়। ওহি বদমাস্ সামনে রহেগা তব্ হাম কভি-নাহি যায়গা।" চাপরাসী তখন কেতাব খুলিয়া বারবেলার গতিবিধি ঠাহর করিত, সাহেব তখন বাহির হইতেন।

আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া সাহেবের নিকট পণ্ডিতজী উপাধি প্রাপ্ত। একদিন সাহেব আমাকে কহিলেন "আভিহাম্ মফঃস্বল যায়গা, পণ্ডিতজী দেখোতো আভি তোমারা বদমাস্ বারবেল্ কাহাহ্যায়?" আমি কহিলাম "এখন বিস্থাদের শেষ।" সাহেব দুই লম্ফে ঘরের ভিতরগিয়া কহিলেন "ইস্ বিস্থাদের শেষ——বাপ্‌রে কা বদমাস্।"

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ।

গান।

লুকিয়ে লুকিয়ে কর যাওয়া আসা
অহো কি গভীর তব ভালবাসা!
মৌন মুখ চন্দ্র নাহিক বাণী
দেখিলে জুড়ায় চির জনম গ্লানি।
জলে স্থলে ফুলে ফলে অনিলে
তব মধুময় বারতা মিলে!
প্রভাত রবি করে, ইন্দু কিরণে
জাগে জ্যোতি তব নীল গগনে!
পয়োধি নদ নদী গিরি কন্দরে
জাগে বাণী তব বন মর্ম্মরে!
কত বর্ণে গন্ধে, কত গীতে ছন্দে
তোমারি মাধুরী বিশ্ব নন্দে!
যেন তব মহিমা প্রচার লাগি
র'য়েছ সখা তুমি ভুবনে জাগি!
কিবা নির্ম্মল উজ্জ্বল শুভ্র কান্তি
কিবা নিবিড় গভীর স্নিগ্ধ শান্তি!
আজিকে বিস্ময় বিহ্বল প্রাণে
নতি নতি তুমি মঙ্গল ধামে!

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কবিভূষণ।

"বাবাজীর ঝুলি"

১। বিবাহ তত্ত্ব।

সন্ধ্যার সময় মৌতাত করিয়া বসিয়া আছি। পার্শ্বে পুত্ররত্ন সুর করিয়া ব্যাকরণ পড়িতেছেন। "সুর" বলিতে কেহ একথা মনে করিবেন না, পুত্র রত্ন আমার, দীপক অথবা মল্লার রাগিণীতে পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। ছেলেরা যখন চেঁচাইয়া পড়িতে থাকে, তখন সেই চীৎকার--সেই এক কথার পুনঃপুনঃ আবৃত্তি, রাগিণীর হিসাবে কানে অত্যন্ত বেসুরা বাজিলেও, তাহার মধ্যে একটা সুর আছে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। একটু মনঃ সংযোগ করিয়া শুনিলে, সেই পড়ার সুরে পাঠকের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি অনেক সময় শুনিতে পাওয়া যায়। একটী কক্ষে ছাত্র বসিয়া পড়িতেছে, অপর কেহ পার্শ্বের কক্ষে বসিয়া শুনিতেছেন, কিন্তু ছাত্রটীকে দেখিতে পাইতেছেন না। এমন অবস্থাতেও কেবল মাত্র পড়ার সুরটী শুনিয়া তিনি ছাত্রটীর মানসিক অবস্থা অনেক সময় বলিয়া দিতে পারিবেন। অবশ্য যাহারা যথারীতি রজত খণ্ড দক্ষিণা দিয়া আমার নিকট হইতে এই বিদ্যা গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাদের কথাই বলিতেছি। সকলেই পারিবেন—এমন কথা আমি বলিতেছি না। দুই একটী উদাহরণ দিতেছি—

(ক) ছাত্র-পড়িতেছে—"হর্ছ মানে ঘোড়া," "হর্ছ মানে ঘোড়া"। পড়িতে পড়িতে যখন হর্ছ মানে ঘোড়া"র পরিবর্ত্তে অনুনাসিক সুরে—"হঁ-র্ঁ। ঘোঁয়া—" "হঁ-র্ঁ।—ঘোঁয়া" এই প্রকার ধ্বনি কেবল শোনা যাইবে, তখন বুঝিতে হইবে সে ছাত্র-হৃদয়, নিদ্রার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

(খ) আবার যদি শুনিতে পাওয়া যায় যে প্রায় পোনর মিনিট হইল, ছাত্র কেবল "হর্ছ মানে ঘোড়া" এই এক কথাই পড়িতেছে, অন্য কোন কথাই বলিতেছে না, তখন বুঝিতে হইবে যে ছাত্রের চক্ষু পুস্তকের দিকে নাই। ছাত্র হয়তো একটা কলম কাটিতেছে, কি নখ্ খুটীতেছে, অথবা খোলা খিরকীর মধ্য দিয়া মাঠের ভিতরে রাখাল বালকগণের খেলা দেখিতেছে। আর অভিভাবক অথবা অপর কক্ষস্থিত

গৃহ শিক্ষকের চোখে ধুলি দেওয়ার জন্য মুখে একটা সুর রাখিয়াছে মাত্র।

(গ) ধীরে ধীরে পড়িতেছে, কখন থামিতেছে এই অবস্থায় হঠাৎ যদি উচ্চৈস্বরে ঘন ঘন পড়িতে আরম্ভ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ছাত্রের অভিভাবক অথবা শিক্ষক কেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন অথবা নিকট দিয়া যাইতেছেন।

সে কথা এখন থাকুক; যে কথা বলিতেছিলাম—আমার পুত্র রত্ন পাঠ করিতেছে; বিশেষ লক্ষ্য করিয়া শুনিলাম শ্রীমান্ একশ বারই কেবল,—

"বিবাহ—বি পূর্ব্বক বহ ধাতু ঘঞ্
বিবাহ—বি পূর্ব্বক বহ ধাতু ঘঞ্"

ইহাই পড়িতেছেন। শ্রীমানের স্মরণশক্তির প্রখরতা বলিয়াই হউক, অথবা বার বার পড়াতে বিবাহ কথাটী পিতার কর্ণে প্রবেশ করিলে, এবং association of ideas দ্বারা, "কিঞ্চিত লিখনং বিবাহ কারণং" এই মহাজন বাক্য পিতার স্মৃতি পথে উদিত হইলে, পুত্রের বিবাহের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া, তিনি অবিলম্বে আবশ্যকীয় উদ্যোগে ব্রতী হইলেও হইতে পারেন, এই ভরসা করিয়াই হউক, শ্রীমান বার বার বিবাহ পদটিরই প্রত্যয় সাধিতে ছিলেন *

বার বার "বহ ধাতু" "বহ ধাতু" শুনিতে শুনিতে চিন্তাস্রোত ঐ "বহ ধাতুর" উপরই কেন্দ্রীভূত হইল। বহ ধাতুর অর্থ চিন্তা করিয়া দেখিলাম "বহন করা"। তখন মনে হইল যে বি পূর্ব্বক বহ ধাতুর অর্থ তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে "বিশেষ ভাবে বহন করা"। মনে একটু সন্দেহ হইল, পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বিবাহ কি বলতো?" পুত্র তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "বিবাহ অর্থ পরিণয়, পাণিগ্রহণ"।

মনে মনে পুত্রের শিক্ষককে খুব তারিফ করিলাম। বুঝিলাম যে সকল শিক্ষক-কুলতিলক, "বাড়ী অর্থ আলয়" "মা অর্থ জননী" "চাঁদ অর্থ শশধর" সূর্য্য অর্থ অংশুমালী" ইত্যাদি ছাত্রগণের বোধগম্য সরল অর্থ শিক্ষা দেন, ইনি তাঁহাদেরই অন্যতম। যাহাই হউক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম "বহ ধাতুর অর্থ কি?" পুত্র বলিল "বহন করা"। আবার প্রশ্ন করিলাম—"তাহা হইলে বিবাহের উদ্দেশ্য কেমন করিয়া সিদ্ধ হইল?" পুত্র উত্তর করিল—"পণ্ডিত মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন—লক্ষণাদ্বারা অর্থ হইবে।" এই বলিয়া কতগুলি সংস্কৃত আওরাইয়া গেল। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কেবল মাত্র একটী কথাই বুঝিতে পারিলাম, সে কথাটী "কা কেভ্য দধি রক্ষন্তাং"। মনে মনে পণ্ডিত মহাশয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিলাম। অহিফেন সেবনী বলিয়াই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, আমি দুগ্ধ ও দধির প্রতি চিরদিনই অনুরক্ত। ব্যাকরণ পড়াইতে পড়াইতেও যে পণ্ডিত মহাশয়, এই অমূল্য পদার্থ যত্নে রক্ষা করার উপদেশ দিয়াছেন, ইহাতে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইল।

শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইল বটে, কিন্তু সন্দেহ তিরোহিত হইল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হইতে লাগিল বিবাহ পদটীতে বহ ধাতুর অর্থের সার্থকতা কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে বিরক্ত হইয়া আফিংএর মাত্রা দ্বিগুণ চড়াইয়া দিলাম। অমনি দেখিলাম কৈলাস পুরীতে আসিয়া পড়িয়াছি। অন্তরাল হইতে দেখিলাম, হরপার্ব্বতীতে বিশেষ কোন্দল বাধিয়া গিয়াছে। শ্রীমান নন্দীকেশ্বর একদিকে দাঁড়াইয়া একবার বাবার একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিতেছেন। শ্রীমান কার্ত্তিকেয় ভায়া একটু অন্তরাল হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া বিবাদের ফলাফল জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। সেখানে, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া, উভয়ের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে বিবাদে জয় পরাজয়ের উপর শ্রীমানের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, তাই তাঁহার এই আগ্রহ।

বিবাদের কারণ এই যে কুমার কার্ত্তিকের এতদিন অবিবাহিত থাকিয়া, এখন হঠাৎ বিবাহ করার জন্য

* আমার অনেক বন্ধুর মত এই যে রাই যেমন বলিয়াছিলেন "না জানি কতই মধু শ্যাম নামে আছে গো" বাঙ্গালীর ছেলেও তেমনি বোল পার হইতে না হইতেই ভাবিতে থাকে "না জানি কতই মধু বিবাহেতে আছে গো"।

খেপিয়া উঠিয়াছেন। পার্ব্বতী পুত্রের পক্ষ হইয়া মহাদেবকে সেই কথা বলিতে আসিয়াছিলেন। মহাদেব শুনিবামাত্র একেবারে আর্জ্জি না মঞ্জুর করিয়া বসিয়াছেন। কাজেই কোঁদলের সৃষ্টি।

"জারমেনীর ভারত আক্রমণ সম্ভাবনায় সকলে এখন ব্যস্ত, ভারতের বীর ছেলেরা দলে দলে সিপাহীর খাতায় নাম লিখাইতেছে, এমন সঙ্কটের সময় এতবড় যোদ্ধা ছেলে যুদ্ধে না যাইয়া, বিবাহ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করিতে চাহে, ছি! ছি! তার জীবনেই ধিক্" ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া, মহাদেব পার্ব্বতীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন কিন্তু কিছুতেই বুঝাইতে পারিতেছিলেন না।

পার্ব্বতী বলিতেছিলেন—"জীবন ভরিয়া যুদ্ধই করিল, এখন বাছা আমার ঘর সংসার করিতে চায়। তুমি তাহাতে বাধা দিওনা। তাহাকে আমি কিছুতেই যুদ্ধে যাইতে দিব না"।

এমন সময়ে ঠাকুরের দৃষ্টি সহসা আমার দিকে পতিত হইল। তিনি আদর করিয়া আমাকে নিকটে ডাকিলেন, আমি প্রণাম করিলাম। মঙ্গল জিজ্ঞাসাদির পর ঠাকুর বলিলেন—"দেখিয়াছ যুগে যুগে অসুর নাশের জন্য যিনি অসুর নাশিনী মূর্ত্তিতে রণাঙ্গণে অবতীর্ণা হন, তিনি আজ পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইতে অনিচ্ছুক। ইহার কারণ কি বলিতে পার?"

অহিফেন প্রসাদে আমার তখন দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়াছে, কাজেই আমি তখন চট্ করিয়া উত্তর দিলাম "সে দোষ তো তোমারই ঠাকুর! বুড়া হিমালয়; ও বুড়ি মেনকার তো অনেকদিন হইল ৺ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তথাপি এখনো সেই ছুতা ধরিয়া, প্রতি বৎসর ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী লইয়া বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ খাইতে যাও। "সংসর্গজাঃ দোষাঃগুণাঃ ভবন্তি"। বাঙ্গালীর সংসর্গে আসিতে আসিতে মা বাঙ্গালী রমণীর স্বভাব পাইয়াছেন। পুত্রকে কোল ছাড়া করিতে চাহেন না, শ্রীমান ভ্রাতা ও খাঁটী বাঙ্গালীর মত ঘরে ভাত থাক্ আর নাই থাক্, বিবাহ ও বংশ বৃদ্ধিই জীবনের সার বলিয়া বুঝিয়াছেন।" *

ভোলানাথ কথাগুলি শুনিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। মহামায়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—একা রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব তার মিতা" ইত্যাদী বলিয়া আমাকে কিষ্কিন্ধ্যা পতির সহিত তুলনা করিয়া, আমার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন। আমি আর কোন কথা বলিতেই সাহসী হইলাম না।

তখন বেগতিক দেখিয়া ভোলানাথকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। তিনি বলিলেন,—তুমি যদি নিতান্তই না মান, তাহা হইলে করুক বিবাহ। কিন্তু তাকে একবার ডাক, বিবাহ ব্যাপারটা কি,—আমি তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেই।"

তখন শ্রীমান কার্ত্তিক ভায়া ভাল মানুষ টীরমত অবনত মস্তকে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহাদেব তখন গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—

"বৎস! বিবাহ পদটী বি পূর্ব্বক বহ ধাতু ঘঞ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে। "বহ" ধাতুর অর্থ বহন করা ইহার আদি অন্ত ও মধ্য সমুদায় কার্য্যেই "বহন করা" ব্যাপারের আধিক্য, এই জন্যই ইহা বিবাহ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বৎস! অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর:—

১। কন্যা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কন্যার পিতা দুর্ব্বহ চিন্তাভার মস্তকে বহন করিতে থাকেন।

২। কন্যা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই "বোঝার উপর শাকের আটীর" ন্যায়—"ওগো তোমার মুখে ভাত রোচে কেমন করে?" "মেয়ে যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হয়ে উঠলো!" "মেয়ের বে দিতে পারনা মুখ দেখাও কেমন করে?" ইত্যাদি গৃহিনীর গঞ্জনা ভার কন্যার পিতাকে অবনত মস্তকে বহন করিতেই হয়।

৩। যদিই বিবাহ স্থির হইল তাহা হইলে, বিবাহের পণের টাকা সংগ্রহ করার জন্য মহাজনের নিকট, পৈত্রিক তালুক অথবা পৈত্রিক বসত ভিটার রেহাণ দলিল (mortgage

---

* দেব সেনাপতি কার্ত্তিক বাঙ্গলায় আসিয়া বর্ম্ম চর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তেড়া সিঁথি, ফুলদার পাঞ্জাবী, পাম্পশু, ছড়ি, উড়ানি, শান্তিপুরে ধুতি, ধরিয়াছেন। দুর্গোৎসবের প্রতিমা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

deed) বহন করিয়া লইয়া যাওয়া, এবং তৎপরিবর্তে আবশ্যক অর্থ বহন করিয়া লইয়া আসা বিবাহের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ।

৪। বিবাহের প্রস্তাব ডাকযোগে উপস্থিত হইলে, পিয়ন কর্তৃক পত্র বহন প্রয়োজন; ঘটকদ্বারা হইলে স্কন্ধে চাদর বহন, বগলে ছাতি বহন, হস্তে চটী জুতা বহন, এবং চরণে হাটু পর্য্যন্ত ধূলি বহন করিয়া ঘটক মহাশয়গণের ঘন ঘন বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে গমনাগমন এবং গহনা যৌতুকের ফর্দ্দ বহন না করিলে বিবাহই স্থির হয় না।

৫। বিবাহের প্রস্তাব স্থির হইলে, পাকা দেখা ও আশীর্ব্বাদ ইত্যাদির জন্য বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার পরস্পরের গৃহে আগমনেও, আমরা বহন করার আবশ্যকতা দেখিতে পাই। অবস্থা ভেদে, হস্তী, অশ্ব, গাড়ী, পাল্কী, মোটর প্রভৃতি এই বহন কার্য্য করিয়া থাকে। দরিদ্র হইলে, যুগল চরণই বহন করিয়া লইয়া যায়।

৬। বিবাহ স্থির হওয়ার পর, আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হইলে, তাহা দোকান প্রভৃতি নানাস্থান হইতে বহন করিয়া বা করাইয়া আনিতে হয়, এ কথা না বলিলেও চলে।

৭। বিবাহের অঙ্গীয় আহারের ব্যবস্থায় কি কি দ্রব্য আবশ্যক হইবে তাহার ফর্দ্দ করিতে বসিলে, অনেকস্থলে সহৃদয় প্রতিবেশীগণের অযাচিত উপদেশ ভার (advice gratis) মাথা পাতিয়া বহন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়-এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

৮। বিবাহের অঙ্গীয় আভ্যুদিক শ্রাদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই কন্যাকর্ত্তাকে পণের টাকা বহন করিয়া বরকর্ত্তার নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, ইহাই চিরানুমোদিত প্রথা।

৯। বিবাহের শোভাযাত্রায় বরকে, চতুর্দ্দোলেই হউক অথবা অন্য কোন প্রকার যানদ্বারাই হউক বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। শুধু শোভাযাত্রায় নহে, বিবাহ সভা হইতে বিবাহ মণ্ডপে যাইতে হইলেও দেশভেদে ভৃত্য অথবা নরসুন্দরদ্বারা বরকে বহন করাইয়া লইতে হয়। কন্যাকেও পিড়ির উপর বসাইয়া বহন করিয়া আনিতেই হইবে। এ প্রথাও সর্ব্বত্র প্রচলিত।

১০। বর-কন্যা উভয়েরই বিবাহকালে মস্তকে করিয়া মুকুট বহন, বরের হস্তে দর্পণাদি বহন উল্লেখযোগ্য।

১১। প্রতিশ্রুত যৌতুক গহনা বা পণ মধ্যে বরকর্ত্তার কিছু অপছন্দ হইলে, অথবা বরযাত্রীগণের অভ্যর্থনায়, পান হইতে চুণ খসিলে, কন্যাকর্ত্তাকে যে বরকর্ত্তার ভীষণ অসন্তোষ ভার বহন করিতেই হইবে এবং তাহার চাপে জীবন্মৃত হইতে হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

১২। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, নববধুর মুখদর্শনী মুদ্রা বহন করিয়া লইয়া আসেন এবং তৎপরিবর্তে লুচি মণ্ডা ইত্যাদি উদরে বহন করিয়া লইয়া যান, ইহা অনবরতই দেখিতে পাওয়া যায়।

১৩। অবস্থা ভেদে একটী, দুইটী অথবা তিনটী কন্যা বিবাহ দেওয়ার পর, কিছুদিনের মধ্যেই, কন্যার পিতার নিকট সাক্ষাৎ সমন—আদালতের পিয়ন, দেনার টাকার নালিশের 'সমন' বহন করিয়া লইয়া আসে। তখন অধিকাংশ স্থলেই কন্যার পিতাকে পৈত্রিক ভিটার মমতা ত্যাগ করিয়া চিম্‌টা ও কম্বল বহন করিয়া গহন-বন গমন-প্রয়াসী হইতে হয়।

১৪। বিবাহের পর হইতেই, চাকুরী অথবা বিদ্যা-শিক্ষার জন্য বিদেশবাসী স্বামীর, প্রতি সপ্তাহে স্বহস্তে সঙ্গোপনে ডাকঘরে 'প্রেমপত্র বহন করিয়া লইয়া যাওয়া-বিবাহের অঙ্গীয় একটী অবশ্য পালনীয় ধর্ম্ম।

১৫। উক্ত বিদেশবাসী স্বামীকে গৃহে প্রত্যাগমন কালে, ট্রাঙ্ক বোঝাই করিয়া, কুন্তলীন, দেলখোস্, পার্শী সাড়ী, সুবাসিত তরল আল্‌তা, জ্যাকেট, সেমিজ প্রভৃতি বহন করিয়া আনিতেই হইবে। নতুবা দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইন অনুসারে তাঁহাকে গুরুতর শাস্তি বহন করিতে হইবে সন্দেহ নাই।

১৬। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর ভরণ পোষণ, অলঙ্কার প্রদান প্রভৃতির যাবতীয় ভার স্বামীকে বহন করিতেই হইবে। এবং তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে অন্য উপায় না থাকিলে স্কন্ধে পাল্কী বহন পর্য্যন্তও করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

১৭। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" ইহাই শাস্ত্র বাক্য। বিবাহের পরিণামে, দশমাস দশদিন উদরে পুত্রকে বহন এবং সেই পুত্র উপযুক্ত হইয়া পত্নীর বাহন স্বরূপে পরিণত হইলে তাহার নিকট হইতে ঐ দশমাস দশদিনের গুদামভাড়া স্বরূপ কিঞ্চিৎ বহন করিয়া অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে জননীর গমন, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। আদুরে পুত্রকে ক্রোড়ে বা স্কন্ধে করিয়া বহন আদর্শ পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১৮। আজ যে মেওক্লেস অশোকারিষ্ট অশ্বান প্রভৃতি ঔষধের শত শত বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রগুলি অঙ্গে বহন করিতেছে, আজ যে শত সহস্র দীনা কাঙ্গালিনী বঙ্গ বিধবা মর্ম্মস্পর্শী বেদনা বক্ষে বহন করিতেছে, আচার বিনয় বিদ্যা যাহাদের অঙ্গের ভূষণ ছিল, এবং সমাজে যাঁহাদের শ্রেষ্ঠ আসন ছিল, সেই সকল কুলীনগণের বংশধরগণ আজ যে শিক্ষিত সমাজের ঘৃণার ভার বহন করিতেছেন, আজ যে শত শত উন্নতিশীল যুবককে অকালে স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতে হইতেছে ইহাও বিবাহে অত্যধিক আসক্তির অঙ্গীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৎস! এই আমি তোমাকে বিবাহ পদের ধাতুগত অর্থ বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলাম।

আমার পরম ভক্ত শ্রীমান কল্কিদাস বাবাজী বিবাহ তত্ত্ব নাম দিয়া ইহা বঙ্গদেশে প্রকাশ করিবে। অষ্টাদশ অধ্যায় বিশিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতগীতার ন্যায়, অষ্টাদশ শ্লোকযুক্ত এই বিবাহতত্ত্বও বঙ্গের ঘরে ঘরে বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণগণের ঘরে নিত্য পঠিত হইলে বাঙ্গালার সুদিন আবার ফিরিয়া আসিবে।"

শ্রীমান্ কার্ত্তিক ভায়ার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, সে তেরা সিঁথি সে কুলধার পাঞ্জাবী, সে পাম্পসু, সে ফিন্ ফিনে চাদর, সে হাতে ছড়ি, সেই পড়নে মিহি শান্তিপুরে ধুতি কিছুই নাই। তার পরিবর্ত্তে বর্ম্ম আচ্ছাদিত অস চর্ম্ম সুশোভিত বীরত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তিতে ভায়া দাঁড়াইয়া; পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন— "বাবা আমি যুদ্ধ করিব, বিবাহ করিব না।"

"বিবাহতত্ত্ব" শ্রবণের ফল হাতে হাতে দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে বাবাকে প্রণাম করিলাম। মাথা তুলিয়া দেখি বাড়ীতে বিছানায় বসিয়া আছি—গৃহিনী ডাকিতেছেন— "ভাত যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল, খাবেনা; খাইতে চলিলাম কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম যে এই "বিবাহতত্ত্ব" শুনিয়া বাঙ্গলার কার্ত্তিকগুলির এই প্রকার পরিবর্ত্তন হইবে কি?"

শিক্ষক ও ছাত্র।

ছাত্র কহে—গুরু তুমি মহাজ্ঞানবান,
এ ভবে শিক্ষক নাহি তোমার সমান।
শিক্ষক বলেন - মিছে এত মতভেদ
আমি দেখি—তুমি আমি রয়েছি অভেদ।
সম্মুখে অসীম এই জ্ঞান পারাবার,
আজো কিছু লভিনাই রত্নরেণু তার।
অপার শিক্ষার ক্ষেত্র, অমূল্য সে ধন,
সে ক্ষেত্রে আমিও ছাত্র তোমার মতন।

শ্রীযামিনীকুমার রায় বিদ্যাবিনোদ।

প্রাপ্তি।

(১)

সতীশ ও সুরবালার মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রীর গুরুতর সম্বন্ধটাকে ছাপাইয়া স্বামী স্ত্রীর মিষ্ট সম্বন্ধটুকু কোন কালেই আত্মপ্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে নাই। সতীশ নিজে বই ভালবাসে, অন্য কোনদিকে দেখিবার বা চিন্তা করিবার তাহার কোন ফুরসৎ নাই। সে অবস্থাপন্ন লোক, তাহাকে টাকার জন্য পড়াশুনা করিতে হয় না। স্কুলে ছাত্র ঠেঙ্গাইতে হয় না। বেলা ৯টায় সন্ধিপূজার উৎসর্গীকৃত অজ পুত্রেরই মত শীত-গ্রীষ্ম-নির্ব্বিশেষে নিজকে চুবাইয়া আনিয়া তাড়াতাড়ি কতকগুলি ডালভাত নাকে মুখে গুঁজিয়া দিয়া, তাহাকে দৌড়াইতে হয় না। অভ্যাস মত নিজের পড়িবার ঘরে বসিয়া সে বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন থাকিত। কখনও বা কোথাও একটু নুড়ি কুড়াইয়া পাইয়া তাহা হইতে একটা গভীর ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিবার বিফল প্রয়াসে সে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইত। আর সুরবালা বসিয়া বসিয়া তাহার গ্রন্থকীট স্বামীটার

অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে হাসিত। সতীশ কখনও তাহার খবর রাখিত, কখনও রাখিত না। অনেক সময় সতীশ তাহার নিজের আবিষ্কৃত কোন গূঢ় তথ্য স্ত্রীকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইত। সে বেচারী অপলক নেত্রে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া তাহার সেই সম্ভব অসম্ভব সকল কথাই শুনিয়া যাইত এবং কখনও বা তাহাতে সায় দিত কখন বা দিত না। কিন্তু তাহাতে বক্তার উৎসাহের কোন ব্যতিক্রম লক্ষিত হইত না; সে অনর্গল বকিয়া যাইত।

সতীশের বয়স তেইশ, সুরবালার পনর। দুই বৎসর হয় বিবাহ হইয়াছে। চারি বৎসর সতীশের পিতার কাল হইয়াছে। বিধবা মা নায়েব গোমস্তার সাহায্যে জমিদারী দেখেন। সতীশ বই আর নুড়ি লইয়াই ব্যস্ত; পুস্তকের মোহ কাটাইয়া বিষয়লিপ্সা বা সুরবালার সৌন্দর্য্যের মোহ তাহার চিত্ত আলোড়িত করিতে পারিল না। আর, সুরবালার অন্তরে যে নারীর অপূর্ণ বাসনা গুমরিয়া কাঁদিতেছিল তাহা সতীশের চক্ষে একদিনের জন্য ও ধরা পড়িল না। সুরবালা সুন্দরী, কিন্তু কেণ্ট হারবার্ট স্পেন্সার লইয়া ব্যস্ত থাকায় সতীশ তাহা লক্ষ্য করিবার ও অবসর পায় নাই। মাঝে মাঝে সুরবালা তাহার নিপুণ হস্তদ্বারা স্বামীর বইগুলি গুছাইয়া রাখিত, তাহার খুঁটিনাটি কাজগুলি করিয়া যাইত। ধ্যানমগ্ন যোগীর মত সতীশ তাহা দেখিয়াও দেখিত না। আর কত যে বিনিদ্র রজনী সুরবালা উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত তাহারও খোঁজ করিবার মত তাহার অবসর হইত না। এমনি করিয়া অপূর্ণ বাসনার বেদনা লইয়া সুরবালার, এবং বই ও নুড়ি লইয়া সতীশের দিনগুলি কাটিতেছিল। একদিন মা ধরিয়া পড়িলেন "সতীশ, এখন যা হোক তোর বয়স হয়েছে, একবার নিজে গিয়া মহালগুলি দেখে আয়, বেশ দুই পয়সা তাতে ঘরে আসিবে এবং প্রজারাও তাহাদের নূতন মনিবকে দেখিয়া সুখী হইবে। মায়ের কথায় সতীশ বিস্তর আপত্তি দেখাইয়া পরে স্বীকৃত হইল। তখন বর্ষাকাল; একটা প্রকাণ্ড বজরা ভাড়া করা হইল, সঙ্গে চলিল নায়েব হরিচরণ দত্ত, ভৃত্য পরাণ ও একজন বামুন ঠাকুর।

(২)

বর্ষাকাল। নদীগুলি কূলে কূলে ভরা। নৌকা স্থানে স্থানে লাগে, সতীশ মধ্যে মধ্যে বাহিরের দৃশ্যগুলি দেখে, আর সময় তাহার বইগুলির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া সংসার ভুলিয়া গিয়া সেই ভাবনায় তন্ময় হইয়া পড়ে।

সে দিন সারাদিন রাত বৃষ্টির বিরাম নাই; দিন পনর ক্রমান্বয়ে নৌকায় কাটাইয়া সতীশ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল এবং কালীগঞ্জের কাছারিতে নৌকা লাগাইয়া নায়েব মহাশয়কে বলিয়া কাছারী বাটীটা একটু পরিস্কার করাইয়া সে সেখানে উঠিয়া গেল। বলা বাহুল্য বইগুলিও তাহার সঙ্গেই গেল। এইগ্রামে সতীশের পিতা বর্ত্তমানে তিনি মধ্যে মধ্যে আসিতেন। নূতন জমিদার গ্রামে আসিয়াছে শুনিয়া দলে দলে গ্রামবাসী লোকেরা তাহাকে দেখিতে আসতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সঙ্গে একটু আধটু মিলামিশা করায় তাহাকে যে গ্রন্থ কীটটা পাইয়া বসিয়াছিল সে যেন একটু নিস্তেজ হইয়া পড়িল। প্রসঙ্গক্রমে সে জানিতে পারিল যে সেই গ্রামের ভূতপূর্ব্ব জমিদারের একমাত্র ওয়ারিস মতিলাল মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছে। পূর্ব্বে মতিলালের পিতাই এই গ্রামের জমিদার ছিলেন। তাহার স্বল্পাবশিষ্ট যথাসর্ব্বস্ব ঋণের দায়ে গিয়াছে। বাড়ীখানার জীর্ণসংস্কার করিবার মত অবস্থাও আর তাহার নাই। এই দুরবস্থার কথা শুনিয়া সতীশের ইচ্ছা হইল একবার তাহাকে দেখিয়া যায়। পাড়ার মাতব্বরে বা তাহাকে লইয়া সেই অকৃতজীর্ণসংস্কার গৃহে লইয়া গেলেন। মৃত্যুর করাল ছায়া রোগীর মুখে ঘনাইয়া আসিয়াছে, আর তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার স্ত্রী। শিয়রের দিকের ক্ষীণপ্রভ প্রদীপটার মত ও শুশ্রূষা পরায়ণা পত্নীর অপলক নয়নদ্বয়ের ক্ষীণদৃষ্টিরই মত রোগীর জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল—কখন বাহির হইয়া যায়। আর দারিদ্র্যের চিহ্নগুলি যম কিঙ্করের মতই যেন তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

(৩)

সেই মৃত্যুশয্যার পাশে স্থির সৌদামিনীর মত অচঞ্চলা গললগ্নীকৃতবাসা, লক্ষীন্দরের শবক্রোড়ে বেহুলারই মত মতিলালের অষ্টাদশবর্ষীয়া স্ত্রী সুপ্রভা বসিয়াছিল। যম কিঙ্করেরাও বোধ হয় তাহার মুখের উপর যে সতীত্বের তেজ

প্রকটিত হইয়াছিল তাহা দেখিয়া অগ্রসর হইতে পারিতে ছিলনা, বুঝিবা সাবিত্রীর সতীত্বের কথাই তাহাদের মনে পড়িয়াছিল। সুপ্রভা বোধ হয় ভাবিতেছিল, "ঠাকুর এ জীবনের সমস্ত সাধ আমার ব্যর্থ করিয়া দিওনা। আমার সংসারে যে আর কেউ নাই"

এমন সময় সতীশকে লইয়া রামপ্রাণ দত্ত সেই মুমূর্ষর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সতীশ আসন্ন মৃত্যু মতিলালকে দেখিল, মূর্ত্তিমতী শুশ্রূষার মত সুপ্রভাকে দেখিল, দুঃখে ও সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। তাহার মধ্যে পাঠলিপ্সা ব্যতীত আর কোনও প্রবৃত্তি ইতিপূর্ব্বে স্থান পায় নাই। কাজেই এই করুণ দৃশ্য তাহার বড় বাজিল। দেখিতে দেখিতে রোগীর অবস্থা খারাপ হইয়া আসিল। তারপর—তারপর—সব ফুরাইল।

ক্রমে ২।৪ জন করিয়া অনেকে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং সকলে মিলিয়া কোন মতে তাহারা দাহ কার্য্য সমাধা করিল। বাঙ্গালীর অন্য যে দোষেই থাকুক এমন সময় কেহ কিছু মনে রাখে না। নায়েব মহাশয়ের প্রমুখাৎ সতীশ মতিলালদের সকল সংবাদ জানিল। আর শুনিল যে সুপ্রভার পিতৃকুলে ও কেহ নাই। আর এ দিকে ত এই অবস্থা।

সতীশ নায়েব মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সুপ্রভাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাওয়া স্থির করিল। সুপ্রভার দাড়াইবার যায়গা ছিল না; সে সহজেই স্বীকৃত হইল। যথাসময়ে মতিলালের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য শেষ হইল। সতীশই তাহার ব্যয় ভার গ্রহণ করিল। তারপর সতীশ সুপ্রভাকে লইয়া বাড়ী ফিরিল।

এবারের এই নৌকা বিহারের ফলে সতীশ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার ভিতরের গ্রন্থকীটটা তাহাকে ছাড়িয়া পালাইল। সমগ্র সংসারে সে একটা নবীনতার সাড়া দেখিতে পাইল। একটা অপরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি সে আজ তাহার নূতন চক্ষে দেখিল। এবং সুন্দরী সুপ্রভাকে সে যে চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল তাহাকে কোন ক্রমেই শ্রদ্ধা বা সহানুভূতির চক্ষের দেখা বলা যায় না। তাহার ভিতরের যে সকল প্রবৃত্তিগুলি বইএর নীচে চাপা পড়িয়াছিল সেগুলি ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিল। সুরবালার দিকে যে কোন দিন চাহিয়াও দেখে নাই সুপ্রভাকে দেখিয়া সে মজিল। সুরবালা সুপ্রভার প্রতি স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিল কিন্তু বরাবর যেমন এখনও তেমনি সর্ব্বংসহা বসুমতীরই মত তাহা সহ্য করিল। ক্রমে সুপ্রভাও কেবল যে দয়া ও সহানুভূতি প্রনোদিত হইয়াই সতীশ তাহাকে স্থান দেয় নাই তাহা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়াও সে প্রথমতঃ কিছু দিন কিছু বলিল না। কিন্তু সে দিন যখন তাহার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে গিয়া সতীশ বলিল যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত এবং লোকের মুখ এবং সমাজের শাসন এই দুয়ের ভয় হইতে মুক্ত হইবার মত অর্থ তাহার মজুত আছে তখন সুপ্রভা ঘৃণার সহিত তাহার ঘৃণিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল এবং এক বস্ত্রে সেই দিনই তাহারবাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল; সুখ ও ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন তাহাকে লুব্ধ করিতে পারিল না।

(৪)

যখন সুপ্রভার প্রতি সতীশের অনুরক্তি সুরবালার চক্ষে ধরা পড়িল, তখন হইতে সুরবালা হৃদয়ের যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্য সাংসারিক কাজের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া ফেলিল। সতীশ সুপ্রভাকে যে ভাবে পাইতে চায় এখন আর সুরবালা স্বামীকে তেমন ভাবে পাইতে চাহিল না। সে এখন স্থির করিল, সেবার ভিতর দিয়া স্বামীকে পাইতে হইবে। তাই স্বামীর কোন কাজ অপর কেহ করিলে তাহা তাহার মনঃপূত হইত না। সে নিজেই স্বামীর সকল কাজ করিত, সতীশের ছাতাধরা বইগুলি সেই ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিত, শয্যা প্রস্তুত করিত। হাত পা ধুইবার জলটুকু পর্য্যন্ত অপর কেহ দিলে তাহার মনে হইত যেমন হওয়া উচিত তেমন বুঝি হইল না। সতীশ যখন সুপ্রভার মোহে মুগ্ধ, তখন স্ত্রীর এই অক্লান্ত সেবা তাহার চক্ষে ধরা পড়িল না কিন্তু যখন ধরা পড়িল, তখন সুপ্রভাও চলিয়া গিয়াছে, আর কোন ক্রমেই লজ্জা ও সঙ্কোচের ব্যবধান করাইয়া সে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিতে পারিত না। সুরবালা স্বামীর সেবা করিয়াই তৃপ্ত, কামনা বাসনা, লালসা পিপাসার আগাছা কুগাছাগুলি সে তাহার মন হইতে সরাইয়া ফেলিয়া পতিভক্তিরূপ বৃক্ষের মূল সেবার সলিল সিঞ্চন করিয়া তাহার প্রীতিসাধনের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিল।

নানা প্রকার প্রবৃত্তিগুলির সহিত কিছুদিন যাবৎ লড়িয়া লড়িয়া সতীশ অসুস্থ হইয়া পড়িল। ক্রমে দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিল। সুরবালা প্রাণ ঢালিয়া দিয়া স্বামী সেবায় নিযুক্ত হইল। তাহার পর ক্রমে যখন মৃত্যুর মুখ হইতেই সতীশ ফিরিয়া আসিল তখন সে দেখিল সুরবালার মুখে একটা স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতিভাত; নারীত্বের মর্য্যাদা হানির কথা স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আর সুরবালার মুখ বিজয়ের উল্লাসদীপ্ত সে ঊর্দ্ধমুখে জোড়করে কহিল "ঠাকুর স্বামীকে যেন সেবার ভিতর দিয়াই চিরদিন পাই। আর যেন কিছু চাই না। অন্য কামনা লালসা যেন মনে কখনও উদয় না হয়।"

সতীশের প্রত্নতত্ত্ব সাধনা চলিয়া গিয়াছে। সে চায় এখন সেই স্থলে সুরবালাকে পূর্ণভাবে পাইতে। সুরবালার আর সে সাধ নাই; সে স্বামীকে সেবার ভিতর দিয়া প্রাণে অনুভব করিতে চায়—লালসার তীব্র দাহন হইতে সে মুক্ত।

মানের বিচারে যান-হারা।

রেল ষ্টেশনের প্লাটফরমেতে
এক জোলা কুলু আর
কথায় কথায় দিল পরিচয়,
কেমন ব্যবসা কার।
জোলা কহে "ভাই কুলু মহাজন
তুমিত সামান্য নও,
দুনিয়া রোশনাই করিতে সতত
ব্যস্ত কর্তা রহ।
অসাধ্য সাধন, স্পন্দনের প্রায়
সমাধা তোমার গুণে
অনায়াসে করে, আহা কি আশ্চর্য্য!
সে কথা যে-ই তা শুনে।
সুতরাং আর তর্ক মিছা ভাই,
তুমি যে আমার বাড়া,
মানের বিচারে, উচিত তোমার
প্রথমে গাড়ীতে চড়া।"
"আরে রাম রাম, একি কথা ভাই,
তুমি 'জোলা' মহাশয়!
'দুনিয়া আব্রু' করিবারই লাগি
তোমার জনম হয়।
সত্যযুগ হ'তে দে'খতেছি দাদা
তোমার কৃপার ফলে
সকলি মোহিত,— লজ্জাবারণ
করিছে তোমার বলে।
সুতরাং ভাই, দেখিনু বিচারি
মান যে তোমারই বড়,
অতএব শুন, তর্ক নাহি করে
অগ্রে গাড়ীতে চড়"।
কে যে বেশী মানী, কে উঠিবে আগে—
উঠিল তর্কটা বেড়ে;
মীমাংসার লাগি, অপেক্ষা না করি
ট্রেইন চলিল ছেড়ে।
তর্কের শেষে, জানিল যখন
কার মান বেশী কম,
শূন্য প্লাটফরম্, দেখি দু'মানীর
আটকে রহিল দম।

শ্রীকুমুদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সাহিত্য সংবাদ।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত সচিত্র "সেকালের চিত্র" সত্বরই বাজারে বাহির হইবে। ইহাতে ময়মনসিংহের প্রাচীন বহু জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশিত হইবে। মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

"ময়মনসিংহ এলবাম" নামে একখানা সচিত্র "এলবাম প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে প্রায় শতাধিক হাফটোন ছবি থাকিবে। জেলার ঐতিহাসিক চিত্র এবং ময়মনসিংহের যাঁহারা গৌরব, তাঁহাদের চিত্র ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইবে। যাঁহারা পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ স্থায়ী রাখিতে চান তাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রয়োজন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য সৌরভ আফিসে পত্র লিখুন।

নরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত সচিত্র ভীষ্ম পুজার বাজারে বাহির হইবে। মূল্য ॥০ আনা।

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত, সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।